সমাজ বিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি

কৃষ্ণ গোপাল কুণ্ডু

ও

অধ্যাপক সুবোধ কুমার মুখার্জী
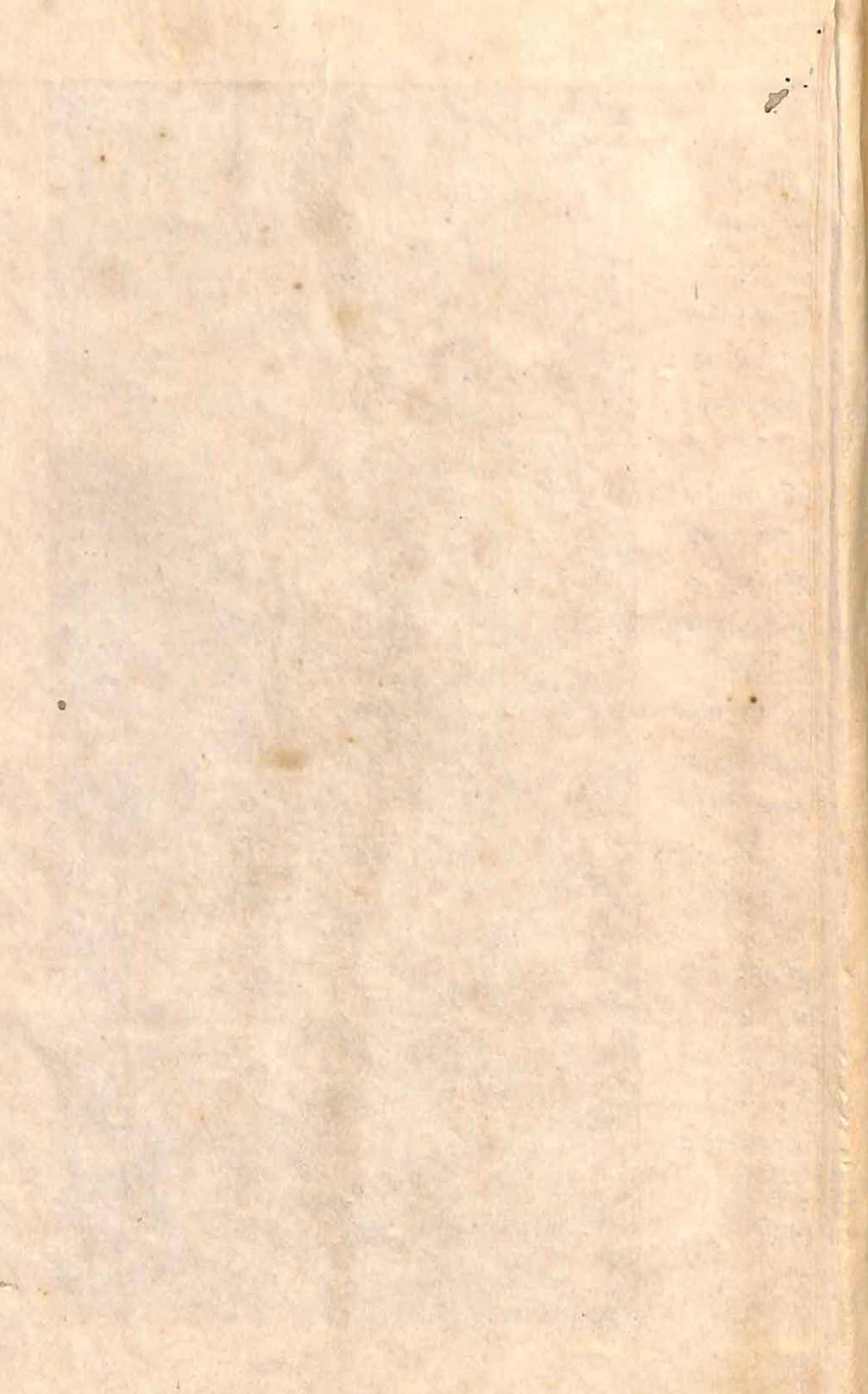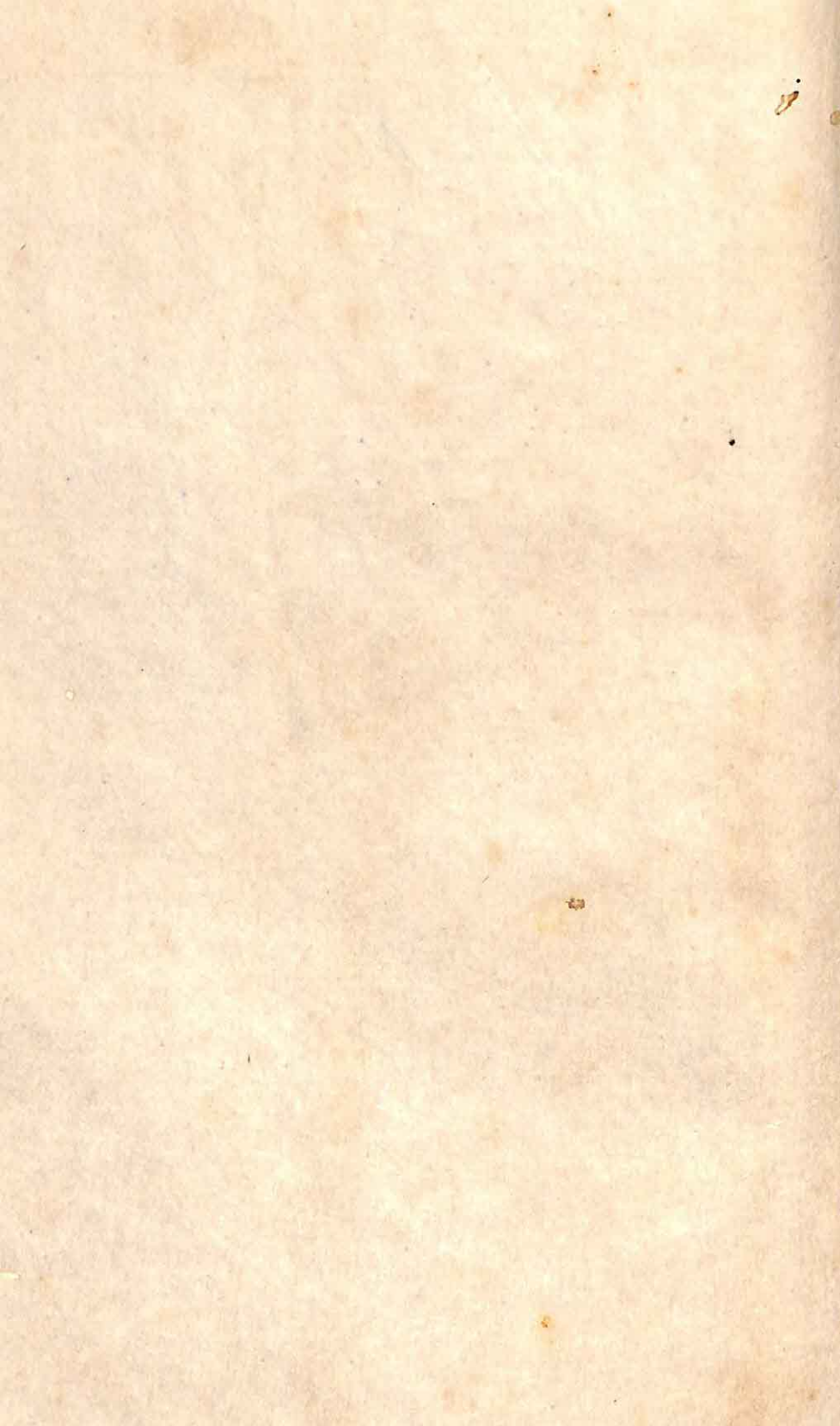
কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, কল্যাণী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের
বি, টি সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।

সমাজবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি

[A Text Book on the Method of teaching Social Studies]

কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু এম. এ., বি. টি

অধ্যাপক সুবোধকুমার মুখার্জী এম. এ., বি. টি

স্নাতকোত্তর শিক্ষা এবং শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগ

এডুকেশনাল বুক করপোরেশন

পুস্তক প্রকাশক

৪।এ কীর্তিবাস লেন

কলিকাতা-২৬

প্রকাশিকা—
এডুকেশনাল বুক করপোরেশনের পক্ষে
শ্রীমতী শোভারাণী চক্রবর্ত্তী
৪এ, কীর্তিবাস লেন,
কলিকাতা-২৬

দ্বিতীয় সংস্করণ

পরিবেশক—
স্বরাজ ভাণ্ডার
১২৭এ, এস. পি. মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

মুদ্রাকর—
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
মনমোহন বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য—৯·০০ টাকা
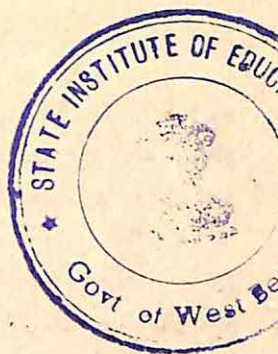
উৎসর্গ

আজীবন শিক্ষাব্রতী

৺ক্ষিতীশচন্দ্র কুণ্ডুকে

গ্রন্থকারদ্বয়।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান বিষয়ে আলোচনামূলক গ্রন্থের বড় অভাব। আমি নিজেও বি. টি. পড়বার সময়ে এই অভাব অনুভব কোরেছি। তাই বি. এল. চক্রবর্ত্তী মহাশয় যখন "সমাজবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি" নামে একখানা গ্রন্থরচনায় অগ্রসর হোতে অনুরোধ কোরলেন তখন তাতে আমি সাগ্রহে সাড়া দিই। গ্রন্থখানির গুণাগুণ সুধী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিচার কোরবেন। তবে বহু ক্রটী যে নানা অপরিহার্য কারণে রয়ে গেছে সে সম্পর্কে আমি নিজেই সচেতন। পরবর্তী সংস্করণে এই সব ক্রটী সংশোধন কোরে গ্রন্থটির উপযোগিতা বৃদ্ধি কোরবার আশা রাখি।

যেসব মূল গ্রন্থের ভিত্তিতে এই গ্রন্থরচনা কোরতে হয়েছে তার সবই ইংরেজীতে। সেই গ্রন্থ থেকে অনেক উদ্ধৃতির প্রয়োজন হয়েছে, কিন্তু সেগুলি বাংলায় অনুবাদ কোরে দেওয়া সম্ভব হয় নি। তার একমাত্র কারণ সময়াভাব পরবর্তী সংস্করণে এই ক্রটী অবশ্যই সংশোধন করা হবে। গ্রন্থখানি বাংলাদেশের সুধী শিক্ষকসমাজের বিন্দুমাত্র উপকারে লাগলেও আমি নিজেকে সবিশেষ অনুগৃহীত বোধ কোরবো। নিবেদন ইতি—

নিবেদক
গ্রন্থকার

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"সমাজবিদ্যা শিক্ষণ পদ্ধতি"র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগে আমরা এ গ্রন্থের বিদগ্ধ পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণের অনেক ক্রটি ছিল, সেকথা আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ কোরেছিলাম। বাংলাভাষায় এবিষয়ে এই বই-ই ছিল প্রথম। আর লিখে প্রকাশ কোরতেও হয়েছিল খুব তাড়াতাড়ি। তাই অনিবার্যভাবেই ঐ ক্রটিগুলি থেকে গিয়েছিল। তথাপি গুণী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যেভাবে গ্রন্থখানির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ কোরেছেন তাতে অভিভূত হতে হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ সকল ক্রটি দূর কোরবার জন্য প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। তা যথাসাধ্য পালন করা হয়েছে। গ্রন্থখানির অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করা হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাগণ যাতে সর্বাধিক উপকৃত হতে পারেন এবং বইখানি যাতে বাংলাভাষায় আলোচ্য বিষয়ে শুধু সর্বপ্রথম গ্রন্থ হিসেবে নয়, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবেও সমাদর লাভ কোরতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই গ্রন্থখানির সংস্কার করা হয়েছে। আশা করি গুণী অধ্যাপকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ পূর্বের মতই গ্রন্থখানির সমাদর কোরে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। এই সুযোগে আমার গ্রন্থখানির বর্তমান প্রকাশিকা মহাশয়ার প্রতি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। বাণীরূপা প্রেসের সুরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় এই গ্রন্থের মুদ্রণকার্যে এবং Proff Reader দুর্গাপদ ঘোষ মহাশয় নানাভাবে সাহায্য করেছেন। নিবেদন ইতি—

নিবেদক
গ্রন্থকারদ্বয়

তারিখ
১লা জুন, ১৯৬৯

CALCUTTA UNIVERSITY

REVISED SYLLABUS FOR THE B. T. EXAMINATION

SOCIAL STUDIES : Full Marks—100

METHODS

I. Meaning and Scope—new trends in the field of social studies :

II. Aims and objectives of social studies—instruction in the secondary school of West Bengal, especially at the senior stage.

III. Patterns of content organisation—principles of correlation, integration and fusion—subject discipline versus integrated approach—merits and defects of the existing syllabuses of social studies for the School Final and Higher Secondary Examination of West Bengal.

IV. Some Methods and techniques peculiarly suited to the teaching of Social Studies—the 'Unit' procedure-preparation of a few sample 'Units' on the basis of the present School Final/Higher Secondary syllabus—Socialized—recitation—Panel discussion and debating methods—the project method, problem of individual differences and assignment methods—importance of concepts and the problem—solving technique—group discussions and committee techniques—interview aud questionaire methods—supervised study, field Trips and excursions—the Social Studies Club and Social life of the School.

V. Utilising Community resources in making Social Studies—instruction effective in the School-Survey of the local community—local studies.

VI. Equipment and room arrangement—the Social Studies Laboratory, need for extending the social studies class room beyond the four walls.

VII, The role of audio—visual materials in Social Studies—Preparation of Maps, Charts, Graph, Diagrams, Picture etc.

VIII. The Social Studies Teacher—his qualifications and preparation.

IX. Need for comprehensive evaluation—Preparation and application of evaluation tools for testing growth in (a) information (b) skills and (c) attitudes —the maintenance of records.

X. Lesson plans and notes.

CONTENTS

On the 'Contents' Side, the trainces would be expected to have a through acquaintance with the subject matter included in the School Final and Higher Secondary of the Board of Secondary Education, West Bengal.

———

KOLYANI UNIVERSITY

CONTENTS AND METHODS OF TEACHING : SOCIAL STUDIES

METHOD :

Planning of instruction and building units of study. Commitee method. Reporting method. Socialised recitation. Text book method. Project method. Problem method. Excursions. Field trips.

Social studies class room. Working towards a democratic climate in the class room. Extending the social studies class room beyond its four walls.

Study of current affairs.

Role of audio-visual materials in the teaching of social studies; Improvising some teaching aids and appliances.

Evaluation : the need for comprehensive evalution ; Evaluating verbal ideas, factual information and curriculum by both teachers and students.

Preparation of lesson plan.

Construction of evaluation tools

CONTENTS :

Man and society.

Forms of human relationship—personal, domestic, social, political, economic, religious, cultural.

Living in the local community. Our basic needs with reference to the region, state and country. The country we live in ; its physical back-ground ; geographical position ; political set-up—the Indian Union and the constituent States.

Evaluation of Indian life and culture through the ages. (only the important epochs and land marks to be touched).

Indian culture ; its characteristic features with reference to religion, language, art, architechture, literature, and fine arts.

The story of India's strugale for freedom. Achievement of independence in 1947. The new constitution. India as a democratic Republic. Welfare State. Reconstruction of New India. The five year Plans.

Man as citizen of the world. Growing inter-dependence of nations and countries. Striving towards world brotherhood and world peace India's role in world affairs.

———

POST GRADUATE BASIC TRAINING COURSE

SOCIAL STUDIES

METHODS

1. Family and enviornment—Man and society—school and community.

2. What are social studies—their relation with the social sciences.

3. Aims, objectives and scope of social studies—Modern trend in education and need for social studies,

4. Organising the modern social studies curriculum—the present—syllabuses of social studies for West Bengal Schools and the problems of integration.

5. Methods and Techniques of teaching—Lecture and Text-book method—unit plan—problem method—project method, socialised recitation—laboratory method and a social studies laboratory—supervised study and the school library—teaching of current events—teacher-pupil planning.

6. Some special activities—dramatisation—debates—drawing—bullietin-board—writen work—field work—local survey,

7. Role of audio-visual aids.

8. Tercher of social studies and his Training.

9. Evaluation in social studies, testing knowledge, attitude and clarity of thinking—written tests and objective measurements—need for follow-up of activities of schools.

———

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

———

সমাজ-বিদ্যা শিক্ষণ-পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

প্রবেশক

মানব অন্যান্য জীব ও বিশ্বপ্রকৃতির সম্পর্ক

সমাজবিদ্যা বস্তুতঃ একটি ব্যাপক অভিধা। সামাজিক, সমাজগত ও সমাজ-সম্পর্কিত যা কিছু, তা-ই এই অভিধার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেদিক দিয়েই দেখতে গেলে মানবসমাজের অন্য সকল অংশ তো বটেই, প্রায় সমগ্র শিক্ষা-ব্যাপারটাও সমাজবিদ্যার কবলগত হয়ে পড়ে। সমাজ অর্থে আমরা জীব-সমাজ না ধরে মানব-সমাজই বুঝব। অর্থ একটু সঙ্কুচিত কোরে নিলেও মানবসমাজের আলোচনা থেকে জীব-সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতির অলোচনা একেবারে বাদ পড়তে পারে না। সমগ্র সৃষ্টি-সংস্থানে জীব ও প্রকৃতির সাথে মানবসমাজ একটা নির্দিষ্ট সম্পর্কে ধৃত হয়ে আছে। সেই আদিম ও চিরন্তন সম্পর্কটাকে মোটেই অস্বীকার করবার উপায় নেই। বনের জন্তুকে আগে আমরা ভয় কোরেছি, এখন ভয় দেখাই ও মমতা প্রকাশ করি—এতে জন্তু সমাজের সাথে আমাদের সম্পর্ক শেষ হয়েছে একথা বলা যায় না। বরং আমরা বলতে পারি, সৃষ্টিজগতে আমাদের অবস্থার সাথে আমাদের আদিম প্রতিবেশীদের প্রতি আমাদের মনোভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু তাদের সাথে আমাদের সম্পর্কটা আমরা মোটেই অস্বীকার কোরতে পারিনে। তাছাড়া আর একটা সম্পর্ক আছে—খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। আমরা আগে ছিলাম হিংস্র জন্তুদের খাদ্য, এখন অধিকাংশ জন্তুই আমাদের খাদ্য। আমরা আধুনিক সভ্য মানুষ, তবু জীবজগতের সাথে আমাদের এই নিষ্ঠুরতার সম্পর্কটার কিছুতেই পরিবর্তন কোরতে পারছি নে। জীবনধারণের মৌলিক প্রয়োজনটাই এই নিষ্ঠুরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। তথাপি আমরা যতদূর সম্ভব আমাদের আদিম সঙ্গীদের প্রতি কোমল ব্যবহার করবার পক্ষপাতী। বিভিন্ন দেশে তাদের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিহারের প্রবল আন্দোলনও বিদ্যমান আছে। উদ্ভিদের প্রতি আমরা আরও বেশী নিষ্ঠুর। তাদের যে প্রাণ আছে সেই কথাটা আবিষ্কার কোরতেই আমাদের উনবিংশ শতাব্দী (স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর আবিষ্কার) পর্যন্ত অপেক্ষা কোরতে হোলো। অথচ উদ্ভিদ শুধু আমাদের নয়, সমস্ত জন্তুসমাজের অন্নদাতা। বা আশ্রয়দাতা। তারা আমাদের নিত্যসঙ্গী, আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের মনন ও

মানব সমাজে প্রাণী ও উদ্ভিদের ভূমিকা

চিন্তনের ওপরেও তাদের অগাধ প্রভাব। এককথায় মানুষের ভৌগোলিক পরিবেশ ও অর্থনীতি আলোচনা কোরতে গেলে প্রাণী ও উদ্ভিদ সমাজের উপযুক্ত ভূমিকা অবশ্যই স্মরণ কোরতে হবে। নৃতত্ত্বের আলোচনাতেও প্রাণিসমাজকে বাদ দেওয়া চলে না। ডারুইনের বিবর্তনবাদে সাধারণ জীবসমাজ থেকেই অসাধারণ মানব-সমাজের উদ্ভব। এককথায়, উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ—সৃষ্টির অতি প্রাচীন কাল থেকেই একসূত্রে বিধৃত হয়ে আছে এবং থাকবে বলেই মনে হয়। ভিন্ন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলে, এদের পরস্পরের সম্পর্ক হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে নিবিড়তর হয়েছে। মানুষ এককালে পশুপালন ও উদ্ভিদের চাষ কোরতো না—কিন্তু এখন সে দুটো তার নিত্য কর্তব্য। মানুষের সমগ্র শিল্পোন্নতির চেষ্টাও বহুলাংশে এ দুটো নিত্য কর্তব্যের ওপরে নির্ভর কোরে আছে। সমাজবিদ্যার বিভিন্ন অংশে বিশ্বপ্রকৃতির আলোচনা অপরিহার্যভাবেই আসে।

সমাজ-গঠনে মানুষের সাফল্য

এইবার মানুষের আভ্যন্তরীণ সমাজের কথা। মানুষ কেন সমাজ গড়লো? এটি একটি মৌলিক জিজ্ঞাসা। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে একটু অনুসন্ধান কোরলেই এই জিজ্ঞাসার মৌলিকত্ব আর অবশিষ্ট থাকে না। ইতর জীবসমাজেও আমরা বিভিন্ন প্রকার পারিবারিক ও গোষ্ঠী সংগঠন দেখতে পাই। পিপীলিকা ও মৌমাছিরা তো এবিষয়ে বেশ অগ্রসর। মানুষ এ ক্ষেত্রে অধিকতর সাফল্যের সাথে আরও বেশী অগ্রসর হয়েছে এই মাত্র। আর মানুষের এই অধিকতর সাফল্যের মূলে যে মৌলিক কারণটি রয়েছে তা হচ্ছে তার সমাজ-সংগঠন থেকে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় হিংসাকে পরিহার করা। যে জীবকুল যতটা হিংসা পরিহার কোরতে পেরেছে ও সেই অনুসারে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান (adjustment) কোরতে পেরেছে, তাদের সমাজ ঠিক সেই পরিমাণে ব্যাপকতর হয়েছে। মানুষ এই হিংসাকে পরিহার করবার জন্যে ক্রমাগত অধিকতর মাত্রায় সক্রিয়, তাই তার সমাজ-সংগঠনও নিত্য ব্যাপকতর হয়ে উঠছে। আজ তারা পৃথিবীব্যাপী সমাজ-সংগঠন কোরতে চলেছে, আর তার সাফল্যের জন্যে জাতিতে জাতিতে হিংসা ও বিশ্বযুদ্ধ পরিহারের জন্য খুবই তৎপর হয়েছে। তবে হিংসা-পরিহার একটা অভাবাত্মক কল্পনা ও ক্রিয়া। এর বিপরীত দিকটি হচ্ছে সহযোগিতা বৃদ্ধি। মানুষ এই সহযোগিতার ভাবাত্মক সূত্রটিকে খুবই সাফল্যের সাথে প্রয়োগ কোরেছে ও করছে! সহযোগিতা দ্বারা হিংসা-পরিহার, সমাজ-সংগঠন ও উন্নতি সাধন - সবই একসাথে হয়ে থাকে। মানবসমাজ তাই ঐক্য ও সহযোগিতার এত মূল্য দিয়ে থাকে। এখন বলা হবে, এই যে মানবসমাজের ঐক্য ও সহযোগিতার প্রেরণা—এটা সমগ্র জীবসমাজের প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রবৃত্তি জীবপ্রকৃতির সার্বজনীন সহজাত

মানুষের হিংসা পরিহার ও পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধান

বৈশিষ্ট্য। আর এরই মধ্যে একটি প্রধান প্রবৃত্তি হোলো যূথ প্রবৃত্তি। অন্য অনেকগুলিও আবার যূথপ্রবৃত্তির সহায়ক। যৌনপ্রবৃত্তি, অপত্য প্রবৃত্তি, কৌতূহল, খাদ্য সংগ্রহ, আত্ম-বিস্তার, আত্মাবমাননা, সংগঠন, অনুনয় প্রবৃত্তি কোন না কোন প্রকারে এই যূথ প্রবৃত্তির সহায়তা কোরে থাকে। এমন কি যুযুৎসা, পলায়ন ও ঘৃণা প্রবৃত্তিগুলিও পরোক্ষভাবে যূথ প্রবৃত্তির আনুকূল্য কোরে থাকে। শেষোক্ত প্রবৃত্তিগুলি আপাতদৃষ্টিতে সমাজসংগঠনের অন্তরায়। কিন্তু এরা জীবকূলকে পরস্পরের সাথে সম্পর্কান্বিত করে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখন বলা যেতে পারে, এই প্রবৃত্তিগুলো তো অন্যান্য জীবের মধ্যেও ছিল, তবে মানুষই কেন এত উন্নতির অধিকারী হোলো? অনেকে আবার মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর জোর দেন। কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে বুদ্ধি একমাত্র মানুষের কেন, অন্য প্রাণীদেরও আছে। বুদ্ধির সাহায্যে শিক্ষালাভ করা যায়, এটা বুদ্ধির একটা ফলিত প্রমাণ (Proof by application)। শেখে অন্য প্রাণীরাও, বিশেষ কোরে গেষ্টাল্ট মতবাদীদের অন্তর্দৃষ্টির পরীক্ষায় বানরের বুদ্ধির তো বেশ প্রশংসাই কোরতে হয়। অতএব বুদ্ধি মানবজাতির একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। বুদ্ধি, চিন্তা ও কল্পনার অতীন্দ্রিয়তাও আজকাল মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার কোরতে নারাজ। বংশগতি, পরিবেশ, সামাজিক অবস্থান (Social position), শিক্ষা প্রভৃতি বুদ্ধির তারতম্যের কারণ হিসেবে নির্ণীত হয়েছে। তাই মানুষের বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় ও ভগবানের বিশেষদান—এসব কথায় আজকাল আমরা আর কেউ কান দিতে চাইনে। তাই মানবের সাফল্যের কারণ আরও গভীরে অনুসন্ধান কোরতে হবে।

যূথ ও অন্যান্য প্রবৃত্তির ভূমিকা

বুদ্ধি

ডারুইনের বিবর্তনবাদে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যবিধান (Struggle) for existenec-যার ফল শ্রুতি সামঞ্জস্য বিধান অথবা বিলোপ) ও সর্বোত্তমের উদ্বর্তনের (Survival of the fittest) কথা বলা হয়েছে। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা অতীতে এমন অনেক প্রাণীর সন্ধান পাই যাদের ভয়ে মানুষই একদিন তটস্থ ছিল। তাদের ভয়ে অন্যান্য প্রণীদের স্বচ্ছন্দ বিহার প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু প্রকৃতির আকস্মিক পরিবর্তনের সাথে তারা আর নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেনি। এটা যে শুধু তাদের বুদ্ধির অভাবে ঘটেছে তা নয়, হয়ত তারা একেবারে বুদ্ধিশূন্য ছিল না। তাদের শারীরিক আকৃতি-প্রকৃতিও হয়ত পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য সাধন করার বিশেষ অন্তরায় হয়ে পড়ে ছিল। এমনতর ক্ষেত্রে উচ্চতর সুবিধা ও ক্ষমতাসম্পন্ন জীবের হাতে তাদের নিধন সহজ হয়ে পড়েছে। শুধু মানুষের মানসিক ক্ষমতাই নয়, তার শারীরিক আকৃতিটিও তার অস্তিত্বের সংগ্রামে বেশ সহায়ক। একমাত্র সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর হাত দুটোর যথেচ্ছ ব্যবহারই কি তাকে কম সুবিধা দিয়েছে। তবে মানুষের দেহ ও মনের গঠন এক মুহূর্তের সৃষ্টি নয়—এগুলিও একটা বিবর্তন-ধারার ফল, যে বিবর্তন ধারা আজও অব্যাহত। মানুষের সাথে অন্যান্য জীবের অস্তিত্বের সংগ্রামে পার্থক্য এই যে মানুষ একজন বিবেচক যোদ্ধা।

অন্যেরা যেখানে ঘটনা ও পরিবেশের দ্বারা চালিত হয়েছে, মানুষ সেখানে পূর্বতন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তী অবস্থার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। আজও আমরা যেমন দেখতে পাই, অন্যান্য জীবের অস্তিত্বের সংগ্রাম মাত্র প্রবৃত্তির তাগিদে, তার মধ্যে বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত বিবেচনার স্থান খুব বেশী নয় অথবা পিপীলিকা ও মৌমাছির ন্যায় তা বাঁধা নিয়মের গণ্ডীও অতিক্রম করেনা—যদি তাদের মধ্যে হটাৎ কোন পরিবর্তন আসে তা মুখ্যতঃ বাইরের আঘাতের ফলেই আসে। কিন্তু মানুষ যেদিন বুঝতে পেরেছে যে অস্তিত্বের সংগ্রাম একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, এবিষয়ে একটু শিথিলতার অর্থই হচ্ছে অবনতি অথবা মৃত্যু, তখন সে তার বুদ্ধি আর শ্রমশক্তিকে বসে থাকতে দেয়নি। একটা প্রশ্ন, মানুষ এই সত্যটা বুঝল, আর অন্যান্য প্রাণীরা বুঝতে পারল না কেন? এর উত্তর অনেকখানি অনুমানের ওপরেই নির্ভর করে। প্রথমতঃ, প্রাণিকুলের অধিকাংশই এত নিম্নস্তরের যে তাদের কাছ থেকে উল্লেখযোগ্য সচেতন ব্যবহার আশাই করা যায় না। বাইরেও উদ্দীপকের তারা একটা প্রতিক্রিয়া দেখায় বটে, কিন্তু নিজেরাই তেমন একটা উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে না। ক্ষুধা, আত্মরক্ষা, বংশবিস্তার প্রভৃতি মৌলিক ক্ষেত্রে তাদের স্তরের বাঁধা ব্যবহারের ধারাতেই তারা চলে। দ্বিতীয়তঃ উচ্চস্তরের প্রাণীদের মধ্যে মানুষ ছাড়া অনেকেরই শারীরিক বিক্রম ছিল বেশী। তারা তাদের শারীরিক শক্তির ওপরেই বেশী নির্ভর কোরছে এবং সেই পরিমাণে তাদের মস্তিষ্কের ব্যবহার ব্যাহত হয়েছে। অন্যদিকে, মানুষ এই উচ্চস্তরের প্রাণীদের চেয়ে তার নিজের শারীরিক হীনবলতা সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিল। এমন কি, নিম্নস্তরের প্রাণীদের থেকেও নানা বিপদের আশঙ্কাকে সে অবজ্ঞা করেনি। ফলে শুধু শারীরিক শক্তি ও বিক্রমের ওপরে নির্ভর না কোরে সে তার বুদ্ধি ও অপরাপর মানসিক শক্তির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার কোরছে। আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি অস্তিত্বের সংগ্রামে মানুষ একজন সচেতন, বিবেচক যোদ্ধা। অন্য জীবেরা যেখানে আজও পরিস্থিতির দ্বারা চালিত হচ্ছে, মানুষ সেখানে বহুকাল পূর্ব থেকেই পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনতে, তাকে পরিচালনা কোরতে ও প্রয়োজনবোধে নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি কোরতে সক্ষম হয়েছে। বহুকালের এই অক্লান্ত ও সচেতন সংগ্রামের দ্বারা মানুষ আজ তার অন্যান্য জীবভ্রাতাদের চেয়ে দুস্তর ব্যবধানে উন্নীত হয়েছে, সে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত হয়েছে।

অস্তিত্বের সংগ্রামে মানুষের সাফল্য

মানুষের মানসিকশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার

মানবসমাজের আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম

তবে মানুষের এই সংগ্রাম একমাত্র প্রকৃতি ও অন্যান্য জীবের বিরুদ্ধে নয়, তার নিজের মধ্যেও অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানুষ জীব বলেই জীবের মূল প্রবৃত্তিগুলোও তার সহজাত। প্রেম যেমন তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, তেমনি হিংসাও তার একটি সহজাত

তীক্ষ্ম অস্ত্র। এই অস্ত্রের প্রয়োগ শুধু তার নিজের সমাজের বাইরে—অর্থাৎ প্রকৃতি ও অন্যান্য জীবের বিরুদ্ধে হয়নি, তার নিজের সমাজে ও এই অস্ত্রের প্রয়োগ চলেই আসছে। তবে আবার সমাজ-সংগঠনের মূলে আছে এই হিংসাপরিহার ও পারস্পরিক সহযোগিতা। মানুষ হিংসাকে পরিহার অথবা খর্ব কোরে সমাজ সংগঠন করেছে, আবার পরক্ষণেই হিংসাকে শাণিত অস্ত্র হিসেবে মানুষের বিরুদ্ধেও প্রয়োগ করেছে। মানব-ইতিহাসে এ এক বিস্ময়—তবে এই বিস্ময় ব্যাখ্যাতীত নয়। মানুষের সমাজ আদিতে খুবই ছোট ছিল। একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত একই অরণ্যে বা একই অঞ্চলে একটি দল বাস কোরতো। সেই অঞ্চলে শিকার ও খাদ্যান্বেষণের অধিকার ছিল একমাত্র তাদের। এই প্রাথমিক গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দল যখন আর একটু বিস্তৃততর রূপ ধারণ কোরলো, তখনই তাদের আমরা এক একটি উপজাতি সমাজের আকারে দেখতে পাই। সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতির দ্বারা তখন তারা ঘনিষ্ঠভাবে প্রভাবিত হয়েছে। অন্য নানা প্রাকৃতিক ঘটনা ও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাদের নিজেদের ব্যাখ্যানুসারে নানা বিশ্বাস আচার, ব্যবহার ও প্রথার মাধ্যমে তাদের মজ্জাগত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী অপর উপজাতি সমাজগুলোকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতে বাধ্য হোতো—কারণ খাদ্য-সংগ্রহের ক্ষেত্রে তারা ছিল সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী। তাছাড়া, মানুষের চলনশক্তিও ছিল সীমাবদ্ধ, সেইজন্য তাদের পরিচিত অঞ্চলের গণ্ডী পেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ও আগ্রহও ছিল সীমিত। কিন্তু খাদ্যাভাবে ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নির্দিষ্ট জন্মস্থানের মোহ এইসব উপজাতি-সমাজকে অনেক সময়েই ত্যাগ কোরতে হয়েছে। সেই অঞ্চলে অন্য উপজাতির এলাকায় হানা দিতে হয়েছে। ফল হয়েছে সংঘর্ষ। সংঘর্ষের পরে এসেছে বিজিত ও বিজেতা উপজাতিগুলির বিচিত্রতর মিলন। এইভাবে আবার একটা বৃহত্তর আঞ্চলিক সমাজ গড়ে উঠেছে। এর পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের দেশে এসেছে প্রাদেশিক ও জাতীয় সমাজ। আর আজ পৃথিবীতে এর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৃথিবীব্যাপী এক আন্তর্জাতিক মানবসমাজ গঠনের চেষ্টা চলেছে। আজও আমরা অঞ্চল বা রাষ্ট্রভিত্তিক সমাজগুলির মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারিনি। এ হচ্ছে মানুষের নিজেদের মধ্যে সেই আদিম অবিশ্বাসের জের। আবার এর বিপরীত দিকে আমরা কিন্তু সেই আদিমকাল থেকেই অনুসৃত সহযোগিতা ও যৌথ-উন্নতির নীতি প্রয়োগ কোরে চলেছি। মানুষের এই ক্রমিক সমুন্নতি ও অত্মপ্রসারের মধ্যে সমাজের সকল ক্ষেত্রেই তাদের অভিজ্ঞতা ও নব নব আবিষ্কার প্রধান ভূমিকা গ্রহণ কোরেছে। তথাপি মানুষের চলন শক্তির প্রসার, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নতি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। সংক্ষেপে, মানুষের আধুনিক বিশ্বসমাজ-সংগঠনে উত্তরণের ক্ষেত্রে আমরা অন্ততঃ চারটি ব্যাপক পর্যায় দেখতে পাই :—

প্রেম ও হিংসা

আদি সমাজ গোষ্ঠী, উপজাতি

প্রাদেশিক ও জাতীয় সমাজ, বিশ্ব-সমাজ গঠণের চেষ্টা

(১) প্রাথমিক পর্য্যায়, উপজাতি সমাজে উত্তরণের কাল পর্যন্ত। এ সময়ে একটি উপজাতির নির্দিষ্ট জন্মস্থানই ছিল তাদের বসবাসের কেন্দ্র।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়, আঞ্চলিক সমাজে উত্তরণের কাল পর্যন্ত। বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত একটি অঞ্চল তখন সমাজের কেন্দ্র। এই সব উপজাতিরা নিজেদের মধ্যে বিরোধের অবসানে এক নতুন সংহতি লাভ কোরছে। এই পর্যায়কে আমরা এক একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক সমাজ বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সমাজ বলে উল্লেখ কোরতে পারি।

(৩) এই পর্যায়ে আছে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমাজের সম্মিলনে জাতীয় সমাজে উত্তরণ। এই সমাজের কেন্দ্র একটি দেশ বা রাষ্ট্র। আঞ্চলিক সমাজগুলো নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের পর নিজেদের মধ্যে বৃহত্তর ও বিচিত্রতর মিলন লাভ কোরেছে। এই মিলনই নতুন জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় সমাজ।

(৪) চতুর্থ পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় সমাজের পৃথিবীব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সমাজে উত্তরণের কাল চলেছে। এরও পেছনে বহু ছোটখাট যুদ্ধ ও সংঘর্ষ তো আছেই, এমনকি দু দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটেছে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা কাজ কোরছে। আজ মানুষের বোঝাপড়া চলছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সমাজ সংগঠনের জন্য। এর কেন্দ্রভূমি আমাদের সমগ্র পৃথিবী।

আমরা উপরের আলোচনা আর একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো, হিংসা ও সহযোগিতা পরস্পর-বিরুদ্ধ নীতি বটে, তবে মোটের ওপর, মানুষ তার সমাজ গঠনে হিংসার ওপরে সহযোগিতাকেই স্থান দিয়েছে, অনেক স্থলেই হিংসা নামক অস্ত্রটিকে সহযোগিতা অর্জনের উপাদান হিসেবে প্রয়োগ কোরেছে। **মানুষ একটি জটিল জীব, তার সমাজও একটি জটিল জৈব সমাজ। যে কোনো অনুসন্ধানী সমাজবিজ্ঞানীই যদি মানব-সমাজকে তার স্বরূপে উপলব্ধি কোরতে চান তবে তাকে মানবসমাজের এই জৈবসত্তা ও তার জটিল প্রকৃতির কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। ব্যক্তি-মানুষের এককালের বিদ্বেষ যেমন অপর সময়ের ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়, মানব-সমাজের মধ্যেও তেমন একটি জৈব প্রক্রিয়া আছে যার দ্বারা সামাজিক হিংসা ক্রমাগত সামাজিক সহযোগিতায় রূপান্তরিত হয়। মানব-সমাজের এই জৈবসত্তাটি তার ক্রমিক উন্নতি ও আত্মরক্ষার একটি মূল ভিত্তি, বোধ করি সে বিষয়ে আজ আর সংশয় প্রকাশ করা চলে না।**

মানব সমাজের জৈব সত্তা, জটিল প্রকৃতি, জৈব প্রক্রিয়া

সমাজ ও শিক্ষা

মানুষের সমাজ সংগঠনে অভিজ্ঞতা অর্জন ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগের কথা আমরা বলেছি। আসলে এরই নাম শিক্ষা। বর্তমান শিক্ষা যে বিপুল

কলেবর ও পরিধি নিয়ে বিস্তৃত, শিক্ষা আদিতে নিশ্চয়ই সেরূপ ছিল না। তবে তার মৌল লক্ষণগুলি একই ছিল একথা বলা যায়। মানুষ প্রাকৃতিক ও

শিক্ষা—আদিকাল

সামাজিক ঘটনা দেখে দেখে চিন্তা করে, চিন্তা কোরে নতুন পরীক্ষায় ব্রতী হয় এবং নিজের অভিজ্ঞতা নির্দেশের আকারে নিজের সন্তানসন্ততিদের উপহার দিয়ে যায়। যখন গ্রন্থ আবিষ্কার হয় নি মানুষ লিখতে পর্যন্ত জানতো না তখনও এই প্রক্রিয়া চলেছে, আমরা শিক্ষাদানের সেই আদিকালকে আমাদের দেশে শ্রুতি ও স্মৃতির যুগ বলে থাকি। মানুষের পর্যবেক্ষণ ও কর্মশক্তি তাকে চিন্তা, পরীক্ষা ও নির্দেশনা—এই তিন আকারে নিজের অভিজ্ঞতার পরিধিকে বিস্তৃততর কোরতে সাহায্য করে। ক্রমে ক্রমে তার চিন্তাশক্তি তাকে উপহার দিয়েছে আধ্যাত্মবাদ ও দর্শন, পরীক্ষণ—প্রচেষ্টা তাকে উদ্বুদ্ধ কোরেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণায়, আর নির্দেশনা (Instruction) ধাপে ধাপে পরিপূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বের রূপ গ্রহণ কোরেছে। অনুকরণ দিয়েই প্রথম মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয়, শিশুরা পিতামাতার ও বয়স্কদের অনুকরণ কোরতে শেখে। কিন্তু সমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিমাণ যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন শুধুমাত্র অনুকরণের দ্বারা আর প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। তখন শিশুর পৃথক শিক্ষাজীবনের ও তাদের শিক্ষাদানের জন্য পৃথক শিক্ষককুলের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে এই শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত হোতো উপনয়ন বা Initiation দ্বারা এবং শেষ করা হোতো ব্রহ্মচর্য কাল অবসানের পর গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করার সময়ে। কিন্তু আধুনিক কালে শিক্ষাকে আর এরূপ খণ্ডদৃষ্টি দিয়ে দেখা হয় না। শিক্ষা বলতে

শিক্ষা—আধুনিক কাল

এখন একটি নিয়ত অভিজ্ঞতা-প্রবাহ বোঝায়। সেই অভিজ্ঞতা প্রবাহের সাথে বহু সূত্র দ্বারা সমাজের সর্বদা অবিচ্ছিন্ন যোগ রয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান 'শিক্ষা' শব্দটিকে নতুন তাৎপর্যমণ্ডিত কোরেছে। **সমাজ পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটী মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ সত্তার পরিপূর্ণ অথচ সামঞ্জস্যময় বিকাশই শিক্ষা। আর এই বিকাশকে প্রতি স্তরে সাহায্য করে আধুনিক মনোবিজ্ঞান। সমাজবিজ্ঞান শিক্ষাকে একটি নতুন "দর্শন" দান করেছে আর মনোবিজ্ঞান তাকে কার্যকরী করার পথ দেখিয়েছে** সংক্ষেপে, মানুষের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে নির্দেশের দিকটি যেভাবে বিকাশ লাভ কোরেছে, তা হোলো এই—প্রথমতঃ অনুকরণ প্রক্রিয়া, দ্বিতীয়তঃ দীক্ষাদান (Initiation) প্রক্রিয়া, তৃতীয়তঃ সর্বাত্মক বিকাশ বা শিক্ষা। কিন্তু এই শিক্ষা আজ সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে সত্তার বিকাশ অবশ্যই ধরতে হবে। আর সামাজিক সত্তার বিকাশ ব্যক্তি সত্তার বিকাশ

সমাজ বিজ্ঞান ও শিক্ষার গভীর সম্পর্ক

নিরপেক্ষ নয়। আবার সমগ্র সমাজের বিবর্তনও এই প্রক্রিয়ার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংশ্লিষ্ট। মোটের ওপর, শিক্ষা আর সমাজ বিজ্ঞান আজ আর দুটো পৃথক বিদ্যা বা শাস্ত্র হিসেবে টিকতে পারছে না। যতই দিন যাচ্ছে ততই, উপলব্ধি করা যাচ্ছে সমাজ-

বিজ্ঞান ও শিক্ষা পরস্পর গভীর সম্পর্কযুক্ত। বস্তুতঃ আজ এই দুই শাস্ত্র মিলে আবার নতুন একটি শাস্ত্রের উদ্ভব হয়েছে যার নাম **শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান**। শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমনি :—
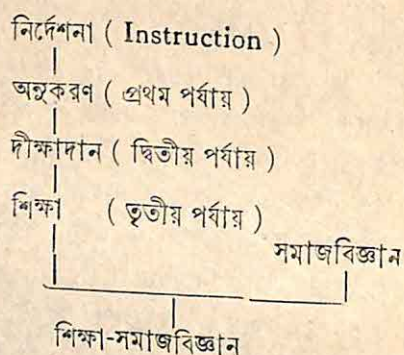
[সমাজবিদ্যার শিক্ষক একাধারে শিক্ষাদান করেন, অন্যদিকে সমাজবিদ্যা দান করেন, এই দুটি কাজ পরস্পরের বিশেষ সম্পূরক। আমরা তাঁর কাছ থেকে এই আশা করি যে তিনি সমাজ-সচেতন ভাবে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা কোরবেন। তার দ্বারা তাঁর সমাজবিদ্যার জ্ঞানদানের উদ্দেশ্য ও প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য— দুই-ই একসাথে সাফল্যমণ্ডিত হবে।]

আমরা আধুনিক শিক্ষা ও তার সাম্প্রতিক সংযোজনা শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান নিয়ে কিছু আলোচনা করলাম। এবার সমাজবিজ্ঞানের মূল নিয়েও কিছু বলা দরকার। সমাজবিজ্ঞানের কথা মানুষ কোন্ পর্যায়ে সচেতন ভাবে আলোচনা কোরতে শিখল তাও আমাদের জানা দরকার। যত স্বল্পতম মাত্রাতেই হোক, মানুষ তার প্রথম আবির্ভাবের পর থেকেই চিন্তা কোরতে শিখেছে। এই দুইয়েরই তৃতীয় অংশ হচ্ছে নির্দেশনা যার কথা আমরা আগেই বলে এসেছি। চিন্তা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা পরবর্তী বংশধরগণের জন্য নির্দেশনার আকার নেবেই। আমরা শিকারী জন্তুদের মধ্যে প্রচুর বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন পাই। তারা যথেষ্ট চিন্তাশীলতা পর্যবেক্ষণশক্তি ও পূর্বতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে থাকে। মানুষ নিঃসন্দেহে এদের থেকে শ্রেষ্ঠতর জীব রূপেই আবির্ভূত হয়েছে। তাই মানুষের আবির্ভাব ও তাদের সমাজ-সংগঠনের সূত্রপাত থেকেই তাদের মধ্যে চিন্তা, পরীক্ষণ ও নির্দেশনা শক্তির প্রয়োগ দেখা যাবে এতে সন্দেহের কিছু নেই। অন্যদিকে মানুষের চিন্তা প্রকৃতির নানা শক্তিকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করেছিল। ক্রমে সে প্রকৃতির মধ্যে যতই অধিকতর পরিমাণে মূল ঐক্যসূত্র খুঁজে পেতে লাগলো ততই সে সমগ্র প্রকৃতির অধীশ্বর এক সার্বভৌম ঈশ্বরের কল্পনা কোরতে সক্ষম হোলো। এর থেকে সে তার নিজের বাইরে এক বিরাট, সার্বভৌম বহিঃসত্তার কল্পনা কোরে নিল,

সমাজ বিজ্ঞানের মূল

তার সাথে নিজের ঐক্য বিধান কোরে নিল—এককথায় সে এক নূতন "দর্শন" লাভ কোরলো। এই দর্শনের সাথে আবার সম্পৃক্ত আছে তার ধর্ম বা (religion)। মানুষের religion বা নীতিবাচক ধর্মের অনুরূপ কিছু ইতর জীবসমাজে নেই। তার কারণ, তাদের প্রবৃত্তির উর্দ্ধে তাদের কোনো বৃহত্তর আদর্শ বা সাধনা নেই। মানুষের জৈব প্রবৃত্তি এবং বৃহত্তর সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন সর্বদা এবং সর্বকালের। তাই তার আছে ধর্ম এবং দর্শন। ধর্ম এবং দর্শন প্রকৃতি, ঈশ্বর ও মানবকে একসূত্রে বেঁধেছে। আর এদের সম্পর্কে যে সব শাস্ত্র রচিত হয়েছে তাদেরকে একথায় মানব-বিদ্যা বা Humanities বলে। একদিকে এই সামগ্রিক মানববিদ্যা ও অপর দিকে তারই অন্তর্ভুক্ত দর্শনশাস্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছে সমাজ-শাস্ত্রসমূহ, সেগুলি আবার ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতিতে বিভক্ত। শেষোক্তগুলি আবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমনি :—

কিন্তু সমাজশাস্ত্রগুলি শুধু যে মানব-চিন্তার ফল তাও নয়। মানবের পরীক্ষণ শক্তির বাস্তব প্রয়োগ যে সকল নতুন বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে, তাদের সঙ্গেও সমাজশাস্ত্রগুলি অঙ্গাঙ্গী জড়িত। মানুষের পরীক্ষণ শক্তি ভৌত বিজ্ঞান-সমূহের (Physical Sciences) সূত্রপাত কোরেছে। এই ভৌত বিজ্ঞান-সমূহের একদিকে রয়েছে জ্যোতির্বিদ্যা যার সাথে দর্শনশাস্ত্রের সম্পর্ক গভীর ও প্রগাঢ়। আর অন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্র শাখায় আছে জীববিদ্যা ও শরীরতত্ত্ব রসায়নিকবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যাসমূহ। এই বিজ্ঞানগুলি আবার কেউ সম্পূর্ণ পৃথক, অন্যনিরপেক্ষ একটি সত্তা নয়। তাদের পরস্পরের মধ্যে রয়েছে গভীর সংযোগ। আবার জীববিদ্যা ও শরীরতত্ত্বের উভয়েরই অন্যতম প্রধান বিভাগ হচ্ছে মনোবিজ্ঞান। আবার সমাজবিজ্ঞানও যে জীববিদ্যা ও

সমাজ শাস্ত্র ও ভৌত বিজ্ঞান সমূহের সংযোগ

শরীরতত্ত্বের বিশেষ অঙ্গ তাতেও সন্দেহ নেই। [সমাজবিজ্ঞানের এই ভূমিকা সমাজ-বিদ্যা শিক্ষককে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে।] আবার সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এই দুই ভ্রাতৃসদৃশ বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আধুনিক কালে উৎপত্তি হয়েছে সামাজিক মনোবিজ্ঞানের (Sccial Psychology)। আর শিক্ষার সাথে মনোবিজ্ঞানের সংযোগে উদ্ভব হয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের। আর সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার একত্র সংযোগে সৃষ্টি অত্যাধুনিক শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞানের। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এমনি :—

শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি
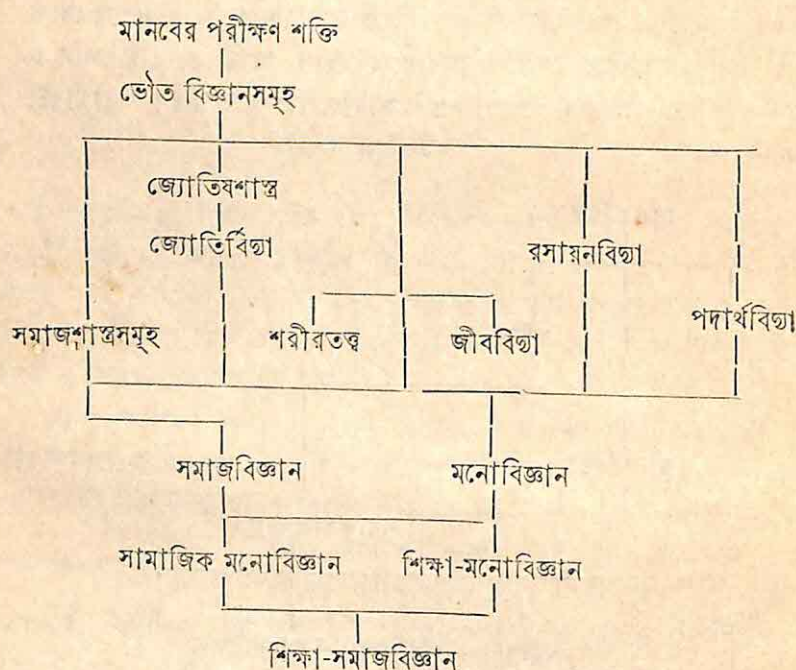
সমাজ সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি

সমাজবিদ্যার শিক্ষককে তাঁর বিষয়ে অন্তদৃষ্টি লাভ কোরতে হলে সমাজশাস্ত্রসমূহ, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উদ্ভবের সূত্রটি জানতে হবে। এইসব বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানও থাকা দরকার এবং সমাজে ও শিক্ষাজগতে এই বিষয়গুলির পারস্পরিক ভূমিকা কি তাও জানতে হবে। বস্তুতঃ আজ পর্যন্ত মানুষ নিজে, তার সমাজ ও প্রকৃতি পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই পরিণতি লাভ কোরে চলেছে,

তার অধীতব্য বিদ্যাসমূহের কোনটিই যেমন অন্যনিরপেক্ষ নয়, তেমনি তার শিক্ষাও সেই সমস্ত বিদ্যা, তার সমাজ ও পরিবেশ নিরপেক্ষ নয়। **সমাজবিদ্যার শিক্ষক সমাজ ও শিক্ষা দুইয়ের সাথেই সংযুক্ত, তাই সমাজ, মানুষ (তার ব্যক্তি ভূমিকা ও সমাজভূমিকা) এবং তার শিক্ষা—এই তিনটি বিষয়েই তাঁর শিক্ষাদান কার্যের সময়ে সুস্পষ্টভাবে নজরে রাখতে হবে। তাঁর শিক্ষাদানের লক্ষ, আদর্শ ও পদ্ধতি নির্বাচনের সময়ে এই তিনের (সমাজ, মানুষ ও শিক্ষা) পারস্পরিক সংযোগ, ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে। তবেই তিনি সমাজবিদ্যা বিষয়ে যথার্থ অন্তর্দৃষ্টি লাভ কোরতে পারবেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তা উপযুক্তভাবে সঞ্চারিত কোরতে পারবেন এবং তাদের প্রকৃত শিক্ষাবিধান কোরতে পারবেন।**

সমাজ, মানুষ ও শিক্ষা—তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া

সমাজবিদ্যার যে ব্যাপক অভিধার কথা আমরা বলে এসেছি, মানবসমাজে বিভিন্ন বিজ্ঞানের উদ্ভব সূত্র আলোচনা কোরেও আমরা তার সমর্থন পাই। সমাজবিদ্যা মানবসমাজ থেকেই উদ্ভূত আর তার কেন্দ্রস্থলে আছে মানুষ নিজে। অন্যান্য বিদ্যাও বিশেষ কোরে ধর্ম, দর্শন ও ভৌতবিজ্ঞানসমূহও এই বিদ্যার বিবর্তনে সহায়তা কোরেছে। **তথাপি মানুষই (তার দ্বৈত ভূমিকায়—ব্যক্তি মানুষ ও সামাজিক মানুষ) সমাজবিদ্যার মূল আগ্রহের বিষয়। সমাজবিদ্যা মানুষকে খণ্ডাংশ হিসাবে বিচার কোরতে চায় না, তার সম্পর্কে জ্ঞানকেও খণ্ডাকারে গ্রহণ কোরতে চায় না, সমগ্র মানবসত্তা ও তার সমাজসত্তাকে এক অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে।** তাই তার ইতিহাস শুধু ইতিহাস নয়, অর্থনীতি শুধু অর্থনীতি নয়, তার রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজনীতি, শিক্ষা—সকলই পরস্পর সাপেক্ষ, সংযোগময় ও সম্পর্কযুক্ত। মানুষ তার সমাজকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য এ কেবল এক একটি দিক থেকে মানুষের ব্যক্তি ও সমাজসত্তাকে অনুধাবন করা এবং তার সমাজের সামগ্রিক রূপটিকে নির্ধারণ করা।

মানুষ ও তার সমাজ সত্তাকে অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে বিচার

সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্য

মানুষের নিজ সমাজের ও তার জ্ঞানভাণ্ডারের বিবর্তনের ইতিহাসের মধ্যেই সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের মূল উদ্দেশ্যও নিহিত আছে। মানুষ চলেছে আজ পৃথিবীব্যাপী এক আন্তর্জাতিক মানব সমাজ গঠন কোরতে, এই সমাজে তার নিজের মধ্যে অবশ্যই হিংসা পরিহার কোরতে হবে। অতীত ইতিহাসের ভুলভ্রান্তি তাকে সংশোধন কোরে নিতে হবে এবং গৌরবময় শিক্ষাগুলিকে সার্বজনীন সম্পদ হিসেবে গ্রহণ কোরতে হবে। ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ, সুবিধা ও অসুবিধারও সম-অংশীদার হতে হবে, বিশ্বের প্রত্যেক মানুষ ও তার আঞ্চলিক

সমাজকে। এই ধারণাকে রূপ দিতে পারে একটা বিশ্বপ্রতিষ্ঠান, আর এই ধারণাকে কিছু পরিমাণে কার্যকরী করার চেষ্টাও কোরে চলেছে বর্তমান রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations Organisation)। কিন্তু এই বিশ্বরাষ্ট্রের ভিত্তি হতে পারে উপযুক্ত বিশ্ব-নাগরিকত্বের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে। এই বিশ্বনাগরিকত্ব শিক্ষাদানের একটি প্রধান উপায় হোলো সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান। **সমাজবিদ্যা মানবের মৌলিক ঐক্য, সহযোগিতা ও পরিণত বিচারবুদ্ধি তথা সমাজ-বিবেকের ওপরে জোর দেয়, যা মানবসমাজ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করে এবং মানুষের নিজের ও তার সমাজের ক্ষেত্রেও বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিচার প্রণালী প্রয়োগ কোরতে শিক্ষা দেয়।** স্কুলপাঠ্য সমাজবিদ্যা অবশ্য তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্র নয়। সেখানে অবশ্য "উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ ভালো"—এই নীতি অনুসারেই পাঠ্যসূচী রচিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব-সমাজের বিবরণ এবং কোন কোন সমাজের বিবর্তন ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানব-অগ্রগতির ছবিটিকে ও তার ক্রম-পরিণতির রূপরেখাটিকে শিক্ষার্থীর চোখের সামনে তুলে ধরা হয়। তত্ত্ব অপেক্ষা তথ্য এখানে থাকে বেশী, তথাপি তথ্যের জঞ্জালও যেন না বাড়ে। শিক্ষক মহাশয় স্বল্পতম তথ্যের সাহায্যে মানব-অগ্রগতির চিত্রটিকে যথাসম্ভব পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে তুলে ধরবেন। **বর্তমান সমাজের উদ্ভব, এর গতিপ্রকৃতি, অনতিদূর ভবিষ্যতে এর পরিণতি, আর এখানে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ভূমিকা কি—এই বিষয়গুলি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত কোরে দিতে পারলে এবং সেই অনুযায়ী তাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত কোরতে পারলে সমাজবিদ্যার শিক্ষক উপযুক্ত সাফল্য লাভ কোরবেন বলে গণ্য করা যেতে পারে।** বস্তুতঃ সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচিও মোটামুটি এই ধারাতেই নির্বাচিত হয়েছে।

বিশ্ব-নাগরিকদের শিক্ষাদান, সমাজ বিবেক, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও বিচার-প্রণালী

স্কুল পাঠ্য সমাজবিদ্যার উদ্দেশ্য

মানব কেন্দ্রমুখী শিক্ষা

সমাজবিদ্যা একটি জগাখিচুড়ী বিষয় নয়। এটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীর একটি সুসম পরিণতি। মানবসমাজে প্রচলিত প্রতিটি বিদ্যাকে খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে বিচার করা ও সেইভাবে তার পঠন পাঠন পরিচালনা করা অপেক্ষা সমস্ত বিদ্যাগুলির মূল উৎস মানবসমাজ ও প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কোরে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রচলিত বিদ্যাসমূহ, বিশেষ কোরে মানববিষয়ক বিদ্যাসমূহ অনুধাবন করা খুবই প্রয়োজনীয়। আজকাল যে কোনো বিদ্যার মূলকেন্দ্র যে মানব অথবা মানবকল্যাণ, গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের ঝোঁকে সেকথা প্রায়ই ভুলে যাওয়ার অবস্থা হয়। বর্তমানের ন্যায় জটিল সমাজ ব্যবস্থায় মানবচিন্তা নিরপেক্ষ জ্ঞানান্বেষণ অনেক সময়েই ভয়াবহ

অমঙ্গলের কারন হয়। এই অবস্থার প্রতিকার কোরতে হোলে সমস্ত মানুষের চিন্তা ও প্রচেষ্টা মানবকেন্দ্র-মুখী করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীকে এইজন্যেই মানবাত্মক চিন্তায়, বিদ্যায়, জ্ঞানসাধনায় ও কর্ম প্রচেষ্টায় অভ্যস্ত কোরে তোলা দরকার। মানব ও প্রকৃতিই সকল বিদ্যার মূল উৎস। অতএব তাদেরকে কেন্দ্র কোরে বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ কোরলে যেমন উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে যথার্থ জ্ঞান লাভ করা যায়, তেমনই শিক্ষার্থীদের কর্ম ও চিন্তাকেও মানবকেন্দ্রমুখী কোরে তোলা যায়। এইজন্যেই আমাদের বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার প্রবর্তনাকে শুধুমাত্র বৈদেশিক অনুকরণ বলে উপহাস করা ঠিক হবে না, অথবা প্রচলিত বিষয়গুলির "জগাখিচুড়ী সমন্বয়" বলে নাসিকা-কুঞ্চন করাও উচিত হবেনা—বরং আমরা আমাদের চিন্তাপদ্ধতি ও শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে উপযুক্তভাবে পরিবর্তন কোরে-মানবাত্মক শিক্ষাদানের জন্য যত্নবান হলেই সমাজের প্রভূত উপকার কোরবো।

মানবাত্মক চিন্তা ও কর্মের আবশ্যকতা

তবে এ কথাও অবশ্যই ঠিক যে, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিটী শাখা-বিদ্যার পৃথকভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে ও থাকবে। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ মাধ্যমিক স্তরেই তাদের শিক্ষা সমাপ্ত কোরবে। তাই এই স্তরে তাদের শিক্ষা খণ্ডদৃষ্টিতে ও খণ্ডিত আকারে না হওয়াই শ্রেয়ঃ। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও গবেষকরা তাদের শিক্ষার গুণেই একটা সমন্বয়মূলক ঐক্যদৃষ্টি লাভ কোরে থাকেন। অতএব তারা প্রতিটী শাখাবিদ্যার গবেষণায় ব্যাপৃত হোলেও তারা সেই বিদ্যার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিত বিস্মৃত হন না। অন্ততঃ তা হওয়ার সম্ভাবনা অল্প থাকে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশের ও মনোগঠনের মূল স্তর, এখানে শিক্ষার্থী অল্প কারণেই ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে এবং মানবসমাজের ও তার নিজের প্রতি ভুল দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোগঠন আয়ত্ত কোরতে পারে। সে সম্ভাবনা রহিত করার জন্যই তার শিক্ষা মানবসমাজ ও প্রকৃতিকে কেন্দ্র কোরে পরিচালিত হওয়া দরকার।

মধ্যশিক্ষার সমন্বয়মূলক ঐক্য দৃষ্টির গুরুত্ব

মানবসমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ঐক্যদৃষ্টি ও উপযুক্ত মনোভঙ্গী দান কোরবে সমাজবিদ্যার শিক্ষা। শিক্ষা বিষয়টি যতই ব্যক্তিগত হোক এটি নিজেও একটি সামজিক প্রক্রিয়া এবং মানবসমাজই এর ভিত্তিভূমি। শিক্ষা যদি হয় সামাজিক পটভূমিতে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত গুণাবলীর বিকাশ, তবে শিক্ষা নিজেও সমাজবিদ্যার একটি মৌলিক অঙ্গ হয়ে পড়ে এবং সমাজ-বিদ্যার শিক্ষা ও কর্ম পরিচালনা শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষালাভ প্রণালীর সাথে অভেদাত্মক হয়ে পড়ে। এদিক থেকে বিচার কোরলে, সমাজবিদ্যা
তাই আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার প্রবর্তনাকে কুণ্ঠার সাথে গ্রহণ
শিক্ষকের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে আর কেউ হতে পারেন না।

শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষায় সমাজ বিদ্যার ভূমিকা

না কোরে বা বিরূপ সমালোচনায় বিপর্যস্ত না কোরে, তাকে আন্তরিক আগ্রহের সাথে সমর্থন জানানো উচিত। সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণও এই বিষয়টি দায়সারাভাবে শিক্ষা না দিয়ে, শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সঠিক কর্ম পন্থার সাথে সমাজবিদ্যার বিষয়-বস্তুকে অন্বিত কোরে নিয়ে তাঁদের হাতে ন্যস্ত শিক্ষার্থীগণের প্রকৃত শিক্ষাবিধান কোরবেন, এই আমার আশা। আশা করি, তাঁদের কাছে আমার এই প্রার্থনা ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের ভরসা বিফল হবে না।

উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সমাজবিদ্যাকে আবশ্যিক শেষ পরীক্ষা-বিষয় (a compulsory subject at the final examination) করা হয় নি। সেটা যে ভালোই হয়েছে এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যের সাথে সুসঙ্গত হয়েছে তা আমরা যথাস্থানে আলোচনা কোরেছি। এক্ষেত্রে তার পুনরুল্লেখ বাহুল্য। তবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের এই ব্যবস্থাকে যেন আমরা ভুল না বুঝি এবং সমাজবিদ্যার শিক্ষাদানে উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ কোরতে বিস্মৃত না হই। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা একটি মূল্যবান সংস্কার। এই সংস্কারকে উপযুক্তভাবে স্বাগত জানানোই আজ আমাদের কর্তব্য।

(ক) পরিবার, ব্যক্তি মানুষ ও সমাজ সংগঠন

বর্তমান আলোচনার উপসংহারের পূর্বে ব্যক্তি ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক আমাদের আর একটু সুস্পষ্ট করার প্রয়োজন আছে। নতুবা সমাজ-বিদ্যার পরিপ্রেক্ষির সম্পর্কে কিছুটা ভুল ধারণার অবকাশ থেকেই যাবে। আমরা আমাদের আলোচনার মধ্যে ব্যক্তি, আঞ্চলিক সমাজ, জাতীয় সমাজ ও বিশ্বসমাজ এবং তাদের পারস্পরিক সংযোগের কথা বলেছি। কিন্তু এই সংযোগ খুবই সহজ প্রক্রিয়ায় সিদ্ধ হয় না। মানুষ তার সমাজের সাথে বড়ই বিচিত্র ও জটিল উপায়ে অন্বিত ও অঙ্গীভূত হয়। মানুষের ব্যক্তিত্ববোধ তার সমাজ সম্পর্কে সচেতনতার অভিব্যক্তি। বস্তুতঃ মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুই মানুষ, একটি জীবমাত্র, যতক্ষণ না সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আঘাতে সমাজ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং নিজের ভূমিকা ও কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ হয়। নিম্নস্তরের চেতনা ও ভূমিকা সম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি যে তাদের কোনো ব্যক্তিত্ব নেই—তার অর্থ এই যে তার ব্যক্তিত্ব সুপ্রকাশ হয় নি ও সুপরিণতি লাভ করে নি। এই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সংঘাতে, কিন্তু মানুষ সব সময় একাকী সমাজের সম্মুখীন হয় না ; বৃহত্তর সমাজের মধ্যে সে তার নিজস্ব সমাজ গড়ে তোলে—যাকে আমরা বলি **গোষ্ঠী**। এই গোষ্ঠীগুলিও এক একটা ক্ষুদ্র সমাজ এবং ব্যক্তিত্বের লালনাগার। **এদের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান হচ্ছে পরিবারের**। মানবশিশুর পক্ষে পরিবারের আশ্রয় একান্ত প্রয়োজন। মানব জীবনের প্রথম একচতুর্থাংশ কাল প্রয়োজন

মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ

গোষ্ঠী, পরিবার

তার লালনপালনের ও তাকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী কোরে তোলার জন্যে। এই সময়ে পরিবারের আশ্রয় তার পক্ষে অপরিহার্য। পরিবারের সদস্য সাধারণতঃ বাবা, মা ও তাদের পুত্রকন্যা। অনেক সময় ঠাকুরদা, ঠাকুরমা অথবা অন্য কোন আত্মীয়স্বজনও পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ কোরতে পারেন বা তার অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। পরিবার কথাটিকেও সমাজবিজ্ঞানীরা আবার দুটো অর্থে বিবেচনা কোরে থাকেন: (১) যে গোষ্ঠী বা বংশ থেকে কোনো মানুষের উদ্ভব, সেই সমগ্র গোষ্ঠী বা বংশকেই তার পরিবার বলা হয়ে থাকে। এটা অবশ্য পরিবার কথাটির ব্যাপক অর্থ। (২) সংকীর্ণ অর্থে বাবা, মা ও ভাইবোনদের নিয়ে যে ক্ষুদ্র সংগঠনে কোনো মানুষ প্রতিপালিত হয় তাকে বলে পরিবার। মানুষের ব্যক্তিজীবনে এই ক্ষুদ্র পরিবার ও বৃহৎ পরিবারের (বংশ) প্রভাব দুইই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ক্ষুদ্র পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে মানুষের সম্পর্ক অতি নিবিড়। প্রতি মুহূর্তে নানাপ্রকার মিলন ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে সে নিজের, অন্যান্য সদস্যদের ও সমগ্র পরিবারের ভূমিকা ও পরস্পর সম্পর্ক বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ এইখানেই তার ব্যক্তিত্বের ও সমাজবোধের প্রথম স্ফুরণ। এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্য দিয়েই সে তার বৃহৎ পরিবারের অর্থাৎ বংশ পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়। সমাজে এই বংশের ভূমিকা কি তাও সে ক্রমশঃ অবগত হয় এবং সে ক্রমশঃ এই পরিবারের গৌরব ও অগৌরবের অংশীদার বলে নিজেকে মনে কোরতে শেখে। এক কথায় সে পরিবারের সামাজিক উত্তরাধিকারের অংশীদার হয় এবং নিজেও সে অংশীদারিত্ব স্বীকার কোরে নেয়। পরিবারের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা নীচের এই উদ্ধৃতি থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারব :—

পরিবারের ভূমিকা

"গ্রোভস্ যেমন বলেছেন, পরিবারের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সেই ঘনিষ্ঠতা আছে এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সেই পারিবারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আছে, যার ফলে পরিবার আমাদের তুলনারহিত এমন কিছু দান কোরতে পারে যা তাকে অন্যান্য গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠান থেকে বিশিষ্ট কোরে দেয়। শিশুদের বলা হয়ে থাকে, "আমাদের পরিবারের আমরা ওরকম কিছু করি না।" পরিবার হচ্ছে একটা "আমরা-গোষ্ঠি" সুনির্দিষ্ট আচরণ মান অনুসরণ করা তার প্রত্যেক সদস্যের ক্ষেত্রে কম বেশী বাধ্যতা-মূলক।" (ব্রাউন, এডুকেশনাল সোসিওলজি, পৃঃ ২১৭)। বস্তুতঃ পরিবার এমনএকটা প্রাথমিক গোষ্ঠী যার মধ্যে প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক নিবিড় এবং পরস্পর "আমরা" এই চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সংঘাত, সামঞ্জস্য-বিধান এবং নিয়ন্ত্রণ সমস্যা রয়েছে; কিন্তু বৃহত্তর সমাজকে কোনো পরিবারের সদস্যরা সেই পরিবারের "আমরা" এই ঐক্যবোধ দ্বারাই লক্ষ্য এবং উপলব্ধি করে এবং সেই অনুসারেই বৃহত্তর সমাজের সাথে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়।

(খ) স্থানীয় প্রাথমিক গোষ্ঠী

আবার পরিবারই একমাত্র গোষ্ঠী নয়। **এর পরে আছে স্থানীয় প্রাথমিক গোষ্ঠী।** সম্পর্কের নিবিড়তায় এবং প্রত্যক্ষতায় পরিবারের পরেই এর স্থান। এখানেও ঐ পূর্বোক্ত "আমরা" বোধ কাজ করে, তবে এই "আমরা" বোধটি পরিবারের ক্ষেত্রে যতখানি সুদৃঢ় ও তাৎপর্যপূর্ণ, এখানে ততটা নয়। আমাদের ক্লাবের সুরেন, আমাদের পাড়ার নন্দ, আমার ক্লাসের সহপাঠী, আমাদের বারোয়ারী সমিতির সভ্যেরা—ইত্যাদি ভাবে এই দ্বিতীয় প্রকারের "আমরা" বোধটি অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে স্থানীয় সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মানুষের সামঞ্জস্য বিধান ও ব্যক্তিত্বের অধিকতর বিকাশ ঘটতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ কোরতে হলে মানুষকে নতুনতর গোষ্ঠীভুক্ত হতে হয়। এই গোষ্ঠীতে পরিবারের ন্যায় সদস্যদের মধ্যে রক্তের বন্ধন নেই, তবে আছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, স্থানীয় নৈকট্য ও কিছুটা সমস্বার্থের বন্ধন। স্থানীয় সমাজকে আমরা বস্তুতঃ অসংখ্য পরিবার ও এই ধরণের স্থানীয় প্রাথমিক গোষ্ঠীসমূহের বিচিত্র-বিন্যাস ছক বলে মনে কোরতে পারি। **এই স্থানীয় প্রাথমিক গোষ্ঠীসমূহও আবার দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনা নিয়ন্ত্রণ করে এবং জাতীর সমস্যার প্রতি ব্যক্তি কি প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কোরবে এবং সেই বিষয়ে কিপ্রকার আচরণ কোরবে তা অনেক পরিমাণে নির্ধারণ করে।**

স্থানীয় প্রাথমিক গোষ্ঠী ঘণিষ্ঠ পরিচয় স্থানীয় নৈকট্য সমস্বার্থ

(গ) মাধ্যমিক গোষ্ঠী সমূহ ও (ঘ) জাতীয় সমাজ

স্থানীয় প্রাথমিক গোষ্ঠীসমূহের পরে আসে **মাধ্যমিক গোষ্ঠীসমূহের কথা।** এগুলি জেলাভিত্তিক, রাজ্যভিত্তিক বা সমগ্র দেশভিত্তিক হতে পারে। সমাজ-বিজ্ঞানীর চোখে এই গোষ্ঠীসমূহের প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ধরণের গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধন নেই, এমন কি প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। তাদের মধ্যে থাকে একটা সাধারণ স্বার্থের চেতনা ও তৎসঞ্জাত বন্ধনসূত্র। যেমন, শ্রমিক সংঘ, বণিক সংঘ, চিকিৎসক সমিতি, শিক্ষক সমিতি, তন্তুবায় সমাজ, কৃষক সমাজ, নানাবিধ ধর্মসম্প্রদায় সংগঠন প্রভৃতি। এই সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যসংখ্যা অনেক ও কর্মক্ষেত্র ব্যাপকতর। তাই এদের সভ্যদের মাঝে সাক্ষাৎ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা থাকাও সম্ভব নয়। একটি সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থের বন্ধনে এদের সদস্যরা আবদ্ধ। **রাষ্ট্রীয় অথবা জাতীয় সমস্যায় এদের সদস্যরা কি ধরণের ভূমিকা গ্রহণ কোরবে, নিজেদের সমস্যা নিয়েও রাষ্ট্রীয় অথবা জাতীয় ক্ষেত্রে এরা কি ধরণের আচরণ কোরবে, এই ধরণের মাধ্যমিক গোষ্ঠীগুলি তা নির্ধারণ করে।**

মাধ্যমিক গোষ্ঠী সাধারণ স্বার্থ-চেতনা

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সকল মাধ্যমিক গোষ্ঠীর প্রভাব-যুক্ত—হয়ে পড়ে। **পরিবার, স্থানীয় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে আবার বিচিত্র সংঘাত ও বিন্যাস চলে—এই ভাবে সামঞ্জস্যবিধানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রীয় বা জাতীয় সমাজ।**

জাতীয় সমাজ

(ঙ) বিশ্ব-মানবসমাজ

বর্তমানে জাতীয় সমাজের ওপরেও গড়ে উঠছে **বিশ্ব-মানবসমাজ**। এই বিশ্ব-মানবসমাজের বর্তমান প্রতিভূ-সংগঠন হচ্ছে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির সহযোগিতায়, তাদের বিরোধ, মিলন ও সামঞ্জস্যবিধানের মধ্য দিয়ে মানব-কল্যাণভিত্তিক নতুন বিশ্বসমাজ গঠনের প্রয়াস চলেছে। এই ক্ষেত্রেও সারা বিশ্বসম্পর্কে একটা "আমরা" বোধ জাগ্রত হচ্ছে। এই "আমরা" বোধের ঘনিষ্ঠতাকে পরিবার অথবা স্থানীয় গোষ্ঠীসমূহের "আমরা" বোধের ঘনিষ্ঠতার সাথে মোটেই তুলনা করা চলে না। এমন কি, জাতীয় ক্ষেত্রে যে "আমরা" বোধ তার থেকেও বিশ্বজনীন "আমরা" বোধ অনেক পরিমাণে পঙ্গু ও দুর্বল। তবে বিশ্বজনীন "আমরা" বোধ ক্রমাগত শক্তি অর্জন কোরছে এবং শক্তিশালী বিশ্বসমাজ গঠনের ভিত্তিও ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে।

বিশ্বজনীন "আমরা" বোধ

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এইটাই দেখাতে চেয়েছি যে **মানুষ বিপুল সমাজ-সমুদ্রে একাকী ভাসমান অবস্থায় সাঁতার কাটে না। সে বিভিন্ন প্রকার গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে এবং গোষ্ঠী গঠনও করে। সেই সকল গোষ্ঠীর বিচিত্র-বিন্যাসেই মানবসমাজের উদ্ভব ও সেই সকল গোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যকলাপ অনুসারেই মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সমাজে তার ভূমিকা নির্ধারিত হতে থাকে।** গোষ্ঠীর ভূমিকা সবসময় যে উপকারক হয় তা নয়। তা অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর হতে পারে। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষগুলি তার সাম্প্রতিক প্রমাণ। তাই শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন ও তাকে সুপরিণতি দান সমাজবিজ্ঞানীর চোখে নিতান্ত সহজ-সাধ্য কর্তব্য নয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষকদের এইসকল গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়ে তাঁদের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন কোরতে হবে।

উপসংহার

আসল কথা, সমাজবিদ্যা যেমন একটি বিচ্ছিন্ন বিদ্যা নয়, মানবকেন্দ্রিক ও মানবাত্মিক বিদ্যাসমূহের ক্রমবিবর্তনশীল একটি সামগ্রিক বিদ্যা, তেমনই মানুষও একটি বিচ্ছিন্ন জীব নয়, তার সমাজও ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটা সংগঠন নয়—মানুষ বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী ও সমগ্র সমাজেরই সৃষ্টি। **মানুষকে তাই উপযুক্ত ব্যক্তি ও বিশ্বনাগরিক কোরে গড়ে তুলতে হলে একই সাথে সমাজবিদ্যা ও তার প্রাণবস্ত মানব ও সামাজিক সম্পর্কসমূহ সম্বন্ধে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান ও সচেতনতা থাকা প্রয়োজন।** আশা করি, আমার এই আলোচনা থেকে সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণ তাঁদের জ্ঞানের রাজ্য ও কর্মক্ষেত্র কি হবে এবং তাঁদের কর্তব্য কতটা কঠিন তা অনুমান কোরে নিতে পারবেন।

গোষ্ঠীবুদ্ধির ভূমিকা সম্পর্কে সতর্ক

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাজবিদ্যার স্বরূপ

(Nature of Social Studies)

সমাজ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী

সমাজবিদ্যা বিষয়টি কি, সমাজবিদ্যা বলতে আমরা কি বুঝি, অর্থাৎ সমাজবিদ্যার স্বরূপ কি, তা আমাদের ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। সমাজ বলতে আমরা মানুষের সমাজই বুঝে থাকি ; কোনো কোনো পশু দলবদ্ধ হয়ে বাস করে সত্য, কিন্তু সমাজ সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা তার সাথে পশুদের সমাজ বলতে যা বোঝায় তার কোন মিল নেই। "সমাজবিদ্যার" সমাজ কথার অর্থই হচ্ছে মানবসমাজ। এই সমাজে প্রত্যেক মানুষের আছে দ্বৈত সত্তা—(১) **ব্যক্তি-সত্তা**, (২) **সমাজ-সত্তা**। ব্যক্তি হিসাবে তার পূর্ণ বিকাশে সমাজই তাকে সহায়তা করে, আবার সমাজের পূর্ণতর বিকাশে তার অঙ্গ স্বরূপ ব্যক্তিরাই সাহায্য কোরে থাকে। প্রত্যেক মানুষকে তাই ব্যক্তিগত উৎকর্ষের এবং সমাজগত উৎকর্ষের জন্য চিন্তা ও কাজ কোরতে হয়। তাই বলে মানুষের ব্যক্তি-সত্তা ও সমাজ-সত্তা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশ নয় ; বস্তুতঃ ওটা একই ঘটনার এপিঠ ওপিঠ মাত্র, অর্থাৎ মানুষ একই সময়ে, একই পরিপ্রেক্ষিতে, একই ঘটনার মধ্যে ব্যক্তি-মানুষ, ও সামাজিক-মানুষ, তার দুটো অস্তিত্ব সর্বদাই পরস্পর সাপেক্ষ এবং পারস্পরিক ক্রিয়াশীল। ব্যক্তি-মানুষ ও সামাজিক-মানুষকে আলাদা খুঁজে পাওয়া যাবে না, সমাজসংসারে একই ভাবে তাদের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব নিহিত। আর এই ভাবে মানুষকে দেখাই হচ্ছে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখা, অর্থাৎ মানুষকে খণ্ডীকৃত কোরে নয়, সমগ্র কোরে দেখা। সমাজবিদ্যা এমন একটি বিষয় যা মানুষকে এবং মানুষের সমাজকে সমগ্রভাবে দেখে, বিচার করে এবং মানুষের মধ্যে এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্ম দেয়।

মানুষের দ্বৈত সত্তা—ব্যক্তি-সত্তা ও সমাজ-সত্তা

এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীটা আর একটা কথাও আমাদের কাছে স্পষ্ট কোরে দেয়। প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ একটা সামাজিক স্রোতের মধ্যে বাস কোরছে। এই স্রোত বস্তুতঃ সৃষ্টি হয়েছে মানুষের অস্তিত্বের বহুমুখী সমস্যা নিয়ে। সে-সব সমস্যাগুলি ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং আরও বহুবিধ। আবার এই সমস্যাগুলি পরস্পর সম্পর্কিত। আমরা একটা নির্দিষ্ট দেশের নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস করি। ভারতবর্ষ হচ্ছে সেই দেশ, পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট অঞ্চল। এ অঞ্চলের প্রায় সবটাই সমতল, নদীবহুল এবং এখানে প্রচুর

সামাজিক স্রোতের মধ্যে ব্যক্তি মানুষের বাস

বৃষ্টিপাত হয়। ধান আর পাট এখানকার প্রধান ছ'টি ফসল। এখানে তাই ভাত খাওয়ার রেওয়াজ এবং কোনো কারণে ধানের উৎপাদন কম হলে আমরা নিদারুণ কষ্টে পড়ি। গম যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা গম খেতে অভ্যস্ত নই। একদা ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দান অনুসরণ কোরেই আমাদের বাংলা দেশে ভাত খাওয়ার রেওয়াজ সৃষ্টি হয়েছিল। একদিনের এই আশীর্বাদ আজ আমাদের দেশে অভিশাপ। কারণ শিল্পোন্নতির দরুন বাংলার বাইরে থেকে এখানে অনেক লোকের আগমনের ফলে এবং স্বাভাবিক জন্মসংখ্যা-বৃদ্ধির ফলেও পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। মাত্র ধানের উৎপাদন দ্বারা আজ আর এদের সম্পূর্ণ ক্ষুন্নিবৃত্তি সম্ভব নয়, তাই বিকল্প খাদ্য অভ্যাসের অর্থাৎ গম প্রভৃতি ব্যবহারের কথা উঠেছে। কিন্তু এটা ঠিক আমাদের অভ্যস্ত এবং মনঃপূত নয় বলে এই নিয়ে অনেক আন্দোলনও করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের একটি ভৌগোলিক ঘটনা থেকে জন্ম নিয়েছে আমাদের সামাজিক রুচি ও অভ্যাস এবং এরই সাথে শিল্পোন্নতি নামক অর্থনৈতিক সমস্যাটি জড়িত হয়ে যে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সেটা শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রশাসকদের রীতিমত শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ সেটি এখন একটি বিরাট রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যাও বটে। অর্থাৎ একটি সমস্যাকে বিভিন্ন বিষয়ের খণ্ড দৃষ্টিকোণ দিয়ে না দেখে, সমস্যাটি আমাদের জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজনের তাগিদে কিভাবে বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রে নিজেকে প্রবাহিত করে দিচ্ছে—সমাজবিদ্যায় সেই জিনিসটাই বিচার্য। জীবনের সমস্যাগুলিই মুখ্য। জীবনমুখীন দৃষ্টিটাই সমাজবিদ্যার দৃষ্টি। কোন বিষয়ের তাগিদে একটা বাস্তব পরিস্থিতিকে খণ্ড ভাবে বিচার করা নয়, সেই বাস্তব পরিস্থিতিটা নিজের তাগিদেই বিভিন্ন বিষয় ক্ষেত্রগুলি কি ভাবে কতটা অধিকার কোরে নিয়েছে সেটা উপলব্ধি করাই সমাজবিদ্যা পাঠকের কর্তব্য। তাই একীকরণের পদ্ধতিতে (method of integration) পাঠদান সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তি—একটি উদাহরণ

একীকরণের পদ্ধতি

ঐক্য দৃষ্টির আর এক দিক

এই ঐক্য-দৃষ্টির আর একটি দিক আছে। জীবন সমস্যা শুধু আজকের বৃন্তেই বিধৃত নয়, মহাকালের স্রোতের সাথে সে গ্রথিত। বস্তুতঃ মহাকাল-স্রোতের অঙ্গীভূতই হচ্ছে আজকের জীবন আর তার সমস্যাবলী। তাই **আজকের জীবনকে যথার্থভাবে বিচার কোরতে হলে চাই ঐতিহাসিক ও দার্শনিকের দৃষ্টি ও বিচারবোধ, এমন কি মানব-জীবন রূপায়ণের রসবৈচিত্র্যবোধও।** সেই সাথে আসে সমাজে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকের ভূমিকা আধুনিক মানব জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। এক

কালের পরিপ্রেক্ষিতে ঐক্যদৃষ্টি

একটা যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার শুধু কোন বিশেষ দেশীয় সমাজের নয়, গোটা বিশ্বমানব-সমাজের চেহারাটাই পাল্টে দিচ্ছে। বিজ্ঞান আজকের মানব-জীবনকে এমনভাবেই অধিকার কোরেছে যে জীবনের প্রতিপদে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে থাকি। বৈজ্ঞানিক সাধনা আজকের উন্নত মানবসমাজ-সৃষ্টিরই সাধারণ অংশবিশেষ। তবে এই সাথেই একটা কথা জানা দরকার, তথাকথিত বিজ্ঞান-প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রেই আজ বিজ্ঞানকে আমাদের কাছে অভিশাপ ও বিভীষিকার বস্তু কোরে তুলেছে। বিজ্ঞানের এই ভূমিকা মানবসমাজের বিবেক থেকে বিচ্যুত ভূমিকা। মানবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিজ্ঞান-সাধনার গুরুত্ব নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। মানবসমাজের সমস্যাবলীর সমাধানে বিজ্ঞানের কল্যাণকর ভূমিকাটিই সমাজবিদ্যার অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয়। সমাজবিবেক বিচ্ছিন্ন বিজ্ঞানের ভয়াবহ ক্ষতিকর রূপটিও অবশ্য দেখিয়ে দিতে হবে। **সামাজিক মঙ্গল ও ঐক্যবিধানে বিজ্ঞান-সাধনার ভূমিকা নির্ণয় করাই সমাজবিদ্যা শিক্ষার কাজ।** সামাজিক সমস্যার স্রোতটাই প্রবাহিত হবে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে, সমাজবিজ্ঞান ও সাধারণ বিজ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক-রূপে কল্যাণকর সমাজবিবেকের জন্ম দেবে—**আর সেই সমাজবিবেকই হচ্ছে সমাজবিদ্যার পটভূমি ও মূলমন্ত্র।** সামাজিক কল্যাণ ঐক্যবোধ এবং ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর-সাপেক্ষ উন্নততর ও সুস্থ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অখণ্ড দৃষ্টি —যার একদিকে বিশ্বজনীনতা অন্যদিকে শাশ্বত আদর্শের মূল্যবোধ, এককথায় চিরন্তন আদর্শের স্রোতে ভাসমান বর্তমান বিশ্বসমাজের উপযুক্ত নাগরিকসৃষ্টি—এই হোলো সমাজবিদ্যার পাঠদানের মূল প্রয়োজন। সংক্ষেপে, **উপযুক্ত সমাজবিবেকের জন্মদানে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক সমস্যাবলীর আলোচনায় সক্ষম যে বিদ্যা, তারই নাম সমাজবিদ্যা।**

বিজ্ঞান ও মানবসমাজ এবং সমাজ-বিবেক

সমাজবিদ্যার একটি কার্যকরী সংজ্ঞা

সমাজবিবেক

ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সাপেক্ষ অস্তিত্বের কথা বলতে গেলেই আসে সমাজ-সংগঠন ও তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা। সমাজ কথার অর্থই ব্যক্তি-মানুষগুলির একত্র সংগঠন। এই সংগঠনের পেছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, যাকে ইংরেজী প্রবাদে বলা হয় to live and let live—পরস্পর বেঁচে থাকা এবং বাঁচতে সাহায্য করা, আর এর সাথে যোগ করা হোক আর একটি কথা—উন্নতি বা progress এই সমন্বয়ে যে বোধের জন্ম হয়, তাকেই বলা হয় সমাজ-বিবেক। উপরে আমরা বিভিন্ন স্থানে এই সমাজবিবেকের কথাই বলেছি। সমাজের প্রত্যেকটি সংগঠন এই সমাজবিবেকের দ্বারা চালিত, অন্তত

সমাজসংগঠনের উদ্দেশ্য

তাই হওয়া উচিত এবং আদিতে একমাত্র সেই উদ্দেশ্যই বর্তমান ছিল। কালক্রমে ব্যক্তি-মানুষের অসাধুতাই সামাজবিবেক কলুষিত কোরেছে এবং সমাজ সংগঠনে পচন ধরিয়েছে। আবার, মানুষের সমাজবিবেক প্রতিনিয়তই এই অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরে চলেছে এবং উন্নততর সমাজসংগঠনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের পরিবর্ধিত ক্ষমতা ও চিরজাগ্রত শুভবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছে। সমাজবিদ্যার অঙ্গীভূত বিভিন্ন বিষয়গুলি, যথা ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, নৃতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি —যখন পৃথক পৃথক ভাবে আমরা আলোচনা করি, তখন শুধুমাত্র তথ্যবিশ্লেষণ, তথ্যবিচার ও তত্ত্ব-আলোচনার একটা নিরাসক্ত দৃষ্টি আমাদের মনকে পেয়ে বসে ; বস্তুতঃ এই নিরাসক্ত দৃষ্টি ছাড়া এই পৃথক পৃথক বিষয়গুলির অন্তর্নিহিত গভীর সত্যগুলি আবিষ্কার করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এখানে মানুষ ক্রমেই কায়া থেকে ছায়া হয়ে দাঁড়ায়, তথ্যের অঙ্ক হিসাবেই তার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়, জীবন্ত মানুষ হয়ে পড়ে প্রচ্ছন্ন, তার যে সমাজবিবেক এই জীবন্ত মানুষের উপস্থিতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাও হয়ে পড়ে ম্লান—সক্রিয়, সচল জীবনের অখণ্ড পরিচয়ের কথা আমরা বলে এসেছি তা হয়ে পড়ে 'গুহায়াম্ নিহিত' হয়ত বা একেবারেই অদৃশ্য। কিন্তু মানুষের জীবন থেকে সমাজবিবেকের অনুপস্থিতি কোন কালেই আমাদের কাম্য হতে পারে না, তাহলে সমাজজীবনটাই বিভীষিকাময় হয়ে দাঁড়াবে, বিশেষতঃ আধুনিক সমাজের মত জটিল সমাজে তা মহা অনর্থের কারণ হবে। বস্তুতঃ চোরা-বাজারী; ঘুষখোরী, মুনাফাবাজী, রাজনৈতিক খুনজখম, পররাজ্যলিপ্সা, রাহাজানি, পতিতাবৃত্তি, ছেলেচুরি ও তাদের ভিক্ষাকাজে নিয়োগ প্রভৃতি বহু অপরাধের পিছনে সমাজবিবেকের অভাবই ক্রিয়াশীল। **সমাজবিবেক ও সমাজসংগঠন দুইটিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত।** অন্যান্য সমাজশাস্ত্রের—যথা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রভৃতির আলোচনায় এই দুইটির সহাবস্থান অনেকক্ষেত্রেই সম্ভবপর না হতে পারে ; **কিন্তু সমাজবিদ্যায় এই দুইটি সূত্রের পরস্পর গ্রন্থনাই হোলো আদি কথা। তাই সমাজবিদ্যা আলোচনার ক্ষেত্রে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হবে এবং যে সকল তত্ত্ব আলোচিত হবে তা সর্বদাই হবে জীবনমুখীন ও ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ কর।**

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে জীবন-মুখীনতার অভাব

সমাজবিবেকের ভূমিকা

সমাজবিদ্যার কাজ (Functions of Social Studies)

Sociology বা সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের রিপোর্টে যা বলা হয়েছে, সমাজবিদ্যার স্বরূপ নির্ণয়ে তা আমাদের যথেষ্ট কাজে লাগতে পারে বিবেচনায় তা উদ্ধৃত করা হোলো :—

"সমাজতত্ত্ব ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এখনও সরকারী স্বীকৃতি লাভ করেনি। এটাকে এমন একটা অভিধা বলে মনে করা হয় যা অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, সামাজিক নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সমাজবিদ্যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি—সমাজ জ্ঞানের এমন সবঅবশিষ্ট অংশকে সূচিত করে। অধ্যাপক G. D. H. Cole সমাজতত্ত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, "**এটা সমাজসংগঠনের একটা সাধারণ পাঠ, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সংগঠিত অস্তিত্বের সূচনাকারী বহু ধরনের সামাজিক গোষ্ঠীগুলির যাদের মধ্যে পরিবার থেকে আরম্ভ কোরে সবচেয়ে ব্যাপক সামাজিক সংঘগুলি রয়েছে তাদের বিচিত্রমুখী পারস্পরিক সম্পর্ক সমূহ ব্যক্ত এবং বিশ্লেষণ করা**। সামাজিক মনোবিজ্ঞান থেকে এর পার্থক্য হচ্ছে যে, এ সংগঠনের ওপরে, বাইরের তথ্যের ওপরে যতটা জোর দেয়, সংগঠনের পশ্চাতে কী সব মানসিক ভাবসমন্বয় আছে তার ওপরে ততটা জোর দেয় না। রাষ্ট্রনীতির সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে, সামাজিক সংগঠনের ব্যাপক তথ্যগুলির সাথেই এর সম্পর্ক, সেগুলি সম্পর্কে মানুষের মতবাদ অথবা সেগুলির বিশিষ্ট রাজনৈতিক দিকের সাথে এর সম্পর্ক নয়। অর্থনীতির সাথে এর পার্থক্য হচ্ছে, এই বিষয়টি সামাজিক অস্তিত্বের ভিত্তিসমূহ নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু অর্থনীতিবিদ সেগুলিকে স্বাভাবিক বিবেচনা কোরেই তা নিয়েই মাথা ঘামায় না। পদ্ধতির দিক থেকে এটি হচ্ছে তথ্যসংগ্রাহক, তথ্যবিশ্লেষক পাঠ; এখানে সামাজিক তথ্যসমূহের বিশ্লেষণ ও তুলনার দ্বারা সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়—আর এইসব সামাজিক তথ্যের কিছু কিছু অন্যান্য সমাজবিদ্যা থেকে সংগৃহীত হলেও এর বহু তথ্যই একে সংগ্রহ কোরতে হয় এবং নিজের অঙ্গীভূত কোরে নিতে হয়। সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব প্রাথমিক মানবসমাজসমূহের আলোচনায় যে পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ কোরেছে, সেগুলি এ ক্ষেত্রে বিশেষ শিক্ষণীয়, জটিল আধুনিক সমাজসমূহের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ঠিক ততটাই, কার্যক্ষেত্রে বরং কিছুটা বেশী।"

সমাজবিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সমাজবিদ্যার স্বরূপ সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ যথেষ্ট আলোচনা কোরছি। অন্যান্য সমাজশাস্ত্রের সাথে সমাজবিদ্যার ঐক্য ও পার্থক্য সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মহাশয় সংক্ষেপে যা বলেছেন, তা বেশ প্রণিধানযোগ্য—সমাজবিদ্যার সাধারণ সূত্রগুলিকে (Socialogical laws) একেবারে অকাট্য না বলিয়া, কতকটা গতি (Trend)-নির্দেশক বলা উচিত। অর্থবিদ্যা (Economics) রাষ্ট্রবিদ্যা (Politics), মনোবিদ্যা (Psychology) নৃবিদ্যা (Anthropology) প্রভৃতি সমাজবিদ্যার অনুরূপ বিদ্যার অনুশীলনের ফলেও এই ধরনের সামাজিক গতিসূচক সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। এইসব বিদ্যা পরস্পর সংশ্লিষ্ট, কারণ প্রত্যেকের বিষয়-বস্তু মানুষ ও সমাজ। মানবসমাজের এক একটি দিক লইয়া বিশেষভাবে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করাই এক একটি বিদ্যার লক্ষ্য। যিনি তাহা করেন, তিনি

সমাজবিদ্যার সূত্রগুলি গতি-নির্দেশক

ক্রমে সেই বিশেষ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া বিশেষজ্ঞ হন। তাঁহাদের আমরা মনোবিদ্ বলি, অর্থবিদ্ বলি, রাষ্ট্রবিদ্ বলি। **সমাজবিদকে কিন্তু সকলকে লইয়া কাজকর্ম করিতে হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক বিদ্যার সাহায্যে কিছু কিছু লইতে হয়।** সেইজন্য এইসব সংশ্লিষ্ট বিদ্যার প্রত্যেকটি সম্বন্ধে তাঁহার অন্ততঃ প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ইতিহাসবোধও তাঁহার সজাগ থাকা আবশ্যক। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য ও ঐক্য কোথায় তাহা বুঝিতে হইলে ইহা ছাড়া গতি নাই।"

সমাজবিদ্

এ প্রসঙ্গে Principal V. R. Taneja যা বলেছেন তা উদ্ধৃত কোরলে দেখা যাবে সমাজবিদ্যার স্বরূপ সম্পর্কে আমরা যা বলে এসেছি তা কত সত্য। তিনি বলেছেন, "পৃথক পৃথক বিষয়গুলি যখন স্থিতিস্বভাবসম্পন্ন, তখন সমাজবিদ্যা পরিবেশ-সংক্রান্ত প্রতিটি বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করে বলে এটি একটি গতিশীল ক্ষেত্র। এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং পৌর উপাদানসমূহের সামগ্রিক এবং একীভূত পাঠ। ব্যবহারিক তথ্যসমূহ এইসব ক্ষেত্র থেকে বাছাই কোরে নেওয়া হয় এবং সমাজবিদ্যা নামে একটিমাত্র ক্ষেত্রে বিমিশ্রিত এবং একীভূত করা হয়। এমন পদ্ধতিতে এই সমন্বয় ঘটান হয় যাতে মানুষের প্রতিটি বর্তমান সমস্যা এবং তার পরিবেশকে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।" সমাজবিদ্যার পাঠ নির্ণয় করার প্রথম নীতিটা হোলো বিশেষজ্ঞের সংকীর্ণতা বাদ দিয়ে বিচিত্র এবং বহুমুখী সমাজের ব্যবহারিক জ্ঞানকে ভিত্তি কোরতে হবে। বিভিন্ন প্রকার সমাজিক সংগঠন যথা পরিবার, স্থানীয় সমাজ, ধর্মসম্প্রদায় এবং রাষ্ট্র ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রকাশ পায়। সমাজবিদ্যা এইসব সংগঠন এবং ব্যক্তির ওপরে তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে। সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে: (১) ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সম্পর্ক, (২) গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠীর সম্পর্কে, (৩) মানুষের সাথে তাদের পরিবেশের সম্পর্ক, তাদের প্রতিষ্ঠানাদির এবং অন্যান্য সংগঠিত কার্যাবলীর সম্পর্ক। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং সমাজতত্ত্ব এতাবৎকাল এই সমস্ত সম্পর্কে তাদের পৃথক স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার কোরে এসেছে। তাদের প্রত্যেকেই একটি কোরে স্কুলপাঠ্য বিষয় এবং মানব-সম্পর্কের একটিমাত্র বিশিষ্ট দিক আলোচনা কোরেছে। এই একদেশদর্শী আলোচনা অতীতে কাজে লেগে থাকলেও বর্তমানযুগের বৈচিত্র্যময় সম্পর্কের ব্যাখ্যায় কোনো কার্যকরী উদ্দেশ্য সাধন কোরতে পারছে না। প্রত্যেক শিশুরই তার সফল জীবনযাপনের জন্য সমগ্র মানব সম্পর্ক বিষয়টি অখণ্ডভাবে পাঠ, উপলব্ধি এবং ব্যাখ্যা কোরতে শেখা প্রয়োজন। সমাজের

সমাজবিদ্যা একটি গতিশীল ক্ষেত্র

পাঠ-নির্ণয়ের প্রথম নীতি

আলোচ্য বিষয়

সমজদার নাগরিক হ'তে হ'লে তাকে সমাজের বিভিন্ন দিক এবং চরিত্র তাকে বুঝতে হবে। সেটা সম্ভব মাত্র বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ের পাঠকে "যৌগিক একীকরণের" দ্বারাই (Subjects fused into one)। "যৌগিক একীকরণ" কথাটি এখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেভাবে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়, সেই অর্থেই প্রয়োগ করা হয়েছে। যখন আমরা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের নাম করি, তখন এই অখণ্ড মানব সম্পর্কটি বোঝাতে পারি না। তাই "সমাজবিদ্যা" নামে একটি ব্যাপক অভিধার প্রয়োজন হয়েছে।

বিভিন্ন বিষয়ের যৌগিক একীকরণ (fusion)

সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা

এরপর সমাজবিদ্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ কোরতে হয়। **সমাজবিদ্যা আসলে অনেকগুলি নয়, মাত্র একটি বিষয়। ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি ইত্যাদি হচ্ছে "বিশেষ বিদ্যা (Specialist Disciplines), কিন্তু সমাজবিদ্যা হচ্ছে এদের অখণ্ড সমন্বয়কারী পাঠ যা শিক্ষার্থীর অতীত ও বর্তমান পরিবেশকে তার সামনে উপস্থিত ও ব্যাখ্যা করে।** অতীতে এবং বর্তমানে মানুষ তার অতীতের সাথে সংগ্রাম কোরেছে এবং কোরছে, কিভাবে তার ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার ব্যবহার অথবা অপব্যবহার কোরেছে, কিভাবে তার সমাজের বিবর্তন হয়েছে এবং কী মৌলিক ঐক্যসূত্র অবলম্বন কেরে মানবসমাজ সভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে, সমাজবিদ্যা তাই বিবৃত করে। **সমাজবিদ্যা হচ্ছে এমন একটি পাঠ "যার বিষয়বস্তু সামাজিক সংঘের সদস্য হিসাবে মানুষের সংগঠন ও বিকাশের কাহিনীর সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট।" এই সংজ্ঞায় ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা সমাজশাস্ত্রের নামোল্লেখ করা না হলেও এর মধ্যে সবকিছুই অন্তর্নিহিত আছে। যেহেতু সমাজবিদ্যার কেন্দ্রবস্তু হচ্ছে "মানুষ এবং পরিবেশের সাথে তার সম্পর্কে", অতএব সমাজ বিদ্যার পাঠে আমাদের প্রত্যেক বিষয়েরই সাহায্য নিতে হবে।**

বিশেষ বিদ্যা নয় অখণ্ড সমন্বয়কারী পাঠ

সংজ্ঞা

কেন্দ্রবস্তু

মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারে সমাজবিদ্যার স্থান

সমাজবিদ্যার স্বরূপটি পূর্ণতরভাবে উপলব্ধির জন্য আমরা অন্যদিক থেকেও বিষয়টি অনুধাবনের চেষ্টা কোরবো। আমাদের যাবতীয় জ্ঞানকে আমরা প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে ভাগ কোরতে পারি :—(১) **প্রাকৃতিক বিজ্ঞান** (২) **সমাজবিজ্ঞান**

(৩) **মানববিদ্যা।** প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কে বিনয় ঘোষ মহাশয় যা বলেছেন, আমরা তাই উদ্ধৃত কোরছি।

"সমাজ বলিতে মানবসমাজ বুঝায়। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ধারা, পৃথিবীর নানাদেশে ও নানা অঞ্চলে, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণে তাহার বৈচিত্র্য ও জটিলতা, নানা রকমের বিধিবিধান, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান নিষেধ নির্দেশ, রীতিনীতি ইত্যাদি অনুসন্ধান ও অনুশীলন করা যে বিদ্যার অন্যতম লক্ষ্য তাহাকে সমাজবিদ্যা বা সমাজ বিজ্ঞান (Sociology) বলে।

"পদার্থবিজ্ঞান (Physics), রসায়ন (Chemistry) অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের (Natural Sciences) সহিত ইহার খানিকটা সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু হুবহু মিল নাই। কারণ পরীক্ষাগারে (Laboratory) প্রকৃতিবিজ্ঞানের উপাদান লইয়া পরীক্ষা করিয়া তাহার সঠিক ফলাফল যেমন নির্ধারণ করা যায়, সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা করা যায় না। সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার সমাজ এবং উপাদান মানুষ। মানুষ ও সমাজ দুই-ই পরিবর্তনশীল ও প্রগতিশীল। সমাজবিজ্ঞানীরা তাই প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের মতো "ইহা হইলে, উহা হইবেই" এমন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না। হাইড্রোজেন গ্যাসের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক মিলন হইলে 'জল' সৃষ্টি হইবেই যেমন প্রমাণ দেওয়া যায়, মানুষে মানুষে দেখা হইলে বা একত্র বসবাস করিলে তাহারা 'এইভাবে' ব্যবহার করিবে বা করিবে না এমন কথা 'প্রমাণ করিয়া দিব, বলা যায় না। তাহা হইলে সমাজবিদ্যাকেও এক রকমের 'বিজ্ঞান' বলা হয় কেন ?

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সহিত সমাজবিজ্ঞানের পার্থক্য

উত্তরে তিনি যা বলেছেন, তাই উদ্ধৃত করা গেল, "বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হইতেছে, কার্য-কারণ সম্বন্ধ কি, অর্থাৎ কি কারণে কি ঘটনা ঘটে তাহা নির্ধারণ করা। মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, গোষ্ঠীগত, সামাজিক, জাতিগত ও আন্তর্জাতিক জীবনধারা কাজকর্ম চালচলন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া মনোযোগ দিয়া অনুধাবন করিলে তাহার প্রত্যেক কাজের কারণ খুঁজিয়া বাহির করা যায়। সমাজবিদ্যা প্রধানতঃ তাহাই করে বলিয়া তাহাকেও এক প্রকারের বিজ্ঞান বলা হয়।"

সমাজবিদ্যা একদিকে যেমন একপ্রকারের বিজ্ঞান অন্যদিকে এটি নিঃসন্দেহে একটি মানববিদ্যা। তবে মানববিদ্যার যে অংশ সমষ্টিগত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে, তাহাই সমাজবিদ্যা বা সমাজবিজ্ঞান। কিন্তু মানববিদ্যার আর একটি নিজস্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ধারা আছে, যেখানে সে সমাজবিদ্যা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ পৃথক। সাহিত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, যুক্তিশাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের সামাজিক ভিত্তি যাই থাক এখানে ব্যক্তিগত চিন্তাধারা অভিমত ও রুচিরই অবিসংবাদিত প্রাধান্য। এইসব বিদ্যার সামাজিক ভিত্তিটি সমাজবিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু এদের

সমাজবিদ্যা ও মানববিদ্যার পার্থক্য

মধ্যে ব্যক্তিগত অবদানের ক্ষেত্রটি নিঃসন্দেহে অধিকতর প্রধান বলে এদের পৃথক শ্রেণীর মানববিদ্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় জ্ঞান নিঃসন্দেহে এক ও অবিভাজ্য। শুধুমাত্র কোনো বিষয়বস্তুর ভূমিকা সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণার জন্য আমরা জ্ঞানকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত কোরে থাকি। সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সে বিষয়টি অবশ্যই স্মরণ রাখা কর্তব্য।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পার্থক্য

সমাজবিজ্ঞান বা সমাজবিদ্যাকে আমরা এতক্ষণে সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার কোরে এসেছি। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে কিছু তফাত আছে। তফাতটা বিষয়বস্তুতে নয়, বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে। সমাজবিজ্ঞানী জোর দেন জ্ঞানের ওপর, তাঁর পদ্ধতি হচ্ছে বিশ্লেষণমূলক। সমাজ বিষয়ে গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং আবিষ্কারাদি হচ্ছে তাঁর লক্ষ্য। এই বিষয়ে একটা বিশেষ পরিমাণ জ্ঞানার্জন তাঁর নিরিখে একান্তই প্রয়োজন। এককথায়, তিনি প্রাপ্তবয়স্কের প্রয়োজন এবং দৃষ্টি থেকে বিষয়টি বিচার করেন, কিন্তু সমাজবিদ্যা বিষয়টি উপস্থাপিত হয় বালকবালিকাদের আগ্রহ ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যার পার্থক্য

এবিষয়ে Principal Taneja বলেছেন, সমাজবিজ্ঞানে উপস্থিত হয় প্রাপ্তবয়স্কের দৃষ্টিভঙ্গী, কিন্তু সমাজবিদ্যায় থাকে শিশুকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী' প্রথম বিষয়টিতে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ আছে, আর শেষোক্তটি জ্ঞান বিতরণ করে। সমাজবিদ্যা অবশ্যই সরল, সহজ, আবেদন-মূলক, চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষাপ্রদ হবে। সমাজ-বিজ্ঞান জটিল, গ্রন্থিময়, সমস্যা সংযুক্ত এবং দুর্বোধ্য হতে পারে। সমাজবিদ্যা হচ্ছে প্রথমতঃ সমাজবিজ্ঞানের সরলীকৃত সংস্করণ। মানববিষয়ের তত্ত্বগত দিক হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান, আর তার ব্যবহারগত দিক হচ্ছে সমাজবিদ্যা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং পৌরবিদ্যাকে পৃথক .পৃথক বিষয় হিসাবে ধরে নিয়ে এই পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে দেখানো যায়। প্রথমটি হচ্ছে প্রাগ্রসর পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয় যা স্নাতকোত্তরে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে ; আর শেষোক্তটি হচ্ছে প্রথমটির সরল সংস্করণ যা বিদ্যালয়ে শিশুদের শেখানো হয়।" অধ্যাপক K. Nesiahও অনুরূপ কথা বলেছেন। তাঁর মতে সমাজবিজ্ঞান মানব সম্পর্ক নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিষয়-সমূহের আলোচনা করে। সমাজবিজ্ঞান বস্তুত মানুষের চিন্তা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার ফল। আর সমাজবিদ্যা হচ্ছে শিক্ষাদান উদ্দেশ্যের অনুবর্তী। সমাজবিদ্যার শিক্ষক অবশ্যই সমাজবিজ্ঞানের বিষয়াদিতে জ্ঞানী হবেন, কিন্তু তিনি তাঁর শিক্ষার্থীদের

কাছে সেসব বিষয় উপস্থিত করার আগে সেগুলি পুনরায় সংগঠিত, সহজ ও সরল কোরে নেবেন।

বিমূর্ত বিষয়সমূহের সাথে সমাজবিদ্যার পার্থক্য

অন্য অনেক বিমূর্ত বিষয়ের থেকে সমাজবিদ্যার একটা পার্থক্য আছে। সেই কথাটি বলেই আমরা বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার কোরবো। বিমূর্ত বিষয়গুলি সাধারণতঃ জ্ঞান এবং চিন্তার ওপরেই জোর দেয়, কিন্তু সমাজবিদ্যা এদিকটা ছাড়াও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ ও সমাজের প্রয়োজনীয় কাজে দক্ষতা অর্জনের ওপরে বিশেষ জোর দেয়।

জ্ঞান ও চিন্তার দিক সম্পর্কে বলা হচ্ছে—"সমাজবিদ্যার পাঠক্রম পরিবেশের বিভিন্ন স্তরের সংগঠন ও বিবর্তন ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি দান করে।" কিন্তু তার থেকেও বড় হোলো এই বিষয়টির ব্যবহারগত তাৎপর্যটা। সমাজবিদ্যার পাঠে বিষয়বস্তুর জ্ঞান থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে শিশুর মধ্যে বর্তমান সমাজে সন্তোষজনক জীবনযাপনের উপযোগী মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী ও দক্ষতার বিকাশসাধন। শিশুকে মাত্র তথ্য এবং জ্ঞান সরবরাহ করাই এর উদ্দেশ্য নয়, শিশুকে উপযুক্ত মনোভঙ্গী এবং দক্ষতাসমূহও অর্জন কোরতে হবে যাতে সে সমাজে তার যথাযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে, সমাজের বন্ধু হতে পারে, সমাজের ক্ষতিকর কাজ থেকে বিরত থাকে এবং তেমন কাজের বিরোধিতা করার মত মনোবল, ক্ষমতা ও পরিচ্ছন্ন বিচারবুদ্ধি অর্জন কোরতে পারে। সমাজ বিদ্যার শিক্ষাক্রমে বিবরণের ওপরে জোর না দিয়ে কাজও আচরণের ওপরে জোর দেওয়াটাই আসল কথা। এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আচরণ ও দক্ষতা-অর্জনের শিক্ষাই পূর্বে আমরা যে সমাজ-বিবেকের কথা বলেছি তার জন্ম দেয়। বস্তুতঃ আধুনিক সমাজের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টিই হচ্ছে সমাজবিদ্যার প্রথম ও প্রধান ভাবনা ; তার জন্য তাকে অন্যান্য অনেক বিদ্যার দ্বারস্থ হতে হয় বটে, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে তাকে বিবেকসৃষ্টিকারী, কর্মপ্রেরণাময়, চিন্তাশীল সংহত মূর্তি নিয়ে দাঁড়াতে হয়। বস্তুতঃ বিষয়টির এখানেই বৈশিষ্ট্য ও মহিমা। এইজন্যেই বিষয়টিকে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে পৃথক কোরে অনুধাবন করার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। এইজন্যেই সমাজবিদ্যা একটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে এবং প্রত্যেক চিন্তাশীল মানবপ্রেমিক এতে অবশ্যই সুখী হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাজবিদ্যার প্রবর্তনাও আমাদের শিক্ষাজগতে নবযুগের নব ভাবনাকে মূর্ত কোরে তুলছে একথা বলাই বাহুল্য। সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা আমাদের শিক্ষার আধুনিকীকরণের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ এবং সেদিক থেকেও আমাদের শিক্ষার জগতে আমরা একে শুভ সম্বর্ধনা জানাই।

সমাজবিদ্যার বৈশিষ্ট্য

Questions

1. What is Social Studies ? Describe its place in the modern organisation of knowledge.

2. A comprehensive approach to life is the keynote of teaching Social Studies. Bring out the full implications of this statement.

3. In modern reforms in Indian education, Social Studies has been introduced at the School level, but Sociology of College level. What are the reasons behind it ?

4. Is Social Studies a Science ? Institute a Comparision between Social Science and Natural Sciences.

5. Expound the relation between Social Sciences and Modern Education. Bring out in this context the full implications of the introduction of Social Studies as a school subject.

6. Describe the relation of Social Studies with other branches of Social Sciences. What are the utilities of teaching Social Studies as a particular Unit ?

7. Is Social Studies a separate subject or a conglomeration or culmination of some other subjects ? Should we teach Social Studies in place of, or inspite of, teaching History, Geography, Civics and some other allied subjects ?

8. In what respects would the teaching of Geography or History as separate subjects differ from the teaching of historical or geographical topics included in Social Studies ? Illustrate your answer with typical examples.
(C. U. 1962)

9. Introduction of teaching Social Studies in Indian schools is a positive step to the modernisation of Indian Education. Discuss.

———

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজবিদ্যার ভূমিকা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(The Aims and values of Social Studies)

সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা

মুদালিয়র কমিশনের (১৯৫২-৫৩) সুপারিশগুলোর ভিত্তিতে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ সংস্কার আরম্ভ হয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা আমাদের শিক্ষাক্রমের মধ্যে একটা নূতন বিষয়বস্তুর পরিচয় পাচ্ছি। সেটা হচ্ছে সমাজবিদ্যা। তাই আলোচনার শুরুতে মুদালিয়র কমিশন পাঠ্যসূচীতে এর প্রবর্তন সম্পর্কে যা বলেছেন, সেটা উল্লেখ করা দরকার। রিপোর্টে বলা হয়েছে :—"**ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে "সমাজবিদ্যা" তুলনামূলকভাবে একটি নূতন অভিধা;** ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিদ্যা ইত্যাদি যে ক্ষেত্রের সাথে বহুকাল ধরে বিজড়িত, এর ক্ষেত্রও তাই। যদি এইসব বিষয়গুলির শিক্ষাদানে বিবিধ এবং সম্পর্কহীন তথ্যসমূহ উপস্থিত করা হয় এবং সামাজিক অবস্থাদি ও সমস্যাবলীর ওপরে কোনো আলোকসম্পাত করা না হয় বা সে সম্পর্কে কোনো অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষও ঘটান না হয়, বা বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতির জন্যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা না হয়, তবে তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য হয় অকিঞ্চিৎকর। অতএব, এই সমস্ত বিষয়াবলীকে একটি অখণ্ড সম্পূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে গণ্য করতে হবে যার উদ্দেশ্য হবে পরিবার, সম্প্রদায়, রাষ্ট্র এবং জাতি যার অন্তর্গত, সেই সামাজিক পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যবিধান, যাতে তারা উপলব্ধি কোরতে পারে সমাজ তার বর্তমান চেহারায় কিভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং যে সামাজিক শক্তিসমূহের ও ঘাত-প্রতিঘাতের কাঠামোর মধ্যে তারা বাস করছে তাকে বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারে। অতীতে এই সামঞ্জস্যবিধান কিভাবে ঘটেছে এবং বর্তমানেই বা তা কিভাবে ঘটছে, এই বিষয়াবলী তা শিক্ষার্থীকে আবিষ্কার কোরতে ও বিশ্লেষণ কোরতে সাহায্য করে। এদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞানার্জনেই সক্ষম হবে না, পরন্তু তারা সেইসব দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণাদি, ও মূল্যবোধও অর্জন করবে যা সার্থক সংঘবদ্ধ জীবনযাপন এবং নাগরিক দক্ষতালাভের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এই বিষয়গোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু জাতীয় দেশাত্মবোধ এবং জাতীয় উত্তরাধিকারের প্রতি সম্ভ্রমবোধ জাগাতেই চেষ্টা কোরবে না, পরন্তু বিশ্ব-ঐক্য এবং বিশ্ব-নাগরিকতা সম্পর্কেও সুতীব্র এবং সজীব আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত কোরবে। এটা এতই সুপ্রত্যক্ষ ব্যাপার যে একথা বলার প্রয়োজন নেই যে এইগুলিই হচ্ছে আমাদের ঈপ্সিত

সমাজবিদ্যা—নূতন অভিধা, অখণ্ড সম্পূর্ণ ক্ষেত্র

লক্ষ্যসমূহের বিবরণ ; পাঠক্রমে এদের রূপান্তরণে সযত্ন চিন্তা এবং ধৈর্যশীল গবেষণা প্রয়োজন"।

"সমাজবিদ্যা" আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নূতন অভিধা বটে, কিন্তু তাকে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করা চলে না। আধুনিক জীবনের প্রয়োজনের তাগিদেই এই অভিধাটির সৃষ্টি হয়েছে। এর পেছনে সমাজগত ও মনোবিজ্ঞানগত বহু কারণও রয়েছে। সমাজ আজ মানুষের কাছে এক বিচিত্র নক্‌শা-কাটা ছক্‌, বা শুধু অপরিণত বুদ্ধি শিক্ষার্থীর কাছেই নয়, প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের কাছেও অনেক সময় দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। মানুষ, স্থান এবং কাল—এই তিনকে একত্রিত কোরে যে অখণ্ড ঘটনাপ্রবাহ, ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র ইত্যাদি তার যে খণ্ডচিত্র উপস্থিত করে তা বর্তমান পরিস্থিতিতে আপামর নাগরিক সাধারণের জন্য সমস্যা সমাধানের তেমন অনুকূল হতে পারছে না। তাই শিক্ষার্থীর সামনে সমাজকে আজ অখণ্ডভাবে উপস্থিত করা দরকার, বিষয়-বাহুল্য কমিয়েও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত (Correlated) বিষয়গুলির একীকরণ (integration) দরকার। এর দ্বারা বর্তমান জটিল সমাজব্যবস্থার যোগ্য গণতান্ত্রিক নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

সমাজগত ও মনোবিজ্ঞানগত কারণ সমূহ

ভারতবর্ষ এতদিন ছিল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ অধ্যুষিত দেশ। আজ সেখানে শিল্প-বিপ্লব ঘটছে। সমাজের চেহারা এবং ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। সরল, পরিচিত জীবনযাত্রা-পদ্ধতির স্থলে আসছে অপরিচিত পরিবেশের হাতছানি, আশঙ্কা এবং ভয়। উৎপাদনের কাঠামো, রীতি, পদ্ধতিতেও পরিবর্তন ঘটছে। কে কোথায় নিজের গ্রাসাচ্ছদনের ও সামাজিক ভূমিকা পালনের সুযোগ পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। ক্ষেত্র বিস্তৃততর হয়েছে, নূতন অভিযানের যেমন ব্যাপক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, তেমনই সার্থকতা ও ব্যর্থতার সম্ভাবনাও বেড়েছে প্রচুর। আমাদের দেশে গণ-নিরক্ষরতা একটি মস্ত বড় সমস্যা। নূতন অবস্থার সঙ্গে অভিযোজনও তাই এখানে বেশ কঠিন সমস্যা। শিল্পবিপ্লবের সাথে উৎপাদনের ও সামাজিক ক্রিয়া-কলাপের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটে, গণতান্ত্রিক চেতনার অভ্যুদয়ও বিকাশ ঘটে, তাকে পুরনো পরিচিত পথে ব্যাখ্যা করা যায় না বা শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাও তার সম্যক হদিস পাওয়া যায় না। তাই আজ বিদ্যালয়কে এগিয়ে আসতে হচ্ছে শিক্ষার্থীর সামনে সমাজের অখণ্ড চিত্রটি উপস্থিত কোরতে এবং শিক্ষার্থী কোথায় কিভাবে নিজের যোগ্য স্থান পাবে তা দেখিয়ে দেবার জন্যে। মুদালিয়র কমিশনের উপরি-উক্ত ঘোষণাটি আমাদের সমাজজীবনের দিক্‌ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত শিক্ষাগত সমস্যার স্বীকৃতি মাত্র।

শিল্প-বিপ্লব ও নূতন সমাজে অভিযোজন সমস্যা

অন্যান্য দেশে সমাজবিদ্যার পাঠ

আমেরিকা এবং অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশের সমাজ ব্যবস্থা আমাদের দেশের সমাজ-ব্যবস্থার চেয়ে অনেক অগ্রসর এবং জটিলতর। তাদের দেশে তাই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের গুরত্ব তারা অনেক আগে থেকেই উপলব্ধি কোরেছে এবং নানাভাবে তার প্রয়োজন মিটিয়ে আসছে। আমেরিকার শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানতঃ সমাজকেন্দ্রিক বলে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন সেখানে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়েছে। অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকখানি ঐতিহ্যধর্মী বলে সমাজবিদ্যা একটি অখণ্ড পাঠ হিসাবে সেখানে সমাদর পায়নি। অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকদের জন্য সমাজবিদ্যা পাঠের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে "সমাজবিদ্যা" অভিধাটির সরকারীভাবে প্রচলন হয়েছে। আমেরিকার National Educational Association মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের নিমিত্ত ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। সেই কমিশনের সমাজবিদ্যা-সংক্রান্ত কমিটি যে রিপোর্ট দেন তাতে সমাজবিদ্যা সম্পর্কে নিম্নোক্ত সংজ্ঞা উপস্থিত করেনঃ—**সমাজবিদ্যা হচ্ছে "সেই সকল পাঠ যার বিষয়-বস্তু প্রত্যক্ষভাবে মানবসমাজের সংগঠন ও বিকাশের সঙ্গে, এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (Social groups) সদস্যরূপে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।"** ঐ সময় থেকে আমেরিকার শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজবিদ্যাকে কেন্দ্র কোরে নানা আলোচনা উপস্থিত হয়েছে এবং অবশেষে সমাজবিদ্যা তাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে প্রবর্তিত হয়েছে, আমাদের দেশে শিক্ষা ইংল্যাণ্ডের মতই ঐতিহ্যধর্মী, তবু সমাজজীবনের প্রয়োজনে আজ যখন সমাজবিদ্যা পাঠের অপরিহার্যতা রয়েছে তখন মুদালিয়র কমিশনের সিদ্ধান্তের সাথে একমত হয়ে আমাদের এই নূতন পাঠটিকে স্বাগত জানাতে দ্বিধা করা উচিত নয়।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া

শিক্ষার লক্ষ্য

শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্যবিধান, জ্ঞানকেই দেবতা হিসাবে পূজা করা নয়—সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান ও কর্মের সমন্বয় ঘটিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ও সমৃদ্ধ করে তোলা, অন্যকথায় তাকে একটি মহৎ ও সুগঠিত চরিত্রের অধিকারী কোরে তোলা, আর সেই সাথেই সমাজের বিকাশ, অগ্রগতি ও সমুন্নতিতে সাহায্য করা, সমাজবিদ্যা—শিক্ষাতে মিল্‌টন শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর অনুকরণীয় ভাষায় যা বলেছেন তা সর্বদাই মনে রাখা দরকার; **মিলটন বলেছেন, "A complete and generous education is that which fits a man to perform justly, 'skilfully and magnanimously, all the**

প্রধান লক্ষ্য মিল্টন ও হাক্সলের সংজ্ঞা

offices, both public and private, of peace and war." (সম্পূর্ণ ও উদার শিক্ষা হচ্ছে তাই যা মানুষকে কি যুদ্ধকালে, কি শান্তির সময়ে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল কাজই ন্যায়, দক্ষতা ও মহত্ত্বের সাথে সম্পাদন কোরতে সাহায্য করে।) **T. H. Huxley**-র কথাটা এই সাথে জুড়ে নিলে সমাজবিদ্যা—শিক্ষা কি এবং কেন তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। **Huxley বলেছেন, "Education is not so much the survival of the fittest but the fitting of the greatest possible number to survive."** যতটা সম্ভব বেশীসংখ্যক লোককে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করা, মুদালিয়র কমিশনও সমাজবিদ্যা-শিক্ষণের লক্ষ্য সম্পর্কে এই মূল কথাটাই বলেছেন। আর আধুনিক জীবনযুদ্ধে জয়ী হ'তে হলে কি দরকার, কমিশনের বক্তব্যে তা অল্পকথায় বেশ ভালভাবেই বলা হয়েছে :—

(১) ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতি সমাজশাস্ত্রকে একটি পরস্পর সংবদ্ধ একক হিসাবে ধরতে হবে এবং সমাজের গড়ন, নানাবিধ শক্তি, আন্দোলন ও গতি সম্পর্কে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন কোরতে হবে। বস্তুতঃ টুকরো টুকরো বিষয়ের সীমার মধ্যে ফেলে জীবনকে খণ্ডখণ্ড কোরে দেখা নয়, জীবনের বাস্তব সামগ্রিক অস্তিত্বটাকেই প্রধান ধরে নিয়ে তার বিভিন্ন চাহিদাপূরণের, বিভিন্ন বিচিত্র সূত্র-বিন্যাসকে অনুসরণ কোরতে হবে। বিভিন্ন খণ্ড বস্তুগুলোর জ্ঞান থেকে সমগ্রকে অনুধাবন করার চেষ্টা নয়, পরন্তু সামগ্রিক সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষা থেকেই তার খণ্ড অংশগুলো অবলোকন করা—সমাজবিদ্যা পাঠের প্রধান উদ্দেশ্য।

সমাজজীবনের পরিপ্রেক্ষা থেকে জীবনকে বিচার

(২) ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা অতীতে কেমনভাবে চলেছে, আর বর্তমানেই বা কেমন কোরে চলছে, সে সম্পর্কে শুধু জ্ঞান অর্জন করাই ছাত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়, ছাত্র নিজেই এই প্রক্রিয়াটিকে আবিষ্কার করবে, বিশ্লেষণ করবে এবং নিজের জীবনে উপলব্ধি করবে। বস্তুতঃ শুধু জ্ঞানের বোঝা বহন করবে, **এমন 'পণ্ডিতমূর্খ' সৃষ্টি করা সমাজবিদ্যা-শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে পারে না** (আধুনিক শিক্ষার আদৌ তা উদ্দেশ্য নয়); জ্ঞানের বহরে ছাত্রের কিছুটা খর্বতা থাকলেও সে যদি সমাজ ও নিজের সম্পর্ক বুঝে নিয়ে সমাজে নিজের যথাযোগ্য স্থানটি আবিষ্কার কোরে নিতে পারে, তবে সমাজবিদ্যা-শিক্ষার সেইটিই হবে সর্বপ্রধান সাফল্য। এর মাধ্যমে ছাত্রের চোখে সমাজ একটা পূর্ণ বাস্তব চেহারা নিয়ে ফুটে উঠবে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে ঠিক কোন্ কাজে কোথায় তার সাফল্য আসতে পারে ছাত্রের মনে সেই আত্মজ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। বস্তুতঃ এই দুইটির পরস্পর পরিপূরক কাজ ছাত্রের নিজ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। সমাজবিদ্যা ছাত্রের সেই বাস্তব অভিজ্ঞতালাভকে সাহায্য করতে চায়, তার অভিজ্ঞতার—শুধুমাত্র জ্ঞানের নয়। আধুনিক শিক্ষা প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য স্বীকার কোরে নিয়েছে; তাদের ভিত্তিতে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ও

ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গতিবিধান

আত্মবিকাশ আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য। আবার ব্যক্তির সামাজিকীকরণ, অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমাজ-শক্তির সাথে সঙ্গত কোরে নেওয়াও আধুনিক শিক্ষার অপর লক্ষ্য। এই দুটো লক্ষ্যই একত্রিত ও সুফলপ্রসূ হতে পারে সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তির সমৃদ্ধ ও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের দ্বারা। **জ্ঞান এই অভিজ্ঞতার অংশ, কিন্তু জ্ঞানই সর্বস্ব নয়।** জ্ঞান সর্বস্ব বা প্রধান হয়ে উঠলে সমাজকে চেনা নয়, জানাটাই প্রধান হয়ে পড়ে; সমাজের উপাদান ও শক্তিসমূহকে আবিষ্কার করা এবং তার আলোকে নিজের শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিচার কোরে তাকে উপযুক্ত সামাজিক ক্ষেত্রে নিয়োগ করার প্রশ্নটা গৌণ হয়ে পড়ে। বাঙালীরা যতদিন সমাজকে তার পূর্ণ অস্তিত্বে আবিষ্কার কোরে নিজের যথাযোগ্য স্থানটিকে সন্ধান কোরে নিতে তৎপর হয়নি, ততদিন তারা ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি সমাজশাস্ত্রের বড় বড় কেতাব মুখস্থ করেও,—সমাজ সম্পর্কে অনেক জ্ঞান অর্জন কোরেও কেবল বাঁধা-বরাদ্দের কেরানীগিরিটুকুই করেছে, তাই বাঙালী কবির মর্মবেদনা মূর্ত রূপ নিয়েছে কবিতায়—

"পুণ্যে-পাপে, দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—···
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান;
...."

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আবিষ্কৃত হয় সমাজ-পটভূমিকায়, আর সমাজের সার্থকতা বিচার হয় ব্যক্তির বিকশিত, সুসমৃদ্ধ, বৈচিত্র্যময়, মহৎ-আদর্শানুগ জীবন থেকে। মহৎ-আদর্শানুগ জীবন বলতে আমরা যেন কখনই দুরাশাময় জীবন মনে না করি। ভারতবাসীরা যুগ যুগ ধরে রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শ অনুসরণ কোরে জীবনযাপন কোরতে অভ্যস্ত হয়েছে, তাই মহৎ আদর্শানুগ জীবন বিরাট না হলেও মহৎ উদ্দেশ্য-পূর্ণ, একথা তারা সহজেই ভালভাবে বুঝতে পারবে। সমাজ-বিদ্যা শিক্ষার ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পর সুসঙ্গতি-বিধানের এই চিত্র ও লক্ষ্যটিকে সর্বদা মনের সামনে সুস্পষ্ট রাখতে হবে ও ছাত্রদের সেই অনুযায়ী কাজে প্রবৃত্ত করিয়ে তাদের নিজ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষালাভে সাহায্য কোরতে হবে। তাই মুদালিয়র কমিশন বলেছেন :—"এদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুধু জ্ঞানার্জনেই সক্ষম হবে না, পরন্তু তারা সেইসব দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণাদি এবং মূল্যবোধও অর্জন কোরবে যা সার্থক সংঘবদ্ধ জীবনযাপন ও নাগরিক দক্ষতালাভের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।"

(৩) আধুনিক জগতে প্রতিটি জাতির পৃথক অস্তিত্বের কথা আজ আর চিন্তা করা যায় না। তাই আজ প্রতিটি জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য ও চাহিদা ছাড়াও সারা পৃথিবীর কথা চিন্তা করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। Wendel Wilkie যে "One World"-এর কথা বলে গেছেন, তা আজ আর কল্পনাজগতে সীমাবদ্ধ নয়।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংযোগ আজ এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে যাকে আমরা বিশ্বরাষ্ট্র-গঠনের সূচনা বলে বর্ণনা কোরতে পারি। তাই আজ সর্বদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ব-ঐক্য আর বিশ্ব-নাগরিকতার কথা এসে পড়েছে। ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই আন্তর্জাতিকতার পরিপ্রেক্ষাকে আজ পূর্ণ মর্যাদা দিতে হবে। মুদালিয়র কমিশন শিক্ষার এই দিকটির কথা তাঁদের রিপোর্টে একাধিকবার উল্লেখ করে আধুনিক সমাজ ও তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষার পূর্ণ রূপটি উপস্থিত কোরেছেন। বর্তমান কালের সমাজ-বিদ্যাশিক্ষা কোনক্রমেই আজ মানবজীবনের এই বাস্তব আন্তর্জাতিক পটভূমিকাটি বিস্মৃত হতে পারে না এবং এইটি আধুনিক শিক্ষার আর একটি প্রধান লক্ষ্য তা স্মরণ রেখে সমগ্র সমাজবিদ্যা-শিক্ষাদান ব্যাপারটি পরিচালনা কোরতে হবে। বস্তুতঃ, ভারতের বিদ্যালয়ে যখন আমেরিকার প্রেরিত দুধের গুঁড়া থেকে দুধ তৈরি কোরে শিশুদের বিলি করা হয়, অথবা ভারতের বন্যার্ত মানুষকে সোভিয়েট রাশিয়ার খাদ্য ও ঔষধ দিয়ে সাহায্য করা হয়, তখন পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজ সম্পর্কে প্রতিটি জাতির দায়িত্বকেই স্বীকার কোরে নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এইরূপ প্রত্যক্ষ নিদর্শনগুলোকে সমাজবিদ্যার শিক্ষক কখনই উপেক্ষা কোরতে পারেন না, বরং তাঁর ছাত্রদের মনে আন্তর্জাতিক চেতনা-সঞ্চারের জন্য এই সুযোগগুলির তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার কোরবেন এইটাই আশা করা যায়। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেক জাতির প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে আন্তর্জাতিক চেতনা-সঞ্চার সমাজবিদ্যার তথা আধুনিক শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য। **এই প্রসঙ্গে জেনারেল ডুইট আইজেনহাওয়ারের** মূল্যবান কয়েকটি কথা আমাদের অনুধাবন করা দরকার। তিনি তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন—"আমার জীবদ্দশায় আমি পৃথিবীর বহু স্থানে ভ্রমণ করেছি। কি যুদ্ধকালে, কি শান্তির সময়ে অন্যান্য জাতির মানুষদের সাথে আমার সাক্ষাতের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই দৃঢ়বিশ্বাসে উন্নীত হয়েছি যে, যেসব গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধাগুলি মানবসমাজকে বিচ্ছিন্ন কোরে রেখেছে, তাদের অনেকগুলিরই মূলে আছে অজ্ঞতা এবং পারস্পরিক উপলব্ধির একান্ত অভাব। আমি এমন হাজার হাজার লোকের সংস্পর্শে এসেছি যারা নিজেদের সন্নিহিত পরিবেশ ও পরিচয়ের বাইরে প্রায় কিছুই জানে না; তাদের সমস্ত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হোলো তাদের খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যক্তিগত প্রয়োজন। তারা পৃথিবীর অন্য সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিভিন্ন জাতির অভিজ্ঞতা ও পারস্পরিক উপলব্ধির অভাব

"আমি দেখেছি জাতীয় ঈর্ষা-বিদ্বেষবশতঃ কোনো মিত্রশক্তির এক বাহিনীর সৈন্যরা অপর বাহিনীর সৈন্যদের সম্পর্কে সন্দিহান হয় ও তাদের প্রতি অমিত্রোচিত ভাব পোষণ করে, যদিও উভয় বাহিনীর সদস্যরা সম-উদ্দেশ্য নিয়েই প্রাণবিসর্জন দিচ্ছে।

"এর থেকে আমার মধ্যে এই দৃঢ়সঙ্কল্প জন্মে যে আমি সৎশিক্ষার মাধ্যমে এই পাপকে দূরীকরণের জন্য আমার ব্যক্তিগত সকল চেষ্টা চালিয়ে যাব।... ..

সত্য শিক্ষার প্রয়োজন

"কোন কোন বস্তুর মত সত্যকেও সহজে চেনা যায় না। তবে এর কতকগুলি প্রধান শত্রুকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়। তারা হোলো......বিদ্বেষ ও তিক্ততার, অবিশ্বাস ও ভয়ের, অদূরদর্শী স্বার্থপরতার, স্ব-কপোল-কল্পিত কাহিনীর এবং নিপীড়নমূলক অজ্ঞতার এক জটিল সংমিশ্রণ। বাস্তবিক, সম্ভবতঃ এমন কোন জাতি নেই যে পূর্বোক্ত শত্রুগুলির এক বা একাধিকের দ্বারা অতীতে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি।

সত্যের শত্রুগুলি

"ডাকিনী-বিদ্যা এবং ডাকিনী-শিক্ষার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, জাতিবিদ্বেষ এবং শ্রেণী-সংঘর্ষ একাধিকবার আভ্যন্তরীণ সংঘাতের কারণ হয়েছে আর তার সাথে এসেছে রক্তপাত, নির্যাতন এবং মানুষের দুঃখদুর্দশা। ঠিক একইভাবে, পারস্পরিক অজ্ঞতা, রাজনৈতিক দৃঢ়বিশ্বাস এবং জাতীয় ঘৃণা থেকে সঞ্জাত তিক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিপুল ধ্বংসাত্মক অথচ অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধসমূহের কারণ হয়েছে।

আন্তর্জাতিক তিক্ততার কারণসমূহ

"শিক্ষকগণ, আপনারা এই শত্রুদের চিনে নিন এবং তাদের বিতাড়নের জন্য প্রতিদিন চেষ্টা করুন। আপনারা আপনাদের শিক্ষার্থীদের যেভাবে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা দেবেন, তারা ঠিক সেইভাবেই কাজ করবে।"

[১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই স্টকহোমে অনুষ্ঠিত WCOTP-র একাদশ প্রতিনিধি-সম্মেলনে আইজেনহাওয়ারের প্রদত্ত ভাষণ থেকে উদ্ধৃত।]

আমরা এতক্ষণ শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে যে আলোচনা কোরেছি, তার সাথে আমেরিকায় কতকগুলি সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের উল্লেখ কোরলে আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা আরও সুপ্রকাশ হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের National Educational Association ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের জন্য যে কমিশন নিয়োগ করে তা "**মাধ্যমিক শিক্ষার মূলনীতি**" নামে যে রিপোর্ট দাখিল করে তাতে বলা হয়েছে, "গণতন্ত্রে শিক্ষা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞান, আগ্রহ, আদর্শ, অভ্যাস এবং ক্ষমতাসমূহের বিকাশ কোরবে যার দ্বারা সে তার নিজের যোগ্যস্থান খুঁজে নেবে এবং ক্রমোন্নত মহত্তর উদ্দেশ্যপূরণের দিকে সে তার সমাজকে এবং নিজেকে পরিচালিত করার জন্যে তার সেই অবস্থানকে ব্যবহার কোরবে।" আর এই উদ্দেশ্য-পূরণের নিমিত্ত যে সাতটি মৌল নীতিকে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে, তা হচ্ছে—(১) উত্তম স্বাস্থ্যসংক্রান্ত জ্ঞান এবং অভ্যাসাদি, (২) পঠন, লিখন, গাণিতিক হিসাব, মৌখিক এবং লিখিত ভাব মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা সহ কয়েকটি মৌলিক প্রণালীর দক্ষতা অর্জন, (৩) পরিবারের যোগ্য সদস্য হওয়া, (৪) বৃত্তির জন্য শিক্ষা, (৫) সুনাগরিক হবার শিক্ষা, (৬) অবকাশের সদ্ব্যবহার এবং (৭) নৈতিক চরিত্র। ১৯৩৮ সালের একটি কমিটির রিপোর্টে চার ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের কথা বলা

মাধ্যমিক শিক্ষার মূলনীতি

সাতটি মৌল প্রয়োজন-ভিত্তিক নীতি

হয়েছে—(১) আত্মোপলব্ধি এবং আত্মবিকাশ-সংক্রান্ত, (২) মানবিক সম্পর্ক-নিচয়ের উপলব্ধি-সংক্রান্ত, (৩) নাগরিক দায়িত্বগ্রহন-সংক্রান্ত এবং (৪) অর্থনৈতিক দক্ষতা-অর্জন-সংক্রান্ত। American Historical Association-এর সমাজবিদ্যা-সংক্রান্ত কমিশনের রিপোর্টে সেদেশের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্বকে যেন সমৃদ্ধ এবং বহুমুখীন করে এবং তরুণ সমাজকে চিন্তা, আদর্শ এবং জ্ঞানের মাধ্যমে—নির্যাতন, চিন্তার সামূহিকতা এবং অজ্ঞতার মাধ্যমে নয়—বর্তমান গঠনশীল সমাজে প্রবেশের যোগ্য কোরে দিতে পারে এবং আমেরিকায় জাতীয় স্বাধীনতাবোধ ও মর্যাদাবোধের আদর্শের সাথে সঙ্গতি রেখে সেখানকার সমাজকে রূপদান কোরতে পারে।

তরুণদের বর্তমান গঠনশীল সমাজে প্রবেশের যোগ্য কোরে তোলা

দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি কমিটি বা কমিশন শিক্ষার্থী যুবসমাজের প্রতি তাদের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত কোরেই কাজ আরম্ভ কোরছেন এবং তাদের ও সমাজের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনা কোরেই তাদের রিপোর্ট তৈরী কোরছেন।

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রধান প্রধান লক্ষ্য

এখন উপরি-উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রধান প্রধান লক্ষ্য কি তা বিচার কোরতে পারি। সেগুলি হচ্ছে :—(১) দেশের রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয় সমাজের উপযুক্ত ও প্রকৃত নাগরিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলা সমাজবিদ্যা পাঠদানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, ঐতিহাসিক বিচারবোধ, মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রেম, সৌন্দর্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি সুকুমার চিত্তবৃত্তির উন্মেষসাধনই এই প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে বিবেচ্য। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশই শিক্ষার চিরন্তন আদর্শ। ইহা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানেরও প্রধান লক্ষ্য। শুধু পুঁথিগত শিক্ষায় কোনকালেই উপযুক্ত মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি বা সম্ভব নয়।

উপযুক্ত ও প্রকৃত নাগরিক সৃষ্টি

(২) আধুনিক সমাজে সমাজের সাথে প্রতিটি ব্যক্তির সামঞ্জস্যবিধান একটা দুরূহ সমস্যা। এর জন্যে একদিকে যেমন সামাজিক ব্যবস্থাদির ক্রমবিবর্তন প্রয়োজন হয়, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তির পক্ষে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে নেবার মত উপযুক্ত মনোভঙ্গীও অর্জন করা দরকার। এজন্যে প্রথম থেকেই শিক্ষার্থীর মনে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা জাগ্রত করা এবং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা কোরে চলতে শিক্ষা দেওয়া সমাজবিদ্যার লক্ষ্য।

আধুনিক সমাজের সাথে ব্যক্তির অভিযোজন

(৩) প্রতিটি নাগরিকের মনে সামাজিক ন্যায়বুদ্ধি ও কর্তব্যবুদ্ধি জাগ্রত করা সমাজবিদ্যার তৃতীয় লক্ষ্য।

সামাজিক ন্যায় ও কর্তব্যবুদ্ধি সৃষ্টি

(৪) মানবপ্রেম সমাজবিদ্যার মূল কথা। স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্ব-মানব-সমাজের প্রতি আনুগত্য-বোধ শিক্ষার্থীদের মনে সঞ্চার করা সমাজবিদ্যা ও আধুনিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। শিক্ষার্থীদের মনে স্থানীয় প্রতিবেশী, দেশবাসী এবং বিদেশী মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, এবং সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অপরিহার্য লক্ষ্য। এর ফলে স্থানীয়, জাতীয় এবং বিশ্বভিত্তিতে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পাবে, মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস হ্রাস পাবে এবং মানবিক সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে তরুণ শিক্ষার্থীদের মন অনুপ্রাণিত হবে।

মানবিক সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি

এক কথায়, আধুনিক মানবসমাজের উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টি করাই সমাজবিদ্যা বিষয়টি প্রবর্তনের মূল লক্ষ্য। উপরে বর্ণিত লক্ষ্যগুলো এই মূল লক্ষ্যের সাথে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত।

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের কয়েকটি সহায়ক লক্ষ্য

কিন্তু আরও কয়েকটি সহায়ক লক্ষ্যের কথা আলোচনা না কোরলে এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই লক্ষ্যগুলির একটি হচ্ছে জ্ঞানের দিক, অপরটি ব্যবহারের দিক। জ্ঞানের দিকে রয়েছে :—

(১) জ্ঞান সঞ্চয় এবং (২) সমাজ-সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসার ফলে স্বীয় প্রচেষ্টা দ্বারা জ্ঞান-লাভ। জ্ঞান-সঞ্চয় নানাবিধ তথ্য-সংগ্রহের উপর নির্ভরশীল। এই তথ্য ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজক্ষেত্রে নিজ চেষ্টা ছাড়াই শিক্ষকদের নিকট থেকে এবং নানাবিধ গ্রন্থ থেকে লাভ কোরতে পারে। এই দিকটাতে বেশী জোর দিতে গেলে শিক্ষা পুঁথিগত হয়ে ওঠে। তথাপি একথা বলতেই হয়, সমাজ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানকে একটা পূর্ণ রূপ দিতে গেলে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান অবশ্যই সংগ্রহ কোরতে হবে। সমাজবিদ্যার গ্রন্থ-রচনার ক্ষেত্রে মরিসনের আদর্শানুযায়ী ছোটো আকারের বই রচনা করাই ভাল। এখানে "সমস্যা এবং পরীক্ষা" পদ্ধতি (Test and Problem Method) অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। পরীক্ষা হবে আবার দুই প্রকারের—ব্যক্তিমুখীন ও নৈর্ব্যক্তিক বা বাস্তব-মুখীন—যাতে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর বাস্তব জ্ঞান, যুক্তিনিষ্ঠা ও বিচারবুদ্ধির সম্যক্ বিকাশলাভ সম্ভব হয়।

জ্ঞান-সঞ্চয়

জ্ঞান-সঞ্চয়ের অপর দিকটি, ছাত্র-ছাত্রীদের স্বীয় অনুসন্ধিৎসা ও প্রচেষ্টা দ্বারা জ্ঞানলাভের ওপর জোর দেওয়াই হবে সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। শুধু শিক্ষকের কাছ থেকে উপদেশ শুনে আর কতকগুলো বাঁধাধরা তত্ত্ব বা কথা মুখস্থ করে রাখলে সমাজ-সম্পর্কে উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হতে পারে না। সমাজ গতিশীল এবং সমস্যাসঙ্কুল। এইজন্য

স্বচেষ্টায় জ্ঞান-লাভ

ছাত্র-ছাত্রীকে "আত্মনির্ভরশীল পাঠক" হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। "আত্মনির্ভরশীল নাগরিক" হতে হলে অবশ্যই "আত্মনির্ভরশীল পাঠক" হওয়া চাই। প্রতিনিয়ত সমাজ যে সকল সমস্যা উপস্থিত করে তার সমাধানের জন্য উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী ও জ্ঞানলাভ কোরতে হোলে প্রতিটি নাগরিককে "গতিশীল পাঠক" হতে হবে, অর্থাৎ তাকে সর্বদাই সমাজ-সমস্যার অনুসন্ধিৎসু পাঠক হতে হবে। এই পাঠে বাস্তব সমাজজীবনের সমস্যার অনুসন্ধান-মূলক গবেষণাও প্রধান স্থান অধিকার করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের এইভাবে "অনুসন্ধিৎসু, আত্মনির্ভরশীল ও গতিশীল পাঠক" হিসেবে গড়ে তোলা সমাজবিদ্যা-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্বনির্ভর পাঠক

সমাজ সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয় ও জ্ঞানার্জনের মুখ্য প্রয়োজন হোলো সমাজবিদ্যা-শিক্ষাদানের অপর একটি মুখ্য উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করা। এটি হোলো (৩) প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠাকে ভালোভাবে বিকশিত কোরে তোলা, কারণ একমাত্র উপযুক্ত জ্ঞানসম্পন্ন, বিচারবুদ্ধিপরায়ণ, যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিরাই সামাজিক ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা অর্জন কোরে থাকে। সমাজ সম্পর্কে তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত জ্ঞানের উপযুক্ত সমন্বয়ের দ্বারাই এই উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হতে পারে। সমাজ-সম্পর্কিত উপযুক্ত তথ্য ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবননিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী কোরে তুলতে পারে। যার একটা অনিবার্য ফল হোলো সমাজ ও ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিলাভ। "এই জৈবিক রসায়নসুলভ" দৃষ্টিভঙ্গীটাই যুক্তিনিষ্ঠা ও সামাজিক ন্যায়বুদ্ধির জন্ম দেয়। আগেই যে অনুসন্ধিৎসু মনের কথা বলা হয়েছে, সেই অনুসন্ধিৎসু মনই হচ্ছে এই যুক্তিনিষ্ঠা ও সামাজিক ন্যায়বুদ্ধির জনক ; আর এই দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি কোরতে পারেন সমাজ সম্পর্কে উপযুক্তভাবে সচেতন শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা, প্রেরণা, কর্ম এবং আচরণের দৃষ্টান্ত দিয়ে। শিক্ষকের মন ও আচরণ ছাত্রের জীবনকে উদ্ভাসিত কোরবে —এই তত্ত্বটির মূল্য সমাজবিদ্যার শিক্ষকের নিকটই সর্বাপেক্ষা অধিক।

বিচারবুদ্ধি ও যুক্তিনিষ্ঠার বিকাশ

(৪) পূর্ব অনুচ্ছেদ থেকেই এটা অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে যে উপযুক্ত আচরণ-পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অপর একটি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য। বিদ্যালয়ের ওপর এই কর্তব্য বর্তমানে আরও গুরুভার হয়ে চেপে বসেছে। আধুনিক জীবন-পরিবেশে গৃহ এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের বাঞ্ছিত ভূমিকা যথাযথভাবে পালন কোরতে পারছে না—এইজন্য মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত, শিষ্টাচার ও কর্মপ্রেরণাসম্পন্ন সুনাগরিক গড়ে তুলতে হলে বিদ্যালয়কেই অধিক দায়িত্ব নিতে হবে। বস্তুতঃ আধুনিক বিদ্যালয়ের সেটি একটি প্রধান ভূমিকা। তাই সহযোগিতামূলক কর্মধারায় ও সামাজিক শিষ্টাচারে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করা সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের আর একটি উদ্দেশ্য।

উপযুক্ত আচরণ-পদ্ধতি শিক্ষাদান

(৫) সমাজে দায়িত্বশীল, বিচারবুদ্ধিপরায়ণ, ধীর, স্থির নাগরিক গড়ে তুলতে গেলে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত অভ্যাস ও দক্ষতা-অর্জনে সাহায্য কোরতে হবে। জীবনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে গঠন কোরতে গেলে প্রয়োজনীয় অভ্যাসসমূহ আয়ত্ত কোরতে হয়, এই অভ্যাস-গুলিকে সুগঠিত ও জীবনের অঙ্গীভূত কোরে নিতে হয়; অন্ততঃ কোনো একটি বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন কোরতে হয়। এর থেকে আসে সূক্ষ্মতাবোধ, সঠিক ও নির্ভুলভাবে কাজ করতে অভ্যাস, কর্মে ও জীবনে পরিচ্ছন্নতা এবং একটি প্রত্যাশিত দ্রুততা, যা জীবনকে গতিময় কোরে তোলে, অভীপ্সিত সুষম বিকাশকে রূপদান করে। নিছক জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রেও এই অভ্যাসটির যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। পড়াশুনার নিয়মিত অভ্যাস, বিদ্যালয়পাঠ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সদ্ব্যবহার, গবেষণামূলক কাজে অধ্যবসায়সহকারে আত্মনিয়োগ প্রভৃতি অভ্যাসগুলি জ্ঞানার্জনকে ত্বরান্বিত করে এবং চরিত্রবিকাশে যথেষ্ট সহায়তা করে। তাই প্রয়োজনীয় অভ্যাসাদি গঠন ও বিশেষ বিশেষ কাজে দক্ষতা অর্জন, তত্ত্বগত ও ব্যবহারগত উভয়বিধ মূল্যবোধ থেকেই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সমাজবিদ্যার শিক্ষা কোনো ক্ষেত্রেই এই উদ্দেশ্যটিকে আদৌ বিস্মৃত হতে পারে না।

উপযুক্ত অভ্যাস-গঠন ও দক্ষতা-অর্জন

বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান অর্জন ও বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী গঠন

বিজ্ঞান আধুনিক সমাজের ভিত্তিভূমি। শতাব্দী-পরম্পরায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-সমূহের প্রয়োগ আধুনিক সমাজের চেহারাটাই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে, বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো এবং তাদের প্রয়োগ আধুনিক সমাজের নাড়ীর স্পন্দনতুল্য। মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের হার এবং সমাজে তার প্রভাব সম্পর্কে বিনয় ঘোষ বলেছেন, "যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মানুষের আবিষ্কারের সংখ্যা প্রায় ১০০; ১৫০০ হইতে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ৬০০; ১৭০০ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৪০০; ১৮০০ হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশত বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০০০। বিংশ শতাব্দীতে গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মানুষের আবিষ্কারের সংখ্যা ও গতি আরও দ্রুত হারে বাড়িয়া গিয়াছে। তাহার কারণ পূর্বপুরুষের উদ্ভাবন ও আবিষ্কার উত্তরপুরুষ লাভ করিয়াছে এবং সেই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া উন্নতির উচ্চতর ধাপগুলি আরও অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করা সম্ভব হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা আজ প্রত্যেক নাগরিকেরই কর্তব্য। সমাজবিদ্যার পাঠক অবশ্য বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তার প্রয়োগকে সামাজিক ফলাফলের দিক থেকেই বিচার কোরবেন। এদিক থেকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠা, চিন্তাধারা ও মনোভঙ্গী

বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী গঠন বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানলাভ

অর্জনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা একান্ত প্রয়োজন। সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের এটিও তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্য, কারণ এ ধরনের শিক্ষা ছাড়া সমাজকল্যাণ ও বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজের যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

সংক্ষেপে (ক) প্রতিটি ছাত্রছাত্রী যে একটা স্থান, সমাজ, জাতি ও বিশ্বের অঙ্গীভূত এটা তারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে; তাই তারা সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি পরিহার কোরতে শিখবে, মানুষে মানুষে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে পরস্পর নির্ভরতার কথাটা শিখবে; প্রতিটি ব্যক্তি নাগরিক ও ব্যক্তি-গোষ্ঠীর সাথে উপযুক্ত, সঠিক এবং সহিষ্ণু আচরণ শিখবে; জানবে বর্তমান সমাজের গড়ন এবং সমাজের বিচিত্র কর্মস্রোতধারা, সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি, মানুষের শারীরিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক—এক কথায় সমগ্র সামাজিক পরিবেশটি। (খ) এই জ্ঞানের সাহায্যে গড়ে উঠবে তাদের সুস্পষ্ট ধারায় চিন্তা করার, ক্ষমতা লাভ কোরবে যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধি এবং তারা হয়ে উঠবে গণতান্ত্রিক সমাজের উপযুক্ত অভ্যাস, দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কুশলী নাগরিক যারা অনুরক্তি, সাহস ও ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি চরিত্র-গুণে নিজ সমাজকে সমৃদ্ধ ও সমুন্নত কোরে তুলবে এবং বিশ্বসমাজেও অবদান রেখে যাবে। বস্তুত সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো সমগ্র শিক্ষা-প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলোর অঙ্গীভূত ও তাদের সাথে অভিন্ন। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের নিকট এই তথ্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্য প্রণিধানযোগ্য।

সমগ্র সামাজিক পরিবেশের জ্ঞান

যুক্তিনিষ্ঠা, বিচারবুদ্ধি, উপযুক্ত অভ্যাস, দক্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি অর্জন চরিত্র-সমৃদ্ধি

আমেরিকান সমাজে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য

আমরা আমেরিকান সমাজের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে আগেই উল্লেখ কোরেছি তাদের শিক্ষা সমাজকেন্দ্রিক শিক্ষা, তাই তাদের বিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিদ্যা আজ বিদ্যালয়-পাঠক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তারা সমাজবিদ্যা ও তার অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠের লক্ষ্য হিসাবে যা বলেছেন, তা আমাদের কাছে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা কোরতে গিয়ে তারা বলেছেন যে শিক্ষার্থীদের **প্রয়োজনানুগ** জ্ঞানদান কোরতে হবে তাদের **যুক্তি-নিষ্ঠা** ও **বিচারশক্তির** বিকাশসাধন কোরতে হবে, **স্বয়ংনির্ভর পাঠক হবার** এবং **অনুসন্ধিৎসার** নিমিত্ত **শিক্ষাদান** কোরতে হবে। **প্রয়োজনীয় অভ্যাস ও দক্ষতাসমূহ** অর্জনের **শিক্ষা** দিতে হবে এবং

লক্ষ্যসমূহ

শিক্ষার্থীদের কাম্য আচরণ-পদ্ধতি গড়ে তুলতে হবে। "The aims of the social studies include the teaching of a certain amount of knowledge, the development of reasoning power and critical judgment training in independent study, the formation of habits and skills and the moulding of desirable patterns of conduct" (Bining and Bining *Teaching the Social Studies in Secondary Schools.*) সমাজবিদ্যার অন্তর্গত বিভিন্ন পাঠ শিক্ষাদানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য তাঁরা যেভাবে নির্ণয় কোরেছেন, তা আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনাই সমর্থন করে। তাঁদের বর্ণিত বিভিন্ন পাঠের নির্দিষ্ট লক্ষ্য নীচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হোলো :—

(ক) **ইতিহাস**—ইতিহাস পাঠদানের লক্ষ্য হোলো—(১) অতীত সম্পর্কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়স্তরের উপযোগী এমন পরিমাণ জ্ঞান-সঞ্চয় যা বর্তমানকে ব্যাখ্যা কোরতে সাহায্য করে। (২) সামাজিক উপাদানসমূহের পক্ষপাতহীন ও ফলপ্রসূ অনুসন্ধান করার ক্ষমতার বিকাশসাধন এবং সামাজিক বিষয়ে গঠনমূলক বিচারবুদ্ধির উন্মেষ ঘটানো। (৩) ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্নতা সম্পর্কে উপলব্ধি জাগানো যাতে মানুষ ও তার সমাজের অবিরাম পরিবর্তনশীল চরিত্র সম্পর্কে এবং মানব-সম্পর্কের পরস্পর-নির্ভরতা ও জটিলতা থেকে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ ও তাদের সমাধান সম্পর্কে শিক্ষার্থী অবহিত হয়। (৪) সভ্যতার উপকরণসমূহ আয়ত্ত কোরতে অতীতে মানুষকে যে মূল্য দান কোরতে হয়েছে তা স্মরণ কোরে নিজের ও সহযাত্রী মানুষদের প্রতি আনুগত্যের মহৎ আদর্শ অনুসরণ করা। (৫) সুনাগরিকতা অর্জনের উপযোগী ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যবিধ মনোভঙ্গী-অর্জনে সহায়তা করা এবং (৬) সাংস্কৃতিক আগ্রহের বিকাশসাধন বা চিত্র ও বিভিন্ন শিল্পকলার নিদর্শনাদি সংগ্রহ, জাদুঘর সংগঠন ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পর্যটনের মধ্যে পরিতৃপ্ত হবে।

জ্ঞান, অনুসন্ধিৎসা, মানব-সমস্যার উপলব্ধি, সমাজের প্রতি আনুগত্য, উপযুক্ত মনোভঙ্গী, সাংস্কৃতিক আগ্রহ

(খ) **পৌরবিদ্যা**—এর পাঠদানের সুস্পষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে উন্নততর নাগরিক সৃষ্টি করা এবং শিক্ষার্থীদের উন্নতধরনের নাগরিক চরিত্র-গঠন। এর জন্যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-যন্ত্র এবং তার কাজ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা চাই। তাছাড়া, শিক্ষার্থীদের জীবনে যা কার্যকরী হবে সেই নাগরিক আদর্শ, আচরণ ও অভ্যাসাদির উন্নতিবিধান কোরতে হবে। নাগরিক ব্যাপারে তাদের স্বাধীন চিন্তায় এবং পক্ষপাতশূন্য ন্যায়বিচারে উৎসাহদান কোরতে হবে। ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও আবেগের বশবর্তী না হয়ে তারা যেন উপযুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাদের সিদ্ধান্ত গঠন কোরতে শেখে।

উন্নত নাগরিক চরিত্র, আচরণ, অভ্যাস, ন্যায়বিচার

(গ) **অর্থনীতি**—এই বিষয়ের পাঠদানের লক্ষ্য হচ্ছে পর্যবেক্ষণ ও বর্তমান আর্থিক লেনদেন-প্রক্রিয়ার উপলব্ধির মাধ্যমে আধুনিক অর্থনৈতিক নীতিসমূহ শিক্ষাদান করা। আধুনিক শিল্প, শুল্ক, কর, সরকারী আয়-ব্যয়, জীবনযাত্রার ব্যয় ইত্যাদি বহুবিধ ব্যাপার যা নাগরিকদের জীবনে সমস্যা সৃষ্টি করে সে সম্পর্কে উপলব্ধি ও অন্তদৃ'ষ্টি জাগিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন কোরতে হবে।

সমাজ সম্পর্কে অন্তদৃ'ষ্টি, আর্থিক সমস্যার পর্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি

(ঘ) **সমাজবিজ্ঞান**—বিদ্যালয়ে এই পাঠদানের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ জাগানো যে সামাজিক ঘটনাগুলোও প্রাকৃতিক ঘটনাগুলিরই তুল্য, অতএব এগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুধাবন কোরতে হবে। সামাজিক তথ্য ও ঘটনাবলী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পদ্ধতির উন্মেষ সাধন কোরতে হবে। সমাজ-সংগঠনের মৌল প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির শুরু হবে স্থানীয় সমাজ থেকে এবং স্থানীয়, জাতীয় তথা বিশ্বসমাজে শিক্ষার্থীর উপযুক্ত অংশগ্রহণের ক্ষমতা যাতে জন্মায় তা দেখতে হবে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামাজিক সমস্যার অনুধাবন

(ঙ) **গণতন্ত্রের সমস্যাবলী**—আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে এটিও একটি পাঠক্রম। এই পাঠক্রমটি যেন সমাজবিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপযোগী একটি বিষয়। এই পাঠের লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমানের প্রধান প্রধান সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক সমস্যাবলী অনুধাবনের দ্বারা উপলব্ধি করা—কেন এই সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়েছে এবং কেমন কোরে তা সমাধান করা যেতে পারে। অন্যান্য সমাজপাঠের অনেকাংশই এই পাঠের গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়ে। তাই সেইসব পাঠের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যও এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

আধুনিক সমাজের সমস্যাবলী ও তাদের কারণসমূহ অনুধাবন, সমাধান নির্ণয়

(চ) **সাম্প্রতিক ঘটনাবলী**—এটিও একটি বিদ্যালয়-পাঠ। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর প্রধান সমস্যা ও ঘটনাসমূহ উপলব্ধি কোরতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করা। এই বিষয়ে সংবাদপত্র ও সামাজিক পত্রাদি পাঠ একান্ত অপরিহার্য।

বিশ্বের সাম্প্রতিক সমস্যা-সমূহের অনুধাবন

(ছ) **ভূগোল**—আধুনিক দৃষ্টিতে ভূগোল হচ্ছে মানুষ ও তার পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক-সংক্রান্ত পাঠ। এই পাঠের লক্ষ্যগুলো হচ্ছে নিম্নোক্ত ব্যাপারগুলো জানা এবং বোঝা—(১) মানুষ কোথায় এবং কেমন কোরে বাস কোরে বাঁচে এবং কাজ করে (২) তাদের পরিবেশ তাদের জীবনযাত্রা, ধ্যান-ধারণা ও প্রথা-পদ্ধতিকে কিভাবে প্রভাবিত করে এবং (৩) এক অঞ্চলের জীবনযাত্রা ইত্যাদি অন্য অঞ্চলের জীবনযাত্রা ইত্যাদিকে কিভাবে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর ব্যক্তিসমূহ,

ভৌগোলিক পরিবেশ ও স্থানীয় সমাজের ওপর তার প্রভাব

প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জাতিসমূহের উন্নততর সম্পর্কসৃষ্টি এই পাঠের প্রধান লক্ষ্য। ভৌগোলিক কারণাদি স্মরণ রেখে সামাজিক তথ্যসমূহের উপলব্ধি এবং তদনুযায়ী দক্ষতার বিকাশসাধন এই পাঠদানের বিশেষ লক্ষ্য।

(জ) **মৌলিক কার্যক্রম** (Core Programe)—এটিও আমেরিকার একটি বিদ্যালয়পাঠ। এই পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে তার দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা-সমাধানে সহায়তাদান। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থী বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তার জীবনে যেসব সামাজিক ও নাগরিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে বা হতে পারে তাদের সমাধানে তাকে সহায়তা করা।

সমস্যাদি সমাধানে সহায়তাদান

উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা আমেরিকার বিদ্যালয়গুলিতে কি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা হয়েছে তা আমরা ধারণা কোরে নিতে পারি। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী হবে তা নির্ণয়ে আমরা যা বলে এসেছি, এই আলোচনা তার পরিপূরক হবে বলেই মনে করি।

লক্ষ্য ও তার রূপায়ণ

এতক্ষণ আমরা সমগ্রভাবে শিক্ষার এবং সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নিয়ে আলোচনা কোরে এসেছি। এ আলোচনা অপরিহার্য সন্দেহ নাই। কারণ, কোনো কাজ করতে গেলে আগে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নির্ধারণ কোরে নিতে হয় এবং সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টাকে সেইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুবর্তী কোরে নিতে হয়। লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে দূরবর্তী, সেখানে পৌছবার পথ দীর্ঘ এবং ক্লেশকর, আমাদের কর্মসূচীর সাথে তাদের যোগসূত্র সর্বদা প্রত্যক্ষ নয়, এমন কি অনেক সময় তা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়তে পারে। অথবা কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্যের উপর জোর দেওয়ার ফলে অন্যান্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি গৌণ হয়ে পড়ে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিকাশকে যদিও আমরা শিক্ষার লক্ষ্য বলে গণ্য করে থাকি, তবু আমরা জ্ঞানসঞ্চয়ের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ায় আমাদের শিক্ষার অন্যান্য লক্ষ্যগুলি গৌণ এবং অবহেলিত হয়ে পড়েছে। **অতএব লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার পথে আমরা কী কী মূল্যবোধ অর্জন কোরে থাকি এখন যে প্রশ্ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।** এই **অর্জিত মূল্যগুলি** দুটো ভূমিকা পালন করে। প্রথমতঃ আমরা লক্ষ্যপথে সঠিক অগ্রসর হচ্ছি কিনা এগুলি তার নিদর্শন উপস্থিত করে, এবং দ্বিতীয়তঃ এরা নিজেরাই

লক্ষ্য ও তদভিমুখী কর্মপ্রচেষ্টা

আমাদের সমগ্র শিক্ষা-কর্মপ্রচেষ্টার সম্পদস্বরূপ। **আমরা যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাদি স্থির কোরে নিয়ে আমাদের শিক্ষাদান কাজ শুরু কোরলাম, তা থেকে আমরা যে বাস্তব ফল বা ঐশ্বর্য-লাভ কোরলাম, তাই হোলো অর্জিত মূল্য**; সেই কারণেই এদের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

অর্জিত মূল্য

অর্জিত মূল্যের আলোচনায় পাঠক্রমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক্রমের ভিত্তিতেই আমরা লক্ষ্যপথে অগ্রসর হই এবং মূল্যবোধ অর্জন কোরে থাকি। অর্জিত মূল্যের ক্ষেত্রে উপযুক্ত জ্ঞানসঞ্চয় উচ্চতর আদর্শপ্রীতি, উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গী, উচ্চ আচরণমান এবং বিভিন্ন কাম্য চারিত্রিক গুণের সঠিক মূল্যায়ণের কথা মনে রাখতে হবে। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুযায়ী হতে গিয়ে বা বাঞ্ছিত মূল্যবোধ অর্জন কোরতে গিয়ে আমরা যেন পাঠক্রমকে অযথা ভারাক্রান্ত কোরে না তুলি, কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার এইটিই হচ্ছে অপরিহার্য ভিত্তিভূমি। আর পাঠক্রম যদি ভারাক্রান্ত হয় তবে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা হয় মর্মান্তিক। ভারতীয় শিক্ষাজগতের নেতাদের আজ এই কথাটি বিবেচনা কোরে দেখার কিন্তু প্রয়োজন আছে।

পাঠক্রমের ভূমিকা

লক্ষ্য ও শিক্ষক

আমরা শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্জিত মূল্যের কথা বলেছি, পাঠক্রমের কথাও উল্লেখ কোরেছি। কিন্তু এই সবের থেকেও যিনি গুরুত্বপূর্ণ তিনি হলেন শিক্ষক। শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতিভূ হলেন শিক্ষক। শিক্ষার্থী তাকে দেখেই শিক্ষার গুরুত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হয়। শিক্ষকের উচ্চ নীতিবোধ, উন্নত আদর্শ-জ্ঞান, কাম্য চারিত্রিক গুণাবলী ও আচরণ নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ. উপযুক্ত জ্ঞানসঞ্চয় শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষার লক্ষ্য ও মূল্যবোধকে প্রাজ্জল করে দেয়। শিক্ষার লক্ষ্য কখনও শিক্ষকের উর্ধ্বে উঠতে পারে না, কারণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের তিনিই তো হাতেকলমে শিক্ষা দেবেন কিভাবে তারা বিদ্যালয়ের, পরিবারের, স্থানীয় ও রাষ্ট্রীয় সমাজের সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারে। আর এক্ষেত্রে তার জীবন, কাজ ও আচরণ হোলো শিক্ষার্থীদের কাছে বাস্তব উদাহরণস্বরূপ। তাছাড়া, যে পাঠক্রমের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকে লক্ষ্যানুবর্তী কোরতে হবে তার কোন্ অংশকে কতটা গুরুত্ব দিতে হবে তাও ঠিক কোরবেন শিক্ষক নিজেই। আর এটা ঠিক করার জন্য নিজের বিষয়ে শিক্ষকমহাশয়ের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই। শিক্ষার লক্ষ্যার্জনের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে, কিন্তু যদি তিনি না জানেন লক্ষ্যে পৌঁছাতে হোলে কোন্ জ্ঞানটুকু অপরিহার্য, তবে শিক্ষার লক্ষ্যাদি বর্ণনায় আমাদের বাগ্‌বিতণ্ডা একেবারেই অর্থহীন। অতএব শিক্ষার লক্ষ্যার্জনে

লক্ষ্য ও মূল্যবোধের জীবন্ত প্রতিভূ—শিক্ষক

লক্ষ্যার্জনে শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষকমহাশয় তাঁর নিজের বিষয় ও তার ভূমিকা এবং নিজের ব্যক্তিগত ভূমিকা সম্পর্কে যথেষ্ট অবহিত থাকবেন এটাই আমাদের আশা।

আমাদের বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার বর্তমান স্থান

আমাদের উচ্চতর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের নবম ও দশম শ্রেণীতে বেশ কয়েক বছর হোলো সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এটি একটি আবশ্যিক মূল বিষয় (core subject), কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার অন্তর্গত বিষয় নয়। কিন্তু আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি পরীক্ষা-অধ্যুষিত, ফলে বহু বিদ্যালয়েই এই বিষয়টি শিক্ষাদানের ওপরে এমন কি শুধু পড়াবার ওপরেও কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। আধুনিক চিন্তার ফলশ্রুতিকে আমাদের সনাতনপন্থী শিক্ষার অঙ্গীভূত করার এই চেষ্টা আজ পর্যন্ত সফল হয়েছে একথা বলা চলে না। বরং বিভিন্ন দিক থেকে এর ব্যর্থতাই সুস্পষ্ট। এই **কলম-বাঁধার** (grafting) চেষ্টায় নতুন চারা যেন শিকড় গজাতে এবং উপযুক্ত রস সংগ্রহ কোরতে পারছে না। যে লক্ষ্যাদি নিয়ে আমাদের পাঠক্রমে সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা, তা আধুনিক কর্মকেন্দ্রিক ও শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার সাথেই থাপ খায়। কিন্তু আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষা অনেকটা চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও সনাতনপন্থী, কিছুটা ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং মূলতঃ পুঁথিগত জ্ঞানকেন্দ্রিক, সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনে শিক্ষার্থীকে দিতে হবে সমাজবীক্ষণাগারের সুযোগ, কর্ম-অভিজ্ঞতা-ভ্রমণ-সংগ্রহ-তথ্যাদির মাধ্যমে শিক্ষা, বাস্তব সমাজই হবে পাঠ, তার জন্য পদ্ধতি হবে প্রধানতঃ সমস্যা ও প্রকল্পমূলক ; সহায়ক উপকরণ হবে শ্রবণ ও বীক্ষণ-সহায়ক উপকরণাদি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, মডেল, ম্যাপ, চার্ট, চিত্র এবং স্থানীয় সমাজ ও সম্প্রদায়ের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগ ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের সনাতন পরীক্ষা-কবলিত শিক্ষাধারায় এইসব কর্মকাণ্ডের কোনো সুযোগ নেই।

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে

তাছাড়া, সমাজবিদ্যাকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষার বাইরে রাখা হয়েছিল বলে মনে হয়, তা হোলো বিদ্যালয় এবং শিক্ষককে এবিষয়ে শিক্ষাদানে বাঞ্ছিত স্বাধীনতাদান, তাঁরা মধ্যশিক্ষা-পর্ষৎ কর্তৃক প্রচারিত পাঠক্রমটিকে সামনে রেখে স্থানীয় সমাজ ও পরিবেশের সুযোগ-সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে নিজস্ব কর্মকাণ্ড পরিচালনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সমাজ ও তার ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে সচেতন কোরবেন ও তাদের নাগরিক গুণাদি ও ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত যোগ্যতা গড়ে তুলতে সাহায্য কোরবেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অন্য ফল প্রসব কোরছে। এই স্বাধীনতা বিষয়টি অবহেলার স্বাধীনতায় পরিণত হয়েছে। আমি জানি, অনেক শিক্ষকমহাশয় এই বিষয়টির উপযুক্ত পাঠ-পরিকল্পনা ও কর্ম-পরিচালনায় আগ্রহী, কিন্তু বিদ্যালয়ের গতানুগতিক পরিচালনা তাঁর আগ্রহের ও কর্ম-পরিকল্পনার পরিপন্থী। যে বিষয়ের

চূড়ান্ত পরীক্ষার বাইরে রাখার উদ্দেশ্য—তার বাস্তব পরিণতি

চূড়ান্ত পরীক্ষায় কোনো স্থান নেই এবং বিদ্যালয়ের ও শিক্ষার্থীদের গতানুগতিক কৃতিত্ব জাহির কোরবার কোনো প্রশ্ন নেই, তার জন্য বিদ্যালয়-পরিচালকদের কোনো মাথাব্যথা নেই। এমনকি, শিক্ষকমণ্ডলীতেও সমাজবিদ্যার চেতনাসম্পন্ন শিক্ষক প্রায় নিঃসঙ্গ।

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়

উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে সমাজবিদ্যা ইতিহাস ও ভূগোলের বিকল্প পাঠ। এখানে এটি চূড়ান্ত পরীক্ষার বিষয়। তাই এখানে বিষয়টি অবহেলিত নয় ঠিকই, তবে পরীক্ষাকবলিত সনাতনী শিক্ষা-পন্থায় এখানে শিক্ষাদানও সনাতনী ধাঁচের। শুধু পুঁথিগত জ্ঞানের ওপরেই জোর অর্থাৎ মুখস্থবিদ্যারই জয়জয়কার। একটা কথা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের শিক্ষাকে সমাজকেন্দ্রিক ও যথেষ্ট উপযোগিতামূলক কোরে তুলতে না পারলে সমাজবিদ্যা তার আধুনিক ধ্যান-ধারণা ও প্রচুর কর্মকেন্দ্রিকতার সম্ভাবনা নিয়েও আমাদের শিক্ষাশালায় পরবাসী হয়ে থাকবে। তাই সমাজ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহী শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের শ্লোগান-অধ্যুষিত সমাজ থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন কোরতে চাইবে। বর্তমানে তারা তো তাই-ই কোরছে। একেই বলে দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটানো এবং আমাদের সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থার সঠিক দৈন্য ও নগ্নতা এখানে একেবারেই প্রকট হয়ে পড়েছে। তবু আমরা চোখ থাকতে দেখতে পাই না। দেখতে পেলেও বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হই না।

বাস্তব পরিণতি

অসাফল্যের কারণ

এদেশে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে অসাফল্যের এইটিই মূল কারণ। এর সাথেই জড়িয়ে আছে বিদ্যালয়ে সমাজ-বীক্ষণাগার গঠনের নিমিত্ত উপযুক্ত ঘর, সাজ-সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব। আরও একটি উল্লেখযোগ্য অভাব হচ্ছে বিষয়টি শিক্ষাদানের নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব।

আশার কথা এই, আমাদের বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা পাঠদানে অসাফল্যের এখন হিসাবনিকাশ শুরু হয়েছে। অতএব, সকল স্তরের শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ এবং পরিচালকগণ এই অসাফল্যের কারণগুলি দূর কোরতে যত্নশীল হবেন আশা করা যায়। সমস্ত সমাজে যখন নীতিহীনতা ও অস্থিরতা দেখা দেয়, তখন বিদ্যালয়গুলিই থাকে একমাত্র ভরসার স্থল। তাই সেখানে উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, উপযুক্ত সম্ভাবনাসহ, উপযুক্ত পদ্ধতিতে সমাজবিদ্যার পাঠকে কোনোক্রমেই অবহেলা করা চলে না। আমাদের দেশে বোধহয় এবিষয়ে আর বিলম্বের অবকাশ নেই।

Questions

1. Discuss the aims and objectives of teaching Social Studies in school. (C. U. 1962)

2. Discuss the aims and objectives of teaching Secial Studies in our Secondary Schools. State from your own experience how far these objectives are being realised in practice. (C. U. 1966)

3. Social Studies is meant for providing help to the pupils to find out their proper place in the Society.—Discuss.

4. "The students should be able to acquire not only knowledge but the attitudes and values which are essential for suceessful group living and civic efficiency". Discuss how Social Studies can extend its help in this respect.

5. Knowledge aim" of education is not completely alien to Social Studies. But how far should we entertain this aim in the field of Social Studies ?

6. What is the importance of scientific knowledge and attitude in Social Studies ?

7. Say why International understanding should be one of the chiet aims of teaching Social Studies.

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু

সমাজবিদ্যার লক্ষ্য ও স্বরূপ আলোচনার পর সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু কিভাবে নির্বাচন ও সংগ্রথিত করা হবে তার আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ এই বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপন-পদ্ধতিকে ভিত্তি কোরেই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পৌঁছুতে আমরা প্রয়াস পেয়ে থাকি। বিষয়বস্তু ও তার উপস্থাপনা হচ্ছে লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ—অতএব এদিকেও আমাদের গভীর মনোযোগসহকারে সমস্যাগুলো বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরের সমাজ-বিদ্যার বিষয়বস্তু সংগঠনের ব্যাপারটি আলোচনার আগে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে "পরিবেশ-পরিচিতি" নামে যে বিষয়গোষ্ঠীর প্রচলন করা হয়েছে সে সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকারের বক্তব্যগুলি আলোচনা কোরে নিলে ভালো হয়। "পরিবেশ-পরিচিতি"র বিষয়বস্তু সংগঠনে ও শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে তাঁরা শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা-ভাবনার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। এই আলোচনা আমাদের সমাজবিদ্যার শিক্ষককে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক জোগাবে এবং সঠিক পথের হদিশ দেবে বলে মনে করি।

পরিবেশ-পরিচিতি

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাভাবনা

আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় "পরিবেশ-পরিচিতি"

সমাজবিদ্যার গোড়ার কথা নিজের পরিবেশকে জানা ও তার সাথে নিজের সামঞ্জস্য বিধান করা। প্রাথমিক পর্যায়ে তাই এর নামকরণ করা হয়েছে Enviornmental Studies; পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার যার নামকরণ করেছেন "পরিবেশ-পরিচিতি"। তবে দুঃখের বিষয় এই যে "পরিবেশ-পরিচিতি"কে একটা অবিভাজ্য বিষয় হিসাবে বিচার না কোরে অনেকগুলি বিষয়ের সমষ্টি (a conglomeration of different subjects) হিসাবে দেখা হয়েছে। মজার কথা এই—পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার "শিক্ষণ-ব্যবহারিকায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী" এবং অবিভিন্ন কার্যসূচীর (undifferentiated curriculum) কথা বলেছেন, অথচ পরিবেশ-পরিচিতি, ভূগোল, ইতিহাস, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রকৃতি-পাঠ, ছড়া ও কবিতার বিষয়ভেদের সীমানাও বজায় রেখেছেন। তার ফলে পরিবেশ-পরিচিতি বিষয়টি সর্বাঙ্গ একক বিষয় (a completely unitary subject) হয়ে ওঠেনি। বিষয়ভেদের এই কৃত্রিম সীমাকে বজায় রাখতে গিয়ে অতীতের অনেক

সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বনাম বিষয়ভেদ

অবান্তর প্রচেষ্টার জের রয়ে গেছে এবং আলোচনা ও নির্দেশগুলো প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে এই, মানুষের জীবনকে কেন্দ্রভূমিতে টানবার বিশেষ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিষয়ের চিন্তাটাই বারংবার কেন্দ্র-ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইভাবে "অবিভিন্ন কার্যসূচী" ও "সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী" ব্যাহত হয়েছে। বস্তুতঃ এই বিষয়ভেদের চিন্তাকে সম্পূর্ণ পরিহার কোরে, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা-পর্ষদ্ দশম মানের বিদ্যালয়গুলির নবম ও দশম শ্রেণীর নিমিত্ত সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী যেভাবে উপস্থিত কোরেছেন, সেই ধাঁচে পুনর্গঠিত করা দরকার। তাতে মানুষের জীবন ও সমাজটাই তার "পরিবেশ-পরিচিতি"র কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়াতো, বিদ্যালয়ের উচ্চস্তরে যখন নব-ভাবনার সূত্রপাত হয়েছে, তখন প্রাথমিক স্তরেও তার পূর্ণ অভ্যর্থনা প্রয়োজন।

উপরি-উক্ত ত্রুটিটুকু বাদ দিলে দেখা যায়, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার প্রকাশিত "শিক্ষণ-ব্যবহারিকা"য় পরিবেশ-পরিচিতি"র বিষয়বস্তু নির্বাচনে অনেক মূল্যবান্ ভাবনা ও নির্দেশ উপস্থিত করা হয়েছে, ব্যবহারিক শিক্ষা এবং হাতের কাজের ওপরেও প্রভূত জোর দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার শিক্ষক এই ভাবনা ও নির্দেশগুলির সংস্পর্শে এলে খুবই উপকৃত হবেন জেনে কিছু কিছু অংশ বাছাই কোরে উদ্ধৃত কোরে দিচ্ছি। আগ্রহী শিক্ষকেরা মূলগ্রন্থ থেকে সম্পূর্ণ অধ্যায়টা পড়ে নিলে অবশ্যই অধিকতর উপকৃত হবেন।

শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাভাবনা

পরিবেশ-পরিচিতির ভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে—

শিক্ষাজগতে যুগে যুগে নানাপ্রকার পরিবর্তন হয়েছে। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ নূতন নূতন ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে এবং ভবিষ্যৎকে কিভাবে আরও অধিকতর সুন্দর ও কল্যাণকর করা যায়, তারই প্রচেষ্টা অহরহ চলছে।

"রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার আদর্শ নানা দেশে যুগে যুগে পরিবর্তন হয়েছে। এই পরিবর্তন যতই বিতর্কমূলক হোক না কেন, অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সর্বত্রই শিক্ষার একটি মূল সূত্র অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষাকে সর্বদেশে সর্বকালে "adjustment" (সামঞ্জস্যবিধান) হিসাবেই গণ্য করা হয়েছে। "এই adjustment" করতে হলে মানুষকে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে জানতে হয়। ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের শাখা সেই পরিবেশকে জানতে সহায়তা করে। এতকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জ্ঞানের এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগগুলোকে আমরা পৃথকভাবে শেখাতে চেষ্টা করেছি। অথচ শিশুর পক্ষে (৬ হতে ১১ বৎসর) এইসব বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান অর্থহীন; পক্ষান্তরে পরিবেশের সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গী তাদের আকর্ষণ করে।

পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধান

"সেইজন্য "Enviornmental tudies"-এর নাম আজকাল শিক্ষাজগতে খুবই শোনা যায়। ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতির বিশেষ জ্ঞান না দিয়ে পরিবেশের মধ্য দিয়ে ঐসব বিষয়ের জ্ঞান দেওয়াই "Environmental studies"-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। আমরা এর নামকরণ করেছি—"পরিবেশ-পরিচিতি।"

"আমরা আমাদের পরিবেশের মধ্যে অনেক জিনিসই দেখি বটে, কিন্তু সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাহা পর্যবেক্ষণ করি না। আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি আমাদের নেই—সেখানেই শিক্ষার অসম্পূর্ণতা, উপরন্তু শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব জীবনের যোগসূত্র বড় একটা দেখা যায় না। তাই বর্তমানে কেতাবী শিক্ষাকে লক্ষ্য করে এবং তার ব্যর্থতা উপলব্ধি করে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে এক জায়গায় বলেছেন :—

আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি

"বহুদিন ধরি বহুদেশ ঘুরি'
বহুব্যয় করি বহু ক্লেশ করি'
দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু।"

"সেইজন্যই দেখতে পাওয়া যায়—বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন এবং রামধনুর সাত রঙ নিয়ে হয়তো যথেষ্ট গবেষণাও করেছেন—এমন অনেক কৃতী ছাত্র বাস্তবক্ষেত্রে কোন্‌টা কি রঙ তা বলতে পারেন না। ভূগোলের কৃতী ছাত্র হিমালয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে রাতদিন গবেষণা করলেও নিজের ঘরের উচ্চতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিহান। আবার দেখা যায়—মহারানী ভিক্টোরিয়ার চৌদ্দ পুরুষের নাম মুখস্থ বলতে পারলেও নিজের বংশের দুই-তিন পুরুষের নাম পর্যন্ত বলতে পারেন না। পক্ষান্তরে না বলতে পারাটাকে খুব দোষাবহ বা নিন্দনীয় কিছু মনে করেন না, বরং অনেকে ইহাকে আত্মশ্লাঘার বিষয় বলেও মনে করেন।

"জ্ঞানের এই যে অসম্পূর্ণতা, দৃষ্টিভঙ্গীর এই যে অভাব, তার পরিবর্তন দরকার; নইলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। আবিষ্কারকের মনোবৃত্তি নিয়ে, সন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমাদের শিশুরা তাদের পরিবেশকে সম্যকরূপে জানতে শিখুক, বুঝতে শিখুক, উপলব্ধি করতে শিখুক এবং সেই লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করুক। নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়, ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান কতখানি স্থান জুড়ে আছে এবং অলক্ষ্যে তা তাদের জীবনকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে—তার প্রত্যক্ষ জ্ঞান তারা আহরণ করুক। তবেই ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।"

"পরিবেশ-পরিচিতি"র অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়—তাদের বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান-প্রসঙ্গ

এই ভূমিকার সাথে সমাজবিদ্যার শিক্ষকমাত্রেই সম্পূর্ণ একমত হবেন এবং পূর্ণভাবে একে গ্রহণ কোরতেও রাজী হবেন। তিনি শুধু বিষয়ভেদ পরিহার কোরতে চাইবেন এবং উল্লিখিত বিষয়গুলিকে একাত্ম করে নেবেন।

এবার ভূগোলশিক্ষা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা গেল। সমাজবিদ্যার শিক্ষক ভূগোলকে পৃথক বিষয় হিসাবে গ্রহণ না করে এক্ষেত্রে সমাজবিদ্যার একটি অংশপ্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে তাই ধরে নেবেন—

"ভূগোল পড়তে গিয়ে গোলে না পড়েছেন—এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই আছে। দেশবিদেশের নাম ও নদনদী, হ্রদের সংজ্ঞা মুখস্থ করা যে কিরকম কষ্টকর তা কারও অবিদিত নেই। কিন্তু তবু ভূগোল পড়তে হয়েছে। এজন্য ভূগোল-শিক্ষার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি উভয়কেই দায়ী করা যেতে, পারে। ছেলেবেলায় অনেককেই মুখস্থ করতে হয়েছে—"যে শাস্ত্র পাঠ করিলে পৃথিবীর জল ও স্থলের বিবরণ জানা যায় তাহাকে ভূগোল বলে।" সেজন্য কতকগুলি দেশের নাম, নদীর নাম, পর্বতের নাম মুখস্থ করাই ভূগোল-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই পৃথিবীতে মানুষের বাস। মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যই নানা শাস্ত্রের অবতারণা। কাজেই প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি কিভাবে মানবজীবন নিয়ন্ত্রিত করছে—তাই ভূগোল-শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। সেইজন্যই ভূগোল-শিক্ষাকে আজকাল মানব-কেন্দ্রিক করা হয়েছে। এক দেশের ঋতু, জলবায়ু, অবস্থিতি প্রভৃতি ভৌগোলিক কারণগুলি সেই দেশের জীবনযাত্রার প্রতি পদক্ষেপে, কি পোশাকে-পরিচ্ছদে, কি আহারেবিহারে, কি শিল্পবাণিজ্যে সর্বত্রই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় ভূগোল-শিক্ষার অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরাও এই কারণ খুঁজে বার করুক। প্রচুর বৃষ্টি না হলে ধান হবে না, আবার শীতকাল ছাড়া গম হবে না ; নোয়াখালী-চট্টগ্রামের অধিকাংশ লোকই কেন নৌবিদ্যায় পারদর্শী, পক্ষান্তরে কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে অধিকাংশ লোকই শ্রমজীবী ও কেরানী—কেন এইসব হয়—কারণ কি? শিশুরা নিজেরাই তার সমাধান করুক, তবেই ভূগোল-শিক্ষার সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভূগোল শিক্ষাদানের পুরাতন উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

বর্তমান উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

"কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম দুই শ্রেণীতে—ছোট ছোট শিশুদের পক্ষে—ভূগোলের জ্ঞান সহজে আসে না এবং জোর কোরে মুখস্থ করালেও তার সম্পর্কে তাদের কোন সম্যক ধারণা জন্মায় না। অথচ ৬।৭ বৎসরের শিশু চায়—তার পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং তা সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সমস্ত প্রাণমন দিয়েই

কোরতে চায়। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশু যে জ্ঞান আহরণ করবে—সেটাই তার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে থাকবে। শিক্ষক হয়তো নদী কি তা বোঝাবার জন্য অনেক বিষয়ের অবতারণা করছেন, তবুও শিশুরা বুঝতে পারছে না—কিন্তু বেড়াবার সময় যদি তাকে নদী দেখানো হয়—তবে সহজেই নদী সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট হবে।

"পৃথিবী গোল, না চ্যাপটা, সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে, না পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে—এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারাটা শিশুর পক্ষে আদৌ স্বাভাবিক নয়—কিন্তু গ্রামের, উত্তরপাড়ায় জেলেদের বসতি, দক্ষিণপাড়ায় কয়েক ঘর নাপিত আছে, গ্রামের রাস্তার শেষদিকে বামধারে একটা পুরাতন ভাঙ্গা মন্দির আছে—এইসব তথ্যসংগ্রহ শিশু খুব আনন্দের সঙ্গেই করতে চায়। রথের মেলায় কত লোক জড় হয়—কত রকমের খেলনা, খাবার আসে ইত্যাদি বিষয়ে শিশু খুবই আগ্রহান্বিত হয়। এইসব বিষয়ের মধ্য দিয়েই শিশুদের প্রথম ভূগোলের জ্ঞান দেওয়া হবে এবং ধীরে ধীরে তাকে কার্যকারণ সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে উৎসাহিত করা হবে।

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আজকাল অবিভিন্ন কার্যসূচী (undifferentiatied curriculum) গ্রহণ করা হয়েছে। কাজেই প্রথম দুই বৎসর মাতৃভাষা শিক্ষার সময়ই নানারূপ গল্পচ্ছলে শিশুর বাচনভঙ্গী বৃদ্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে ভূগোলের জ্ঞান দিতে হবে।"

এবার ইতিহাস শিক্ষাদান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা কিঞ্চিৎ উদ্ধার করবো। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে এই বক্তব্যগুলিও বেশ মূল্যবান।

"প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিষয়বস্তুর একটা সামাজিক উদ্দেশ্য আছে। এর মধ্যে কয়েকটি বিষয় (subject) বিশেষ করে শিশুর স্বভাবের সামাজিক দিকের বিকাশে সাহায্য করে। ইতিহাসকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা যেতে পারে ও নানারূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; কিন্তু ইতিহাস যে মানবজীবনের কাহিনী—এই কথাটাই বেশী কোরে মনে রাখতে হবে।" অতীত মানুষ যাহা ভাবিয়াছে ও করিয়াছে ইতিহাস তাহাই বর্ণনা করে।" তাদের সুখ-দুঃখ, ভুল-ত্রুটি পরিশ্রম ও বিশ্রাম, জয়-পরাজয়ের কাহিনী। সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তারা কিভাবে এই পৃথিবীকে আরও আনন্দপূর্ণ ও আরামদায়ক কোরেছে তা ইতিহাসের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়।

ইতিহাস মানবজীবনের কাহিনী

"প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিশুর সামাজিক ভাবের বিকাশসাধন করা। ইতিহাস, ভূগোল, প্রভৃতি সামাজিক শিক্ষার বিষয়বস্তুর পুনর্গঠন কোরে শিশুকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বর্তমান জীবনের সমস্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অতীতের ও দেশবিদেশের কাহিনী বলা উচিত। শিশুর সামাজিক বিকাশ তখনই সম্ভব হবে যখন শিশুর শিক্ষা উন্নত, বাস্তব ও জীবন্ত হবে। অর্থাৎ শিশুকে

অফুরন্ত সুযোগ দিতে হবে যেন তার অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে সে কোনও শিক্ষণীয় বিষয়নির্বাচন, মূল্যনিরূপণ, ও চিন্তা করে কাজে পরিণত করতে পারে। কোন বিষয় শেখাবার সময় মনে রাখতে হবে যে শিশুর মানসিক ক্ষমতা বা বোঝবার যোগ্যতা কতটা, তার জানবার ইচ্ছা বা আগ্রহ আছে কিনা, তার বয়স অনুসারে সে কতটা জানতে পারে এবং জানা উচিত। শিশুর ক্ষমতা, আগ্রহ ও প্রয়োজন এই তিন ভিত্তির উপর স্থাপন করতে হবে তার সমগ্র শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা।

"শিশুরা স্বভাবত কৌতূহলী, তারা দেশবিদেশের ও অতীত দিনের লোকজনের জীবন, তাদের পছন্দ-অপছন্দ, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও বিশ্বাস এইসব জানতে চায়। এই কৌতূহল জাগিয়ে রাখা ও বৃদ্ধি করা উচিত যেন সেটা চিরদিনই জাগরূক থাকে। ইতিহাসশিক্ষার ফলে শিশু ক্রমশঃ বুঝতে শিখবে যে অতীত থেকেই বর্তমানের উদ্ভব হয়েছে ও বর্তমানই আবার ভবিষ্যতে পরিণত হবে। আরও সে বুঝতে পারবে যে একজাতির ঘটনাবলী সময়ে সময়ে আর একজাতির ইতিহাসে বিস্তার করে যেমন বর্তমানে টাকার মূল্যহ্রাস (Devaluation) গত মহাযুদ্ধের পরে অস্থায়িভাবে অনেক ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি ও জীবিকা-সমস্যা দূরীকরণ। ইতিহাসের গল্প সকল শিশুর কল্পনা-শক্তির উদ্রেক করে ও তাদের আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।

"অবিভাজ্য শিক্ষা-পদ্ধতিতে (undifferentiated curriculum) ইতিহাস-শিক্ষার প্রণালী পুরাতন পদ্ধতি থেকে ভিন্ন প্রকারের হবে। গতানুগতিক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর পরিবর্তে শিশুর আগ্রহকে কেন্দ্র করে একটা নির্ধারিত বিষয় (topic) নির্বাচন করে কাজ করা বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রের প্রচলিত প্রণালী। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, পুরাকালের জীবনযাত্রা, জীবনযাত্রার দৈনিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা, পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন, পৃথিবীর নানাদেশের আবিষ্কার ও উন্নতিবিষয়ক বর্ণনা, জাতির কৃষ্টি, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা (যথা, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থিক) প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা ও কাজ করা যেতে পারে।

ইতিহাস শিক্ষাদানের নূতন প্রণালী

"এই প্রণালীতে শিক্ষাদানে শিক্ষককে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে শিশুর শিক্ষা-গ্রহণ কাজগুলি (Learning activity) তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে জড়িত, কাজগুলির একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই এবং কার্যপ্রসঙ্গে কোনও বিশেষ নির্বাচিত সমস্যার সমাধান করা যেন হয়। এই নির্বাচিত বিষয়ের (topic) প্রসঙ্গে অথবা সেই বিষয় বোঝবার বা কাজে পরিণত করবার জন্যে যে যে তথ্য বা জ্ঞানের প্রয়োজন, ঠিক সেইগুলি যেন শিক্ষাদানের বা শিক্ষাগ্রহণের সময় স্থান পায় ;—প্রয়োজন ব্যতীত অবান্তর কথা উল্লেখ, শেখানো বা গ্রহণ যেন কোনও মতে করা না হয়।"

"নাগরিকতা শিক্ষা" সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের আর একটি আগ্রহের বিষয়; এ প্রসঙ্গেও কতকগুলি মূল্যবান কথা পূর্বোক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে—শ্রেণীগত নির্বাচন দিয়ে শিক্ষক দেশশাসন সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞান দিতে পারেন। তিনি নায়ককে কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করিয়ে দেবেন, প্রত্যেক সভ্যকেও কর্তব্য বুঝিয়ে দেবেন ও তারপর দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন যে যুক্ত দায়িত্ব, সহযোগিতা প্রভৃতি শ্রেণীকার্যের বিশেষত্বগুলি বিস্তৃতভাবে দেশশাসন-প্রণালীর উপর প্রযোজ্য। ভোট দেওয়া, শুল্ক দেওয়া, জল, আলো, শুশ্রূষালয়, বাজার, স্কুল, পুস্তকাগার, এই সমস্তই স্থানীয় শাসনের আঙ্গিক। এইভাবে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করবে ও জীবনে কি নাই বুঝতে সক্ষম হবে; এটা সেটা লাভ করবার পথে যে সমস্ত বাধা এসে পড়ে সেসব বোঝবার জ্ঞান ক্রমশঃ বাড়বে। শিশুকে স্বাভাবিক ভাবে চলতে দেওয়া হবে। কার্যসূচী যতটা সম্ভব পরিবর্তনশীল করতে হবে। বাস্তবের সঙ্গে তার শিক্ষার সম্বন্ধ আছে কিনা সে বিষয়ে সব সময়ে সতর্ক থাকতে হবে ও ছেলেমেয়েরা সেই সম্বন্ধটা দেখতে পারছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে; তবেই শিক্ষা সম্পূর্ণ ও সার্থক হবে। রাষ্ট্রশাসনকার্য আলোচনার সময় শিক্ষক স্পষ্ট করে তাদের বোঝাবেন যে দাবির সঙ্গে দায়িত্ব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, নাগরিক রাষ্ট্রের কাছে আশা করে ও দাবি করে বহু সুবিধা, সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকের নিজের কতকগুলি কর্তব্য বা দায়িত্ব আছে রাষ্ট্রের প্রতি। উভয়ে যখন কর্তব্যসাধনে তৎপর হয় তখন সেই রাষ্ট্রের কার্য ও সেই রাষ্ট্রবাসীদের জীবন সুখময় হয়।"

নাগরিকতা শিক্ষা—উদ্দেশ্য ও প্রণালী

"পরিবেশ-পরিচিতির" অপর দুটি অংশ "প্রকৃতিবিজ্ঞান" এবং "প্রকৃতিপাঠ, ছড়া ও কবিতা" সম্পর্কে সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের যথেষ্ট আগ্রহ থাকলেও ঐ বিষয়গুলির পরিণত রূপ প্রধানতঃ "সাধারণ বিজ্ঞানের" অঙ্গীভূত বলে তার উদ্ধৃতি থেকে নিবৃত্ত থাকা গেল। এই অংশের অনেক আলোচনা অবশ্য প্রাকৃতিক ও মানবিক ভূগোলের এক্তিয়ারেও এসে পড়ে। তাছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞান একেবারে সমাজবিদ্যার এক্তিয়ার-বহির্ভূত নয়। আগ্রহী শিক্ষকগণকে অনুরোধ, তাঁরা মূল গ্রন্থ থেকে এই অংশটুকু পড়ে নেবেন।

পাঠক্রম নির্ধারণের মৌল নীতি

আমরা এতক্ষণ ধরে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু কোথা থেকে কেমন কোরে সংগ্রহ করা হবে, আধুনিক মানুষের জীবনপ্রচেষ্টার সাথে তার যোগ কতখানি এবং সেই সংযোগকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার কোরতে হবে তা আলোচনা কোরেছি। এই প্রসঙ্গগুলি থেকে আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সমাজবিদ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি প্রতিপন্ন হলেও, সমাজবিদ্যার দাবিকে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতেও আলোচনা কোরে দেখা দরকার। মুদালিয়র কমিশন পাঠ্যসূচী নির্ধারণের কতকগুলি মৌলিক নীতি নির্ধারণ কোরেছেন;—আমরা তা এখানে উদ্ধৃত কোরে

দিচ্ছি এবং তার আলোকে সমাজবিদ্যাকে আধুনিক পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি যে কতদূর যুক্তিযুক্ত তা সম্যক্ উপলব্ধি করা যাবে। মুদালিয়র কমিশন-কথিত পাঁচটি প্রাসঙ্গিক নীতি হোলো এই :—

(১) "সর্বোত্তম আধুনিক শিক্ষা-চিন্তা অনুযায়ী প্রথমতঃ একথা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে যে এই প্রসঙ্গে পাঠক্রম বলতে আমাদের বিদ্যালয়ে চিরাচরিত যেসব প্রতিষ্ঠানিক বিষয় (academic subjects) শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলি বোঝায় না। অপরপক্ষে এর (পাঠক্রমের) অন্তর্গত হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতাসমূহের সমষ্টি যা শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে, পাঠাগারে, পরীক্ষাগারে, কর্মশালায়, খেলার মাঠে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অসংখ্য অনিয়মিত সংযোগে বিদ্যালয়ের বহুবিচিত্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে অর্জন কোরে থাকে। এই অর্থে, বিদ্যালয়ের সমস্ত অস্তিত্বই হচ্ছে পাঠক্রম যা শিক্ষার্থীদের জীবনকে সকল বিন্দুতেই স্পর্শ করে এবং তাদের সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্বের বিবর্তনে সহায়তা করে।"

বিদ্যালয়ের সমুদয় অভিজ্ঞতাই পাঠক্রম

বস্তুতঃ সমাজবিদ্যা এমন একটি বিষয় যা জীবনকে সব দিক থেকে স্পর্শ করে, বিদ্যা এবং কাজ অর্থাৎ শিক্ষার তত্ত্বগত এবং ব্যবহারিক দুটো দিককেই অধিকার করে এবং সমস্ত বিদ্যালয়-জীবনটাই শিক্ষণীয় বিষয় কোরে তোলে ; আর এই বিষয়টা শিক্ষার্থীদের সুষম ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পক্ষে অপরিসীম সহায়ক। বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গে—শ্রেণীকক্ষে, গ্রন্থাগারে, পরীক্ষাগারে, কর্মশালায়, খেলার মাঠে সমাজবিদ্যার অধিকার প্রসারিত ; এবং কি ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাবনা, কি আধুনিক ভাবনা উভয় দিক থেকেই সমাজবিদ্যার দাবি অনস্বীকার্য। চিরকালই সমাজ ও সামাজিক জীবন মানুষের শিক্ষাজীবনের মূল প্রেরণা বা ভাবনা ছিল, আর প্রকৃত প্রস্তাবে "সমাজবিদ্যা" কথাটিতেই নিহিত ছিল শিক্ষার পরম লক্ষ্য এবং আশু লক্ষ্য। পরম লক্ষ্যটি ছিল আত্মজ্ঞান (আত্মানং বিদ্ধি) এবং আশু লক্ষ্যটি ছিল সমাজকে জানা এবং সেখানে নিজের যোগ্যস্থানটি অধিকার করা—স্ব-ক্ষেত্রে, স্ব-ধর্মে যোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। একেই আমরা বর্তমানে বলেছি "evolution of a balanced personality" ; তাই সমাজবিদ্যার দাবি আধুনিক তো বটেই, এমনকি ঐতিহ্যগত।

তত্ত্বগত ব্যবহারিক একদিক

(২) "দ্বিতীয়তঃ, পাঠক্রমে যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও প্রসারণশীলতা থাকা উচিত, যাতে ব্যক্তিগত প্রভেদানুযায়ী ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজন ও আগ্রহের অনুকূলতা করা যায়। আস্বাচ্ছন্দ্যকর বিষয় বা পাঠসমূহ, তা শিক্ষা কোরতে অনুপযুক্ত শিশুদের ওপরে জোর কোরে চাপিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা হোলে, অবশ্যই নৈরাশ্যবোধ সৃষ্টি কোরবে এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত কোরবে। অবশ্য জ্ঞান, দক্ষতা এবং রসাস্বাদনের এমন কতকগুলি প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে যার সংস্পর্শে আসা সকল শিশুরই পক্ষে প্রয়োজন, এবং পাঠক্রমে সেগুলির অবশ্যই স্থান থাকা চাই।"

পাঠক্রমের বৈচিত্র্য ও প্রসারণশীলতা, ব্যক্তিগত প্রভেদ স্বীকার

সমাজবিদ্যা এমন একটি বিষয় যার শিক্ষা আরম্ভ হয় প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং আচরণ থেকে। "পরিবেশ-পরিচিতি"তে আমরা যে প্রসঙ্গ আলোচনা কোরেছি, তাতেই দেখানো হয়েছে শিশুরা কেমন কোরে পরিবেশ ও সমাজকে জানতে ও চিনতে শেখে এবং এখানে ব্যক্তিগত প্রবণতা ও ক্ষমতার ভেদ অনুসারে তাদের স্ব স্ব উপলব্ধি নিজস্ব অভিজ্ঞতার ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। তাছাড়া মোটের উপর একটা কেন্দ্রীয় পাঠ্যসূচী থাকলেও সমাজবিদ্যায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং স্থানীয় সামাজিক জীবনকে এমনভাবে আলোচ্য বিষয় করা চলে যা প্রত্যেক শিশুরই পক্ষে সহজবোধ্য হয়। আর এখান থেকে আরম্ভ কোরে কেন্দ্রীয় পাঠ্যসূচী আলোচনাও সহজ হয়। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী সত্যই বৈচিত্র্যপূর্ণ, প্রসারণশীল অথচ একটি সাধারণ অংশময় হতে পারে। পাঠ্যসূচী নির্ধারণের এই দ্বিতীয় নীতিটিকে সমাজবিদ্যা সার্থকভাবেই পরিপূরণ করে।

স্থানীয় সমাজজীবনের সাথে পাঠক্রমের সংযোগ

(৩) "পাঠক্রম হবে স্থানীয় সমাজজীবনের সাথে প্রাণবন্ত এবং জৈবিক প্রক্রিয়ায় সংবদ্ধ, শিশুর কাছে ব্যাখ্যা কোরবে সেই সমাজের বিশিষ্ট এবং তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলি এবং শিশুকে দেবে তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ। স্পষ্টতঃ, এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে সংঘবদ্ধ মানবজীবনের মেরুদণ্ডস্বরূপ যে উৎপাদনশীল কাজ তাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া। এর থেকে একথা স্বতঃসিদ্ধ যে আমাদের সমগ্র বিদ্যালয়-ব্যবস্থার জন্য শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সাধারণ পাঠক্রমকে স্থানীয় প্রয়োজন ও পরিস্থিতিসমূহের সাথে অবশ্যই খাপ খাইয়ে নেবার গুণসম্পন্ন হতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে এই প্রাণময় ধারণাটি তৈরী কোরে দেবেন যে তারা হচ্ছে স্থানীয় সমাজের অবিভাজ্য অংশ এবং স্থানীয় সমাজও যেন একথা উপলব্ধি কোরতে সমর্থ হয় যে বিদ্যালয় হচ্ছে তার জীবনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান অংশ।"

এই অংশের প্রতিটি কথাই সমাজবিদ্যা বিষয়টির অনুকূলে প্রযোজ্য এবং এইখানেই সমাজবিদ্যাকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার সর্বপ্রধান গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী প্রধানতঃ এই নীতি অবলম্বনেই প্রণীত হয় এবং সমাজের প্রয়োজনে সে উল্লিখিত ভূমিকাও সর্বাংশে গ্রহণ কোরে থাকে। এ বিষয়ে আর অধিক ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

অবসরবিনোদনের শিক্ষা

(৪) "চতুর্থতঃ, পাঠক্রম এমনভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের শুধু কাজের জন্য নয়, অবসরযাপনের জন্যও শিক্ষাদান করা যায়। আমরা ইতিপূর্বে বিদ্যালয়ে সমাজ, শিল্পকলা, খেলাধুলা ইত্যাদি সংক্রান্ত বহুবিধ কর্মপ্রবর্তনার বিষয়টি আলোচনা কোরেছি। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী যখন উপস্থিত শুধুমাত্র তখন এবং শিক্ষার্থীর জীবনকে মনোরম ও অর্থবহ কোরে তোলার জন্যে নয়, পরন্তু বহুমুখী আগ্রহ এবং শখের চর্চা প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে যে গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিশাল অবসরময় অংশ রয়েছে, সেই অবসরযাপনের জন্য চমৎকার শিক্ষাদানের সুযোগ দেবে বলেই এই সুপারিশ করা হয়েছে।"

সমাজবিদ্যা, বিশেষ করে তার ব্যবহারিক কর্মসূচী, এই শর্তটাও অনবদ্যভাবে পূরণ করে। সমাজ সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা এবং উপযুক্ত সামাজিক শিক্ষা সুচারু-ভাবে অবসরযাপনে মূল্যবান সহায়ক। তাছাড়া সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে যে অভ্যাস গড়ে ওঠে, তা অবশ্যই অবসরযাপনকে সুন্দর ও সমাজের পক্ষে উপযোগী কোরে তুলবে।

(৫) "পঞ্চমতঃ, এটি (পাঠক্রম) যেন কিছুসংখ্যক বিচ্ছিন্ন, সমন্বয়বিহীন, সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়সমূহে বিভক্ত হয়ে এর শিক্ষাগত মূল্যকে ব্যর্থ না করে। বিষয়গুলি যেন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় এবং প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে বিষয়বস্তুনিচয় যতদূর সম্ভব "প্রশস্ত ক্ষেত্র" এককসমূহ ("broad fields" units) হিসাবে নির্দেশিত হয় যাতে সেগুলি শুধু সংকীর্ণ তথ্যরাশি না হয়ে জীবনের সাথে উন্নততর সমন্বয় লাভ কোরতে পারে।"

পাঠক্রম হবে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত "প্রশস্ত ক্ষেত্র" এককসমূহ

সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা বস্তুতঃ পাঠ্যসূচীতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, অন্যনিরপেক্ষ বিষয়বাদের প্রতিক্রিয়া। ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও অন্যান্য সমাজশাস্ত্রকে অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করাই সমাজবিদ্যার প্রথম কাজ। এইগুলি পারস্পরিক সমন্বয়সাধন (correlation), একীকরণ (integration) এবং শেষপর্যন্ত একাত্মকরণ (fusion)—এই-ই সমাজ-বিদ্যার পাঠ্যসূচী-নির্মাণের চূড়ান্ত লক্ষ্য। মানবজীবন-এর কেন্দ্রস্বরূপ এবং মানবজীবনের সাথেই এই বিদ্যা সমন্বিত হবে, সমাজবিদ্যা প্রবর্তনের এইটেই গোড়ার কথা। অতএব পঞ্চম নীতিটিও সমাজবিদ্যা উপযুক্তভাবে পরিপূরণ করে এবং আধুনিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে তার নিজের স্থানকে সুনিশ্চিত করে। বর্তমানের পাঠ্যসূচীতে সমাজবিদ্যাকে তাই অপরিহার্য অঙ্গরূপেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং মুদালিয়র কমিশন সমাজবিদ্যাকে মূল পাঠ্যাংশের (core curriculum) অন্তর্ভুক্ত কোরেছেন।

সমন্বয়সাধন, একীকরণ এবং একাত্মকরণ

মূল পাঠ্যাংশে (core curriculum) সমাজবিদ্যার স্থান

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে সমাজবিদ্যাকে কেন মূল পাঠ্যাংশের (core curriculum) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। Core curriculum-এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা দান করা। এই সাধারণ শিক্ষার কাজ সম্পর্কে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন—"মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ব্যক্তির প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে পরিচয়, ভৌত এবং জীববিজ্ঞানের মূল ধারণাগুলির জ্ঞান, সাহিত্যে যেমন প্রকাশিত তেমনি জীবনের উচ্চতর মূল্যবোধের আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসাবে ভাষার সঠিক ও ফলপ্রদ ব্যবহার এবং সংঘবদ্ধ-

সাধারণ শিক্ষার কাজ

ভাবে কাজ ও জীবনযাপন-প্রক্রিয়াসমূহের উপলব্ধি। গোড়ার বছরগুলিতে এইগুলি খুব সরলভাবে এবং পরের পরের বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতা ও পূর্ণাঙ্গতার সাথে উপস্থিত কোরতে হবে।"

এইজন্যেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের **নবম ও দশম শ্রেণীর** আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসাবে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন যে ছয়টি বিষয়ের নাম করেছেন তার মধ্যে সমাজবিদ্যা অন্যতম। সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা উভয়ে মিলে আমাদের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পূর্ণ পরিচয় উপস্থিত করে। প্রাথমিক স্তরে আমরা দেখেছি এই দুটো বিষয় "পরিবেশ-পরিচিতি" নামক একই বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, মাধ্যমিক স্তরে এই দুটোকে অধিকতর বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনার জন্য পৃথক দুটো বিষয়, অবশ্য পরস্পর-সংশ্লিষ্ট (correlated) হিসাবে উপস্থিত করা হয়েছে। কমিশনের নিজের ভাষাতেই এই মূল ছয়টি পাঠ্য বিষয়ের নির্দেশনা উপস্থিত করা গেল :—

ছয়টি বিষয়ের অন্যতম সমাজবিদ্যা

1. Mother Tongue (correct and effective use of language, acquaintance and appreciation of select literature).
2. Federal Language (comprehension and use in simple everyday situations)

   Or,

   A Classical or Modern India Language (for those whose mother-tongue is the Federal Language).
3. English (comprehension and simple composition).
4. El mentary Mathematics.
5. General Science (including a brief outline of World History with special emphasi on the history and geography of India).

একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য কমিশনের পরিকল্পনা নিম্নরূপ :—

1. Mother Tongue.
2. Federal Language.

   Or,

   A Classical or Modern Indian Language (for those whose mother-tongue happens to be the federal language).
3. English.
4. General Science (Physical and Biological).

   Or,

   Social Studies (including Elements of Economics and Civics).

এখানে অবশ্য ইতিহাস এবং ভূগোলকে ঐচ্ছিক বিষয়ের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য সমাজবিদ্যা বিষয়টিকে আমরা যেভাবে গ্রহণ কোরেছি, সেভাবে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। অতএব রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের এই শেষোক্ত নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা পরিহার করা গেল।

এ প্রসঙ্গে মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্যও নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—"আমরা সুপারিশ কোরেছি যে উচ্চ বিদ্যালয়স্তরে যারা সমাজবিদ্যা এবং সাধারণ বিজ্ঞান (অথবা তৎসম্পর্কিত বিষয়সমূহ) তাদের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহের মধ্যে শিক্ষা কোরবে না, তাদের জন্যে এই দুটি বিষয়ের সাধারণ পাঠের ব্যবস্থা করা উচিত। বস্তুতঃ, ভাষাসমূহ এবং একটি হস্তশিল্পের সাথে এই দুটি বিষয় উচ্চবিদ্যালয় শিক্ষাক্রমের সাধারণ মূল অংশ (common core) হবে। এর সাথে যুক্ত হবে শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও আগ্রহানুযায়ী তার বাছাই করা বিশেষ বিষয়গুচ্ছ।

"সমাজবিদ্যা এবং সাধারণ বিজ্ঞানের শিক্ষাক্রমগুলি হবে সাধারণ ধরনের এবং সেগুলি উচ্চবিদ্যালয়ের মাত্র প্রথম দুবছরে শিক্ষা দেওয়া হবে, কিন্তু সেগুলি পরীক্ষা-বিষয় হবে না। শিক্ষার্থীদের জীবনকে রূপদান কোরছে যে সকল সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত ও শক্তিগুলি, এবং বিজ্ঞানের যে সকল অবদান সামাজিক ধাঁচকে পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত কোরছে সেগুলিকে, মধ্যস্তরে যতটুকু সম্ভব হয়েছিল তার থেকে আরও বেশী কোরে—বুদ্ধির সাহায্যে এবং খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে না গিয়ে—ব্যাখ্যা করাই হবে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমানের দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বুদ্ধিমানের মত বাঁচতে গেলে প্রত্যেকেরই এইগুলি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান থাকা উচিত।"

শিক্ষাক্রমের ধরন

সমাজবিদ্যার পাঠ্যনির্বাচনের নীতিসমূহ

দুটি কমিশনের বক্তব্যের উপরি-উক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা মূল পাঠ্যাংশে সমাজ-বিদ্যার স্থান নির্দেশের কারণগুলির হদিশ পাচ্ছি। এই কারণগুলোর মধ্যে শিক্ষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক যুক্তিসমূহ নিহিত আছে। এই যুক্তিসমূহের ভিত্তিতেই আমরা এখন সমাজবিদ্যার পাঠ-নির্বাচনের নীতিগুলি উল্লেখ কোরব। নীতিগুলির প্রয়োগ সম্পর্কে পূর্বেই যথেষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। এই নীতিগুলি হোলো—

শিক্ষাতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক যুক্তিসমূহ

(১) শিক্ষার মূল লক্ষ্যকে সর্বদাই চোখের সামনে রাখতে হবে। এই লক্ষ-অর্জনে সমাজবিদ্যা কিভাবে সাহায্য করে তা স্মরণ রাখতে হবে। তাছাড়া সমাজবিদ্যা প্রবর্তনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিও স্মরণ রাখতে হবে। সমাজবিদ্যার পাঠ্যবস্তু এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের অনুগামী হবে।

মূল লক্ষ্যানুসরণ

(২) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন এবং ক্ষমতা সব সময়েই স্মরণ রাখতে হবে। পাঠ্যবস্তু যেন শিক্ষার্থীদের নিকট অপ্রয়োজনীয় এবং গুরুভার বোধ না হয়। সমাজ সম্পর্কে ধারণা এবং শিক্ষার্থীর নিজস্ব সামাজিক যোগ্যতাবিধানের নিমিত্ত ব্যবহারিক কাজকর্মের যেন বেশী সুযোগ থাকে। পাঠ্যবস্তু যেন মুখস্থবিদ্যার আকর না হয়। শিক্ষার্থীর আচরণ, অভ্যাস ও কর্মদক্ষতা অর্জনের কথা সমাজবিদ্যার পাঠ্যবস্তু নির্বাচনের সময় অবশ্যই মনে রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর প্রয়োজন ও ক্ষমতা, ব্যবহারিক কাজকর্মের সুযোগ

(৩) সমাজ নিয়ত পরিবর্তনশীল। মানুষের জীবনের ধারা এবং ধারণাও নিত্য-পরিবর্তনশীল। সমাজবিদ্যায় পাঠ্যবস্তু যেন এই ক্রমিক পরিবর্তনশীলতার প্রতি উদাসীন না হয়। তা হলে সমাজ বিদ্যাও হ'য়ে উঠবে "dead bits of knowledge"। সমাজবিদ্যার পাঠ্যবস্তু হবে নমনীয় এবং বিবর্তনশীল। পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সে সর্বদাই নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবে। যে বিদ্যার নিজের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের (adjustment) শক্তি নেই, তা শিক্ষার্থীকে সামঞ্জস্যবিধানের শিক্ষা দিতে পারে না।

লক্ষণায় ও পরিবর্তনশীল পাঠক্রম

(৪) সমাজবিদ্যায় বিষয়বস্তু নির্বাচন কোরতে হবে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ধারণানুযায়ী। তাদের এই ধারণা ২ নম্বর নীতিতে উল্লিখিত তাদের প্রয়োজন ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামঞ্জস্যবিধানের, অন্যকথায় উপযুক্ত নাগরিকতার শিক্ষা এখানে বড় কথা হওয়ায় শিক্ষার্থীদের নিজস্ব চিন্তা ও ধারণার বৃদ্ধির দিকে নজর দিতে হবে। তাই প্রাপ্তবয়স্কের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমাজবিদ্যার পাঠ্য নির্বাচন করা সঙ্গত হবে না।

শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও ধারণাবৃদ্ধি

(৫) সমাজবিদ্যা যেহেতু উপযুক্ত নাগরিকতার শিক্ষা এবং তার জন্য যথেষ্ট ব্যবহারিক কাজকর্মের, অন্যকথায় আচরণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার প্রয়োজন—সেজন্য এর পাঠ্যবস্তুকে সুষ্ঠু রূপদানের নিমিত্ত বিদ্যালয়ের টাইম-টেব্‌লে যথেষ্ট সময় নির্দেশ কোরতে হবে। নতুবা অল্প সময়ে অনেক জ্ঞান আহরণের নিমিত্ত সনাতনী মুখস্থ-বিদ্যাকে প্রশ্রয় দিতে হবে। তাহলে আমরা যা পাব তা হবে "শুক্‌নো জ্ঞানের টুকুরো" এবং তার ফলে সমাজবিদ্যা-প্রবর্তনায় সকল মহৎ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

টাইম-টেব্‌লে যথেষ্ট কাজের সময়দান

(৬) তবে সময়সংক্ষেপের নিমিত্ত এবং পাঠ্যবস্তুকে শিক্ষার্থীর মানসিক কাঠামোর মধ্যে উপযুক্তভাবে গ্রহণের জন্য পাঠ্যবস্তু নির্বাচনে সমন্বয়সাধন (correlation) ও একীকরণের (integration) নীতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। এই নীতিটি শিক্ষাজগতের একটি প্রধান অবলম্বনীয় নীতি। তবে সমাজবিদ্যার পাঠ্যবস্তু নির্বাচনে যতদূর সম্ভব একাত্মকরণের (fusion) নীতিকে অবলম্বন করাই সর্বাপেক্ষা অভিনন্দনযোগ্য।

পাঠ-সংক্ষেপন—সমন্বয়সাধন একীকরণ ও একাত্মকরণ

(৭) ঐতিহাসিক এবং অনৈতিহাসিক বিষয়গুলির প্রভেদ না বাড়িয়ে ইতিহাসকে আধুনিক জীবনের ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ কোরে অতীত সমাজের বিবিধ সমস্যাবলীর পর্যালোচনার ভিত্তিতে আধুনিক সমাজের সমস্যাবলী উপস্থিত করা দরকার। এইজন্যেই ইতিহাস বংশাবলীর পরিচয় না হয়ে বিভিন্ন যুগের সামাজিক ইতিহাসে পরিণত হওয়া দরকার। আর এরই ভিত্তিতে যে পাঠ্যবস্তু নির্বাচন হবে তাতে ভবিষ্যৎ সমাজের আভাসও সুস্পষ্ট রেখায় ফুটে উঠবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রচারিত দশম মান বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যসূচীটি এই ধরনের একটি অভিনন্দনযোগ্য পাঠ্যসূচী।

মানবসমস্যাকে কেন্দ্র কোরে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনা

(৮) সমাজবিদ্যা পাঠ্যবস্তুর ফলশ্রুতি হ'তে হবে শিক্ষার্থীর উপলব্ধির গভীরতা ও দূরদৃষ্টির উন্মেষ। এই সাথে শিক্ষার্থীর মনে জাগবে সামাজিক বিবেক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার-বোধ। এককথায় উপলব্ধিতে, আচরণে এবং দূরদৃষ্টিতে শিক্ষার্থীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব (social individuality—individuality in the context of society) সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

শিক্ষার্থীর সামাজিক ব্যক্তিত্ব

(৯) শুধু স্থানীয় সমাজের প্রতি অনুরক্তি এবং জাতীয়তাবোধ নয়, শিক্ষার্থীর মনে জাগবে আন্তর্জাতিকতাবোধ এবং বিশ্বসমাজের চেহারা। সে যে বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব-নাগরিক এবং বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠনের পথে একজন অভিযাত্রী—এই বোধ তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে জাগ্রত কোরতে হবে।

বিশ্ববোধের উন্মেষ

(১০) সমাজবিদ্যার প্রবর্তনা আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে যেন "প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে" (progressive schools) পরিণত করে যেন হয়ে ওঠে একটা "Commonwealth in which work is play and play is life, three in one and one in three" সমাজবিদ্যা প্রবর্তনার পশ্চাতে এই ভাবনা যে বিদ্যমান, আশা করি এতক্ষণের আলোচনায় তা বেশ সুস্পষ্ট হ'য়ে গেছে। সেই মূল একটি কথায় আবার ফিরে আসতে হয়, **সমাজবিদ্যার পাঠ্যবস্তু এবং পঠন-পাঠন যেন আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষালয়ের আধুনিকীকরণের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করে।**

প্রগতিশীল বিদ্যালয় সৃষ্টি

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত পাঠ্যসূচীসমূহ

এর পরে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু সংগঠনের উদ্দেশ্যে যে সকল পাঠ্যসূচী ঘোষণা কোরেছেন সেগুলির কথা এসে পড়ে। এই বিষয়বস্তু নিয়ে আমাদের দেশের শিক্ষামহলে নানা আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এই আলোচনা

গুলো একটি নির্দিষ্ট ধারা অনুসরণ করার চেষ্টা কোরছে, কিন্তু সেই ধারাটি কি হবে তা আমাদের কাছে এখনও সম্যক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারত-সরকার এবং All India Council for Secondary Education, তাদের নিজ নিজ চিন্তা অনুযায়ী সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীর রূপরেখা উপস্থিত কোরছেন। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির (দশম মান) জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যসূচী ঘোষণা কোরেছেন। এই চারিটি পাঠ্যসূচীর মধ্যে শেষ তিনটি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। বস্তুতঃ All India Council for Secondary Education ঘোষিত পাঠ্যসূচীই পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রচারিত দুটি বিভিন্ন পাঠ্যসূচীর ভিত্তিস্বরূপ। তথাপি সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া আবশ্যক তা নিয়ে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন চিন্তার জন্যেই এই তিনটি পাঠ্যসূচীতে অনেকখানি প্রভেদ ঘটে গেছে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনের মূলনীতির দিক থেকে এই প্রভেদ যথেষ্ট মূল্যবান। এই প্রভেদ আবার সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত কোরবে।

চারিটি পাঠ্যসূচী

ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে বলা যায়, এই পাঠ্যসূচী সমাজ-বিদ্যা শিক্ষাদানের মূলনীতিকে তেমন অনুসরণ করেনি। এই পাঠ্যসূচীতে সমাজকে একটা অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দেখবার বা সামাজিক শক্তিগুলোকে একটা মৌলিক অখণ্ড জীবন-প্রচেষ্টার বিভিন্ন প্রকাশ হিসেবে উপলব্ধির চেষ্টা তেমন অগ্রসর হয়নি। এখানে ইতিহাস, ভূগোল এবং পৌরবিজ্ঞান তাদের পুরনো দাবিকে একচুলও সহজে ছেড়ে দিতে রাজী হয়নি। এই পাঠ্যসূচীর ঝোঁকটা পুরনো ধারার দিকেই প্রবল হয়ে রয়েছে—যাকে আমরা অন্য কথায় বলি **traditionalism** বা ঐতিহ্যবাদ, এর কেন্দ্র-বিন্দুতে সেই ধারণাটাই জোরালো হয়ে রয়েছে। অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের বাস্তব ঘটনাপ্রবাহকে তেমন উল্লেখযোগ্য অংশ দেওয়া হয়নি। জনসংখ্যাবৃদ্ধি, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের অপ্রতুলতা, ভোগ্য-পণ্যের সদ্ব্যবহার ও মিতব্যয়িতা—নব-ভারতের অর্থনীতির এই বাস্তব দিকগুলো এখানে উপেক্ষিত হয়েছে, তেমনি আবার ভারতের বহু বিচিত্র মানবসমাজের নানা প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, বেশভূষা, আচারব্যবহার প্রভৃতি সামাজিক জীবনের বাস্তব দিকগুলো এই পাঠ্যসূচীতে স্থান পায়নি। অথচ এগুলির অন্তর্ভুক্তি বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং শিক্ষার্থীর জীবনেও ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে এর বাস্তব মূল্য যথেষ্ট। এটা হবার কারণ হলো এই যে ইতিহাস, ভূগোল ও পৌরবিজ্ঞানের বিস্তৃততর অংশগুলোকে একসাথে জুড়ে দিয়ে "সমাজবিদ্যা" হিসেবে উপস্থিত করা হয়েছে; সমাজবিদ্যার সেই জীবনরসায়ন-প্রক্রিয়াটি এখানে মোটামুটিভাবে অনুপস্থিত। এর ফলে তথ্যের ভার বেড়েছে এবং হাতে-কলমে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাও সঙ্কুচিত হয়েছে।

মন্তব্য

A. I. C. S. E. প্রচারিত পাঠ্যসূচী

All India Council for Secondary Education প্রচারিত পাঠ্যসূচী ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যসূচী অপেক্ষা উন্নততর। এই পাঠ্যসূচীতে অবশ্য উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য, পশ্চিমবঙ্গে যা মোটামুটিভাবে নবম ও দশম শ্রেণী অনুসৃত হচ্ছে। ১৯৬৩ সাল থেকে দশম মানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতেও সমাজবিদ্যার একটা পাঠক্রম নবম ও দশম শ্রেণীগুলোতে চালু করা হয়েছে। Council প্রচারিত পাঠ্যসূচী নিয়ে উদ্ধৃত করা হোলো। এতে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেরাই পাঠ্যসূচীটি বিবেচনার সুযোগ পাবেন :—

A. Living in Communities :

1. Living in the Local Community :

(a) How does the Community meet the primary needs of food, clothing and shelter (this pre-supposes an intimate knowledge of the physical features, climatic conditions and natural resources of the locality. It includes items as the need for the right food, proper sanitary houses and suitable clothing.)

(b) How does the community provide for our safety, health, recreational and cultural needs ? Study of localities, water-supply, sanitation and lighting arrangements, Prevention of di eases and health services, recreational, cultuaral, and educational facil ties, Protection against fire and trafic accidents, prevention and control of Crimes.

(c) How does the community meet its economic needs— Survey of the main agricultural and industrial activities, inter-dependence of the community, the neighbouring region and the outside world ; trade and means of communication and transport ; job opportunities for the young people in the locality.

2. Living in Pre-historic and ancient communities :

(a) Early human settlement, primitive tools and occupations, earliest forms of Government (family, clan and tribe), the river valley civilisation with emphasis on Mohenjodaro and Harappa— unique achievements of the Sind Valley civilisation refl cting concern for public welfare. (b) The abiding elements of the Greek and Roman Civilisation. (c) The Aryan Civilisation—a survey of early and later Vedic Civilisation (Social and economic life of the people), the caste system and its effects, art, science and religion

Jainism, Buddhism, the age of Ashoka, the Civilisation of the Moryas and Guptas, expansion of Indian culture, trade and commerce. (d) Indian life and art under the Sultanate and the Mughal rules—the spread of Islam, its impact and contributions ; medieval religions in India, reformation and Bhakti Movement ; heading towards a national monarchy (Alauddin Khilji ; Shershah, Akbar) ; Mughals and their contributions to social and economic life, education, administration, art and architecture.

3. Communities in the world of today :

(a) a Malayan Community ; How the aborigines of Malaya—Semang satisfy their basic needs through fruit-gathering, fishing, hunting, and shifting agriculture. Growth of rubber plantations through imported Asian labour and European supervision. Development of other economic activities and trade. Reference to Congo and Amazon Basins for comparision. (b) A mining community in West Australia : How the aborigines live in West Australia. Growth of mining towns in the desert and the solution of the problems of communication, and water and food supply for comparative study. Bedouins and Arabia, Fellahin of Egypt. (c) A North Chinese Community—Farmers of forty centuries ; Intensive agriculture and subsidiary occupations such as sericulture progress in New China.

(d) A Collective farm in Israel :—Life before large-scale migration of Jews ; rapid development of agriculture and industry under a planned economy, for comparative study ; Italy, Spain.

(e) A Dutch Community near Zuider Zee : Land below sea-level, dykes ; fighting the sea for claiming land. Intensive mixed farming.

(f) An Industrial Community in Rhineland : richness of natural resources and their suitable location, mining and industry —exchange of German Coal and French iron Ore. The effects of repeated wars.

(g) Cattle and wheat farming in Argentine and American Praires : Comparative study of the two Communities to bring out

difference based on different levels of civilisation in the two regions.

(h) A Community on the bank of the St. Lawrence ; Saw-mills and paper mills turning on hydro-electricity. Seasonal occupations of lumbering and tapping. Trade with Red-Indians and Eskimos.

(i) A Collective Reindeer farm in North Siberia : The old way and the new. Growing vegetables and wheat in the polar regions. Use of aeroplanes and ice-breakers.

B. Problems of Living in the Modern World.

1. The modern world takes shape in the West :

(a) A brief survey of the Middle ages and Feudalism. Renaissance, the age of discovery and the development of oceanic trade. First contacts o India with the West.

(b) The rise of democracy in Great Britain. The French Revolution ; its effect on other countries. The Industrial Revolution and its effects.

2. How India's civilisation was influenced by the West :

(a) The British traders became rulers of India. Early foreign power. The decline of the Mughals, the rise and fall of the Marathas, Hyder Ali and Tipu. The Regulating and Pitt's India Acts. Permanent Settlement of Bengal. Lord Bentinck's Reforms. Policy of annexation and expansion. National Resurgence of 1857 and Royal proclamation.

(b) India under the Crown and growth of National Consciousness. Development of representative institutions and Local Self-Government. Cultural and educational movements led by Raja Rammohan Roy and Sir Syed Ahmad Khan. Establishment of Indian National Congress. Minto-Morley and Montague-Chelmsford Refroms, Mahatma Gandhi. Non-cooperation and Khilafat Movements. Round Table Conferences and the Act of 1935. Events leading to the partition. Independence—Integration of States, Establishments of the Republic.

3. *Living as Citizens of Free India* :

(a) Contributing to Happy Family Life. Young people as the architechts of India's Destiny. Citizenship begins at home. Family as the fundamental, so. ial and economic unit in all Communities, past and present. Family satisfies the basic needs of its members. Obligations of parents and children. Recent changes in the Indian family. Problem of "Improvement of Maternity" and its remedies. Problem of crowded home slums.

(b) How well is the community organised to satisfy our need for Education and Government.

(i) **The School** : Learning to know the school, the class-fellows and the staff to get the most out of the school. Being a good citizen of your school. Organising the school as a democratic community. Choosing a vocation fitting one's aptitudes and interests ; facilities for occupational training and suitable employment.

(ii) **Local Government** : Structure of local government and its functioning. How we participate in local government, local taxes and elections. Relationship of the local administration to the district and State administration.

(c) The need for a National Government.

The National and State Governments have certain functions that they can discharge better than the local and district administration. Study in outline of Indian Constitution and its relationship to other administrative units. Fundemental rights and vote of the Judiciary

Fundamental rights and role of the Judiciary.

4. *The Task of the National Reconstructoin* :

(a) Feeding India's Increasing Millions—Need for self-sufficiency in food and its proper distribution. Bringing new land under cultivation. Irrigation and multipurpose projects. Grow More Food Campaign, demonstration farms, better seeds, implements and manures. Intensive agriculture and increase in yield by new methods. Consolidation of holdings, abolition of Zamindari

and Bhoodan movement. Credit facilities to cultivators and encouraging farmers' Co-operatives.

(b) Industrial Development for raising Standard of Living. The Textile Industry. Our mineral power resources, Progress of heavy industries; Localisation of iron and steel industry, Small scale and Cottage industries; Educational, Social and Cultural development.

5. *Living in the World Community :*

(a) Development of Transport and Communication, Commercial interdependence. A closely-knit World.

(b) Two World Wars and the Need for Peace—League of Nations, U. N. O. and its Agencies. India's Contribution to World Peace, Pancha-Shila, Atom Energy in the service of mankind.

উপরি-উক্ত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে প্রধান বক্তব্য এই যে, ভারত সরকার ঘোষিত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আমরা যেসব আপত্তি উত্থাপন কোরেছি, এতে তা দূর করার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। এতে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান প্রভৃতিকে নিছক একসাথে জুড়ে দেবার তেমন চেষ্টা নেই, পরন্তু জীবন-প্রচেষ্টা বা "Living"কে পাঠ্যসূচীর কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরে নেওয়ার ফলে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞান, নৃবিদ্যা এবং সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের সাথে সংযোজিত হয়ে একাত্মকরণের (fusion) পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া জীবনকে এখানে বর্তমানকালের জীবন-প্রয়াস হিসেবে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভবিষ্যতের আলোকে উপস্থাপন করার ও বিচার করার চেষ্টা হয়েছে। তাই জীবনে এর উপযোগিতা যেমন বেশী, তেমনি এই পাঠ্যসূচী কেবল মুখস্থবিদ্যার গণ্ডীতেও আটকে পড়তে পারে না। স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক জীবন—অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, স্থান ও কাল এই উভয়ের ব্যাপ্তির দিক থেকেই মানবসমাজের জীবনকে একটা অখণ্ড প্রচেষ্টার ধারা হিসেবে দেখতে এবং বিচার কোরতে চাওয়া হয়েছে, যা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্যের একান্ত অনুযায়ী। তবু এটা সমাজবিদ্যা পাঠ্যসূচীর একটা রূপ এবং রেখা মাত্র, ক্রমাগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই আন্তর্জাতিক ভাবনা-সঙ্গত রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় জীবন-প্রয়াসের অনুকল্প হিসেবে সমাজবিদ্যার উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রণয়ন সম্ভব। আমরা এবার এই পাঠ্যসূচীকে কেন্দ্র কোরে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যে দুটি পাঠ্যসূচী ঘোষণা কোরেছেন তা উল্লেখ কোরবো। তা থেকেই প্রতীয়মান হবে সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং চিন্তা-ভাবনা কেমন কোরে অগ্রসর হচ্ছে।

মন্তব্য

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যসূচী

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক প্রচারিত একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির নবম ও দশম শ্রেণীর নিমিত্ত সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী :—

The Syllabus is divided into three main parts—I, II and III—dealing respectively with the elements of Human Geography, the evolution of Indian Culture and its contacts with other peoples, and some principles of Citizenship and Government.

Section II will carry 50% of the total marks alloted to Social Studies in the evaluation of the work of the Students ; Sections I and III will carry 25% each.

It is proposed that Section I be covered in Class IX and section III in Class X, while section II may be studied in both the classes. A school should, however, have the freedom to dapart from the proposed order to suit its own special convenience.

Syllabus

Section I : **Living in Communities.**

(a) Living in the Local Community in our own land. How does the Community help us to meet our primary needs of food, dress, shelter ?

(i) Food-gathering Economy :—

The Andamanese country and the people—fiishing and hunting —collection of roots and leaves from the jungle—houses and settlements—dress, utensils, weapons—family and group life—religion, music and dancing.

(ii) Pastoral Economy :

The farmers and pastoral people of the Almora Hills—the seasonal migration—moving with the cattle—temporary shelters and permanent villages—fairs and market scenes.

(iii) Agriculture :

Cultivation of rice and jute in the South, in Bengal ; plantations and forestry in the North. The country where rice and jute are grown—food and clothing in the plains—transport by bullock carts or boats in the first stage—the sale and uses of ute and food

crops—life in the villages of Lower Bengal. Plantation and manufacture of tea in the Nor h—scenes and life in a tea-garden—villages and towns in the hills—forests and their uses—floating down timber to the plains.

(iv) Industries in Bengal :

Coal-mining in the Asansol area—scenes in the iron works in Burnpur—Chittaranjan and the manufacture of railway engines (and wagons—engineering works in Calcutta and Howrah)—the Organisation of rail and road transport—the Port of Calcutta—the scattered small workshops—the new constructions in the D. V. C area. Contrast between old town like Howrah and a new town like Chittaranjan.

(v) Villages and Towns in our Country :

Scattered Villages of Lower Bengal of Kerala—Compact Villages of the Uttar Pradesh or the Punjab—different kinds of towns—our house. Market villages—villages with crafts like weaving and pottery. Fairs in the countryside for buying and selling of grains, cattle, cloth, implements, building materials, fineries etc. How villages grow larger and may fuse into towns. Story of the growth of Calcutta from three small villages.

(b) Living in different Regional Communities in foreign lands—(Not more than four foreign regional communities out of the eight below are to be studied.)

(i) A Collective Reindeer farm in North Siberia,
(ii) A Malayan Community.
(iii) A Community on the Bank *of* the St. Lawrence.
(iv) A Dutch Community near Zuyder Zee.
(v) A North Chinese Community.
(vi) Cattle and Wheat farming in the American Prairies.
(vii) A Mining Community in West Australia.
(viii) An Industrial Community in the Rhineland.

Section II : Indian Culture and Contacts with the World.

(A review of the broad currents and significant epochs of Indian cultural evolution ; a political framework will be used only to the extent necessary to preserve continuity and time-sequence.)

(i) Basic factors in History :

Man and his environment—the physical features of India and the influence of geography on Indian History. Different races, languages, religions, ways of life as well as common features. Unity in diversity in India.

(ii) Types of source-material :

Archaeological relics, inscriptions and coins, literary records, travel-accounts.

(iii) Our pre-historic ruins :

The story of important discoveries—the romance of archaeology—the Indus Valley Culture.

(iv) The Aryan Vedic Civilisation :

Society, literature, religion—interactions with Non-Aryan Cultures—the emergence of the great Epics and the social and institutional changes represented in them.

(v) Two great new religions :

Buddhism and Jainism—their main teachings and importance in Indian History—the evolution of Buddhism and its advance into foreign lands.

(vi) The Maurya Age :

The greatness of Asoka in history—inscriptions of Asoka—Maurya society and culture—Magasthenes' account.

(vii) The Persian and Greek impacts on India.

Extent and importance of Indo-Greek intercourse—the Greeks in the borderlands of India—the Indian contacts with the Roman Empire—the question of Hellenic influence on India and Indian influence on the classical world.

(viii) The Age of Transition :

The evolution in the five centuries after Asoka—art and literature, society and religion, trade and economic conditions—the reign of Kanishka—the Sakas and other foreigners in the border country.

(ix) The Gupta Age :

Society and religion, art and literature, economic conditions, administration—the Hunas and the fall of the Gupta Empire—

Harsha and his times—the Chinese travellers Fa-hien and Hiuen Tsang.

(x) Early History of Bengal :

Social, economic and cultural life from the age of Guptas to the age of the Palas and the Senas.

(xi) South Indian History :

Early kingdoms and settlements—art and culture under the Pallavas, the Ch lukyas, the Cholas—trade and economic conditions and activities—Hindu revivals from the South.

(xii) Indian Culture Abroad :

Indian maritime and Commercial activity—religious missions—colonial enterpri e and cultural expansion.

(xiii) The Rajputs in Indian History :

Origins and activities—the dynastic struggles and disunion. Coming of Islam to India. The nature of the Muslim conquest. Alberuni's account.

(xiv) Society and culture in Early Muslim Days :

The Sultanate of Delhi and conditions under it—the interaction between Hindu and Muslim cultures—conditions in the provincial regions, especially in Bengal and Vijoynagar.

(xv) The Mughal Empire :

The importance of Akbar, the Mughal system of administration, art and architecture—Society and economic conditions—literature—foreign travellers.

(xvi) The fall of the Mughal Empire :

The advent of the Europeans—the rise and fall of the Maratha. Mysorean and Sikh powers – life and conditions in the 18th century.

(xvii) The building-up of the British Power in India-Landmarks in the process of conquests the—administrative organisation—the relation with the Home Government—popular struggles against the British – the Revolt of 1857.

(xviii) British impact on Indian economy :

The destruction of old order—the land settlements, changes—in trade, transport, Industry—modernisation in the economic life of the country sets in as a process.

(xix) The Western Cultural impact on India :

The 19th Century awakening in Bengal and elsewhere—liberal and scientific education from the West—creative literature and learning—social reform—religious reforms—modern thoughts and outlook n the country.

(xx) The National Movement and Liberation :

National consciousness in early 19th Century—genesis of national movements and agitations—the birth of the National Congress and early leaders—gradual growth of a Left Nationalism—Bengal's Swadeshi upsurge—revolutionary terrorism—the impact of Gandhiji and his movement—the struggles for independence and its achievement. The Tasks Ahead—peace and prosperity for the people—national reconstruction and a Welfare State—a Socialist Pattern of Society as the goal.

Section III : Citizenship and Government :

(i) Life in the family and in a Locality—how we need the inner circle of the family and relations and the outer circle of different associations—what we learn from family life and the life in the associations—the elements of the Good Life and the qualities essential for developing such life.

(ii) The Health of the Community :

Civic virtues and duties - the necessary provisions and amenities for the maintenance of public health and prevention of disease, Recreation and culture of the community organisations and acti-ivities of different types. Education.

(iii) The People and its Government—

Elections from time in modern communities, the right to vote and participate n public affairs—parties and what they want—freedom of the press—expressions and association and consquent responsibilities—political life in a modern community. Ideals of democratic society. Democratic Conduct in everyday life.

(iv) Organisations of Local Administration :

The Corporation in Calcutta—the Municipalities in the Towns —Local Self-Government and Local Authorities in the district and the countryside—Modern Community Development activities. The Projection of the community and the necessary organisation for it.

(v) Democratic Government in our States and in the Indian Union—how Government is carried on, the process of deliberation, legislation, adjudication and routine administration—the division of work between the Centre and the States—the Union organs in the Governmental system in India.

(vi) Contacts with the outside World :

Political, economic and cultural contacts and agencies for the same—Indian foreign policy aims of peace and goodwill—the U. N. O. and the ideals of moving towards World Community.

N. B. The syllabus sketched above is not intended to be adhered to in a closed, rigid, mechanical manner. It is only an attempt to map out a field of Social studies which can be followed as a Compulsory Course in our schools. The schools should also havethe liberty to change the order in teaching to suit the convenience and to experiment on the course in any constructive way.

মন্তব্য

এই পাঠ্যসূচীটির All India Council for Secondary Education প্রচারিত পাঠ্যসূচীটির সাথে কিছুটা পার্থক্য আছে। পার্থক্যটা তেমন প্রকৃতিগত নয় কিন্তু আকৃতিগত নিশ্চয়ই। Council প্রচারিত পাঠ্যসূচীতে ভূগোল, ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলাদা চেহারাটা যেমন চোখে পড়ে না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের উপরি-বর্ণিত পাঠ্যসূচীতে এই তিনটি বিষয়ভেদের চেহারাটাকে প্রধানতঃ অবলম্বন কোরেই সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী উপস্থিত করা হয়েছে। তবে একটি কারণের নিমিত্ত দুটো পাঠ্যসূচীর প্রাণবস্তুতে বেশ মিল আছে। পর্ষদ্ ভূগোলকে মানবিক ভূগোল এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নাগরিকতা শিক্ষা এবং রাষ্ট্রীয় সমাজ পরিচালনার সমস্যা হিসেবে উপস্থাপনের কথা বলেছেন, আর ইতিহাসকে ভারতীয় রাজারাজড়াদের ইতিহাস না হয়ে বিভিন্ন ভারতীয় সমাজসংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি এবং সাধারণ জীবনযাত্রার ইতিহাস হিসেবে উপস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছেন। এদিক দিয়ে মানুষের অতীত ও বর্তমানের জীবন-প্রয়াসই এর প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়েছে। সেই আলোকে ভবিষ্যতের রূপরেখাও উপস্থিত করার চেষ্টা হয়েছে। সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনের দিক দিয়ে এখানে আমরা অনেকখানি উন্নততর প্রচেষ্টার সাক্ষাৎ পাই, তবে বিষয়ভেদের অতীত ধারণাটা পাঠ্যসূচী-প্রণেতাদের মনে বদ্ধমূল থাকায় এই তিনটি বিষয়ের একাত্মকরণ (fusion) সম্ভব হয় নি। বিষয়বস্তু-নির্বাচনটা উন্নততর হলেও তা উপস্থাপনের ধারাটা বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজনমূলক ("জোড়া-গাঁথা ধরনের) পর্যায়েই রয়ে গেছে। উপস্থাপন-প্রণালীর দিক থেকে এটা Council প্রচারিত পাঠ্যসূচীর এক ধাপ পশ্চাতেই রয়ে গেছে একথা অবশ্য স্বীকার কোরতেই হবে।

পর্ষদের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যসূচী

আবার পর্ষদ্ সম্প্রতি দশমমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নবম ও দশম শ্রেণীর নিমিত্ত সমাজবিদ্যার যে পাঠ্যসূচী ঘোষণা করেছেন তা সবদিক দিয়ে অভিনন্দন-যোগ্য। এখানে বিষয়ভেদকে শুধু যে বর্জন করার চেষ্টা হয়েছে তাই নয়, বিষয়গুলির একাত্মকরণ বহুল পরিমাণে অগ্রসর হয়েছে। তাছাড়া সমাজবিদ্যা যে শুধু পঠনীয় বিষয় নয়, শিক্ষণীয় বিষয়, ব্যবহারিক কাজকর্মের (practical work সুস্পষ্ট, নির্দেশের ফলে তা'ও প্রাঞ্জলতর হয়েছে। আমরা ভারতীয়, বিশ্ব-মানবসমাজের অংশ, আমাদের একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় বিকাশধারা রয়েছে, আমাদের একটি বিশিষ্ট অতীত আছে, সেই অতীত এবং আধুনিক সমগ্র মানবসমাজের পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের বর্তমান উন্নয়ন-প্রয়াস চলেছে, আমরা একটা সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের অভিমুখে যাত্রা কোরেছি, হাসি-কান্না-গানে, শিল্পে-ভাস্কর্যে, আচারে-ব্যবহারে, বেশভূষায় মানবসমাজের বিচিত্র দরবারে আমরা একটা বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে উঠেছি, উঠছি এবং উঠবো—আমাদের দেশের মানুষ এই বিরাট কর্মধারার মধ্যেই "যার যেথা স্থান" সন্ধান কোরে নেবে, আমাদের সমাজবিদ্যার শিক্ষাদান তাদের সেই কাজে সাহায্য কোরবে এবং তাদের চিন্তাশক্তির উন্নয়নে ও প্রতিটি কাজসম্পাদনের যোগ্যতাবৃদ্ধিতে মূল্যবান সহায়ক হবে; পর্ষদের এই পাঠ্যসূচীটি আমাদের উক্ত আশা পূরণের বিশেষ সহায়ক একথা অকপটচিত্তে স্বীকার কোরতে হবে।

পর্ষদের নিজের ভাষাতেই এবার পাঠ্যসূচীটি তুলে দিচ্ছি :—

Social Studies has been introduced as an Alternative Course to Indian History and Geography to enable our boys and girls to know India as a whole and in relation to other parts of the world. Historical facts and geographical features find a place in it in so far as they contribute to this understanding. The Course plans to give an idea of :

(i) Essential Geographical features of India.
(ii) Our Basic needs and how we meet them.
(iii) Our cultural and social heritage.
(iv) Our struggle for Independence.
(v) Our Constitution and Government.
(vi) Our Programme for social and economic reconstruction.
(vii) The place of India in the Comity of Nations.
(viii) The concept of 'One World'.

The course is to be taught in classes IX and X of X-class schools in lieu of Indian History and Geography.

The time-table should be so adjusted that two consecutive periods are available when project work is undertaken.

Syllabus

Paper. I : 100 Marks.

A. Introduction.

Unit 1. *The Country we live in*—its physical background—geographical position in relation to the rest of the World—the political set up—the Indian Union and the Constituent States—Living as Citizens of Free India.

B. Our Basic Needs.

Unit 2. *Food*—food taken in different parts of India—influence of enviornment (Nature and Social) on food habits—Composition of our food and its nturitive value.

A comparative study of food in India and a few typical countries e. g. Arab Countries, Mediterranean Countries, Japan, Lapland etc.

Unit 3. *Clothing*—Clothing worn in different parts of India—influence of environment (Natural and Social) on clothing—aesthetic factors in clothing.

A comparative study of Clothing in India and a few typical countries e.g. Desert Lands, undeveloped African Countries, European Countries, Polar Regions.

Unit 4. *Shelter*—Types of our houses in different parts of India—influence of environment (Natural and Social) on housing modern developments and problems of housing in India.

A comparative study of housing in India and a few typical countries e.g. Desert Lands, Polar Regions, European Countries and U. S. A., African jungles.

Unit 5. *Other Needs*—Consumers' goods and services.

C. How We Meet Our Needs.

Unit 6. *Our principal Occupations for meeting the basic needs*: agriculture and supplementary Occupations, forestry mining, fishing and pastoral occupations, industries, transport; social services, e.g. education, health, entertainments, adminis-tration, law and order.

Unit 7. *Detailed studies of important occupations and servives.*

(i) Agriculture – pincipal crops – types of agriculture – geographical factors and methods of cultivation. Need for irrigation —the role of the River Valley Projects in India's economic progress. The problem of self-sufficiency in food.

A comparative study between India and a few other countries, e.g. Japan, Egypt, U. S. S. R. regarding crops, methods of cultivation and yield.

(ii) Occupations supplementary to agriculture – fishing, animal husbandry, poultry, dairy, preservation of food

(iii) Forestry—Important forest areas and products—utilisation, Conservation and afforestation.

(iv) Mining—mineral wealth of India – important mining centres—utilisation and conservation.

(v) Industries—different types—heavy industries e.g. iron and steel, textiles (jute, cotton, wool, silk, synthetic), chemical, ship-building, locomotives automobile and air-craft industries.

Our Cottage Industries—Chief centres of production in West Bengal.

(vi) Transport and Communication in India—

Forms of Communication and Transport in rural and urban areas.

A comparative study of different forms of transport in typical areas e.g. desertlands, polar regions, mountains etc. A brief account of development of transport through the ages—invention of wheel and mechanical power – use of steam, gas, electricity and atomic power—recent developments e.g. space ship.

Paper II : 100 Marks

D. Our Culture and Heritage.

Unit 8. (a) *The past background*—a short survey of the evolution of Indian culture and heritage through the Ages (only land-marks to be touched).

(b) *Our Religion*—principal religions in India—Hinduism—Buddhism, Jainism—Christianity and Islam—teaching of some important religious reformers of medieval and modern times.

(c) *Our Language*—The Chief language group and linguistic areas – Federal languages and Regional languages—medium of instruction of different stages of education.

(d) *Our Art*—Some notable forms of Art—Ajanta, Ellora, Gandhara, Mahavalipuram, Mugal and Rajput Art—Modern Art.

(e) *Our Architecture*—Some notable forms of architecture—temples, mosques, and other famous historical buildings.

(f) *Our Music*—Classical and other forms of music—Baul, Bhatiali, Folk-songs, 'Rabindra Sangeet.'

(g) *Our Dance*—Classical, modern and folk dances of India—their characteristics.

In the teaching of the above items it is not necessary to go into technical details. Attempt should be made to present things like Music, Dance, Art and Architecture in real or realistic settings with ample suitable illustrations.

E. Our National Government.

Unit 9. (a) *Living as citizens of Free India*—achievement of independence in 1947—building up a New India—a free, sovereign, democratic republic with a rich heritage and culture—unity in diversity.

(b) How we attained Independence in 1947. First War of Independence against the British in 1857—growth of National and the Indian National Congress—Partition of Bengal—Swadeshi Movement—Mahatma Gandhi and Non-violent Non-coperation movement—armed struggle in Bengal—August movement 1942—Netaji and the I. N. A. Achievement of Independence in 1947.

(c) Our National Government—The New Constitution, 1950—Important features of the Constitution—Fundemental Rights and Duties—Federal Character—Centre and Constitnent Units—Parliamentary Government—Universal suffrage and Democratic—Government—how our laws are made and administered—our Local

Administration. India, a Welfare State—increasing role of Government in the economic life of the people—India's striving for a socialistic goal.

F. India Today

Unit 10. *Post-Indetendence eflorts towards Reconstruction.*

(a) *Our immediate problems*—growing population—economic problems—problems of health and education—our efforts to solve them. The Five Year Plans—the main features—Development of Power, Heavy Industries, Community Development etc. Family Planning.

(b) *India's foriegn Trade Communities*—we generally export and commodities we import—countries with which most of the trading take place—change in the nature of trade especially with reference to Trade Balance.

(c) *India's foriegn pol cy*—of non-Alignment—participation in World Organisations—India's efforts in the preservation of world peace—India's place in the Comity of Nations.

G. Man as Citizen of the World.

Unit 11. Shrinkage of distance through development of transport and communication facilities—growing inter-dependence of Nations and Countries—Necessity of World Peace—World organisations and their efforts towards solution of international problems—need of developing world-mindedness.

Practical Work

The practical work should consist of the following :—

(a) Visit of educational value e.g. to factories, farms, ports, museums, industrial and agricultural fairs, National Library etc. and preparation of individual and group reports on visits.

(b) Educational projects and activities and preparation of hand-work, models, charts, graphs and short reports.

(c) Maintenance of individual scrap book.

(d) Organisation of cultural and educational functions including educational exhibition.

(e) Celebration of Independence Day and Republic Day. Two c nsecutive periods should be available when project work is undertaken.

উপরি-উক্ত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে প্রশংসাবাক্য আমরা আগেই উচ্চারণ কোরেছি কেন? সে প্রসঙ্গে আরও দু'চার কথা বলছি। সমাজবিদ্যা বিষয়টিকে যে একটা সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করা হয়েছে তার একটা প্রধান লক্ষণ হোল এই যে, মোট বিষয়বস্তুকে একটিমাত্র অবিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে ধরে নিয়েই ধারাবাহিকভাবে ১১টি ইউনিট বা এককে বিভক্ত করা হয়েছে। অবশ্য এই ১১টি ইউনিটকে সাতটি অংশে এবং দুটো পেপারে ভাগ করা হয়েছে। এই সাতটি অংশের যেভাবে নামকরণ করা হয়েছে,—যথা—Introduction, Our Basic Needs, How We Meet Our Needs, Our cultur and heritage, O r National Government, India Today এবং Man as Citizen of the World. তাতে পুরানো ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রভৃতির বিভাগধারা অনুপস্থিত; আমাদের ভারতীয় জীবনকেই এর কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন কোরে তার নানা সমস্যা, তাদের উৎপত্তি এবং সমাধানের চিন্তা ও উপায় সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ এদিক থেকে বলা যায়, সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এই পাঠ্যসূচীতে Problem Method এবং Source Method-গুলিকে প্রশংসনীয়ভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এই এগারোটি একক এবং তাদের অনু-এককে আমাদের বর্তমান জীবনের বিভিন্ন সমস্যাগুলিই বিভিন্ন দিক থেকে উপস্থিত করা হয়েছে। বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, ইতিহাসকে Our Culture and Heritage এই পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে—সাতটা আধুনিক সমস্যার বা জীবনের প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে বিচার করা হয়েছে। সেগুলি হোলো, The Past Background, Our Religion, Our Language, Our Art, Our Architecture, Our Music এবং Our Dance. এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিমিত্ত পাঠ্যসূচীতে আমাদের এই অতীতকে ইতিহাসের পাঠ্যসূচী হিসেবে এবং বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের নামানুসারে যুগবিভাগ কোরে উপস্থিত করা হয়েছে। এতে দুটো প্রধান ত্রুটি এই যে, অতীত কথা স্মৃতি-রোমন্থনের বা মুখস্থবিদ্যার পর্যায়েই রয়ে গেছে এবং মানুষের মনের যুগসঞ্চিত সংকীর্ণতা ও বিভেদপ্রবণতাকেই আমল দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমান আলোচ্য পাঠ্যসূচীতে অতীত কথাকে সমস্যামুখীন আলোচনার গণ্ডীতে এনে ফেলায় এই দুটো ত্রুটিই অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে। এই Problem Method অনুযায়ী বিষয়বস্তু নির্বাচনে Source Method বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। আমাদের প্রতিটি

মন্তব্য

Problem ও Source Method-গুলির অনুসরণ

তুলনা

সমস্যারই একটি উৎপত্তিস্থান রয়েছে, Source Method আমাদের দৃষ্টিকে সেই অভিমুখে চালিত কোরে সমস্যাটির উৎপত্তি ও গতির বিশিষ্ট ধারাটি বুঝতে আমাদের প্রভূত পরিমাণে সাহায্য কোরেছে। এইভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচনে আর একটি বিশেষ সুবিধা হয়েছে এই যে, যে কোন project বা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন অগ্রসর হতে বিশেষ বাধা ঘটবে না। এদিক থেকে যথেষ্ট পরিমাণে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা শিক্ষার যে আধুনিকীকরণের কথা বলে থাকি, সমাজবিদ্যার এই পাঠ্যসূচীটি আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে তাকেই স্বাগত জানাচ্ছে।

Project Method অনুসরণে সুবিধা

পাঠ্যসূচী-প্রণেতারা ব্যবহারিক শিক্ষা বা practical work-এর প্রস্তাবনা দ্বারা সমাজবিদ্যা যে মননীয় ও আচরণীয় এই সত্যটিকে প্রাঞ্জলতর কোরেছেন। বস্তুতঃ যে জ্ঞান আচরণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত বা তাদের দ্বারা সমর্থিত নয়, তাকে আদপে জ্ঞান বলে মেনে নেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা যথার্থ সঙ্গতভাবেই সংশয় উপস্থিত কোরেছেন। সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনে তাই গোড়া থেকেই ব্যবহারিক কাজের (practical work) ওপরে নজর দেওয়া আবশ্যক। ব্যবহারিক কাজ (practical work) সম্পর্কে এই পাঠ্যসূচীর নির্দেশ বেশ ব্যাপক এবং উপযুক্ত, অবশ্য যে কোন যোগ্য শিক্ষকই এই সুযোগকে ব্যাপকতর ও স্থানীয় প্রয়োজন ও অবস্থানুযায়ী অধিকতর সঙ্গত ও সম্ভাবনাময় কোরে নিতে পারেন। গ্রন্থরচনার বিষয়ে গ্রন্থের আয়তন চিত্রণ, ভাষা প্রভৃতি সম্পর্কেও পর্ষদের নির্দেশকে সঙ্গত বলেই গ্রহণ করা যায়। এ সম্পর্কে পর্ষদের ভাষা উদ্ধৃত করা গেল: The book should be suitably illustrated. The total volume of the book, including diagrams, pictures and questions, should not exceed 540 pages. A relaxation upto 10% over the total page limit may be allowed. Language of the book should be very simple." বিষয়বস্তু সম্পর্কে ছাত্রদের অভিজ্ঞতা ও ধারাকেও কিভাবে যাচাই কোরে নিতে হবে সেদিকেও অল্প কথায় একটা উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া আছে—"Suitable essay type, short answer type, the objective type questions should be appended at the end of each chapter. The questions should be set in English. এর শেষ বাক্যটি সম্পর্কে আমরা হয়ত অনেকেই আপত্তি পোষণ করি, তবে আমাদের দেশের অবস্থাবৈগুণ্যে এ প্রসঙ্গে এখন আর কোনো আলোচনা উপস্থিত করা সঙ্গত বোধ কোরছি না।

ব্যবহারিক কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ

পাঠ্য-গ্রন্থ

মূল্যায়ন সম্পর্কে নির্দেশ

ক্রমবিবর্তনশীল পাঠ্যসূচী

শেষোক্ত পাঠ্যসূচীকে আমরা যথেষ্ট প্রশংসা কোরলেও সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচীটাই একটা ক্রমবিবর্তনশীল (exploratory) ব্যাপার—নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এই বিষয়টি পূর্তির পরিণতির দিকে অগ্রসর হবে, অথচ কোনোদিনই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ পরিণতিতে পৌছবে না—একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। মানুষের সমাজ পরিবর্তনশীল, মানুষ পরিবর্তনশীল, তাই তার সমাজবিদ্যাও নিয়ত গতিশীল, নিয়ত বিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। তাই আমাদের ক্রমাগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুকে আমাদের চলিষ্ণু জীবনের ক্রমান্বয়ে উপযোগী কোরে নিতে হবে। আমাদের বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার প্রবর্তন একটি আধুনিক ভাবনা, তাই একে খোলা মনে গ্রহণ কোরে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরিচালিত কোরে একে উপযুক্ত পরিণতির দিকে পৌছে দিতে হবে ; সমাজবিদ্যা আধুনিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ—একথা কোনোক্রমেই ভুললে চলবে না। আমাদের চিন্তা ও অভ্যাসের জড়ত্বকে কাটিয়ে, টাইমটেবলে একে উপযুক্ত স্থান দেবার সকল বাধাকে অপসারিত কোরে আধুনিক শিক্ষাদান-প্রক্রিয়ায় সমাজবিদ্যাকে উপযুক্ত ভূমিকাগ্রহণের সুযোগ অবশ্যই কোরে দিতে হবে। এই বিদ্যার প্রবর্তন থেকে আমরা যে সুফল আশা করি, তা লাভ কোরতে হোলে এই বিদ্যার বিষয়বস্তু নির্বাচনে এবং তার পঠন-পাঠন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের সজাগ, সতর্ক এবং যত্নশীল হতে হবে এবং প্রতি পদক্ষেপে আমাদের মূল্যবান অভিজ্ঞতাগুলিকে কাজে লাগাতে হবে। অর্জিত অভিজ্ঞতাগুলির সদ্ব্যবহার বিষয়বস্তু-নির্বাচন ও শিক্ষাদানের গোড়ার কথা। জীবন প্রতি মুহূর্তে যত্নের অপেক্ষা রাখে, জীবনের বিদ্যাকেও তা থেকে বঞ্চিত করা চলে না।

চলিষ্ণু জীবনের উপযোগী পাঠক্রম

অর্জিত অভিজ্ঞতাসমূহের সদ্ব্যবহার

Questions

1. What are the claims of Social Studies to the present School Curriculum ? Describe its importance, or otherwise in this respect.

2. Why is Social Studies introduced as one of the subjects of the Core Curriculum of the High School ? What is its relation to modern life ?

3. Describe the role of Social Studies in our Secondary Curriculum in the light of modern trends in Education. In this connection comment on the view that Social Studies in school should not be treated as a course with a special function, (C. U. '63)

4. Bring out the principles of framing a Social Studies Curriculum, How ar are the personal problems welcome in such a curriculum ?

5. What do you mean by "Social Individuality ?" How can Social Studies Curriculum help to evolve this "Social Individuality ?"

6. Social Studies deems our Sehool to be "Progressive Schools"—how can Social studies help to transform our schools into "Progressive Schools ?"

7. Why has the syllabus suggested by the All India Council for Secondary Education been accepted as the basis of Social Studies Curriculum ? Bring out its main features.

8. What are the merits and demerits of the Social Studies Syllabus introduced by the Board of Secondary Education West Bengal for classes IX and X of the Higher Secondary Schools ? How far does it differ from the syllabus suggested by the All India Council for Secondary Education ?

9. What are the salient features of the Social Studies Syllabus introduced by the Board of Secondary Education, West Bengal, for class IX and X of the X-class schools ? Institute a comparison between this syllabus and the other introduced by the Board for classes IX and X of the Higher Secondary Schools ?

10, What are the main points of view from which we should judge a Social Studies Curriculum ? What should form the subject matter of Social Studies and how should it be made more perfect ?

11. Draw up a Curriculum on Social Studies for children aged 14 to 16 years, stating the aims you will have in view te make it effective.

(C. U. B. T. 1962)

———

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠন-পদ্ধতি

Method of Teaching and learning Social Studies

আমাদের বিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ও তার ফলশ্রুতি

জাতকের একটি গল্পে বলা হ'য়েছে বোধিসত্ত্বের এক শিষ্য ছিল। শিষ্যটি হাতীর, দুধের এবং গুড়-জলের একটিমাত্র উপমা দিয়েছিল—সবই নাকি লাঙ্গলের ইষের মত। বোধিসত্ত্বের ঐ শিষ্যের মতো আমাদের পঠন-পাঠন-পদ্ধতিরও এক কথা প্রায় "ভদ্রলোকের এক কথা"র মতই—মুখস্থবিদ্যা। মুদালিয়র কমিশন তাই আক্ষেপ ক'রে বলেছেন, "আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এখনও বাঁধা ছকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; এখনও মুখস্থবিদ্যারই প্রাবল্য, শিক্ষাদানের সাথে বাস্তব জীবনের কোনো যোগ নেই, এমন কি মৌখিক ও লিখিত ভাবে আমাদের মনোভাব প্রকাশের মানের অবনতি রোধ করবার কোনো দৃঢ় চেষ্টাও নেই।" এহেন অবস্থায় সমাজ-বিদ্যা নামক আর একটি বিষয় প্রবর্তিত হওয়ার অর্থ হ'য়েছে ৫০০।৬০০ পৃষ্ঠার আরও একখানি বইয়ের জ্ঞান-রত্ন-রাজি সংগ্রহে ছাত্রেরা মুখস্থ-শক্তির উৎকর্ষের বাহাদুরি দেখাবে, আর তার ফলশ্রুতি হবে, মুদালিয়র কমিশনের ভাষাতেই "জড়, পূর্বপ্রস্তুত জ্ঞান, যা তার ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং যা তার মনকে উদ্দীপ্ত কোরতে শুধু ব্যর্থ হয় তাই নয়, পরন্তু পরীক্ষার হলে সেগুলি উগরে দেবার সাথে সাথেই সে তা দ্রুত বিস্মৃত হয়"।

মুখস্থবিদ্যা ও তার ফল

অতএব অনন্তর কি কর্তব্য? মহৎ লক্ষ্য ও উচ্চাশা নিয়ে সমাজবিদ্যা প্রবর্তনার পর এখন সবই কি নিষ্ফল পদ্ধতির বালি-চড়ায় ঠেকে নষ্ট হবে? যদিও অতীতের জের সহজে মিটতে চায় না, তবু আমাদের আশা এ অবস্থা বেশীদিন চলবে না। শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতিসমূহ নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট গুরুত্ব এবং ভূমিকা সম্পর্কে আমাদের শিক্ষকসমাজ ক্রমশঃ অবহিত হচ্ছেন।"

শিক্ষক ও শিক্ষাদান-পদ্ধতি

অনেকে বলেন শিক্ষক নিজে তাঁর বিষয়ে জ্ঞানী হবেন এবং নিজের বিবেচনানুযায়ী জ্ঞান বিতরণ কোরবেন, এইটেই আসল কথা। তাঁর যদি যথেষ্ট জ্ঞান থাকে, তবে তা তিনি সহজে ও স্বচ্ছন্দে বিতরণ কোরতে পারবেন; অতএব এর মধ্যে পদ্ধতি নিয়ে মাথাব্যথা করার কোনো প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা-ভাবনা দেখিয়েছে যে, এই চিন্তাধারার মধ্যেই ভুল আছে এবং শিক্ষা যেহেতু একটি বিজ্ঞান, অতএব অন্যান্য বিজ্ঞানের মত তারও অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সঠিক

পদ্ধতিসকল নির্ণয়ের প্রয়োজন আছে। আজ আধুনিক শিক্ষার কেন্দ্রভূমিতে আছে শিশু, শিক্ষক নন; আবার জ্ঞান বিতরণ করা যায় না, জ্ঞান অর্জিত হয়, শিশু জ্ঞান অর্জন করে, অতএব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষকের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও গভীরতার ভূমিকা পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ নয়।

সঠিক পদ্ধতি নির্বাচনের গুরুত্ব

যেহেতু শিশু জ্ঞান অর্জন করে, সেই হেতু শিশুর প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী জ্ঞানের ধরন ও মাত্রা নির্ধারিত হবে এবং শিশুর পক্ষে সম্ভবপর উপায়েই শিশু তা আয়ত্ত কোরবে। আবার যেহেতু শিশুর পক্ষ থেকেই জ্ঞানার্জনের কাজটা শুরু হবে, অতএব সেই কাজের জন্য তার আগ্রহ এবং প্রণোদনাও থাকা চাই। আবার শিক্ষা তো শুধু জ্ঞানার্জন নয়, আচরণ—অভ্যাস—দক্ষতা অর্জনও বটে, অতএব শিশুর সমগ্র সত্তাকেই কর্মে নিমগ্ন কোরতে হবে; শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা তাই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা—আর তাই শিশুর সমস্ত আগ্রহ, প্রবণতা, কর্মশক্তির কিভাবে, কেন, কতখানি সফল প্রয়োগ করা যায় তা দেখতে হবে এবং তা দেখতে গেলে সঠিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি নির্ধারণের প্রশ্ন স্বতঃই উপস্থিত হয়। "যদি শিক্ষাদানকে সর্বোচ্চ পরিমাণ দক্ষতা-সম্পন্ন কোরতে হয়, তবে এটা সুস্পষ্ট যে শিক্ষকগণকে নিজেদের ক্ষেত্রের শিক্ষণীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে হবে এবং উত্তম শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা-দর্শনের অংশস্বরূপ মনস্তত্ত্বসহ সকল পর্যায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশস্ত জ্ঞান রাখতে হবে।" (Bining and Bining. *The Teaching of Social Studies in Secondary Schools*)।

সঠিক পদ্ধতির লক্ষ্য ও লক্ষণ

সঠিক শিক্ষাদান-পদ্ধতি নির্বাচনের বিষয়ে মুদালিয়র কমিশন যেসব বক্তব্য উপস্থিত কোরেছেন তা ভালভাবে বিবেচনা করা দরকার। সঠিক পদ্ধতি কোন্‌টি বা কোন্‌গুলি, তাদের লক্ষ্য কি, কিভাবে তাদের চিহ্নিত করা যাবে। সে বিষয়ে কমিশনের বক্তব্য থেকে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল :—

(১) **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সংযোগের প্রকৃতি ও প্রতিক্রিয়া, কাম্য আচরণ ও মূল্যবোধের সৃষ্টি :** "পদ্ধতি শুধু কিছু তথ্যসরবরাহের প্রক্রিয়া নয় এবং "বিতরণ প্রান্তে" অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র এমন শিক্ষকের ব্যাপারও নয়। ভালে বা মন্দ, যে কোনো পদ্ধতিই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগকে সর্বদা পারস্পরিক ক্রিয়ার সাহায্যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে সংযুক্ত করে; কেবল শিক্ষার্থীদের মনের ওপরে নয়, পরন্তু তাদের সমগ্র ব্যক্তিত্ব তাদের কাজ ও বিচারের মান, তাদের বুদ্ধি ও আবেগপ্রকরণ, তাদের আচরণাদি ও মূল্যবোধের ওপরে এর প্রতিক্রিয়া হয়। পদ্ধতিসমূহ নির্ণয়ে ও মূল্যায়ণে, তাদের **শেষ-উৎপাদন ফল** অর্থাৎ সজ্ঞানে বা নির্জ্ঞানে তাদের (শিক্ষার্থীদের) মধ্যে সঞ্চারিত আচরণাদি ও মূল্যবোধের কথা শিক্ষকদের সর্বদা অবশ্য বিবেচনা কোরতে হবে।"

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক ক্রিয়া

শেষ উৎপাদন-ফলের চিন্তা
End-Products

(২) **কর্মপ্রীতি ও সর্বোচ্চ পরিমাণ দক্ষতা অর্জন ঃ** সকল পদ্ধতিই যে সর্বোচ্চ মূল্যবোধ সৃষ্টি করার চেষ্টা কোরবে তা হচ্ছে কর্মপ্রীতি এবং ব্যক্তির পক্ষে যথাসাধ্য সর্বোচ্চ পরিমাণ দক্ষতার সাথে তা সম্পাদন করার ইচ্ছা।...বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যে সমস্ত কাজ কোরছে সেগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর প্রকৃত আসক্তি এবং সেগুলির সম্পাদনে তার সমস্ত মনপ্রাণ নিয়োজিত করার ইচ্ছা সৃষ্টি কোরতে শিক্ষা ব্যর্থ হয়, তবে তা মনকে শিক্ষিত কোরতে পারে না, চরিত্রও গঠন কোরতে পারে না।"

কর্মপ্রীতি ও সর্বোচ্চ দক্ষতা অর্জন

(৩) **জ্ঞান হবে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্যমূলক ও বুদ্ধিগত ও ব্যবহারিক কাজের ফল ঃ** "বর্তমান শিক্ষাদানের আর একটি গুরুতর ত্রুটি হচ্ছে অতিরিক্ত শব্দদৌরাত্ম্যের বিষক্রিয়ার বিড়ম্বনা। ...শব্দ-দৌরাত্ম্যের দৃঢ়মুষ্টিকে জ্ঞানার্জন বলে ভুল করা হয়। অথচ জ্ঞান হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং উদ্দেশ্যমূলক বুদ্ধিগত ও ব্যবহারিক কাজের ফল। যে সকল পদ্ধতি বিদ্যাকে নির্দিষ্ট রূপ এবং বাস্তবতা দান করে এবং জীবন ও বিদ্যার মধ্যে, বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজের মধ্যে সকল বাধা অপসারণ করে, সেই সকল পদ্ধতিই অবলম্বন কোরতে হবে।"

বুদ্ধি ও ব্যবহারিক কাজের ভূমিকা ও সমাজের পূর্ণ সংযোগ

(৪) **স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির বিকাশ ঃ** "জ্ঞানের দিকে শিক্ষাদান-পদ্ধতিসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির বিকাশ। এইটিই প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিকে বৈশিষ্ট্য দান করে। বর্তমান "বহুমুখী সম্ভাবনাময়" পৃথিবীতে এর গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে, কারণ এখানে আজ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই বিদ্বেষ ও আবেগমুক্ত হয়ে নানা প্রশ্ন ও সমস্যার বিচার করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা শিখতে হবে।"

স্বচ্ছ চিন্তাশক্তির আবশ্যকতা

(৫) **শিক্ষার্থীর আগ্রহ-ক্ষেত্রের ব্যাপকতা বৃদ্ধি ঃ** "সর্বশেষে, শিক্ষণ-পদ্ধতি-সমূহ শিক্ষার্থীদের আগ্রহক্ষেত্রের ব্যাপকতা বৃদ্ধি কোরবে। সংস্কৃতিবান মানুষের থাকে বহুমুখী আগ্রহ। যদি স্বাস্থ্যকর আগ্রহসমূহের বিকাশসাধন করা যায়, তবে তারা ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ কোরবে।"

ব্যাপক বহুমুখী আগ্রহ

এ কথা আমাদের স্মরণ রাখা দরকার যে, সর্বোত্তম পদ্ধতিসমূহ শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও চেষ্টা জাগ্রত করে। এই আগ্রহ ও চেষ্টা থেকে শিক্ষার্থীদের স্বয়ংক্রিয়া ও উদ্যোগের বিকাশ হয়। এই স্বয়ংক্রিয়া ও উদ্যোগ আবার তাদের স্বাধীন চিন্তা এবং বিচারবোধকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টি করে এবং তাদের সমাজীকরণের পথ প্রস্তুত করে।

শিক্ষার্থীদের স্বয়ংক্রিয়া ও উদ্যোগ

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি-নির্বাচনের মূলসূত্রগুলি

সঠিক পদ্ধতি-নির্বাচনের লক্ষ্য ও লক্ষ্যগুলি আলোচনার পর সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের সঠিক পদ্ধতি-নির্বাচনের মূলসূত্রগুলির কথা এসে পড়ে। নিম্নলিখিত নীতিগুলির ভিত্তিতে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান পদ্ধতি-নির্বাচিত হওয়া দরকার :—

(১) **শিশুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষাগ্রহণ হবে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় সমাজবিদ্যা শিক্ষার ও মূল সূত্র।** কথার ফুলঝুরিতে জীবনের বেগ নেই, জীবনের গতি নির্ধারিত হয় অভিজ্ঞতার সংঘাত ও প্রেরণা দ্বারা। শিশুর উপযুক্ত সামাজিক ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য **সার্থক ও উদ্দেশ্যমূলক কাজের মধ্য দিয়ে** শিশুকে সমাজবিদ্যার শিক্ষিতব্য বিষয়ের সাথে পরিচিত করাতে হবে। অভিজ্ঞতামাত্রই শিশুর নিজস্ব সম্পদ, তাই সার্থক অভিজ্ঞতার সোপান বেয়েই সমাজবিদ্যার জ্ঞানলাভ করা যেন তার পক্ষে সম্ভব হয়। আমরা যেন তাকে "Second hand" জ্ঞান অর্থাৎ আমাদের অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার দেবার চেষ্টা না করি।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিক্ষা

(২) **সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন হ'চ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর যৌথ দায়িত্ব।** তাছাড়া সমাজবিদ্যা চলিষ্ণু জীবনের শাস্ত্র বলে তার পাঠ্যসূচী কোন সময়েই সম্পূর্ণ সুনির্দিষ্ট হ'তে পারে না। পাঠ্যসূচী সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্যও কোরেছি। তাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সর্বদা সমবেত চেষ্টা হবে **সমাজবিদ্যার পাঠ্যবিষয়কে আবিষ্কার** কোরে নেবার। অন্যকথায় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশকে জানবার ও বুঝবার আগ্রহ বুকে বেঁধে, চোখে সন্ধানী আবিষ্কারের দৃষ্টি নিয়ে সমাজবিদ্যার শিক্ষক-শিক্ষার্থী তাদের জীবন-পরিস্থিতি এবং সেই সেই ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতা, শক্তি ও দুর্বলতা উপলব্ধি কোরবে। তাই হবে তাদের পাঠ্য বিষয় এবং পঠন-পাঠনের মাধ্যমও হবে কাজ, যার দ্বারা লাভ হবে অভিজ্ঞতা, ধারণা, অভ্যাস ও দক্ষতা। বই আর রুটিন—এই দুয়ের থেকে প্রয়োজনীয় সাহায্য নিতে হবে ঠিকই, কিন্তু এই দুইকে যথেষ্ট সমীহ কোরে চলতে হবে একথা ভুললেও চলবে না। নতুবা শেষপর্যন্ত সবই "Second hand" জ্ঞানের কোঠায় গিয়ে ঠেকবে।

যৌথ দায়িত্ব

পাঠক্রম আবিষ্কার

(৩) সমাজবিদ্যার পাঠ্যসূচী যেমন নির্ণীত হবে শিশুর অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতানুযায়ী, তেমনি **তার শিক্ষাদান-পদ্ধতিও ঠিক কোরতে হবে শিশুর আগ্রহ, বুদ্ধি, বয়স এবং শ্রেণী বিচার কোরে**—তাদের সাথে সংগতি রেখে। পাত্রে যতটুকু জল ধরে যেমন তাই রাখা চলে, তেমনি সেই পাত্রে জল ধরবার এবং রক্ষণাবেক্ষণ করবার পদ্ধতিও পাত্রের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে—এটা যেমন একটা স্বতঃসিদ্ধান্ত, তেমনি-শিশুর আগ্রহ, বুদ্ধি, বয়স এবং শ্রেণী বিচার কোরে কোনও বিষয়ের শিক্ষাদান-পদ্ধতি স্থির কোরতে হবে, সেটাও মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান, অত্যাবশ্যক এবং

শিশুর শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতা বিচার

অপরিহার্য সিদ্ধান্ত। সমাজবিদ্যা যেহেতু জীবনসমস্যার সক্রিয় আলোচনা, সেইজন্য প্রাপ্তবয়স্কের আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাকে বিচার কোরবার ঝোঁকে সব সময়েই শিক্ষকের মধ্যে বর্তমান থেকে যেতে পারে। কিন্তু শিক্ষককে এই লোভ দমন কোরতে হবে এবং **শিক্ষার্থীদের অপরিণত আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে পাথেয় কোরেই তাদের আবিষ্কারের যাত্রা আরম্ভ কোরতে হবে।**

(৪) **সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে যেন পাণ্ডিত্যের ঝাঁজ না লাগে, শিক্ষার্থীদের সাথে ঘরোয়া পরিবেশে খোলা মনে যেন আলোচনা আরম্ভ হয়।** আবিষ্কার ও অভিজ্ঞতা সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের মূলকথা হওয়ায় ছাত্রদের অনুসন্ধিৎসা ও তার ফলশ্রুতিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। ভুল পথে চলবে বলে তাদের কৌতুহলকে যেন অযথা বাধা দেওয়া না হয় এবং তাদের প্রদত্ত উত্তর যদি ভুল হয়, তবু যেন সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করা হয়। তাতে তাদের মন আর কাজ করতে চাইবে না, সেই দিলখোলা মেজাজটা নষ্ট হবে যাবে এবং তাদের চিন্তা ও মনন ব্যাহত হবে। শিক্ষকমহাশয় তাদের সাথে আলোচনা আরম্ভ কোরে তাদের ভুলটা বুঝতে এবং শোধরাতে স্বকৌশলে সাহায্য কোরবেন—তিনি দেখবেন ভুল বুঝতে পারা এবং সংশোধন করা যেন ছাত্রদের দ্বারাই হয়। জ্ঞান যেন তিনি দান না করেন, জ্ঞান যেন অর্জিত হয়।

শিক্ষকের পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন নয়—শিশুর প্রচেষ্টায় উৎসাহদান

(৫) পরিবেশ শিক্ষার ওপরে অনস্বীকার্য প্রভাব বিস্তার করে, তাই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের সময় **শিক্ষা-পরিবেশ এমনভাবে গঠন কোরতে হবে যেন তা বাস্তব জীবনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ যোগসম্পন্ন হয় এবং বিশেষ শিক্ষাপ্রদ হয়।** শিক্ষাদানের সময় শিক্ষা-পরিবেশের কথা কোনক্রমেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। যখন কোন Project বা কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা হবে, তা অবশ্যই তার স্বাভাবিক পরিবেশে যাতে চলতে পারে তা দেখতে হবে। আলোচনা ইত্যাদিও বাস্তব এবং শিক্ষাপ্রদ, উন্নত পরিবেশের মধ্যে পরিচালনা কোরতে হবে।

শিক্ষা-পরিবেশ গঠন

সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন থেকে আমরা শিক্ষার্থীদের একদিকে জ্ঞান ও ধারণা এবং অন্যদিকে আচরণ, অভ্যাস ও দক্ষতা লাভ আশা করি। বস্তুতঃ সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের এই দুটোই মূল লক্ষ্য। তাই সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের নিমিত্ত যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে, তাদের দ্বারা যেন ঐ দুটো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। এর জন্য যেসব পদ্ধতি অবলম্বনের প্রস্তাব করা হয়েছে, তাদের নাম হচ্ছে ; (১) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি, (২) বক্তৃতা পদ্ধতি, (৩) আলোচনা পদ্ধতি, (৪) কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প পদ্ধতি, (৫) সমস্যামূলক পদ্ধতি, (৬) একক নির্ধারণ পদ্ধতি, (৭) উৎস বা মূল সূত্র পদ্ধতি এবং (৮) সমষ্টিগত পাঠচর্চা পদ্ধতি (Socialised Recitation) (৯) সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ইত্যাদি।

বিভিন্ন পদ্ধতি

(১) গ্রন্থানুসারী পদ্ধতি (Text Book Method)

এই পদ্ধতির সাথে আমরা আবহমান কাল পরিচিত। এর সুফল এবং কুফল দুই-ই আছে। তবে কুফলটা আমরা আজকাল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি "মুখস্থ-বিদ্যার" দৌলতে—মূলগ্রন্থ সংক্ষিপ্ত হ'য়ে নোট-বই, নোট-বই থেকে suggestion বা বাছাই-করা প্রশ্নোত্তর সম্বলিত বই, তার থেকে আবার last minute preparation series—'শেষ মুহূর্তে দেখে নেবার', অর্থাৎ বিদ্যাকে শেষ ক'রে দেবার "অমূল্য সহায়"গুলি। অনেকে বলবেন, দোষটা পরীক্ষা-বিধির, তবে দোষটা যে অনেকখানি এই পদ্ধতির সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রেণীর জন্য নির্বাচিত একখানি পাঠ্যগ্রন্থ থেকে ক্রমাগত অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদগুলি অনুসরণ কোরে পড়িয়ে চলেন শিক্ষকমশাই, আর ছাত্রদের বিদ্যা-বুদ্ধির যাচাইও হয় ঐ গ্রন্থকে কেন্দ্র কোরেই। এহেন অবস্থায় ছাত্রদের চিন্তা-ভাবনা সবকিছু নির্ভরশীল হ'য়ে পড়ে ঐ গ্রন্থের ওপরে ; তারপরে পরীক্ষার মাধ্যমে যখন ঐ জ্ঞানেরই যাচাই করা হয় তখন যেন-তেন প্রকারেণ পাস করবার আগ্রহহেতু বিভিন্ন প্রকারের Suggestions অবলম্বন করা এবং এমন কি পরীক্ষায় অসাধু উপায়াদি গ্রহণ করা থেকেও ছাত্রদের নিবৃত্ত করা সহজে সম্ভব হয় না। গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির সুফল হোলো এই, মূল্যবান প্রসঙ্গাদি সংগতিপরম্পরায় যথাক্রমে সজ্জিত থাকে। তাদের ক্রমিক পর্যালোচনায় ছাত্রদের মনে যুক্তিসিদ্ধ উপায়ে মনন, চিন্তন ও ধারণাশক্তির বিকাশ হয়। তবে বিপদ হ'চ্ছে কোন শিক্ষা যদি মাত্র এই পদ্ধতিসর্বস্ব হয়, তবে ছাত্রেরা গ্রন্থবহির্ভূত জগতে দৃষ্টিপাত কোরতে চায় না, তাদের কৌতূহল ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি স্তিমিত ও ব্যাহত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত তাই পরীক্ষার্থীরা হয় গ্রন্থকীটে পরিণত হয়, নতুবা যেন-তেন প্রকারেণ পরীক্ষা পাস করার চেষ্টা করে। গ্রন্থ যুক্তিবিন্যাসী (log cal) এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত (p ychol gical)—উভয় পন্থাতেই রচিত হ'তে পারে। উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নিমিত্ত সাধারণতঃ প্রথম পন্থায় এবং নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের নিমিত্ত সাধারণতঃ দ্বিতীয় পন্থায় গ্রন্থ রচিত হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানসম্মত পন্থায় রচিত গ্রন্থাদির আবেদনটা বেশী। এই ধরনের গ্রন্থ আবার অনেক সময়েই শুধু গ্রন্থের মধ্যেই দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখতে দেয় না। এমন অনেক ইঙ্গিত, মন্তব্য, এবং চিত্রাদি থাকে যাতে ছাত্রদের মন বাইরের জগতের দিকে অনেকখানি আকৃষ্ট হয়। কৌতূহলবৃদ্ধির এবং স্বাধীন চিন্তাবিকাশের পক্ষে এগুলি বেশ সহায়ক হয়ে থাকে। তবে কোনও সময়েই পঠন-পাঠনের জন্য গ্রন্থ-সর্বস্ব পদ্ধতির অবলম্বন সুপারিশ করা যায় না। অন্যান্য পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতিকে গ্রহণ কোরতে হবে। **গ্রন্থ হবে দিগ্-দর্শন যন্ত্রস্বরূপ**। সে মাত্র নির্দেশ কোরবে পঠন-পাঠন প্রধানতঃ কোন্ পথ ধরে চলবে এবং কোন্ লক্ষ্যে তাকে পৌছতে হবে। তাছাড়া, গ্রন্থানুসারী

কুফল

সুফল

গ্রন্থরচনা

গ্রন্থের ভূমিকা ও ব্যবহার

পদ্ধতির কুফলকে দূর কোরতে হোলে কোনও শ্রেণীতে এই বিষয়ে বিভিন্ন লেখক-প্রণীত একাধিক গ্রন্থ পাঠ্য হিসেবে নির্বাচন করা প্রয়োজন। তাতে ছাত্ররা একই বিষয়ে বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের সাথে পরিচিত হ'তে পারবে; কোন্ বিষয়াংশে কোন লেখকের বেশী আগ্রহ, কোন্ লেখকের কম আগ্রহ, তা দেখে একই বিষয়ে বিভিন্ন প্রকারের চিন্তার সাথে তারা পরিচিত হ'তে পারবে এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমস্যাবলীকে বিভিন্নভাবে পর্যালোচনা কোরতে শিখবে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অনেক সময়েই জটিল সমস্যার মুখে এসে পড়ে। এখানে শিক্ষকের প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক সাহায্য প্রয়োজন। তিনি কোন্ বই থেকে কতটা শিখতে হবে তা বলে দেবেন। কোনো বিষয়ের একাধিক পাঠ্যগ্রন্থ কেনা আমাদের দরিদ্র ছাত্রদের পক্ষে বেশ কষ্টকর; এইজন্য নিম্নলিখিত দুটো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে:—

(১) ভিন্ন ভিন্ন ছাত্র ভিন্ন ভিন্ন লেখকের লেখা বই কিনবে এবং পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান কোরে পড়বে; তাছাড়া (২) বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সেই বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থকারের লেখা কয়েকখানি বই থাকবে এবং ছাত্রেরা গ্রন্থাগার থেকে সেই বইগুলি ধার নিয়ে পড়বে। কোন ছাত্র যেন কোনও বই নিজের কাছে বেশীদিন না রাখে, তাহলে অন্য ছাত্রেরা প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে।

তাছাড়া, ছাত্রেরা স্বয়ং পাঠ্যগ্রন্থ রচনার ভার নিতে পারে। এটা এক হিসেবে একটা Project বা কর্মকাণ্ড হয়েও দাঁড়ায়। শিক্ষকমহাশয় কোন অধ্যায়ের এক রূপ দেখা দিলেন, তারপর ছাত্রদের বিভিন্ন দলে ভাগ কোরে সেই অধ্যায়ের একটি অংশ লিখবার জন্য এক একদল ছাত্রকে ভার দিলেন; ছাত্ররা যাতে সাহায্য নিতে পারে তার জন্য শিক্ষক মহাশয় অবশ্য প্রাসঙ্গিক পত্র-পত্রিকা এবং মূল গ্রন্থের নাম এবং কি উপায়ে ছাত্রেরা তা পেতে পারে তা বলে দেবেন। গ্রন্থানুসারী পদ্ধতির সাথে এইটুকু যোগ কোরলে দেখা যাবে "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা" (Learning by doing) নীতির অনেকখানি সার্থক প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং ছাত্রেরাও আর "নীরব শ্রোতা" মাত্র হয়ে থাকছে না। যাহোক, এই পুরোনো ঐতিহ্যাশ্রয়ী (traditional) পদ্ধতিকে আমরা একেবারে বাদ দিতে পারি না। আবশ্যকমত সংস্কার এবং সংশোধন কোরে নিয়ে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

শিক্ষার্থীদের স্বয়ং গ্রন্থরচনা

সংক্ষেপে এই পদ্ধতির সুবিধা হোলো (১) **শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার শেখে এবং তার পাঠাভ্যাস গঠন হয়।** (২) **শিক্ষার্থীর স্মৃতিশক্তি বাড়ে এবং বারংবার অনুশীলনের ফলে তার অভিজ্ঞতা স্থায়ী ও মার্জিত হয়।** (৩) **শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার শেখার সাথে সাথে স্বাধীনভাবে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ লাভ করে।** (৪) **গ্রন্থোল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তরমূলক আলাপ-আলোচনায় শিক্ষার্থীর যুক্তি, অনুধাবন ও উপস্থাপনের ক্ষমতা বাড়ে।** (৫) **শিক্ষার্থীর স্বাধীন পাঠের ক্ষমতাবিকাশের**

সুবিধা

ফলে স্বাধীন চিন্তাশক্তি জন্মে এবং মনোবিজ্ঞানসম্মত পুস্তক নানা ছবি, নকশা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কৌতুহল বৃদ্ধি করে এবং বহির্জগতের প্রতিও তার আকর্ষণ বাড়ে এবং (৬) বিভিন্ন পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা পাঠের সাহায্যে সমাজবিষয়ক নানা সমস্যা ও তাদের সমাধান সম্পর্কে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলেই অবহিত হতে পারেন।

এই পদ্ধতির অসুবিধা হোলো, (১) পাঠ্য পুস্তকের অধীত বিদ্যার সকল অংশের সম্যক যাচাই, বিশেষ কোরে উচ্চশ্রেণীর ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। (২) সমাজসমস্যা উপলব্ধির চেয়ে মুখস্থ করার প্রবণতাই এখানে বেশী। (৩) তথ্যগুলি স্মরণ রাখাই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়, সেগুলি থেকে কোনো সঠিক ধারণা জন্মালো কিনা তা বুঝবার উপায় নেই। ভুল ধারণা সময়মত সংশোধন করা না হোলে সমস্ত শিক্ষাই বিফল হয়। এই পদ্ধতি খুবই উপচয়মূলক এবং শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় আচরণ ও দক্ষতা সৃষ্টি কোরতে পারে না। (৪) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী গ্রন্থকীট হয়ে পড়ে। (৫) শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং নীরব শ্রোতা হয়ে থাকে। "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা" নীতি এখানে সফল হয় না।

অসুবিধা

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি দূর কোরে কিভাবে সর্বোচ্চ ফলপ্রসূ করা যায় তা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(২) বক্তৃতা-পদ্ধতি (Lecture Method)– *ইহার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা এবং অসুবিধা*

বক্তৃতার একদিকে বক্তা, অপর দিকে শ্রোতা। বক্তা সক্রিয়, শ্রোতা নিষ্ক্রিয়। এই পদ্ধতিতে কাজের অর্থাৎ বলার ভারটা পড়ে শিক্ষকের ওপরে, ছাত্রেরা হ'য়ে যায় কর্মহীন শ্রোতা। তাই এই পদ্ধতিকে আমরা নিম্নশ্রেণীতে একেবারেই প্রয়োগ কোরতে চাই না। নীরব শ্রোতা হিসেবে তারা বেশীক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারে না, বক্তৃতার যুক্তিপরম্পরাবোধটা তাদের নেই বলে তার মর্মটাও তারা ভালভাবে বুঝে উঠতে পারে না। তাই তাদের যা কিছু বলতে হবে, তাদের মনের উপযোগী কোরে অর্থাৎ মনস্তত্ত্বসম্মত পন্থায় বলতে হবে। তাই এই পদ্ধতিটিকে তাদের উপযোগী কোরে নিয়ে আলোচনা-পদ্ধতিতে (Conversation Method) দাঁড় কোরতে হবে। শিক্ষকের বলাটা একঘেয়ে হয়ে উঠবে না, ছাত্রদের শোনাটাও একটানা ধৈর্যের পরীক্ষা হবে না, বলা কাজটাতে তারাও অংশগ্রহণ কোরবে। বিদ্যালয়ের ওপরের শ্রেণীগুলোতে এবং কলেজ-ক্লাশে বক্তৃতার একটা অপরিহার্য স্থান আছে। এই শ্রেণীর ছাত্রেরা যুক্তিসিদ্ধ পন্থায় চিন্তা কোরতে শেখে, যুক্তিসম্মত (logical) বক্তৃতা তাদের

উচ্চশ্রেণীর শিক্ষায় ইহার স্থান

কাছে অনেক পরিমাণে উপযোগী এবং উপাদেয়। তাছাড়া অল্প সময়ে তাদের অনেক কিছু জানা দরকার, তাই তাদের শিক্ষায় শিক্ষকের বক্তৃতার একটা অপরিহার্য অংশ থাকবে।

তবে নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের বেলায় যেমন, উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের ক্ষেত্রেও তেমনি সমাজবিদ্যার শিক্ষা যেন কেবল বক্তৃতামূলক না হয়। শিক্ষকের বক্তৃতা শুনলে জ্ঞান জন্মাবে এমন নিশ্চয়তা নেই। বক্তৃতার সাথে আলোচনা, নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি ও অভিনয়, ছাত্রদের দ্বারা তুল্য দৃশ্যাদির বর্ণনা এবং অনুষঙ্গী কাজ (project) প্রভৃতির ব্যবস্থা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া সমাজবিদ্যার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য আচরণ-শিক্ষা এবং অভ্যাস ও দক্ষতা-অর্জন। বক্তৃতার দ্বারা এই লক্ষ্য পূর্ণ হয় না। তাই বক্তৃতার এক-একটি কর্মকাণ্ডের (project) ব্যবস্থা থাকা দরকার। বস্তুতঃ বক্তৃতা এবং কর্মকাণ্ড (project) দুটো হবে পরস্পরের পরিপূরক পদ্ধতি। একটি কর্মকাণ্ডের ভূমিকা হিসেবে বক্তৃতার দরকার, মধ্যপথে বা শেষেও ব্যাখ্যা, মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রভৃতির জন্যও বক্তৃতার প্রয়োজন, তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয়, সংগতি এবং বৈপরীত্য নির্দেশও করে বক্তৃতা। বক্তৃতাই তো ছাত্রদের ধারণাশক্তিকে বাড়িয়ে দেয়, একটা বিষয়ের পূর্ণ চিত্রকে তাদের সামনে উপস্থিত করে এবং সে বিষয়ে তাদের আগ্রহকে বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ছাত্র এবং শিক্ষকের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন এই বক্তৃতার মাধ্যমেই উপস্থিত করা হয়। তাই এই প্রাচীন পদ্ধতিটিকে আধুনিক সমাজবিদ্যা-শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে আমরা একেবারে বিদায় দিতে পারিনে। তবে সেকেলে গ্রন্থসর্বস্ব বক্তৃতার ফাঁদে পড়তে না হয়, তার জন্য এর ব্যবহারের ক্ষেত্রকে সংকুচিত কোরতে হবে এবং সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্তই এই পদ্ধতিকে ব্যবহার কোরতে হবে।

নিম্নশ্রেণীতে ইহার ব্যবহারে সতর্কতা

প্রয়োজনের ক্ষেত্র

কতকগুলি প্রয়োজনীয় নীতি

বক্তৃতা-পদ্ধতি কখন অবলম্বন করা যেতে পারে সে বিষয়ে কতকগুলি নীতি নির্দেশ করা হয়েছে ঃ—

(১) কোনো বড় পাঠ-এককের একটা সামগ্রিক ধারণা উপস্থিত করার জন্য ;

(২) শিক্ষার্থীদের পঠনের সহায়তা ও পরিপূরণের জন্য ;

(৩) কোনো বিশেষ পাঠ্যের পশ্চাৎপট উপস্থিত করার জন্য যাতে শিক্ষার্থী অধিকতর জ্ঞানের সাহায্যে তার কাজে প্রবৃত্ত হতে পারে ;

(৪) শিক্ষার্থীর সময় বাঁচাবার জন্য, যাতে অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ পড়াশোনার নিমিত্ত সে সময় দিতে পারে ;

(৫) শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য ;

(৬) শিক্ষার্থীকে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে করণীয় কোনো কাজ দেবার ভূমিকা হিসেবে;

(৭) বিভিন্ন সংজ্ঞাগুলি ব্যাখ্যার জন্য এবং ভুল ধারণা সংশোধনের জন্য; এবং

(৮) সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং মন্তব্যাদি উপস্থিত করার জন্য।

বক্তৃতা-পদ্ধতি অবলম্বনের ক্ষেত্রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সতর্কতা

(১) শিক্ষকের যদি কোনো সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকে, তবে তার জন্য তিনি যত্নের সাথে পরিকল্পনা প্রস্তুত কোরবেন। তাঁর সঠিকভাবে জানা থাকা দরকার তিনি কী বলতে চান এবং কেমন কোরে তা বলবেন।

(২) বক্তৃতা যদি দীর্ঘ হয়, তবে তার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলিকে সুস্পষ্ট করার জন্য যথাযথ উপবিভাগে ভাগ কোরে নিতে হবে।

(৩) খুঁটিনাটি তথ্যের ভারে মূল বক্তব্য যেন চাপা না পড়ে।

(৪) কোনো ভঙ্গী দিয়ে নয়, সহজ আলোচনার সুরে বক্তব্য উপস্থিত কোরতে হবে।

(৫) বক্তৃতার রূপরেখাটি সুস্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে। বক্তৃতা দেবার সময় ঘন ঘন নোটের দিকে তাকান উচিত নয়।

(৬) শিক্ষার্থীদের মুখের দিকে তাকিয়ে বক্তৃতা দিতে হবে। তারা আনন্দ পাচ্ছে কিনা, তাদের আগ্রহ আছে কিনা, তারা অনুধাবন কোরছে কিনা, সেটা তাদের মুখ দেখে এবং মাঝে মাঝে এক-আধটা প্রশ্ন কোরে বা তাদের মতামত চেয়ে বুঝে নিতে হবে।

(৭) ধীরে ধীরে বক্তৃতা দিতে হবে। কারণ যত তাড়াতাড়ি বলা যায়, তত তাড়াতাড়ি বোঝা যায় না। শিক্ষার্থীদের কথাগুলি বুঝে নেবার জন্য মাঝে মাঝে সময় দিতে হবে, দরকারমত থামতে হবে।

(৮) দীর্ঘ বক্তৃতাকে মাঝে মাঝে আলোচনায় রূপান্তরিত কোরে নেওয়া প্রয়োজন।

(৯) মূল আলোচনা থেকে এক-আধটু বিচ্যুতি ঘটলে আপত্তি করার নেই, যদি তা শিক্ষার্থীদের কাজে লাগে বা আনন্দ দেয় এবং বক্তৃতার মূল ধারা ব্যাহত না হয়।

(১০) বক্তৃতার সাথে সংযত রসবোধের পরিচয় থাকলে ভালো হয়। তাতে বক্তৃতা মনোগ্রাহী হয়।

(১১) বক্তব্য বিষয় স্মরণ রাখার প্রয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা নোট নেবে।

(৩) *আলোচনা-পদ্ধতি* (Discussion Method)

আলোচনা-পদ্ধতি বিদ্যালয়ের সর্বশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পক্ষেই একটি বিশেষ উপযোগী পদ্ধতি। আলোচনা দুটো প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে—(১) শিক্ষার্থীরাও এতে অংশগ্রহণ করে এবং (২) আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনের, তাদের গ্রহণ ও ধারণক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় বলে শিক্ষক তাঁর বক্তব্য নমনীয় ও মনস্তত্ত্বসম্মত কোরে নিতে পারেন। তবে ছাত্ররা যাহাতে আলোচনায় খোলা মনে অংশগ্রহণ কোরতে পারে সর্বপ্রথম সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা লাজুক ছেলেটাও তার লজ্জা কাটিয়ে যেন আলোচনায় যোগ্য অংশগ্রহণ কোরতে পারে। আলোচনায় থাকবে একটা ঘরোয়া পরিবেশ এবং বিদ্যার্থীরা যেন একে নিজেদের কাজ বলেই গ্রহণ করে—শিক্ষকের নির্দেশ যেন তাদের কাছে প্রত্যক্ষ না হয়ে ওঠে। শিক্ষক আলোচনার গতিনির্দেশ করবেন ঠিকই, কিন্তু তা সুকৌশলে এবং শিক্ষার্থীদের আদৌ বুঝতে না দিয়ে। আলোচনা চলবে সহজ ধারায় স্বাভাবিক পরিণতির পথে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হবেন সেখানে সমান অংশীদার। প্রত্যেকেই তার ভাবনা, চিন্তা এবং যুক্তিকে উপস্থিত কোরবে আলোচনার উত্তর-প্রত্যুত্তরে সহজভাবে যোগদান কোরতে। এই আলোচনার একটা নিজস্ব গতি আছে এবং শিক্ষক কোনও পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে তাতে বাধাসৃষ্টি কোরবেন না। তিনি খোলামনে সকল প্রকার উত্তর-প্রত্যুত্তর গ্রহণ কোরবেন এবং আলোচ্য বিষয়টিকে বিভিন্ন ব্যক্তির দৃষ্টি দিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে অবলোকন করার সুযোগ দেবেন। এজন্যে আগে থাকতেই অনেক সম্ভাব্য পরিস্থিতি অনুমান কোরে নিয়ে শিক্ষককে প্রস্তুত থাকতে হবে। আলোচনা যতক্ষণ প্রাসঙ্গিক হবে এবং বিষয়সীমা ছাড়িয়ে না যাবে, ততক্ষণ তিনি তাতে আদৌ আপত্তি কোরবেন না এবং ধৈর্য ধরে আলোচনার স্বাভাবিক পরিণতির জন্যে অপেক্ষা কোরবেন। কোন নির্দিষ্ট পাঠকে ছাত্রদের সহযোগিতায় বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে এই স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষকের কর্তব্য এবং এই প্রয়োজনীয় গতি-নির্দেশক কাজটুকুই তাকে সুকৌশলে কোরতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভুল বলা এবং ঠিক বলা—দুটোকেই সমানভাবে গ্রহণ কোরতে হবে এবং তাদের ভুলকে তাদের দ্বারাই সংশোধন করিয়ে নির্দিষ্ট আলোচনায় রাজপথে ফিরে আসতে হবে। শিক্ষার্থী যেন কোনক্রমেই নিরুৎসাহ না হয় এবং আলোচনায় তার অংশগ্রহণে যেন কোন বাধা না জন্মে।

আলোচনার উপযোগিতা ও পরিচালনা

আলোচনাকে উপযোগী কোরে তুলতে হলে তাতে প্রাণসঞ্চার করা প্রয়োজন। আলোচনা হবে যেন সমস্যার চিত্রণ। তাই শিক্ষার উপকরণগুলিকেও এ বিষয়ে সহায়ক হতে হবে। মানচিত্র, ছবি, নকশা, চার্ট প্রভৃতি এ বিষয়ে মূল্যবান সহায়ক। ছোট ছোট তথ্যচিত্র, রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি নানাবিধ দেখা ও শোনার সহায়ক যন্ত্রগুলিকেও উপযুক্তভাবে কাজে

সহায়ক উপকরণের আবশ্যকতা

প্রয়োগ কোরতে হবে। মোট কথা, আলোচনার পরিবেশটি যেন অর্থবহ, সজীব এবং প্রাণবন্ত হয়। সজীব শিক্ষক আলোচনার পরিবেশটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ কোরবেন যেন প্রাণহীন উপকরণগুলি প্রাণবন্ত শিক্ষার অঙ্গ হয়ে ওঠে। আলোচনার অর্থই প্রাণবন্ত আলোচনা এবং প্রাণবন্ত শিক্ষাদানই আলোচনা-পদ্ধতির উদ্দেশ্য।

সংজ্ঞা

আলোচনা-পদ্ধতির সংজ্ঞা হোলো ভিন্নদলের বা ব্যক্তির নানাবিধ সমস্যা নিয়ে পারস্পরিক কথাবার্তা, চিন্তা ও মত-বিনিময়। এই আলোচনা মুখোমুখি বসে হতে পারে বা পত্রপত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন বা অন্যপ্রকার জনসংযোগ উপায়ের মাধ্যমেও হতে পারে। বিদ্যালয়ে এর পরিচিত রূপগুলি হচ্ছে দলগত আলোচনা, পাঠচক্র, বিতর্ক-সভা, রচনা-পাঠ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, অনুকল্প-অনুষ্ঠান (mock performances) ইত্যাদি।

এই পদ্ধতির সুবিধা

(১) এর দ্বারা শিক্ষার্থী সক্রিয় হয়, তার স্বাধীন চিন্তা ও সৃজনী-শক্তির বিকাশ হয়। তার স্বাধীন মতামত গঠনের ও প্রকাশের সুযোগ এখানে বেশী।

(২) এখানে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক চেতনাবোধ বিকাশের সুযোগ খুবই বেশী, তার সামগ্রিক জ্ঞান, চিন্তাধারা, যুক্তিশীলতা, বিচারবুদ্ধি ও অনুভূতি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

(৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী কাজ করার সাথে সাথে স্বনির্ভর প্রচেষ্টার ও স্বাধীনতার আনন্দ লাভ করে। এর মধ্যে স্বতঃশিক্ষার (auto-education) নীতি নিহিত আছে। কাজ এখানে আনন্দদায়ক খেলার রূপ নেয় এবং খেলার ছলে শিক্ষালাভ হয়।

(৪) এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যবধান দূর হয় এবং অপরিণত শিক্ষার্থী ও প্রাপ্তবয়স্ক পরিণত-বুদ্ধি শিক্ষক সহজ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়।

(৫) পরস্পর সহযোগিতা ও গঠনমূলক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নানা সমস্যার সমাধান আবিষ্কার এই পদ্ধতিতে সম্ভব হয়।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

(১) সময়াভাব ও ব্যক্তিগত অসামর্থ্যের ফলে সকল শিক্ষার্থী সমালোচনায় যোগদান কোরতে পারে না। যারা আলোচনায় যোগদান করে, সময়াভাবে তারাও তাদের পূর্ণ বক্তব্য সঠিকভাবে উপস্থিত কোরতে পারে না। তাছাড়া অনেক সময় গণ্ডগোল ও শ্রেণীশৃঙ্খলা নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে।

(২) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পূর্বপ্রস্তুতি না থাকলে আলোচনার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

(৩) মতান্তরের ফলে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে এবং নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অনেক অযৌক্তিক বক্তব্য উপস্থিত করা হতে পারে।

(৪) সাধারণতঃ দেখা যায়, আলোচনায় উচ্চবুদ্ধি ছাত্রেরাই বেশী যোগ দেয়, অন্যেরা নীরব ও আগ্রহহীন শ্রোতা হয়ে পড়ে। এতে একাংশ শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়।

আলোচনা-পদ্ধতিকে সফল করার বিষয়ে কয়েকটি সতর্কতা

(১) আলোচ্য সমস্যা হবে বাস্তব, তা হবে বাস্তব পরিবেশ থেকে উদ্ভূত।

(২) সমস্যাটি আলোচনার জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি চাই।

(৩) আলোচনা সকলের মন দিয়ে শোনা চাই।

(৪) খোলা মন নিয়ে আলোচনায় যোগ দিতে হবে। অন্যের কথা শুনবার মত ধৈর্য ও ঔদার্য থাকা চাই।

(৫) বক্তার কণ্ঠস্বর যেন সকলের শ্রুতিগোচর হয়।

(৬) বক্তব্য সংক্ষিপ্ত ও যুক্তিপূর্ণ হতে হবে।

(৭) আলোচনায় সকলের অংশগ্রহণ চাই। ব্যক্তিবিশেষের প্রভাব এড়াতে হবে।

(৮) অন্যের মত খণ্ডন বড় কথা নয়, ইতিবাচক বক্তব্য যেন প্রাধান্য পায়।

(৯) আলোচনাকে সাহায্য করার জন্য ম্যাপ, চার্ট, চিত্র, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার চাই।

(১০) সমগ্র শ্রেণীর এক সাথে আলোচনা ছাড়াও ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনার ব্যবস্থা থাকা চাই। এতে সকলের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হয়। এবং আলোচনার অনুকূল একটি ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

তিনটি আলোচিত পদ্ধতির একাঙ্গীভূত প্রয়োগ

উপরে আমরা তিনটি পদ্ধতির আলোচনা কোরেছি—(১) গ্রন্থানুযায়ী পদ্ধতি, (২) বক্তৃতা-পদ্ধতি এবং (৩) আলোচনা-পদ্ধতি। তিনেরই মূল লক্ষ্য জ্ঞানার্জন। এই বিষয়ে এই তিনটি পদ্ধতিকেই একাঙ্গীভূত কোরে যে বিশেষ সুফল পাওয়া যায় তা নিম্নলিখিত উদাহরণ থেকেই বোঝা যাবে। ধরা যাক, আমাদের নির্দিষ্ট পাঠ পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প। আমরা এই নির্দিষ্ট পাঠে ওপরের তিনটি পদ্ধতিকে একত্রে নিম্নোক্তভাবে প্রয়োগ কোরতে পারি :—

একটি উদাহরণ

(১) আমাদের পাটচাষ বিষয়ে ছাত্রদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে একটি আলোচনা। সেই মাসে হুগলীনদীর দুই তীরে অবস্থিত পাটকলগুলির কথা আলোচনা। উভয়ের মধ্যে সংযোগ বিষয়ে আলোচনা।

(২) পাট আমাদের বিদেশী মুদ্রা-অর্জনের সহায়ক। বিদেশী মুদ্রা কি, এর তাৎপর্য কি, পাটশিল্প এই মুদ্রা-অর্জনে আমাদের কিভাবে সাহায্য করে, অন্যকথায় পাটের রপ্তানি-বাণিজ্য, পাটশিল্পের প্রতি দেশের ভরসা ও সরকারী দৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা,—লক্ষ্য দেশ-বিদেশের বৃহত্তর জীবনের সাথে আমাদের পাট-শিল্পের যোগ-নির্দেশ।

(৩) শিক্ষক কর্তৃক এ বিষয়ে নানা উপযোগী গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকাদি নির্দেশ। শিক্ষার্থীরা এককভাবে বা এক-একটি দলভুক্ত হয়ে এগুলি পড়বে। এক-একটি ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে পড়া এবং আলোচনাটাই প্রকৃষ্ট পন্থা। তাছাড়া, শিক্ষক এক-একটি ছোট দলকে এক-একটি বিষয়াংশ নির্দিষ্ট কোরে দিতে পারেন। তারা সেই অংশটি শুধু ভালভাবে পড়বে এবং আলোচনা কোরবে তাই নয়,—সেই বিষয়ে নিজেরাও ধারাবাহিকভাবে নিবন্ধ লিখবে। শিক্ষক বিভিন্ন দলের প্রচেষ্টাকে একত্রিত কোরে সংকলনের নির্দেশ দেবেন। দেখা যাবে, ছাত্রদের সমবেত প্রচেষ্টায় "পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্প" সম্পর্কে একখানি উপযোগী গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এটা শিক্ষার্থীদের নিজেদের সৃষ্টি—কাজের মাধ্যমে শিক্ষা (learn ng by doing)। এভাবে জ্ঞানার্জন পূর্ণতর হয় একথা বলাই বাহুল্য।

সুফল

তাই আমাদের বিশ্বাস, অভিজ্ঞ শিক্ষক মাত্রেই এই পদ্ধতির সমন্বিত প্রয়োগে শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনে অধিকতর মূল্যবান ও উপযোগী সাহায্যদান কোরবেন।

(৪) কর্মকাণ্ড বা প্রকল্প-পদ্ধতি (Project Method)

প্রকল্প-পদ্ধতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ও সংজ্ঞা

জ্ঞানার্জন তো বটেই, আচরণ অভ্যাস ও কর্মদক্ষতা অর্জনের পক্ষে বিশেষ সহায়ক এই Project-পদ্ধতি। Project মনস্তত্ত্বের দুটি প্রধান শর্ত পরিপূরণ করে। এর দ্বারা ছাত্রদের আগ্রহ ও উৎসাহ জাগ্রত ও বর্ধিত হয় এবং হাতে-কলমে কাজটি সম্পাদন করার ফলে "কাজের মাধ্যমে শিক্ষা" লাভ হয়। তবে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বিস্তারিত কোনও আলোচনার আগে Project বা কর্মকাণ্ড কাকে বলে, অর্থাৎ এই পদ্ধতির প্রবক্তারা Project বলতে কী বোঝাতে চেয়েছেন তা জানা দরকার। Dr. Kilpatrick-এর ভাষায় Project হচ্ছে একটা "whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment." আর Dr. Stevenson-এর ভাষায় এটি হচ্ছে "a problematic act carried to completion in its natural setting."

মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি

Project-এর সংজ্ঞা

গ্রন্থানুযায়ী পদ্ধতি এবং বক্তৃতা-পদ্ধতির সাথে এর প্রধান পার্থক্য হচ্ছে: In the topical organisation principles are learned first, while in the project, the problem are proposed which demand in the solution the development of the principles by the learner as needed. বিষয়ানুযায়ী পদ্ধতিতে সূত্রগুলি আলোচিত হয় আগে, তদনুযায়ী কাজের কথা আসে পরে। কিন্তু Project পদ্ধতিতে ব্যাপারটা বরং বিপরীত বলা চলে। এখানে কর্মকাণ্ডটাই আগে সমাদর পায় এবং সেই কর্মকাণ্ড সম্পাদনের পথে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলো আয়ত্ত করে।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রকল্প-পদ্ধতির চারিটি স্তর

প্রজেক্ট বা প্রকল্প-পদ্ধতির চারটি প্রধান স্তর আছে। এই স্তরগুলো এবং তাদের গুণের কথা সংক্ষেপে উল্লেখ কোরলেই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানে প্রজেক্ট-পদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাবে। স্তরগুলো হোলো—

(১) **উদ্দেশ্য নির্ণয়** (Purposing), (২) **পরিকল্পনা** (Planning), (৩) **সম্পাদন** (Execution) এবং (৪) **বিচারবিশ্লেষণ** (Judging)।

(১) প্রজেক্ট হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প বা কর্মকাণ্ড। তা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসাধক। শিক্ষার্থীদের মনে একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প হাতে নেবার আগ্রহ যখন আসে, তখন তারা সেই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যত্নবান হয়। এই নির্দিষ্ট প্রকল্পের ধারণা বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীর শিক্ষা-পরিবেশ থেকেই উদ্ভূত হয়। শিক্ষকের সহায়তায় শিক্ষার্থীদের সেই ধারণা স্পষ্টতর হয় এবং তারা প্রকল্পটি সম্পাদনের উদ্দেশ্য গ্রহণ করে। তখন এই প্রকল্প সম্পর্কে মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই ছাত্রদের মনে আগ্রহ এবং উদ্দেশ্য প্রাধান্য বিস্তার করে। আগ্রহ ও উদ্দেশ্য-সচেতনতা শিক্ষার প্রথম সোপান। প্রকল্প-পদ্ধতি সেই প্রথম শর্ত দুটি অবশ্য পূরণ করে।

আগ্রহ ও উদ্দেশ্য-সচেতনতা

(২) কোন প্রকল্পকে কার্যকরী কোরতে হলে তার সুসমাধানের নিমিত্ত চাই পরিকল্পনা। শিক্ষার্থীরাই এই পরিকল্পনা কোরবে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার কাজের নির্দিষ্ট অংশ বুঝিয়ে দেবে। এজন্য সমগ্র প্রকল্পটির ধারণা যেমন অপরিহার্য তেমনি তার প্রত্যেক অংশের বিবরণও জানা চাই। শিক্ষার্থীরা তাদের পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়েই এ বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান ও তথ্য লাভ কোরবে। সমগ্র ও অংশের অঙ্গসম্বন্ধ এবং পারস্পরিক ভূমিকা এর ফলে তাদের কাছে বড়ই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শিক্ষক এসব কাজে তাদের সর্বদাই সাহায্য করবেন ঠিক, তবে সে সাহায্য অযাচিত হবে না এবং তিনি নিজেকে সযত্নে অন্তরালে রাখবেন। শিক্ষার্থীদের দ্বারা

পরিকল্পনার ভূমিকা

গৃহীত প্রকল্পের পরিকল্পনাও মুখ্যতঃ তারাই কোরবে; —এটা এই পদ্ধতির একটা অবশ্য পালনীয় শর্ত। **এই স্তরের প্রধান লাভগুলো এই ঃ—**

(**ক**) বাস্তব জীবনের বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার মানসিক শক্তি, উদ্যোগ ও প্রস্তুতি লাভ। আজ যারা বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে আবদ্ধ তারাই একদিন বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন কর্মীশ্রেণীতে আবদ্ধ হবে, জীবনের বহুবিচিত্র অবস্থা তাদের বহুবিচিত্র চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে, সেদিন প্রয়োজন হবে তাদের নির্ভীকতা, মানসিক ধৈর্য, পরিস্থিতির গুণাগুণ বিচার কোরে পরিকল্পনা গ্রহণ করবার মানসিক শক্তি এবং সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার উদ্যোগ ও প্রস্তুতি। শুধু পুঁথি পড়ে বা বক্তৃতা শুনে এই শিক্ষা—ট্রেনিং লাভ হয় না। পুঁথি বা বক্তৃতা দেয় ধারণা, কিন্তু সেই ধারণাকে কার্যকরী কোরতে হ'লে চাই ভিন্নতর মানসিক ও শারীরিক শিক্ষা। প্রকল্প-পদ্ধতির পরিকল্পনা-স্তরটি শিক্ষার্থীর মন ও শরীরকে সেই বিশেষ শিক্ষাগ্রহণে প্রস্তুত করে।

মানসিক শক্তি, উদ্যোগ ও প্রস্তুতি

(**খ**) প্রকল্প-পদ্ধতিতে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য চাই শিক্ষার্থীদের সম্মিলিত, আলোচনা, যার অপর নাম সহযোগিতা ও সংগঠনমূলক আলোচনা। বাঙালীদের সম্পর্কে একটা প্রচলিত অপবাদ এই যে, তারা বড়ই তার্কিক এবং চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলে। তারা তর্কের ঝোঁকে মতভেদকে বড় কোরে তোলে এবং তাদের সভাগুলি নিরর্থক, বিশৃঙ্খল চিন্তায় পর্যবসিত হয়। তাদের দলভাঙা এবং দলগড়াও শুধু নিরর্থক নয়, সমূহ ক্ষতিকর দলাদলিতে পরিণত হয়। এই অবস্থাকে এড়াবার জন্য বিশেষ মানসিক শিক্ষার প্রয়োজন। সে শিক্ষা পুঁথিসর্বস্ব নয়, কর্মকেন্দ্রিক। কোন আলোচনার কেন্দ্রস্থলে যদি একটা কর্মসম্পাদনের উদ্দেশ্যকে গ্রহণ করা যায় এবং আলোচনার সকল বক্তব্যকেই যদি সেই কেন্দ্রাভিমুখী করা যায়, তবে নিছক অপচয়শীল ও ক্ষতিকর বিতণ্ডা এড়ানো যায়, অল্প সময়েই কর্মসম্পাদনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়, কর্মীদের মনন ও চিন্তনকে গঠনমূলক কোরে তোলা যায় এবং তাদের মধ্যে অনাবশ্যক বিতণ্ডার ফলে উদ্ভূত বিরূপতা ও বিদ্বেষকে এড়িয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব অর্জন করা যায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশী তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। জাতির শিক্ষালয়গুলি হোলো "জাতীয় বীক্ষণাগার"—সেখানেই সহযোগিতা ও সংগঠনমূলক আলোচনার শিক্ষা-লাভ হবে, সকলেই তা বিশেষভাবে কামনা করেন। প্রকল্প-পদ্ধতি বাস্তবজীবনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় এই অবশ্য শিক্ষণীয় শর্তটি পূরণ করে।

সহযোগিতা ও সংগঠনমূলক আলোচনা

(**গ**) সমগ্র প্রকল্প এবং তার অংশগুলির অঙ্গ-সম্বন্ধ এবং পারস্পরিক ভূমিকার কথা আগেই উল্লেখ কোরেছি। পরিকল্পনা-পর্যায়ে এগুলির আলোচনা কোরে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর ওপরে প্রতিটি অংশ সম্পাদনের ভারার্পণ প্রয়োজন। সেটা অবশ্য

শিক্ষার্থীরাই কোরবে। শিক্ষক প্রয়োজন হলে সহায়তা কোরবেন। কোন প্রকল্প হাতে না নিলে সমগ্র প্রকল্পটি এবং তার অংশগুলি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। কোন কাজ সম্পাদনে যখন ব্রতী হওয়া যায় তখনই আমাদের দেহ ও মন সমস্ত শক্তি নিয়ে সেদিকে আকৃষ্ট হয়। তখন কর্মসম্পাদনের পথে সমস্যাগুলি এবং স্তরগুলির আলোচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন কর্মের ধারণা যখন মাত্র পুঁথির সীমানায় আবদ্ধ থাকে, তখন তার বিভিন্ন স্তর ও অংশগুলো স্পষ্ট চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হয় না, হয়ত অনেক স্তর বা অংশের কথা আদৌ আমাদের মনেই আসে না। কিন্তু কাজটি কোরতে বসে দেখা যায় অনেক কিছুই প্রয়োজন এবং তার জন্য বিশেষভাবে মনন ও চিন্তনের প্রয়োজন। তখনই সমগ্র প্রকল্পটি শুধু পূর্ণতর চেহারায় নয়, নতুন চেহারা নিয়ে আবির্ভূত হতে থাকে এবং অংশগুলোও সুস্পষ্ট রেখায় আমাদের মানসপটে আবির্ভূত হতে থাকে। আসল কথা, তখনই আমাদের মাত্রাজ্ঞানের প্রকৃত উন্মেষ হতে থাকে। আমরা প্রধানতঃ ভাবপ্রবণ এবং দার্শনিক চিন্তা-সম্পন্ন জাতি বলে এই শিক্ষাটা আমাদের বিশেষভাবে প্রয়োজন। আমাদের আশা, চিন্তা এবং কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। তার কারণ, আমাদের চিন্তা কর্মকেন্দ্রিক নয়, তাই সে এক আঁচড়েই অনেক সমস্যার সহজ সমাধান কোরতে চায়—বাস্তব সমাজ-সংসারের রূঢ় আঘাতে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য; এটাও আমাদের জাতীয় দুর্বলতা। একে পরিহার কোরতে হ'লে প্রকল্পকেন্দ্রিক মনন ও চিন্তনের বিশেষ প্রয়োজন।

সমগ্র প্রকল্প তার অংশগুলির অঙ্গসম্বন্ধ সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা

(৩) প্রকল্প-পদ্ধতির তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে কর্মসম্পাদন—অর্থাৎ প্রকল্পটিকে এইবার হাতেকলমে সম্পন্ন করা। এই স্তরে উপকরণাদি সংগ্রহ থেকে তাদের সুষ্ঠু ব্যবহার, প্রতিটি অংশের সুসম্পাদন এবং শেষপর্যন্ত সমস্ত প্রকল্পটির উত্তম রূপায়ণ প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষার্থী পরিকল্পানুযায়ী তার নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন কোরবে, প্রয়োজন হোলে সহকর্মীদের সহযোগিতা দান কোরবে এবং ন্যূনতম ক্ষেত্রে শিক্ষকের পরামর্শ প্রার্থনা করবে। প্রকল্পটির উত্তম রূপায়ণ মূল লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন থেকেই প্রত্যেক শিক্ষার্থী কাজ কোরবে। বলা বাহুল্য, নিজেদের কাজ বলেই শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে সচেতন থাকে এবং যথাসম্ভব সুন্দরভাবে নিজ নিজ কর্তব্যসম্পাদনের চেষ্টা করে। কারও পক্ষে অসুবিধা ঘটলে তাকে সাহায্য করে। ফলে সমগ্র প্রকল্পটির উত্তম রূপদানের মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি থাকে। শিক্ষককে তার বাস্তব প্রয়োগগুলি অবলোকন কোরে যেতে হয় এবং প্রার্থিত ক্ষেত্রে সাহায্য কোরতে হয়। প্রকল্পটির সুসম্পাদন একটি আবশ্যিক শর্ত। কারণ তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে আসবে তৃপ্তি। আর এই তৃপ্তি তাদের শিক্ষাকে ফলপ্রসূ ও দৃঢ় কোরবে এবং কর্মের প্রতি তাদের মনকে আরও বেশী কোরে আকর্ষণ কোরবে। আমরা কর্মবিমুখ জাতি বলে আমাদের

কর্মসম্পাদন—শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

একটা অপবাদ আছে। সেই অপবাদ দূর কোরতে হলে শিক্ষার্থীদিগকে কর্মে আগ্রহী, কর্মপ্রয়াসী এবং উত্তম কর্মী কোরে গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি কর্মের সুসম্পাদনই সেই উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে সিদ্ধ করে। তাই প্রকল্পটির সৎ-সিদ্ধি প্রকল্প-পদ্ধতির একটি আবশ্যিক শর্ত। কর্মে আগ্রহ, কর্মপ্রয়াস, কর্মদক্ষতা প্রভৃতি যেমন এই পর্যায়ে লাভ হয়, তেমনি পারস্পরিক সহযোগিতায় হাতে-কলমে কাজ করার শিক্ষা হয়। তাছাড়া হাতে-কলমে কাজ করায় নানা আনুষঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় বলে জ্ঞানেরও পূর্ণতর পরিণতি লাভ হয়। জ্ঞান হচ্ছে একটা Indivisible whole, অবিভাজ্য সামগ্রিক প্রণালী—একটা সুসম্পাদিত কর্ম সেই প্রণালীকেই সমৃদ্ধতর করে। অনেকে প্রজেক্ট-পদ্ধতি সম্পর্কে ঠিক এখানেই আপত্তি কোরেছেন। তারা বলেন, বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষাদানের ফলে কোন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞানলাভ করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু শিক্ষা যে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির জন্ম দেয়—যা ছাড়া কোন শিক্ষাই শিক্ষাপদবাচ্য নয়—তা প্রকল্প-পদ্ধতির মাধ্যমেই সহজে লাভ সম্ভব। তাছাড়া অপরিণত শিক্ষার্থীদের মনের অগ্রগতি এবং বয়স্কদের মনের অগ্রগতি ঠিক একই পথে, একই ধারায় হয় না, তা মনে রাখতে হবে। তাছাড়া বই থেকে যা পড়া হয় বা বক্তৃতা থেকে শোনা যা হয় তার সবটাই, এমন কি সকল প্রধান সূত্র এবং তথ্যও কেউ মনে কোরে রাখে না; তাহলে ধারাবাহিকতা তো অনেকখানিই সেখানে নষ্ট হ'য়ে যায়। তবে জ্ঞান জন্মায় কি কোরে? লব্ধবিদ্যা বা অভিজ্ঞতাকে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মনে নতুন কোরে গ'ড়ে নেয়। প্রজেক্ট (Project)-পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থী তাই করে। অতএব, **প্রজেক্ট-পদ্ধতি সম্পর্কে এইটেই বড় কথা যে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জ্ঞান, কর্মদক্ষতা, কর্মক্ষমতা, রুচিবোধ এবং সৌন্দর্যপ্রয়াসের বিচার কোরছে—এই দৃশ্যটাই তো শিক্ষাজগতের প্রকৃত কাম্য।** শিশুর প্রাণ-মন-দেহ এখানে একসূত্রে গ্রথিত; এই তো শিশুকেন্দ্রিক (paido-centric) শিক্ষা। শুধু "বিষয়"-বুদ্ধি (curriculum) নিয়ে থাকলে "বিষয়" বোধ যে হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, আমাদের দেশের পরীক্ষাগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের ফেল করাতেই তার প্রমাণ মেলে—অথচ তা দিয়ে শিক্ষার্থীর "সজীব মনুষ্যত্বের" শিক্ষাটাও নষ্ট হয়। প্রকল্প-পদ্ধতি এই "সজীব মনুষ্যত্বের" শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী-দের জন্যে সে বহন কোরে আনে "শব্দরাজ্যের দৌরাত্ম্য" (tyranny of words) থেকে মুক্তি।

প্রকল্পের সৎ-সিদ্ধিই আবশ্যক

জ্ঞানের পূর্ণতর পরিণতি, অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি লাভ

স্বকর্মের মূল্যায়ন

সজীব মনুষ্যত্বের শিক্ষা

(৪) প্রকল্পটি সম্পাদনের পর আসে সম্পাদিত কর্মের গুণ ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, সাফল্য এবং অসাফল্যের বিচার-বিশ্লেষণ।

এই স্তরটিতে বস্তুতঃ সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন এবং তার থেকে উদ্ভূত সূত্রসমূহ নির্ধারণ করা হয়। এই স্তরে প্রকল্পের আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াটি

বিচার করা হয়, প্রস্তাবিত কর্ম যথাযথ সম্পন্ন হয়েছে কিনা, কর্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কিনা, কর্মপথের বাধাগুলি আরও সহজে এড়িয়ে আরও সার্থক ও সুন্দরভাবে কর্মটি সাধন করা যেত কিনা, এই পর্যায়ে তার বিচার করা হয়। আমাদের বাস্তব জীবনেও আমরা এক-একটি কর্মসম্পাদনের পর আমাদের ভুলভ্রান্তি, ক্ষমতা, সাফল্য-অসাফল্যের এইভাবে হিসাব-নিকাশ কোরে থাকি এবং অভিজ্ঞতাগুলিকে সংক্ষিপ্ত সূত্রাকারে রূপদান কোরে থাকি। একটি প্রকল্প শেষ করার পর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরও এইভাবে অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন ও সূত্রনির্ধারণ দরকার।

একথা ঠিক, যে কোন কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতির মতই প্রকল্প-পদ্ধতি কর্মের সীমার দ্বারা খর্বতাপ্রাপ্ত, কিন্তু কর্মই আবার মনন ও চিন্তার ভিত্তি গঠন করে, উপকরণ সংগ্রহ করে এবং নতুন প্রেরণা জাগিয়ে সেই খর্বতা দূর কোরতে প্রয়াসী হয়। এ প্রসঙ্গে পূর্বেই কিছু আলোচনা কোরেছি। মোট কথা, সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কাছে প্রকল্প-পদ্ধতিটি সবিশেষ মূল্যবান এবং সর্বপ্রথম বিবেচনা-যোগ্য। তবে শিক্ষকমহাশয়কে একথা ভালো ভাবেই বুঝে নিতে হবে যে, কোন কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ প্রণীত নির্দিষ্ট বিষয়সূচী (Syllabus) মেনে প্রকল্প-পদ্ধতিতে কাজ করা সহজসাধ্য নয়। বস্তুতঃ, এইজন্যেই কোন কেন্দ্রীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ সমাজবিদ্যার বিষয়সূচীকে অবশ্য সম্পূর্ণ অনুসরণযোগ্য বলে মনে করেন নি। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্বাধীন ইচ্ছার ও স্বাধীনভাবে কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ অনুমোদন করা হয়েছে। এটা এখন অনেক পরিমাণে এবং প্রধানতঃ সমাজবিদ্যার শিক্ষকের ওপরে নির্ভরশীল যে, শিক্ষার্থীরা এই সমাজবিদ্যা বিষয়টিকে তাদের প্রকৃত শিক্ষা-অর্জনের জন্য কিভাবে এবং কতখানি কাজে লাগাবে। বিভিন্ন শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রচারিত বিষয়সূচীগুলি এবং তাদের আনুষঙ্গিক বক্তব্যগুলি পড়লেই বোঝা যায় Project-পদ্ধতি যে বহুল পরিমাণে এক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে সেটা স্বতঃসিদ্ধ হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়েছে। অতএব এই পদ্ধতিটির প্রতি সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।

প্রকল্প-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রয়োগের আশা

প্রকল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষকের কর্তব্য

(১) শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনকালে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়, তার মধ্য থেকেই প্রকল্প বাছাই করা হবে।

(২) এই বাছাই-কাজটা কোরবে শিক্ষার্থীরা, শিক্ষক সহযোগিতা কোরবেন।

(৩) শিক্ষার্থীরাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিকল্পনা উপস্থিত কোরবে ; শিক্ষক হবেন তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। তিনি জোর কোরে কোন প্রকল্প চাপিয়ে দেবেন না।

(৪) প্রকল্পগুলির শিক্ষাগত মূল্য ও গুরুত্ব থাকা চাই। ছোটখাটো সাধারণ কাজ বা উপকরণ প্রস্তুত করাকে প্রকল্প বলা চলে না। প্রতিটি প্রকল্পের একটা উপযুক্ত ব্যাপ্তি থাকা চাই, যার মধ্যে প্রকল্পের মূল চারটি স্তরের প্রয়োগ সম্ভবপর।

(৫) শিক্ষার্থীদের কর্মে আগ্রহ জন্মানো চাই। পারস্পরিক সহযোগিতায় তারাই প্রকল্পের যৌথ-পরিকল্পনা ও যৌথ-সম্পাদনার দায়িত্ব নেবে।

(৬) শিক্ষকমহাশয় দেখবেন প্রকল্পের ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব যেন শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য ও দক্ষতার সীমা পেরিয়ে না যায়।

(৭) ঐতিহাসিক বিষয়াদির পঠন-পাঠনে প্রকল্প-পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য। এ বিষয়ে শিক্ষকমহাশয়ের সতর্কতা দরকার।

কয়েকটি প্রকল্পের উদাহরণ

(১) স্থানীয় সমাজজীবনের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দিক সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ।

(২) বিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন পরিচালনা।

(৩) বিদ্যালয়-পত্রিকা প্রকাশন।

(৪) জনস্বাস্থ্যসংক্রান্ত কোনো বিষয়।

(৫) শিক্ষার্থীদের নিজেদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত তথ্যসংগ্রহ।

(৬) বিদ্যালয়ের কোনো গুরুত্বপূর্ণ উৎসব—যথা, পুরস্কার-বিতরণ বা সরস্বতী-পূজা সংগঠন ও পরিচালনা।

(৭) বিজ্ঞান বা হস্তশিল্প বা অনুরূপ কোনো প্রদর্শনী সংগঠন ইত্যাদি।

পৌরসমস্যা বিষয়ে প্রকল্প বিশেষ উপযোগী। এ বিষয়ে একটি প্রকল্পের উদ্ভব ও রূপায়ণ বর্ণনা করা গেল। আমেরিকার একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান প্রায়ই চাঁদা চেয়ে পাঠাত। শিক্ষার্থীদের প্রায়ই চাঁদা দিতে হোতো। এ বিষয়ে নবম মানের পৌরবিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা একটা প্রকল্প গ্রহণ কোরলো। তারা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান চাঁদা চাইত তাদের এবং অন্যান্য অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে তথ্য-সংগ্রহের পরিকল্পনা নিল এবং কতকগুলো কমিটি তৈরি কোরে কাজের ভার দিল। ফলে, স্থানীয় সমাজের প্রত্যেকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য উদ্ঘাটিত হোলো। তাদের কত আয় এবং স্থানীয় সমাজে ও তার বাইরে তারা কত খরচ করে তাও জানা গেল।

পৌরসমস্যা প্রকল্পের উদাহরণ

স্থানীয় সমাজের সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে এভাবে শিক্ষার্থীদের একটা পূর্ণ চিত্র জানতে পারল। তারপর সেই বছরে তারা নিজেদের মধ্য থেকে যথেষ্ট অর্থসংগ্রহ করার ও তার বিতরণের সিদ্ধান্ত নিল। শিক্ষার্থীরাই পরিকল্পনা কোরে অর্থসংগ্রহ কোরলো। তারপর প্রত্যেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তারা তাদের সংগৃহীত অর্থের বিভিন্ন অংশ বরাদ্দ কোরলো। এর শিক্ষাগত মূল্য স্বতঃই স্পষ্ট। শিক্ষার্থীরা স্থানীয় সমাজ ও তার কল্যাণমূলক দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় কোরলো। তার থেকেও বড় কথা, তারা দায়িত্ব-গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা অর্জন কোরলো। তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় নাগরিক স্বার্থে কাজ করা শিখলো।

এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা ঃ

(১) এটি একটি মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর রুচি, আগ্রহ, কর্মক্ষমতা. দক্ষতা ও সৃজনী-প্রতিভার বিকাশ হয়। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভূমিকার ওপর জোর দেওয়ায় শিক্ষা শিক্ষার্থীর প্রয়োজনানুগ উপযোগী এবং প্রকৃত শিক্ষালাভে সহায়ক হয়। বস্তুতঃ শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা-তত্ত্বের উপর এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত এবং হাতে-কলমে নানা কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করে।

(২) পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজের মাধ্যমে শিক্ষালাভের ফলে শিক্ষার্থীর সামাজিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। তারপর ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তা উভয়েরই সার্থক বিকাশ ঘটে। সহযোগিতা, দলপ্রীতি, আত্মত্যাগ প্রভৃতি গুণের বিকাশ ঘটে। এমন কি, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা-মূলক কাজের মাধ্যমে এগুলি ঘটে বলে তা সাধারণ স্বার্থমূলক এবং কল্যাণকর হয়। সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও সুনাগরিকতাবোধ উদ্বুদ্ধ হয়।

(৩) কাজের মাধ্যমে শিক্ষার ফলে পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যায়। ফলে অভিজ্ঞতার পুনর্গঠন হয় এবং বাস্তব জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ হয়। শ্রেণীকক্ষে রুটিনমাফিক জীবনের একঘেয়েমি নষ্ট হয়।

(৪) শিক্ষার্থীদের কাজের স্বাধীনতা তাদের হৃদয়-মনকে উদ্দীপিত করে এবং ঈপ্সিত দায়িত্ববোধের জন্ম দেয়।

(৫) অনুবন্ধ-প্রণালীর বাস্তব প্রয়োগে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অখণ্ড জ্ঞানলাভের পথ প্রস্তুত হয়।

(৬) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক সহজ, ও স্বাভাবিক ও ঘনিষ্ঠতর হয়।

(৭) শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজের মূল্যায়ন কোরতে শেখে।

অসুবিধা ঃ

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় এবং কোন বিষয়ের শিক্ষা সম্পন্ন করা যায় না। ইতিহাস শিক্ষাদান, শিল্পসৃষ্টি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের সাথে সার্থক পরিচিতির পক্ষে এই পদ্ধতি উপযুক্ত নয়। বিমূর্ত চিন্তা ও ধ্যান-ধারণাও এই পদ্ধতিতে উপস্থিত করা যায় না।

(২) অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে যোগসূত্র স্থাপন কোরতে গিয়ে জটিলতা ও শিক্ষা-বিভ্রাটের সৃষ্টি হয়।

(৩) এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানে অর্থ ও সময়, দুইয়েরই বিশেষ প্রয়োজন।

(৪) জ্ঞানার্জনের চেয়ে কাজ, লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্য বড় হয়ে উঠতে পারে।

(৫) শুধু বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন তাই নয়, শিক্ষকের যথেষ্ট স্বাধীনতাও চাই। বহিঃ-পরীক্ষা ও রুটিন-অধ্যুষিত শিক্ষা-ব্যবস্থার সাথে এর সামঞ্জস্য-বিধান আদৌ সহজসাধ্য নয়।

(৬) শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ, কর্মনিষ্ঠা এবং নেতৃত্বদান-ক্ষমতার উপর এই পদ্ধতি নির্ভরশীল। কোনো কারণে এগুলির ব্যত্যয় ঘটলে প্রকল্পের অসাফল্য স্বাভাবিক।

(৭) আমাদের অনুন্নত দেশের অস্থির সামাজিক পরিবেশে এবং সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতায় এই পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণ ব্যাহত হবার সম্ভাবনা।

(৫) *সমস্যামূলক পদ্ধতি* (Problem Method)

এই পদ্ধতির চারিটি স্তর ও নীতিসমূহ—

প্রজেক্ট-পদ্ধতির মত Problem বা সমস্যাপদ্ধতিরও চারটি স্তর। প্রথমে সমস্যাটাকে পরিষ্কার ভাষায় উপস্থিত কোরতে হবে। দ্বিতীয়তঃ সমস্যার সমাধানচিন্তায় সাহায্য করে এমন সব তথ্য, সংবাদ ও উপকরণ সংগ্রহ কোরতে হবে; অর্থাৎ আবশ্যক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে; এবং চতুর্থতঃ সর্বশেষে উপনীত সিদ্ধান্তগুলির পুনর্বিবেচনা এবং পুনঃপরীক্ষা কোরতে হবে।

সমস্যা-পদ্ধতির চারটি স্তরের অনুষঙ্গী **সমস্যা সমাধানের চারটি নীতির** উল্লেখ করা হয়েছে :—

শিক্ষার্থীর নিজের সমস্যা

(১) সমস্যা হবে শিক্ষার্থীর নিজের স্থির করা, শিক্ষকের চাপিয়ে দেওয়া নয়। সমস্যাটির চ্যালেঞ্জ শিক্ষার্থী নিজে অনুভব কোরবে। শিক্ষকের কর্তব্য হবে পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা, যাতে শিক্ষার্থী উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদ সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তা সমাধানের নিমিত্ত তাদের আগ্রহ উদ্দীপিত হয়।

সমস্যার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাদান

(২) সমস্যাটি সুনির্দিষ্ট ভাষায় উপস্থিত কোরতে হবে, শিক্ষার্থীরা যাতে মূল সমস্যা থেকে দূরে চলে না যায়, শিক্ষককে সর্বদাই সেটি দেখতে হবে। কারণ, সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাযুক্ত সমস্যাটি সর্বদা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত থাকলে তারা প্রাসঙ্গিক সূত্রগুলি নিয়ে সঠিক পথে কাজে অগ্রসর হতে পারবে।

উপযোগী উপকরণ

(৩) সমস্যা সমাধানের উপযোগী উপকরণসমূহ বাছাই করা। এগুলি হবে বাস্তব এবং স্পষ্ট। এ বিষয়ে শ্রেণীভেদে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কম-বেশি সাহায্য কোরবেন।

(৪) সমাধানগুলি সুনির্দিষ্ট এবং সুস্পষ্ট হওয়া চাই। সিদ্ধান্ত সম্পর্কে

শিক্ষার্থীদের মনে কোনোরকম অস্পষ্ট ধারণা থাকলে চলবে না। যদি সমাধান সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতান্তর উপস্থিত হয়, তবে তার কারণসহ বিভিন্ন সমাধানের উল্লেখ কোরতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যুক্তিসিদ্ধ মতের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন কোরতে হবে।

সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সমাধান

উপরের চারটে স্তর থেকেই বোঝা যায় সমস্যাপদ্ধতি হচ্ছে চিন্তামূলক, এখানে হাতে-কলমে কাজের কোন প্রশ্ন আসছে না। এটা শিক্ষার্থীদের মনের কাছে একটা সমস্যারূপী চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করে এবং তারা নানা তথ্যাদির সাহায্যে মনন, চিন্তা ও বিচারশক্তির গুণে তার সমাধানে উপনীত হয়। প্রজেক্টের প্রধান অঙ্গ হাতে-কলমে কার্য-সম্পাদন, আর সমস্যা-পদ্ধতিতে উপস্থিত হয় সমস্যার মাত্র মানসিক সমাধান। প্রকল্প-পদ্ধতি "demands a practical accomplishment in real situation" আর সমস্যা-পদ্ধতি "emphasises the mental conclusion that is drawn." প্রজেক্টের মতো প্রব্লেমেরও উৎপত্তি হবে ছাত্রদের মনেই, আর এটা তাদের মনে আসবে তাদের বাস্তব জীবন-পরিবেশ ও শিক্ষা-পরিবেশ থেকে— শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মধ্য থেকেই। প্রজেক্ট-পদ্ধতির মত শিক্ষক এখানেও নিজেকে রাখবেন প্রচ্ছন্ন, অযাচিত সাহায্য কোরবেন না এবং প্রার্থিত ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সাহায্য কোরবেন। প্রব্লেম বা সমস্যাটিকে দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ভাষায় এবং সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থিত কোরতে হবে। তাছাড়া সমস্যা-সমাধানের পথটিই অনির্দিষ্ট না হয়ে তথ্য, সংবাদ ও উপকরণভিত্তিক হয় তা লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা হবে যুক্তিনিষ্ঠ এবং তাদের উপস্থাপিত সমাধানগুলিও হবে তথ্য ও যুক্তির উপর নির্ভরশীল। সমস্যার মতো তার সমাধানটিকেও উপস্থিত কোরতে হবে সুস্পষ্ট ভাষায় এবং সুনির্দিষ্টভাবে।

পদ্ধতিটি মানসিক প্রক্রিয়ামূলক

এই পদ্ধতির সুবিধা

সমাজবিদ্যায় সমস্যার অভাব নেই। বস্তুতঃ কোন শিক্ষক ইচ্ছে কোরলে এক-একটি সমস্যাকে কেন্দ্র কোরে সমাজবিদ্যার পাঠকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তবে প্রজেক্ট-পদ্ধতির অপরিহার্যতাও বিচার কোরে প্রজেক্ট ও প্রব্লেম পদ্ধতি দুটোকে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে প্রয়োগ করাই উচিত। সমস্যা-পদ্ধতির প্রয়োগে ছাত্রদের মনে সমস্যাটিকে পরিপূর্ণ উপলব্ধির আগ্রহ জন্মে, তারপর সমস্যা-সমাধানের জন্য একটা মানসিক প্রস্তুতি ও উদ্যোগ চলে, সমস্যাকে ভয় না কোরে তার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হ'তে সাহস ও প্রেরণা যোগায়, শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিকে যেন সমস্যার রণক্ষেত্রে আহ্বান করে, তাদেরকে তথ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ হ'তে শিক্ষা দেয়, গ্রন্থ ও বাস্তব জীবন থেকে কিভাবে উপযোগী সাহায্য নেওয়া যায় তার শিক্ষা দেয়, অপ্রয়োজনীয় উপকরণকে বাদ দেবার বিশ্লেষণ-বুদ্ধি জাগ্রত করে, তাদের মশক পূর্ব-ধারণা ও সংস্কারের বন্ধন

সুফল

থেকে মুক্তি দেয় এবং সমস্যাটির সকল দিক পর্যালোচনা করার ক্ষমতা জন্মায়, ফলে শিক্ষার্থীরা লাভ করে একটা উদার দৃষ্টিভঙ্গী, তাদের মন হয় সমস্যাপরায়ণ। তাছাড়া তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা জন্মে, সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা পর্যালোচনা কোরতে শেখে, উৎপত্তি হয় বিচারবোধের। সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ধারণা ও সংস্কার-মুক্ত, উদার দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মনের যুক্তিনিষ্ঠ বিচারবুদ্ধিই জন্ম দেয় সামাজিক ন্যায় বিচারবোধের—যার অপর নাম "সমাজবিবেক"—যার কথা আমরা প্রসঙ্গান্তরে পূর্বেই আলোচনা কোরেছি। শিক্ষার্থীদের মনে এই "সমাজবিবেক" সৃষ্টি সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের একটি মূল লক্ষ্য। সে কথাও আগেই বলা হয়েছে।

সমস্যা-পদ্ধতিটি ভালোভাবে বুঝবার জন্যে আমরা এখানে কয়েকটি সমস্যার উদাহরণ দিচ্ছি :—

(১) সাম্প্রতিক লোকগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র দশ বছরের মধ্যে আমাদের লোকসংখ্যা প্রায় $\frac{১}{৫}$ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য যোগাবার দুরূহ কর্তব্যটি আমরা কিভাবে সম্পন্ন কোরতে পারি ?

(২) কৃষকেরা বলেন, জলই তাদের প্রধান সমস্যা। অপ্রচুর জল এবং অতিরিক্ত জল দুইই তাদের সমস্যা। এই সমস্যাগুলি দূরীকরণের জন্য আমরা কি কি কাজ কোরতে পারি ?

(৩) আমাদের শহরের ও গ্রামের জীবনযাত্রা শিক্ষা ও ধ্যান-ধারণায় বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। আধুনিক যানবাহন মারফত উন্নত যোগাযোগ-ব্যবস্থা এই পার্থক্য কিভাবে হ্রাস কোরতে পারে।

(৪) সম্রাট অশোক হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ কোরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কোরেছিলেন। সম্রাট আকবরও ইসলামধর্মের পরিবর্তে দীন-ইলাহী ধর্মমত উদ্ভাবন কোরেছিলেন। তাদের প্রত্যেকের ধর্মবুদ্ধি তাদের প্রত্যেকের সাম্রাজ্যবিস্তার ও তার স্থায়িত্ব-সাধনে কতখানি সহায়ক হয়েছিল ? অন্যদিকে তাদের প্রত্যেকের সাম্রাজ্যবুদ্ধি তাদের প্রত্যেকের ধর্মবুদ্ধিকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল ?

(৫) পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরেজ এবং ফরাসীরা, সকলেই আমাদের দেশে বাণিজ্য কোরতে এসেছিল। তাদের মধ্যে কেবল ইংরেজরাই এদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারে সফল হোলো কেন ?

(৬) এ বছরের সরকারী তথ্য থেকে জানা গেছে যে কলকাতায় রেজেস্ট্রীভুক্ত মোটরগাড়ীগুলির ১০·৭%, লরীগুলোর ১০·৩% এবং ট্যাক্সিগুলোর ৬৬% দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছে। অথচ রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসগুলি ২৫৪% দুর্ঘটনা কোরেছে, রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ৫৫০ খানি বাসের প্রত্যেকখানি গড়ে ২৫ বার দুর্ঘটনা কোরেছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাসগুলির এত দুর্ঘটনা করার কারণগুলি কি কি ?

যত্নশীল শিক্ষক সমাজবিদ্যার প্রতি অংশেই এভাবে ছাত্রদের বহু সমস্যার আভাস দিতে পারেন। বস্তুতঃ সমাজবিদ্যা বাস্তব জীবনধর্মী ব'লে এখানে সমস্যা খুঁজতে হয় না, প্রতিপদেই অসংখ্য সমস্যা ছড়িয়ে রয়েছে। শুধু চাই সেগুলোকে উপযুক্তভাবে বাছাই কোরে নিয়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ। আর এই সমস্যা-পদ্ধতির বিশেষ সহায়ক হচ্ছে প্রকল্প-পদ্ধতি, এ কথাটা ভুললে চলবে না।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

(১) সমস্যা-পদ্ধতি বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর উপযোগী নয়।

(২) সময়ের এবং দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে এই পদ্ধতি সুপ্রযুক্ত হতে পারে না।

(৩) উপাদান-বাহুল্যে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্ত হয় এবং পরস্পর-বিচ্ছিন্ন সমস্যাগুলির ফলে কোনো বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞানলাভ থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

(৪) পাঠ্য-বইকে অবহেলা করার প্রবণতা বাড়তে পারে। তাছাড়া অনেক সমস্যা ভালভাবে না বুঝে তার সমাধান কি হবে তা যান্ত্রিকভাবে আয়ত্ত কোরতে পারে। অনেকের মতে এই পদ্ধতি প্রাচীন প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতির নবসংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব কি প্রশ্নের কি উত্তর হবে, তা অনেক শিক্ষার্থী মুখস্থবিদ্যার সাহায্যেই উপস্থিত কোরতে পারে।

(৫) সমস্ত শিক্ষাধারা যদি সমস্যাজড়িত হয়, তবে শিক্ষার্থীরা বড়ই বিব্রত হয় এবং শিক্ষা আনন্দদায়ক না হয়ে ক্লান্তিকর হয়ে পড়ে।

তবে সমস্যা-পদ্ধতির অসুবিধাগুলি বহুলাংশে এর অপপ্রয়োগের ফলেই উদ্ভূত হয়।

(৬) একক-নির্ধারণ পদ্ধতি (Unit Method)—ইহার বৈশিষ্ট্য

সমাজবিদ্যায় একক-নির্ধারণ-পদ্ধতি বা Unit Method-এর যথেষ্ট স্থান রয়েছে। বস্তুতঃ একক-পদ্ধতি কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি নয়। একটি বিষয়-একক নির্ধারণ কোরে তাকে অন্য কোন পদ্ধতি অনুযায়ী অনুসরণ করা যেতে পারে। ঐ বিষয়-এককটি অনুধাবনের জন্য শিক্ষক বক্তৃতা, আলোচনা, প্রজেক্ট, প্রব্লেম প্রভৃতি যে কোন পদ্ধতিকে সমূহ উপযোগী বিবেচনায় প্রয়োগ করতে পারেন। তাছাড়া একক (Unit) শুধু বিষয়-একক নয়, অভিজ্ঞতার এককও বটে। একক হ'চ্ছে 'an instructional device to give knowledge or experience or both'. বস্তুতঃ, আমরা যে কোন ব্যাপক বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে আলোচনা কোরতে গেলে তাকে সংগতি ও সামঞ্জস্য বিচার কোরে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিভাগে ভাগ কোরে নিই। এই বিভাগগুলি হয় যথাসম্ভব স্বাভাবিক পর্যায়গুলি মেনে। এক-একটি বড় বড় প্রসঙ্গ হয় এক-একটি একক। এই একক-নির্ধারণে অবশ্য বিষয় বা অভিজ্ঞতার বিভিন্ন দিকের (different aspects কথাও বিচার কোরতে হয়।

এককের সংজ্ঞা

বড় বড় প্রসঙ্গের ভিত্তিতে একক-নির্ধারণের প্রধান প্রয়োজন এই যে, জীবন-সমস্যার এক-একটি দিক এবং পর্যায়ের সমগ্র ধারণা ও তার গুরুত্ব যেন শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি কোরতে পারে। সেই সাথে অবশ্য এটাও লক্ষ্য রাখতে হয় এককগুলি যেন আবার খুব বড় না হয়, তাতে সেই প্রসঙ্গের একটা পূর্ণাঙ্গ ধারণা করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর সাধ্যে কুলিয়ে উঠবে না এবং তার আগ্রহও তাতে স্তিমিত হ'য়ে পড়ে।

একেকের দৈর্ঘ্য

সংক্ষেপে, একক হ'চ্ছে "The organisation of material in related groups, each large euough to be significant, but small enongh to be seen as a whole by the pupil."

এই পদ্ধতিতে পাঠদানের সময় সমগ্র বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠদানের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ কোরতে হবে। শিক্ষার্থীর সকল কর্মপ্রচেষ্টা সেই উদ্দেশ্য-অনুসারী হবে। উপযুক্ত শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহার কোরতে হবে এবং শিক্ষার্থী পাঠ কতখানি সার্থকভাবে গ্রহণ কোরতে পারল, তার মূল্যায়ন কোরতে হবে। বসিং-এর মতে, "A Unit consists of a comprehensive series of related and meaningful activities, so developed as to achieve pupil purposes, provide significant educational experiences, and result in appropriate, behavioral changes." এই উদ্ধৃতিতে এককের শিক্ষাগত মূল্যটি ভালভাবেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এককের শিক্ষাগত মূল্য

"একক হচ্ছে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, অর্থবহ কর্মধারায় একটি অখণ্ড ক্রম। এই ক্রম এমনভাবে সংগঠিত যাতে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যগুলি পরিপূরণ হয়, সে তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং তার আচরণে যথোপযুক্ত পরিবর্তন ঘটে।"

এককের পঞ্চস্তর

একক-পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনায় **ডাঃ মরিশন** পাঁচটি স্তরের কথা বলেছেন :—

(১) অনুসন্ধান (Exploration),
(২) উপস্থাপন (Presentation),
(৩) আত্তীকরণ (Assimilation),
(৪) সংগঠন (Organisation),
(৫) আবৃত্তি (Recitation).

হার্বার্টের পঞ্চস্তর পদ্ধতির সাথে এই পদ্ধতির অনেকখানি সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে।

অনুসন্ধান পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করা হয়। **উপস্থাপন স্তরে** শিক্ষক এককটি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা উপস্থিত করেন। **আয়ত্তীকরণ পর্বে** শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নিজেদের সক্রিয়তার সাহায্যে এককটি আয়ত্ত করার চেষ্টা করে। **সংগঠন স্তরে** শিক্ষার্থী এককটি সম্পর্কে ধারাবাহিক রূপরেখা রচনা

করে। **শেষ স্তরে** শিক্ষকমহাশয় দ্বিতীয় পর্যায়ে যেভাবে এককটিকে উপস্থাপন করেছিলেন শিক্ষার্থীরা ঠিক সেইভাবেই তাকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করে। সে সিলেবাসগুলি আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত কোরেছি, তার দিকে লক্ষ্য কোরলেই একক বা Unit সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হবে। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ দশম-মান বিদ্যালয়-গুলির জন্যে সমাজবিদ্যার যে পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কোরেছেন, তা একক হিসেবেই বিভক্ত। মোট পাঠ্যসূচীকে ৭টি অংশে ১১টি একক (Unit) বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭, ৮, ৯ এবং ১০নং ইউনিটগুলি খুবই বড়। বস্তুতঃ এদের প্রত্যেকটি কয়েকটি ইউনিট বা এককের সমষ্টি। অন্যান্যগুলিকে এককের উপযুক্ত উদাহরণ বলা চলে। ২নং এককটি হচ্ছে :—

Food—food taken in different parts of India—influence of environment (natural and social) on food-habits—composition of ur food and its a nutritive value. A comparative study of food in India and a few typical countries e.g., Arab Countries, Mediterranean Countries, Japan and Lapland etc.

আমাদের খাদ্য আমাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের একটি একক। কিন্তু এই এককটিকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা হয়েছে। বস্তুতঃ একটি একককে উপযুক্তভাবে ভাগ কোরতে হ'লে এবং সম্যকভাবে উপলব্ধি কোরতে হ'লে এককটিকে এইভাবে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ কোরে নিতে হয়। এখন কথা হচ্ছে, কোন বিষয়ের একক এবং তার উপবিভাগগুলি সর্বশ্রেণীর জন্যে একই প্রকার হবে না। নিম্নশ্রেণীর জন্যে এককগুলি হবে ছোট এবং তার উপবিভাগের সংখ্যাগুলিও বেশী হবে না। কারণ ছোট ছোট শিশুদের ধারণা-ক্ষমতা বেশী নয়। একক বড় হ'লে শিশুরা তার সমগ্র ধারণাটা হারিয়ে ফেলবে, ফলে তার আগ্রহ এবং কৌতূহলও স্তিমিত হয়ে পড়বে। উচ্চতর শ্রেণীতে এককগুলি বড় হতে পারে এবং তাদের উপবিভাগের সংখ্যাও বাড়তে পারে। এই একক-পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে হলেও অনিবার্যভাবেই আগে থেকে পরিকল্পনা করার প্রয়োজন থাকে এবং সেই পরিকল্পনাও অবশ্য নমনীয় হবে। অন্যান্য পদ্ধতিতে যেমন, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরাই হবে প্রধান অংশগ্রহণকারী, শিক্ষক নিজেকে পাদপ্রদীপের আলো থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব প্রচ্ছন্ন রাখবেন।

এই পদ্ধতির সুবিধা

এই পদ্ধতির সুফলগুলো হল, ছাত্রেরা যুক্তি ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে চিন্তা কোরতে শেখে। সমগ্র বস্তু বা অভিজ্ঞতাটি এবং তার অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ভূমিকা বুঝতে পারি। আগে যে "মাত্রাজ্ঞানের" কথা বলছি, এর দ্বারা সেই মাত্রাজ্ঞানের বিকাশ হয়। সংযোগ ও সমন্বয়ের ভিত্তিতে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে উপস্থিত করা হয়

বলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা সহজসাধ্য হয়, আর এককগুলি আমাদের জীবনসমস্যা ও অভিজ্ঞতাগুলির সাথে জড়িত বলে শিক্ষা হয় জীবন্ত এবং ক্রিয়াশীল, শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল বাড়ে, সৃষ্টিশীল চিন্তা ও কর্মপ্রেরণা জন্মায়, আর তার প্রকাশও হয় তাদের ভাষায় ও কর্মে—অবশ্য সমস্ত প্রক্রিয়াটিতেই শিক্ষককে যত্নশীল ও সচেতন থাকতে হবে। আর তার ফলে জীবনে অবশ্য-প্রয়োজনীয় অনেক দক্ষতা ও আচরণ শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত কোরতে পারবে। তবে আগেই বলেছি, এই পদ্ধতিকে প্রকাশ-পদ্ধতি ও সমস্যা-পদ্ধতির সাথে সমন্বয় কোরে প্রয়োগ কোরলে সুফলের আশা অনেক বেশী।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি এই যে, এই পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ সহজ নয়। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এই পদ্ধতি উপলব্ধি করা এবং তদনুযায়ী শিক্ষাদান করা সহজ-সাধ্য নয়। Geslatt মনোবিজ্ঞানের সমগ্রতা মতবাদ এই পদ্ধতির মূল ভিত্তি। তাই অনুরূপ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব থাকলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য সার্থক হয় না। তাই এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। অবশ্য প্রত্যেক নূতন পদ্ধতির ক্ষেত্রেই এই সকল অসুবিধা দেখা দিয়ে থাকে।

(৭) উৎস বা মূলসূত্র পদ্ধতি (Source Method)

উৎস বা মূলসূত্র-পদ্ধতি প্রধানতঃ উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সমাজবিদ্যার ঐতিহাসিক আলোচনার ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতি সমধিক উপযুক্ত। তবে এই প্রণালীকে কুশলী শিক্ষক যে নিম্নতর শ্রেণীতেও সার্থক-ভাবে প্রয়োগ কোরতে পারেন, তা পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রকাশিত "শিক্ষণ-ব্যবহারিকা" থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশটি পাঠ কোরলেই বোঝা যাবে :—

উপযোগিতার ক্ষেত্র

"শিশু পরিবেশকে পর্যবেক্ষণ করে কয়েকটা সমস্যা (problem) বুদ্ধির সঙ্গে পরীক্ষা করতে শেখে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োজন শুধু বিজ্ঞান আবিষ্কারের জন্য গবেষণাগারে নয়—ইতিহাস শেখার জন্যও কাজে লাগতে পারে। সামাজিক শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় শিশুকে পরিমাণে অনেকটা জ্ঞান দেওয়া বরং সে কিভাবে বুদ্ধি ও বিচার-শক্তি ব্যবহার করছে, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে কতটা জ্ঞানলাভ করছে তার উপর জোর পড়ছে। মূলসূত্র থেকে তথ্য আহরণ করার একটা বড় উপকার এই যে, শিশু নিজে থেকে পড়ে বিচার করে, পরীক্ষা করে সত্য আবিষ্কার করছে। ভবিষ্যতে সে শোনা কথায় সহজে বিশ্বাস করবে না। সাধারণতন্ত্র সমাজের একটা

শিশুর বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-শক্তির ওপরে জোর

বড় ভিত্তি হবে যখন প্রত্যেক নাগরিক পরীক্ষামূলক শিক্ষার ফলে ও বিচারশক্তির প্রয়োগে জীবনের ও রাষ্ট্রের সব প্রশ্নের উত্তর ও সমস্যার সমাধান করবে। অপরের দ্বারা চালিত না হয়ে নিজের শক্তিতে সত্য গ্রহণ করবে ও সেই অনুসারে কাজ করবে।

"এই প্রণালীতে ইতিহাসশিক্ষা সহজভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আরম্ভ করা যেতে পারে। স্থানীয় ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখতে যাওয়া, তারপর সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে তথ্য সংগ্রহ করে ইতিহাস পুনর্গঠন করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—মুর্শিদাবাদে শিশুদের পুরাতন রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখানো ও তৎসম্পর্কে আলোচনাও ইতিহাস শেখা। এইখানে তারা যে বিশাল ধ্বংসাবশেষ দেখল সেটার মূল্য এই যে, শিক্ষকের মৌখিক গল্প বলবার মধ্যে যে ফাঁক ছিল তা পূর্ণ করে শিশু নিজের মনে বিগত দিনের ইতিহাসের কিছুটা তৈরী কোরে নিতে পারে। অতীত বিষয় সেই অল্প সময়ের মধ্যে তাদের কাছে মূর্ত হয়ে দেখা দেবে। শিক্ষক ইচ্ছা কোরলে এখানে সাহিত্যের সমন্বয় (correlation) কোরতে পারেন ও এমন সাহিত্য পড়তে অনুপ্রাণিত করতে পারেন যা সেই যুগের সাক্ষ্য দেয়। সেই সময়ের লোকদের অবস্থা, বস্ত্র ও খাদ্যের সুলভতা, যানবাহন, অলংকার ও পরিচ্ছদ, অস্ত্র ও যুদ্ধসজ্জা জীবিকানির্বাহের উপায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য ও আলোচনা, উপযুক্ত পরিচালনার মধ্যে দিয়ে শেখানো যেতে পারে। শিক্ষক কোন সময়েই নিজের মতামত জোর কোরে খাটাবেন না। এ ধরনের কাজ কোরতে গিয়ে যদি তিনি শিশুদের অমনোযোগ লক্ষ্য করেন তবে তিনি তৎপর হোয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা পরিত্যাগ কোরবেন, কারণ শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করাই শিক্ষার একটা মূল উদ্দেশ্য।

উৎস দেখে ইতিহাস পুনর্গঠন

"কোলকাতার Victoria Memorial স্মৃতিসৌধ বা আগ্রার তাজমহল পরিদর্শনে আনন্দ আছে। প্রথমোক্ত স্থানে সযত্নে রক্ষিত রানীর ব্যবহার্য জিনিসগুলি ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে, সেই সময়ের বিখ্যাত লোকদের ছবি দেখে, নানারকম চিঠি ও কাগজপত্র দেখে, medals পরীক্ষা করে, শিশুদের মনে ইতিহাসের ব্যক্তিগত দিক ও মানবিকতার দিক (human element) স্পষ্ট কোরে চোখে পড়ে। Fort William কেল্লা পরিদর্শনে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। শিশুরা তাদের অপরিণত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সমস্ত দেখে, তাই এই সময়ে শিক্ষক কখনও কৃত্রিম উপায়ে তাদের উত্তেজিত কোরে তাদের কৌতূহল উদ্রেক কোরবেন না। হাতের কাজ, সেলাই, আঁকা ও model তৈরীর ভেতর অভিজ্ঞতা নিজের ধন হয়ে যায়—"learning by doing". সেকালের শিল্পকলার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ কোরবেন শিক্ষক যখন সেকালের আসবাব, অস্ত্র, অলংকার ও পরিচ্ছদের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা শেখাবেন।"

ইতিহাসের মানবিক দিক সম্পর্কে অবহিতকরণ

উৎস-পদ্ধতির উপযোগিতা এবং তা কিভাবে ব্যবহার কোরতে হয় তা উপরের অংশে বলা হয়েছে। তবে বড়দের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের পর্যালোচনা ও ব্যবহার: এই

প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং তা উপযোগীও বটে। মূলগ্রন্থ ব্যবহার কোরে ছাত্রেরা শুধুমাত্র নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি কোরতে পারে, আবার হয়তো সেগুলি পর্যালোচনা কোরে নিজেরা যাচাই কোরে নিজেদের ভাষায় নতুন কোরে বর্ণনা কোরতে পারে। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পক্ষে মূলগ্রন্থ ব্যবহার কোরে তার থেকে নিজেদের নতুন বিবরণ উপস্থাপিত করা অনেকখানি শক্ত কাজ, তাই অনেকে তাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রন্থের ব্যবহারটাই মাত্র শিক্ষা দিতে বলেন। তবে অগ্রসর ছাত্রেরা হয়ত নতুন বিবরণ লিপিবদ্ধ কোরতে সক্ষম হবে।

উপযোগিতা

মূলসূত্র বলতে আমরা কি বুঝি তা আগেই ইঙ্গিত করা হোয়েছে। সংক্ষেপে নানাবিধ ঐতিহাসিক উপকরণ ও বিবরণকেই আমরা মূলসূত্র বা উৎস বলে অভিহিত কোরতে পারি। ছাত্রদের এর সংস্পর্শে আনার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তারা অন্য কোন দ্বিতীয় মাধ্যম প্রত্যক্ষতঃ মূলসূত্র থেকে জ্ঞানলাভ কোরতে পারবে। এতে তাদের কোন কিছুকে যাচাই কোরে নেবার বুদ্ধি ও শক্তি বাড়ে। অর্থাৎ তাদের বিচারশক্তি বিকশিত হয়। একটা মূল উপকরণ কিছু দেখলে অত্যন্ত অলসপ্রকৃতির ছাত্রও উৎসাহে চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং সেটা নেড়েচেড়ে দেখতে চায় বা কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। আবার তা থেকে কোন বিবরণ লিখতে দিলে তা বর্ণনা কোরতে বসে তাদের যাচাই-বাছাই কোরে পড়ার (critical reading) প্রয়োজন হয়, ফলে তাদের যুক্তি-ক্ষমতা ও বিচারবোধ বিকশিত হয়। তাছাড়া, মূল উপকরণগুলি সেই অতীতকালের আবহাওয়া যেন অনেকখানি সঙ্গে কোরে আনে। এর নতুনত্ব এবং অদ্ভুতত্বও ছাত্রদের উৎসাহবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পরোক্ষ উপস্থাপনে ঠিক এটি হয় না। এই প্রেরণা, কৌতূহল ও উৎসাহই তো শিক্ষালাভের মৌলিক শর্তাবলী। সংক্ষেপে এই পদ্ধতি থেকে শিক্ষার্থীরা লাভ করে—(১) মূল উপকরণাদির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞ (first-hand expriences), (২) কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এবং (৩) অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি, যা হোলো সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি।

সুফল

অন্যান্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে যেমন, এই উৎস বা মূলসূত্র-পদ্ধতির ক্ষেত্রেও শিক্ষকের ভূমিকা ও সতর্কতা, দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি-প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার বিশেষ শিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা দরকার। কোথায়, কখন এবং কেন এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে এবং অভীপ্সিত ফল কি, সে সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। পৃথিবীতে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মূলসূত্রের অভাব নেই। তাই বলে সবগুলিই সমান শিক্ষাপ্রদ নয়, অনেকগুলির উপযুক্ত শিক্ষা-মূল্যও নেই। তাই নিজের ক্ষেত্রে শিক্ষককে যেমন জ্ঞানী ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হতে হবে, তেমনি তাঁকে সুদক্ষ পরিচালকও হতে হবে, নতুবা শিক্ষার্থীদের জাগ্রত কৌতূহল ও কর্মপ্রচেষ্টা বিভ্রান্ত ও অকার্যকর হতে পারে।

শিক্ষকের ভূমিকা ও সতর্কতা

(৮) সমষ্টিগত পাঠচর্চা-পদ্ধতি (Socialized Recitation)

সমষ্টিগত পাঠচর্চা-পদ্ধতি সম্পর্কে বড় কথা হচ্ছে যে, এই পদ্ধতি "attempts to make learning a cooperative enterprise in which the group thinks together in order t reach a conclusion, acceptable to all its members." এই পদ্ধতির অবশ্য নানা মাত্রাভেদ (degrees of socialized recitation) আছে। তবে মোটের উপর ছাত্রেরা নিজেদের সভাপতি নির্বাচন করে, কমিটি গঠন করে এবং দলগতভাবে উত্থাপিত বিষয়সমূহের আলোচনা করে। এখানে প্রশ্ন, প্রস্তাব ও আলোচনা প্রধানতঃ ছাত্রেরাই করে। শিক্ষক এই আলোচনার কেন্দ্রস্থলে থাকেন না, বা তাঁকে উদ্দেশ্য কোরে প্রশ্নাদি বা প্রস্তাবাদি উত্থাপিত হয় না। সেগুলি শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে নিজেরাই করে। শিক্ষক থাকেন অন্তরালে, শুধু তাদের আলোচনা যাতে উপযোগী ও কার্যকর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখেন। শিক্ষার্থীদের পরিচালনার কাজে তিনি ন্যূনতম মাত্রায় সাহায্য করেন। অধ্যাপক বিনিং ও বিনিং-এর মতে এই পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা হোলো :

আনুষ্ঠানিক সংজ্ঞা

"Socialized recitation may be better called socialized discussion·· the procedure is one in which the teacher turns the preriod over to the class or to a committee chosen by the pupils and then withdraws entirely from any participation in the activities of the class".

উক্ত অধ্যাপকদ্বয়ের মতে এই পদ্ধতি দুরকমের হতে পারে, (১) **সরল ও অনানুষ্ঠানিক** এবং (২) **জটিল ও পার্লামেণ্টারী ধাঁচের**। আবার কেউ কেউ এর "প্রতিষ্ঠানিক" ("institutionalised") রূপের কথা বলেছেন। প্রথম ক্ষেত্রে, একটি নির্দিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষার্থী সভাপতি নির্বাচিত হোয়ে অনানুষ্ঠানিক ভাবে সাধারণ ধরনে ঐ ঘণ্টায় কাজ পরিচালনা করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, শ্রেণীর সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য পদাধিকারীরা স্থায়িভাবে নির্বাচিত হয়, এবং রীতিমত পার্লামেণ্টারী পদ্ধতিতে শ্রেণীর কাজ চলে। তৃতীয় ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীরা বয়স্কদের কোনো প্রতিষ্ঠানের নকল অনুষ্ঠান করে। হয়ত কোনো সময় শ্রেণী পৌরসংস্থার এবং প্রতি শিক্ষার্থী পৌরসংস্থায় সদস্যের ভূমিকা নেয় এবং পৌরসংস্থায় সমস্যাদি আলোচনা ও তৎসংক্রান্ত কাজের অনুষ্ঠান করে। সাধারণতঃ দলগতভাবে আলোচনা করা হয় বলে দলের নেতাদের যথেষ্ট ভূমিকা থাকে। অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীই তার জ্ঞাতব্য বিষয় প্রশ্ন কোরতে পারে। আলোচনার শেষে যদি দেখা যায় উপযুক্ত তথ্যের বা মন্তব্যের অভাব আছে, তবে শিক্ষকমহাশয় তা সরবরাহ করেন।

পদ্ধতির দুই প্রকার

এই পদ্ধতির সুবিধা

এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধাগুলো হোলো এর প্রয়োগ দ্বারা ছাত্রদের আগ্রহ, কৌতূহল, অভাব ও প্রয়োজন সম্পর্কে শিক্ষক সবিশেষ জ্ঞানলাভ কোরতে পারেন। তার ফলে তিনি শিক্ষাকে আরও মানবমুখী (humanised), শিশুকেন্দ্রিক (padio-centric) কোরে তুলতে পারেন। শিক্ষা উদ্দেশ্যমূলক ও উপযোগী হওয়ায় স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ জন্মে ; ফলে তাড়াতাড়ি তার শিক্ষালাভ ঘটে, অনেক অপচয় নিবারিত হয় এবং সময়ের সাশ্রয় ঘটে। শ্রেণীকক্ষে সহযোগিতামূলক আলোচনার মাধ্যমে জীবনে পাস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অবহিত হয়। তাছাড়া, শিক্ষার্থীরা হয় আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল এবং প্রভূত পরিমাণে মানসিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই যে কোন পরিস্থিতিতে অবস্থা বিবেচনা কোরে উদ্যোগ ও নেতৃত্ব গ্রহণ কোরতে তারা পশ্চাৎপদ হয় না। এই শিক্ষা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলির অন্যতম এবং জীবনের সাফল্যলাভের প্রথম সোপান। আর সমাজবিদ্যা তো জীবনে সাফল্যলাভের শিক্ষাই দেয়—তাই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগও বিশেষ বিবেচনার অবকাশ রাখে।

এই পদ্ধতির অসুবিধা

শ্রেণীকক্ষের নেতৃত্ব শিক্ষকের হাতে না থাকায় প্রায়শঃ শ্রেণী-শৃঙ্খলা নষ্ট হতে পারে। সময়ের অপব্যবহার হতে পারে, সকল শিক্ষার্থী সমানভাবে উৎসাহিত হয় না, উচ্চবুদ্ধি শিক্ষার্থীরাই নেতৃত্ব ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং অনেক সময়েই দলাদলির উদ্ভব ও অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হতে পারে। এই পদ্ধতির বহুল ও একক প্রয়োগ শিক্ষাকে কৃত্রিম কোরে তুলতে পারে। এই পদ্ধতিতে বিশেষ শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক না হলে শিক্ষাকার্য পরিচালনায় বিভ্রাট ঘটতে পারে।

বিশেষ বক্তব্য এই যে, অন্যান্য পদ্ধতির সাথে প্রয়োজনমত এই পদ্ধতির সুবিবেচনা-সম্মত প্রয়োগ কোরলে সুফল লাভ করা যেতে পারে। বিশেষ কোরে, শিক্ষকের তত্বাবধানে পাঠ-পরিচালনার পর এই পদ্ধতির প্রয়োগ বেশ ফলপ্রসূ।

(৯) সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি (Interview and Questionaire Method)—ইহার বৈশিষ্ট্য

এই পদ্ধতি একাধারে বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক (Analytic and Synthetic)। ফলে শিক্ষাদানের কার্যে এর গুরুত্ব সমধিক। এর উদ্দেশ্য, "সমুদ্রের তলাকার গুপ্ত রত্নরাজির মত শিশুমনের মধ্যকার গুপ্ত অভিজ্ঞতার মণি-মাণিক্য শিক্ষককে আবিষ্কার কোরতে হবে, উদ্ধার কোরতে হবে। এই কাজে শিশুর মন-সমুদ্রে প্রশ্নের ডুবুরি নামিয়ে দিলে তবেই তার

উদ্দেশ্য

মনে রত্নরাজির উদ্ধার সম্ভব হবে।" প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতির প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। গীতাতেও শিক্ষালাভের উপায় হিসেবে গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। প্লেটোর মতও তাই। তাঁর মতে শাসকদের তো এমন শিক্ষা থাকা চাই যাতে তারা প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার এবং প্রশ্নের উত্তর দেবার যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করে।

প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব

এই প্রশ্নোত্তর-পদ্ধতি দুভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে—(১) শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে এবং (২) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে। প্রথম ক্ষেত্রে সকল শিক্ষার্থীই অন্যের প্রশ্ন এবং উত্তর শুনে উপকার লাভ কোরতে পারে এবং নিজের উত্তরটিকে উপযুক্ততর করার চেষ্টা করে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও শিক্ষার্থী শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে এবং একাকী নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সাহস অর্জন করে। সকলপ্রকার ভয় ও সংকোচ কাটিয়ে সে স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়শীল হোতে পারে। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিই হচ্ছে এই পদ্ধতির বিশিষ্ট প্রয়োগ। এর ফলশ্রুতি সম্পর্কে P. R. Cok বলেছেন, "The socialization of mind may be regarded as the special function of intercourse and intercourse is conducted mainly asprocess of question and answer." এই সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চিন্তাধারার সমতাবিধান করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীর চিন্তাধারা আর ব্যক্তিগত থাকে না, সাধারণীকৃত বা সমাজগত হয়ে যায়। এই পদ্ধতি-প্রয়োগের পূর্বে শিক্ষার্থী কোনো নির্দিষ্ট পাঠ সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানার্জন কোরবে। শিক্ষকের প্রশ্নাবলী এমন ধরনের হবে যাতে শিক্ষার্থীর সমস্ত বিষয়বস্তুর জ্ঞান যাচাই করা যায়। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অগ্রগতি ও কৃতিত্ব বিচারের জন্য এইসব সাক্ষাৎকারের সময় প্রতি শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতার মূল্যায়ন কোরে তার বিবরণ সযত্নে রক্ষা করা উচিত।

দুই প্রকার প্রয়োগ

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চিন্তার সমতাবিধান

প্রশ্নের গুণ

এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা

এই মনস্তত্ত্বসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মন আলোড়িত, সক্রিয় এবং সৃজনশীল হয়। শিক্ষার্থী যুক্তিনিষ্ঠ এবং আত্মপ্রত্যয়শীল হয়। নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ায় বাস্তব জগতের নানা সমস্যা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং প্রশ্নাদির দ্রুত ও সুষ্ঠু উত্তর দেবার ক্ষমতা অর্জন করে। জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে অগ্রসর হবার এইটিই একমাত্র উপযুক্ত পদ্ধতি। এই পদ্ধতির সাহায্যে শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষা সহজসাধ্য হয়।

সুবিধা

এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলি এই যে, পাঠ্য বিষয়ে পূর্বজ্ঞান না থাকলে শিক্ষার্থী প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না, ফলে প্রশ্ন জিজ্ঞাসার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। শিক্ষার্থীর রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী প্রশ্ন করা সহজসাধ্য নয়। এর জন্য শিক্ষকের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি ও দক্ষতা থাকা চাই। প্রশ্ন এবং তার উত্তর দীর্ঘ হলে সময়ের অপচয় হবে, শিক্ষার্থীদের মনের সহজ ক্রিয়াশীলতা নষ্ট হবে এবং গতানুগতিক মুখস্থবিদ্যার ধারাই প্রাধান্য পাবে। তাই প্রশ্নোত্তর সহজ, সংক্ষিপ্ত এবং জটিলতামুক্ত হওয়া দরকার। নতুবা এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে।

অসুবিধা

[আমরা এই অধ্যায়ে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রায় সকল উপযোগী ও প্রয়োজনীয় পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা কোরেছি। তবু আরও কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনার অবকাশ থেকে গেল। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা তা আলোচনা কোরবো।]

Questions

1. Describe the usefulness of a method to be adopted in teaching Social Studies.

2. Describe the value of Activity Methods in teaching Social Studies.

3. What should the role of the students be when any method is employed in teaching Social Studies ? What should the teacher try to do ?

4. Describe the procedure, advantages and disadvantages of any of these methods—Text-Book Method, Lecture Method and Discussion Method, when employed in teaching Social Studies.

5. Discuss that Project Method is the most suitable method of teaching Social Studies. Find out its limitations too.

6. With the application of Project Method draw up a scheme of lesson on the subject to be taught in Social Studies to Secondary School pupils. (C. U. 1962)

7. Compare Problem Method with Project Method and ascertain the value of each in teaching Social Studies.

8. Unit Method also demands a great consideration in being employed to teaching Social Studies. What is its scope and utility in this particular field ?

9. Source Method can be best utilised in teaching historical topics of Social Studies.—Discuss.

10. Socialised Recitation is one of the important methods of modern teaching. How can you employ it successfully in teaching Social Studies ?

11. It is better in teaching not to stick to one method only but to combine two or more methods in such a fashion as to produce impressive results. How far can it be done in the case of teaching Social Studies ?

পঞ্চম অধ্যায়

সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠন পদ্ধতি (২)

প্রয়োগশালা-পদ্ধতি

শিক্ষার নামে শুধু "মুখস্থবিদ্যার" দৌরাত্ম্য সম্পর্কে আমরা আগেই আপত্তি জানিয়েছি। তাছাড়া শিক্ষাদান কাজটাও শুধু বক্তৃতা করা নয় এবং শিক্ষাগ্রহণ কাজটাও শুধু বক্তৃতা শোনা নয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিভিন্ন পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কোরেছি। "সক্রিয় শিক্ষাই মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা, এবং তার থেকে শিক্ষার্থীর স্মৃতিভাণ্ডার (অন্য কথায় আমরা যাকে জ্ঞানস্তূপের ভাণ্ডার বলতে পারি) পূর্ণ করাটাই আসল কাজ নয় ; আসল কাজটি হ'ল শিক্ষার্থীকে সমাজজীবন সম্পর্কে সচেতন কোরে তোলা, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার সমাজবোধকে এবং সমাজবিবেককে জাগ্রত করা এবং সেই সুস্থ এবং সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে তার ব্যক্তি-সম্ভাবনাকে স্ফুটতর করা—এককথায় সমাজভিত্তিক সুগঠিত ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করা। এইরূপ ব্যক্তিত্বশীল মানুষকে দেখে তার "ব্যক্তিত্বের প্রভায়" চমৎকৃত হোয়ে আমরা "শিক্ষার দীপ্তি" বা "radiation of learning" সম্পর্কে আস্থাবান হ'তে পারব। আমাদের দেশে অন্নবস্ত্রের দুর্ভিক্ষের মতই আছে 'ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষ", সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠনটা যেন এমন হয় যার সাহায্যে আমরা এই ব্যক্তিত্বের দুর্ভিক্ষ দূর কোরতে পারি। এই ক্ষেত্রে পূর্বালোচিত অন্যান্য পদ্ধতিগুলোর সাথে "সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা"-পদ্ধতির একটু বিশেষ পার্থক্য আছে। এইজন্য সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনে সংশোধিত ডাল্টন-পরিকল্পনা (Dalton Plan) বা প্রয়োগশালা-পদ্ধতির (Laboratory Method) আলোচনার বিশেষ তাৎপর্য র'য়েছে।

ডাল্টন পরিকল্পনার ইতিহাস ও ভিত্তি

ডাল্টন পরিকল্পনার উদ্গাতা হ'লেন মিস হেলেন পার্কহার্স্ট। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ডাল্টন শহরে এই পরিকল্পনার উদ্ভব বলে এর নামকরণ হ'য়েছে **ডাল্টন পরিকল্পনা**। আর

উদ্ভব

এই পরিকল্পনানুসারে কাজের নিমিত্ত প্রতিটি বিষয়ের জন্য এক-একটি বিষয়-কক্ষকে প্রয়োগশালা বা Laboratory-র অনুকরণে সজ্জিত করার প্রয়োজন হয় বলে এই পরিকল্পনার অপর নাম দেওয়া হয়েছে প্রয়োগশালা-পদ্ধতি বা Laboratory Method। বিষয়-কক্ষগুলি সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজন হয় টেবিল, চেয়ার,

ব্ল্যাকবোর্ড প্রভৃতির সাথে অন্য নানা উপকরণ, যথা :—মানচিত্র, চার্ট, বিষয়োপযোগী নানাপ্রকার দেয়ালচিত্র, নানা পত্রপত্রিকা, বিষয়টির সমস্যাবলী, আলোচনার উপযুক্ত সহায়ক গ্রন্থাগার (Subject Library), ছাত্রদের নিজস্ব রচিত বুলেটিন, শব্দযন্ত্র, অভিক্ষেপণ-যন্ত্র প্রভৃতি নানাপ্রকার সহায়ক যন্ত্রাদি। এককথায় বিষয়-কক্ষটি হবে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপযুক্ত আলোচনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও পরিবেশ সমন্বিত একটি প্রকাণ্ড হলঘর, একটি সুসজ্জিত ল্যাবরেটরী—সেখানে উপস্থিত থাকবেন শিক্ষক, আর তাঁর সাহায্যপ্রত্যাশী হয়ে আসবে ছাত্রেরা,—কখনও একক ভাবে, কখনও দলবদ্ধ হোয়ে।

উপকরণ

ডাল্টন পরিকল্পনার প্রথম ভিত্তি **ব্যক্তি-পার্থক্য,** যা নিঃসন্দেহে মনোবিজ্ঞানের একটা গোড়ার কথা। প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনার বিকাশ তার নিজস্ব পথে এবং নিজস্ব গতিতেই সম্ভব। শিক্ষায় দলবদ্ধতা এবং অনুকরণের খুবই প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে ; মানুষ সামাজিক জীব বলেই এই প্রয়োজনটাও মনোবিজ্ঞানসম্মত এবং মনোবিজ্ঞানের এটিও একটি গোড়ার কথা। তবু এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে শিক্ষার ফলশ্রুতি হবে ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি ("আত্মানং বিদ্ধি") এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। তবে ব্যক্তির এই আত্মোপলব্ধি এবং তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ অবশ্যই সমাজসাপেক্ষ এবং কখনই সমাজনিরপেক্ষ হতে পারে না। আধুনিক ভারতে আমরা ব্যক্তি-মানুষের সম্যক বিকাশের চেহারা মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথকে দেখে অনুমান কোরতে পারি। একজনের বিশেষ প্রবণতার ক্ষেত্র রাষ্ট্রনীতি, অপরজনের সাহিত্য। অথচ এঁদের বিশেষ প্রবণতার উৎস আমাদের দেশের সমাজ। এই প্রবণতা নির্ভর কোরছে আমাদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপরেই, শক্তি সংগ্রহ কোরছে সেখান থেকেই এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ এ সমাজকে আশ্রয় কোরেই সম্ভব হোয়েছে। তাঁদের ব্যক্তিত্ব ছিল সমাজাশ্রয়ী, তেমনই সমাজচেতনা ও সমাজবিবেকসম্পন্ন। ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা এবং সমাজসত্তা যে কতখানি পরস্পর নির্ভরশীল তা এই দুজনের উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়। **"আত্মানং বিদ্ধি" শিক্ষার ফলশ্রুতি এবং তা সমাজ-নির্ভর।** সমাজবিদ্যার শিক্ষককে একথা মনে রেখেই প্রতিটি শিক্ষার্থীর "নিজস্ব পথ ও নিজস্ব গতি" অনুসারে চলতে হবে, কিন্তু রাশ টানতে হবে এক এক সময়ে শিক্ষার্থীকে "যথার্থ সামাজিক মানুষ" হিসেবে গড়ে তোলার জন্যেই। **মূল ডাল্টন পরিকল্পনা প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভেদনির্ভর, কিন্তু সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর সামাজিক অস্তিত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। তার সামাজিক প্রয়োজনকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হোয়েছে।**

প্রথম ভিত্তি ও ব্যক্তি-পার্থক্য

ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি সমাজনির্ভর

মূল ও সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনার পার্থক্য

মূল ডাল্টন পরিকল্পনা

মূল ডাল্টন পরিকল্পনায় **শিক্ষকের দায়িত্ব হচ্ছে পাঁচটি :—**

(১) তিনি বিষয়কক্ষটিতে পড়াশুনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি কোরবেন।

(২) ছাত্রদের যে ব্যক্তিগত কাজ (assignment) দেওয়া হবে, তিনি তা বুঝিয়ে দেবেন।

(৩) বিষয়-কক্ষে যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার কোরতে হবে তিনি তার ব্যবহার শিখিয়ে দেবেন।

(৪) কোনো নির্দিষ্ট বিষয় কিভাবে অনুধাবন কোরতে হবে, তিনি সে সম্পর্কে ইঙ্গিত বা আভাস দেবেন।

(৫) ছাত্র যখন একান্তভাবে প্রয়োজন বোধ কোরবে, তখন কোন বিষয়াংশ সম্পূর্ণ বুঝিয়ে দেওয়া চলবে। সমগ্র বিষয়টির মর্মের সাথে এই বিষয়াংশের সংযোগও তিনি দেখিয়ে দেবেন।

ব্যক্তিগত কাজ

ডাল্টন পরিকল্পনায় প্রত্যেক ছাত্র ব্যক্তিগতভাবে কাজ করে। এখানে নির্দিষ্ট সময়-তালিকা বা সেই অনুসারে ঘণ্টা বাজানোর কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্রেরা যে কোন বিষয়-কক্ষে হাজির হতে পারে, পড়ার বিষয়গুলি নিজেদের মধ্যে খুশিমত আলোচনা কোরতে পারে, আবার ইচ্ছে কোরলে বেড়িয়েও বেড়াতে পারে।

বিষয়-শিক্ষা

বিষয়-কথা

প্রতি মাসের কাজ

উন্নতির রেখাচিত্র

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে এখানে শ্রেণী-শিক্ষক প্রথার পরিবর্তে বিষয়-শিক্ষক প্রথাই কার্যকরী। তাঁরা নিজের নিজের বিষয়-কক্ষে উপস্থিত থাকেন। ছাত্রদের বছরের কাজটাকে তাঁরা দশটা ভাগে ভাগ কোরে এক-একটা ভাগকে প্রত্যেক মাসের কাজ (assignment) হিসেবে নির্দিষ্ট কোরেছেন। ছাত্রেরা নিজেদের ইচ্ছেমত চলতে পারে ঠিকই, কিন্তু মাসের মধ্যে এই নির্দিষ্ট কাজটা তাকে কোরে দিতে হবে। যারা নির্দিষ্ট সময়ের আগে কাজ শেষ কোরতে পারবে, তারা পরবর্তী মাসের কাজ নিয়ে অগ্রসর হয়ে যাবে। পিছিয়ে-থাকা ছাত্রদের জন্য তাদের অপেক্ষা কোরতে হবে না। আবার অন্য পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ান্তে যারা প্রথম দফার কাজ দিতে পারবে না, তারা পরবর্তী দফায় কাজ পাবে না। প্রথম দফায় কাজ শেষ হবার পরেই পরবর্তী দফার কাজ মিলবে। আর এই কাজের গুণাগুণ বিচার কোরেই শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের "উন্নতির রেখাচিত্র" অঙ্কন কোরবেন। ডাল্টন পরিকল্পনায় পরীক্ষার কোন স্থান নেই। তাই মুখস্থবিদ্যারও

(cramming) কোন অবকাশ নেই। ছাত্রদের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এক-একটি কাজ শেষ কোরে দেবার চুক্তি কোরতে হয় এবং সেই চুক্তি (contract) অনুযায়ী কাজ শেষ না-করা পর্যন্ত তাকে নূতন কাজ দেওয়া হয় না। এইভাবেই প্রতিটি বিষয়ের প্রত্যেক ছাত্রের নিজস্ব অগ্রগতি নির্ধারিত হয়।

কাজের চুক্তি আছে পরীক্ষা নেই

ইহার সুবিধা ও অসুবিধা

ডাল্টন পরিকল্পনার সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা যাচ্ছে।

সুবিধা ঃ

(১) শিক্ষাদান এই পদ্ধতিতে শ্রেণীগত নয়, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ পায় এবং প্রত্যেক বিষয়ে নিজের ক্ষমতানুযায়ী অগ্রগতি লাভ করে।

(২) শৃঙ্খলা এখানে "শৃঙ্খল" নয়। আচরণের স্বাধীনতাই এখানে শৃঙ্খলার মূল কথা। শৃঙ্খলা এখানে স্বাধীনভাবে পালনীয় বা স্বেচ্ছায় আচরণীয় অনুশাসনের ("free" discipline) রূপ নেয়। অধিকন্তু, শিক্ষার্থীরা কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করায় তারা আপনা থেকেই কাজের প্রেরণা লাভ করে।

(৩) শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দায়িত্বপালনে ব্রতী হওয়ার সময় এবং কাজের অনুপাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে এবং আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর হোতে শেখে।

(৪) বিদ্যালয়-সমাজটি হোয়ে ওঠে তাদের কাছে একাধারে ব্যক্তিত্ববিকাশের এবং সামাজিক সংযোগের স্থল। প্রত্যেকে একটি সামাজিক সংগঠনের অধীনে নিজস্ব ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনের শিক্ষা লাভ করে।

(৫) নিয়মিত উন্নতির একটা সুস্পষ্ট পরিমাপ পাওয়া যায়। এই পরিমাপ অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত এবং নির্ভরযোগ্য, আর একনজরেই শিক্ষকমহাশয় ছাত্রের উন্নতি নির্ণয় কোরতে পারেন।

(৬) কোন একটা বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা পড়াশুনার ফল যাচাই করা হয় না বলে বাছাই কোরে পড়া ও মুখস্থবিদ্যার (suggestion and cramming) কুফল থেকে ছাত্রেরা অব্যাহতি পায়। নিজ রুচি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রেরা পড়াশুনা কোরবার সুযোগ পায় ; সেইজন্য একদিকে যেমন তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি পায় ও অপচয় নিবারিত হয়, তেমনি অন্যদিকে যেসব বিষয়ে ছাত্রেরা কাঁচা, সেইসব বিষয়ে নিজেদের ত্রুটি-সংশোধনেরও সময় পায়।

অসুবিধা ঃ

(১) যেসব ছাত্রেরা জড়বুদ্ধি বা পশ্চাৎপদ, তাদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ নয়। এমন কি "সাধারণ" ছাত্রেরাও এই পদ্ধতির সুযোগগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার কোরতে পারে না।

(২) শিক্ষকমহাশয়দের কাজ এখানে না কমে বরং অত্যধিক বেড়ে গেছে। তিনি সব সময় প্রয়োগশালাতে অপেক্ষা কোরে থেকে ছাত্রদের সাহায্য কোরবেন, তদুপরি শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যভার (assignment) স্থির কোরে দেবেন, সেগুলোর পরিপূরন সম্পর্কে নজর রাখবেন এবং উন্নতির রেখাচিত্র ইত্যাদি অঙ্কন কোরবেন।

(৩) এই পদ্ধতিতে মৌখিক কাজের সুযোগ নেই, অথচ ভাষাশিক্ষার কাজে এই মৌখিক কাজ অবশ্য প্রয়োজন।

(৪) অনুপ্রেরণামূলক বিষয়গুলিতে শ্রেণীশিক্ষার একটা বিশেষ অবদান আছে। এই পদ্ধতিতে গণমনের বিকাশ ঘটে না, এইজন্য যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষাদানে গণমনসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইসব ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসু নয়। তাছাড়া নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার্থীদের পক্ষেও এই পদ্ধতি ফলপ্রসু নয়।

(৫) সমাজবিদ্যার শিক্ষকের নিকট উপরি-উক্ত অসুবিধাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ গণমনবিকাশের সাথে গণচেতনা এবং সমাজবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। বিদ্যালয়ে বহু বিদ্যার্থীর পরস্পর সংযোগ হয় ঠিকই, কিন্তু উপযুক্ত সংগঠনের অভাবে (যথা—শ্রেণী-সংগঠন) গণমনের ও গণচেতনার বিকাশ সম্ভব হয় না। ব্যক্তিগত দায়িত্বনির্ধারণ এবং নিজস্ব কর্তব্যপালন সমাজজীবনে অবশ্য শিক্ষণীয়, কিন্তু তারও পূর্বে চাই সমাজবোধ ও সমাজচেতনা। ডাল্টন পরিকল্পনাতে সে ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

(৬) ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গুণগত প্রভেদ সত্ত্বেও তাদের মধ্যে যে যোগসূত্র রয়েছে, মনে হয় ডাল্টন পরিকল্পনায় তার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর অত্যধিক জোর দিতে গিয়ে দলগত কাজের গুরুত্বকে অবহেলা করা হয়েছে। একটি দলের বিভিন্ন শিক্ষার্থী তাদের আগ্রহ, প্রয়োজন এবং সামর্থ্যের বিভিন্নতা হেতু বিভিন্নমুখী কাজে ব্রতী হয়। এই বৈচিত্র্য থেকে ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করে ; তাছাড়া উপযুক্তভাবে পরিচালনা কোরতে পারলে দলগত কাজের সাথেই ব্যক্তিগত কাজের উপযুক্ত সংযোগ কোরে দেওয়া যায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মাত্র ব্যক্তিগত ভূমিকাটিকেই গুরুত্ব দিলে চলবে না। মানুষ সমাজে একই সাথে দলগত এবং ব্যক্তিগত জীবনযাপন করে ; বিদ্যালয়সমাজেও তার এই দ্বৈত ভূমিকা অক্ষুণ্ণ থাকে। বস্তুতঃ বৃহত্তর জীবনে এই দ্বৈত ভূমিকা সে যাতে যথার্থভাবে পালন কোরতে পারে বিদ্যালয়ে তন্নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষাদান করাই প্রয়োজন।

(৭) সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের পক্ষ থেকে ডাল্টন পরিকল্পনায় আরেকটি বড় আপত্তি এই যে, শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে সজীব সংস্পর্শের পরিবর্তে পাঠ্যগ্রন্থের ওপর নির্ভরতাকেই এতে বেশী জোর দেওয়া হোয়েছে। সমাজ হচ্ছে সজীব মানুষের আদান-প্রদান, এই বোধটা যেন এই পরিকল্পনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(৮) রুটিন এবং ঘণ্টা না দেবার ব্যবস্থা থাকায় সমস্ত ব্যাপারটাই ছাত্রদের স্বেচ্ছাধীন হোয়ে পড়ে। এর বাস্তব পরিণতি হয় একটা বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং সকল বিষয়েই "অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট" হবার উপক্রম হয়। তাছাড়া,

(৯) এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কাজ হয় একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন, অতিরিক্ত এবং ক্লান্তিকর। অথচ তাঁর নিজে থেকে উদ্যোগ নেবার কিছু নেই, তিনি হলেন নিষ্ক্রিয় দর্শক এবং প্রয়োজনক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র। আর ছোট ছোট ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি একেবারেই অচল। কারণ ছাত্রেরা কিছুটা স্বাবলম্বী হোতে না শিখলে এ পরিকল্পনা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

অথচ সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা এই ত্রুটিগুলোকে দূর কোরে সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের লক্ষ্য ও প্রয়োজনকে সিদ্ধ করার কাজে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে। মূল ডাল্টন পরিকল্পনা সম্পর্কে বহু আপত্তির কারণই এখানে দূরীভূত করা হয়েছে।

সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা

এই সংশোধিত পরিকল্পনায় বিদ্যালয়কে শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন নৈরাজ্যে পরিণত না কোরে **"সুশৃঙ্খল স্বাধীন ব্যবস্থাকে"** লক্ষ্যসাধনের সোপান হিসেবে গ্রহণ করা হোয়েছে। আধুনিক গণতন্ত্রে প্রতিটি নাগরিককে যেমন একটা সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা (minimum control) মেনে নিয়ে সর্বাধিক পরিমাণে মৌলিক নাগরিক অধিকারগুলিকে ভোগ কোরতে দেওয়া হয়, সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনাতেও বস্তুতঃ সেই নীতিই গ্রহণ করা হোয়েছে। **আধুনিক সমাজ-পদ্ধতির সাথে এই শিক্ষা-পদ্ধতিটির এখানে একটি আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে।** বস্তুতঃ সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রণ (minimum control) এবং সর্বাধিক সুযোগসুবিধা (maximum privilege) আধুনিক উন্নতিশীল জীবনের মূল তত্ত্ব, এতে ব্যক্তির দলগত ও ব্যক্তিগত এই দ্বৈত ভূমিকাই সার্থকতা লাভ করে। সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনায় এই নীতি গ্রহণ করায় এই ব্যবস্থানুসারে বিদ্যালয়সমাজ-পরিচালনা আধুনিক সমাজ-পরিচালনার প্রতিচ্ছবি হোয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে রক্ষা কোরেও এখানে প্রয়োজনীয় নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণ চালু করা হোয়েছে।

শিক্ষার্থীকে সর্বনিম্ন নিয়ন্ত্রণ ও সর্বাধিক সুযোগদান

বিদ্যালয়ের প্রতিদিনের শিক্ষা-সময়কে এই পরিকল্পনানুসারে দু ভাগে ভাগ করা হোয়েছে। দিনের প্রথমাংশে চলবে শ্রেণী-পাঠনা, যাতে শিক্ষার্থীদের গণমনের সৃষ্টি হয় এবং সামাজিক জীবন ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায় ও তারা সহযোগিতামূলক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ হয়। দিনের দ্বিতীয় ভাগে চলবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুযায়ী বিষয়গুলির ব্যক্তিগত পাঠনা। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই,—দিনের প্রথমাংশে চলবে শ্রেণী-পাঠনা এবং দ্বিতীয়াংশে ব্যক্তিগত-পাঠনা। শ্রেণী-পাঠনার মাধ্যমে শিক্ষক যে বিষয়ে শিক্ষাদান কোরলেন, ব্যক্তিগত-পাঠনার কালে শিক্ষার্থীরা সেই বিষয়গুলি স্বীয় চেষ্টায় আয়ত্ত কোরবে। তবে সবক্ষেত্রেই যে এই দুটো ভাগ অনুযায়ী পড়াশুনা চলবে তার প্রয়োজন নেই। কোন বিষয়ের একটি অংশ মাত্র শ্রেণী-পাঠনা এবং অপর কোন কোন অংশ মাত্র ব্যক্তিগত-

শ্রেণী-পাঠনা

ব্যক্তিগত-পাঠনা

পাঠনার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সমাজবিদ্যা-শিক্ষায় আমরা শিক্ষার্থীর দ্বৈত-ভূমিকার কথা বলেছি। সেই দ্বৈত ভূমিকার কারণেই সমাজবিদ্যা-শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শ্রেণী-পাঠনা ও ব্যক্তিগত-পাঠনার সমন্বয় অদ্ভুত ফল প্রদর্শন কোরতে পারে। সামাজিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার উৎকর্ষসাধনে এই পদ্ধতি সত্যই খুব ফলপ্রদ হতে পারে।

সামাজিক সহযোগিতা ও ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা

সময়-তালিকার দিকে, প্রথমাংশের জন্য নির্দিষ্ট রুটিন থাকবে এবং পুরোপুরি তা মেনে চলা হবে। আর দ্বিতীয়াংশের জন্য প্রত্যেক বিষয় ব্যক্তিগতভাবে পড়বার একটা মোটামুটি সময় নির্দেশ থাকবে—প্রথমাংশের ন্যায় দ্বিতীয়াংশেও সেই অনুযায়ী ঘণ্টা বাজবে, তবে দ্বিতীয়াংশে কোনো শিক্ষার্থী ইচ্ছা কোরলে একটি বিষয় একাধিক ঘণ্টা ধরেও পড়তে পারবে।

সময়-তালিকা

শ্রেণীকক্ষ এবং বিষয়কক্ষ দু-ধরনের ব্যবস্থাই এখানে থাকবে। তবে সমাজবিদ্যা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই সুসজ্জিত বিষয়কক্ষ থাকবে। ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়াদি শ্রেণীকক্ষেই পঠন-পাঠন চলতে পারে।

শ্রেণীকক্ষ ও বিষয়কক্ষ দুই থাকবে

উন্নতির রেখাচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রতিটি ছাত্রের পঠিত বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখার গুরুত্ব যেমন থাকবে, তেমনই মাঝে মাঝে মৌখিক এবং লিখিত পরীক্ষাদির ওপরেও নির্ভর কোরতে হবে।

মূল্যায়ন

এইভাবে সংশোধিত ডাল্টন পরিকল্পনা বা প্রয়োগশালা-পদ্ধতি (Laboratory Method) সাধারণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছে। সমাজবিদ্যার শিক্ষকও এই পরিকল্পনাকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাবেন।

Questions

1. Discuss the merits and demerits of the Dalton Plan. How far is it useful in teaching Social Studies ?

2. Why has it been suggested that Dalton Laboratory Method should be modified ? What are the modifications suggested to the original method ? How far do the modifications favour the development of the child both as a social and as an individual being ?

3. The development of social virtues and individual abilities is a salient feature of education for all ages. How far is this development helped by the modified Dalton Plan ?

4. What are the objections of a Social Studies Teacher to the Dalton Plan ? Why should he welcome the modifications to the original plan ?

5. Discuss, on the whole the usefulness of the Dalton Plan as a modern method of teaching. Why should the Social Studies Teacher give special attention to this method and with what reservations ?

———

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যবহারিক শিক্ষা

Practical Work

ইহার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব

সমাজবিদ্যা-শিক্ষাদান-পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা পূর্বেই মুদালিয়র কমিশনের নিম্নোক্ত কথাগুলি উদ্ধৃত কোরেছি। তবু সামাজিক শিক্ষাদানে ব্যবহারিক শিক্ষার গুরুত্ব কোথায় তা নির্দেশ কোরবার জন্যে সূত্র হিসেবে আবার তা উল্লেখ কোরতে বাধ্য হচ্ছি :—

(১) শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ নির্বাচন ও মূল্যায়নের ব্যাপারে শিক্ষকগণ সর্বদাই তাদের শেষ ফলের কথা, অর্থাৎ তাদের অন্তর্নিহিত মনোভঙ্গী ও মূল্যবোধের কথা স্মরণ রাখবেন।

(২) সকল পদ্ধতির সর্বোচ্চ মূল্য হচ্ছে কর্মপ্রীতির এবং সেই কাজ সর্বোচ্চ পরিমাণ দক্ষতার সাথে সম্পাদন-ইচ্ছার উন্মেষে।

(৩) উত্তম কাজ, অভ্যাস ও দক্ষতাসমূহ তত্ত্বগতভাবে নিরবলম্ব অবস্থায় অর্জন করা যায় না। দীর্ঘকাল ধরে কাজের যথোপযুক্ত অভ্যাস এবং প্রত্যেকটি কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটির ওপরে জোর দেওয়ার ফলেই প্রয়োজনীয় মনোভঙ্গী ও মূল্যবোধ-সমূহের উদ্ভব হয়।

(৪) শুধু মাত্র সেইসব পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য যা বিদ্যাকে সুনির্দিষ্ট অস্তিত্ব ও বাস্তবতা দান করে এবং যা জীবন ও বিদ্যার মধ্যে, বিদ্যালয়ের এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সকল বাধা দূর করে।

শব্দের দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তি চাই

এই প্রসঙ্গে আবার কমিশন "strangle-hold of verbalism"—যাকে আচার্য জে. বি. কৃপালনী "tyranny of words" বা "শব্দ-রাজির দৌরাত্ম্য" বলে অভিহিত কোরেছেন, তা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করার কথা বোলেছেন। উপরের কথা-গুলির মধ্যেই সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের গুরুত্ব নিহিত রয়েছে। তাছাড়া, এটি হচ্ছে "জীবনযাপনের বিদ্যা" (art of living)। তাই

আচরণশিক্ষা আবশ্যক

গ্রন্থগত নীতিশিক্ষা যতক্ষণ আচরণগত ব্যবহারিক শিক্ষায় পরিণত না হয়, ততক্ষণ সে শিক্ষা সমাজবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া শিক্ষা যথার্থ হয় তখনই, গ্রন্থ বা বক্তৃতা আলোচনা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যা জানতে পারে নিজেদের ব্যবহারিক আচরণের মধ্য দিয়ে যখন তার উৎস নির্ণয় কোরতে এবং নিজেদের ক্ষমতা যাচাই

কোরতে পারে। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ব্যর্থ এইখানে যে কত গ্রন্থকীট এবং তত্ত্ববিৎ সৃষ্টি কোরেছি, তার সামান্য এক ভগ্নাংশও মানুষ সৃষ্টি কোরতে পারিনি। স্বাধীনতালাভের পরে আমাদের চারিদিকে যে বিবেকহীন আচরণের স্রোত দেখতে পাই তার মূল কারণ এইখানে। আমাদের জ্ঞান ও আচরণের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। ব্যবহারিক শিক্ষণ জ্ঞান ও আচরণের সামঞ্জস্য-বিধান করে; শুধু তাই নয়, ব্যবহারিক আচরণ (practical activities) আবার নতুন নতুন জ্ঞানের সন্ধান দেয়।

জ্ঞান ও আচরণের সামঞ্জস্য বিধান

এককথায়, **মুখস্থবিদ্যা ও শব্দরাজির দৌরাত্ম্য থেকে মুক্তির জন্য, জ্ঞান ও আচরণের সামঞ্জস্যবিধানের জন্য, নতুন ও উন্নততর জ্ঞান ও পূর্ণতর ব্যক্তিত্ব-অর্জনের জন্য ব্যবহারিক শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।** সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষাদান তাই একটি অতিরিক্ত কর্তব্য মাত্র নয়, একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এই সমস্যাবলী আবার আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুনও বটে, তাই এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে,—এ কথা বলাই বাহুল্য।

অপরিহার্য কর্তব্য

শিক্ষার একটি মূল সূত্র হচ্ছে **স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভ**। কোনো তথ্য বা নিয়মকে সরাসরি মেনে না নিয়ে, এমন অবস্থা থেকে কাজ আরম্ভ করা দরকার যেখান থেকে সেই তথ্য বা নিয়মকে আবিষ্কার কোরে নেওয়া যায়। এই শিক্ষা শুধু কণ্ঠগত না হয়ে সত্যিই আত্মগত হয়। অধ্যাপক এইচ. এ. আর্মস্ট্রং হিউরিষ্টিক পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে এ বিষয়ে যা বলেছেন সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তা'ও একটি অতি প্রয়োজনীয় ভিত্তি বিশেষ। বস্তুতঃ সমাজে জীবনযাপনের নিয়মটা শিক্ষার্থীর পক্ষে মাত্র জেনে নেওয়ার থেকে সমাজে বসবাসের দ্বারা স্বচেষ্টায় আবিষ্কার কোরে নেওয়াই ভালো। আর সে শিক্ষা আচরণগত হয় বলে তা হয় যথার্থ এবং সুদৃঢ়। অধ্যাপক আর্মষ্ট্রং বলেছেন, "Heuristic methods of t aching are methods which involve our placing students as far as possible in the attitude of the discoverer methods which involve their finding out instead of being merely told about things." গ্রীক heurisco শব্দের অর্থ হচ্ছে 'আমি আবিষ্কার করি।'

স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভের গুরুত্ব

হিউরেষ্টিক পদ্ধতি

বস্তুতঃ প্রত্যেক শিশু সমাজেই জন্মগ্রহণ করে, ক্রমশঃ সমাজ-সচেতন হয় এবং সারাজীবন সমাজেই অতিবাহিত করে। সমাজে বসবাসের বহু অলিখিত, অকথিত এবং অদৃশ্য নিয়ম আছে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী এর ক্ষুদ্র ভগ্নাংশমাত্র জানতে পারে এবং বহু নিয়মই তাকে আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা কোরে নিতে হয়। অর্থাৎ নিজে থেকেই আবিষ্কার কোরে নিয়ে রপ্ত কোরে নিতে হয়। সমাজবিদ্যার শিক্ষক শিশুকে বিদ্যালয়-

আবিষ্কারের ভূমিকা ও তাৎপর্য

সমাজে এমনভাবে স্থাপিত কোরবেন, তার পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কোরবেন এবং তাকে এমনভাবে কাজে উদ্বুদ্ধ কোরবেন যাতে সে বিদ্যালয়-সমাজে ও বৃহত্তর সমাজে সচেতন আবিষ্কারকের ভূমিকা গ্রহণ কোরতে পারে। সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এইটিই হবে প্রারম্ভিক সোপান। শিক্ষা একটি অন্তহীন প্রণালী বিশেষ। তাই এখানে "চূড়ান্ত" কিছু সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়—এখানে দৃষ্টিভঙ্গী এবং আচরণধারারই গুরুত্ব ; এই দুটিকে সম্বল কোরেই ভবিষ্যতের দুস্তর জীবনসমুদ্রে শিক্ষার্থীকে ঝাঁপ দিতে হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষায় ব্যবহারিক কাজের ধরনধারণ

এখন এই দৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণধারা শিশু কিভাবে কিপ্রকার ব্যবহারিক কাজের মধ্য দিয়ে লাভ কোরবে তাই এখন আমাদের আলোচ্য বিষয়। এ বিষয়ে শিশুদের সামাজিক ও পৌরশিক্ষা, তাদের অনুষ্ঠিতব্য আনন্দ-উৎসবাদি এবং তাদের সৃজনাত্মক কর্মরাজির বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রচারিত "শিক্ষণ ব্যবহারিকায়" যা উল্লিখিত হয়েছে তার প্রতি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এই কাজগুলো বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তর্গত শিশুদের জন্য বাছাই করা হয়েছে, কিন্তু সেজন্য অন্যান্য পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এর গুরুত্ব কমে যায় না। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে এই কাজগুলি বাছাইয়ের অন্তর্নিহিত নীতির প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে এবং এর অনুরূপ ও উচ্চতর মানের কাজ উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারণ কোরতে হবে। এ বিষয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে যে ধরনের ব্যবহারিক কাজকর্ম সুরু করা হয়েছে তাও যথাস্থানে আলোচনা কোরবো।

এখন "শিক্ষণ ব্যবহারিকা" থেকে প্রয়োজনীয় অংশগুলো উদ্ধৃত কোরে দেওয়া গেল :—

সামাজিক ও পৌরশিক্ষা

ভূমিকা: বুনিয়াদী শিক্ষায় শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশের দিকেই শুধু দৃষ্টি দেওয়া হয় না। যাতে সে ভবিষ্যৎ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়। বলা বাহুল্য যে, কতকগুলি পুঁথিগত উপদেশ দিয়ে শিশুকে নাগরিক করে তোলা যায় না।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়ায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের পক্ষে একটি ছোটখাট সমাজ হয়ে দাঁড়ায়। শ্রেণীর শৃঙ্খলারক্ষণ, আসবাবপত্র-সংগ্রহ ও তার যত্ন করা, হিসাব রাখা, শ্রেণীর পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, পানীয় ও (সম্ভব হলে) জলযোগের সুব্যবস্থা করা, উৎসব-অনুষ্ঠান, ও পরিচালন, রোগীর শুশ্রূষা, অতিথির সুপরিচর্যা প্রভৃতি কাজ এই সমাজের সম্মুখে স্বাভাবিকভাবে আসে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা

শিক্ষক ও শিশুসমাজ—এই শিশুসমাজ গণতান্ত্রিক আদর্শে পরিচালন করা হয়। প্রত্যেক শিশু এই সমাজের সক্রিয় সভ্য। শিক্ষকসমাজ পরিচালনে যুক্তি ও উপদেশ প্রদান করেন বটে—শুধু "আদেশ" দিয়েই তিনি তা পরিচালনা করেন না। শিশুদের গণতান্ত্রিক মতামতেই তা পরিচালিত হয়—তিনি সেই মতামতকে সুনিয়ন্ত্রিত করেন। প্রত্যেক শিশু এই সমাজপরিচালনে নিজ মতামত ব্যক্ত করতে পারে। তারাই বিভিন্ন কাজ চালাবার জন্য তাদের ভেতর হোতে এক একজনকে নির্বাচিত করে। ঐ নির্বাচিত শিশুকে **মন্ত্রী** বলা হয়। যেমন—শ্রেণীমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী, সাফাইমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইত্যাদি। এই 'মন্ত্রী' কথা ব্যবহারের তাৎপর্য এই যে এর দ্বারা শিশু তাদের প্রাপ্ত কর্মভারকে যথোচিত মর্যাদা দিতে শেখে এবং যে ভবিষ্যৎ সমাজের জন্য তারা প্রস্তুত হচ্ছে সেখানে "মন্ত্রী" ক্ষমতা ও সম্পদভাগী অর্থে ব্যবহৃত না হোয়ে "সেবক" অর্থেই যাতে ব্যবহৃত হয়, তার ভিত্তি এই শিক্ষার মধ্যে স্থাপিত হোচ্ছে।

শিশুরাই কর্মী ও পরিচালক

'মন্ত্রী' নির্বাচন—'মন্ত্রি'মণ্ডলী বা নেতৃমণ্ডলী নির্বাচনের মধ্যে শিশুরা যথেষ্ট আনন্দ ও কৌতুক অনুভব কোরবে, দায়িত্ববোধও জাগ্রত হবে—আর গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ কোরবে। একটা নির্দিষ্ট সময় পরে পরে মন্ত্রীদের নির্বাচন হবে এবং পুরাতন মন্ত্রীরা শিশুসমাজের কাছে তাদের কাজের বিবরণ দেবে। প্রথম শ্রেণীর শিশুরা লিখিত বিবরণ দিতে পারবে না—তারা মৌখিক বিবরণ দেবে। তারা বেশী দিনের কথা মনে রাখতে পারবে না—তাই তাদের নির্বাচন সাপ্তাহিক হওয়া ভালো। দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্বাচন পাক্ষিক হওয়া মন্দ নয়। তৃতীয় শ্রেণীর নির্বাচন মাসে একবার করাই ভালো। সমগ্র বিদ্যালয়ের সাধারণ কাজের জন্য একদল শিশুকে পৃথকভাবে নির্বাচিত করার প্রয়োজন হবে। এরা হবে বিদ্যালয়ের মন্ত্রিমণ্ডল—কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলের সঙ্গে তুলনীয়।

মন্ত্রিমণ্ডলী

ভোটদান পদ্ধতি—বয়স ও অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে নির্বাচনে ভোটদান-পদ্ধতির পরিবর্তন করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষে হাত তুলে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থাই ভালো। বড়দের জন্য "ব্যালট" ব্যবস্থা করা যায়। পঞ্চম শ্রেণীতে "একক সঞ্চরণশীল ভোট" (single transferable vote) ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

নির্বাচন

ঐরূপ নির্বাচনব্যাপারে উৎসাহ থাকা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু যাতে মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার, ধ্বংসাত্মক আলোচনা, বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি না ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখবেন।

মন্ত্রীর সংখ্যা ও কাজ—শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে নিয়মত মন্ত্রিপদ সৃষ্টি করা যায়।

১। **শ্রেণীমন্ত্রী**।—এ কাজ হবে শ্রেণীর শৃঙ্খলারক্ষা—শ্রেণীর কাজের জন্য আসবাব প্রভৃতির ব্যবস্থা করা ও তার যত্ন নেওয়া, শিশুদের সাহায্যে শ্রেণীর শৃঙ্খলা-

রক্ষার জন্য নিয়ম রচনা করা ও সকলকে সেগুলিকে মান্য করার প্রতি অবহিত রাখা, উপস্থিতি-অনুপস্থিতির হিসাব রাখা ইত্যাদি।

শ্রেণীর শৃঙ্খলারক্ষার নিয়মগুলি সহজ হওয়া দরকার আর নিষেধাত্মক শব্দ অপেক্ষা অনুজ্ঞাত্মক শব্দ থাকাই ভালো। বেশী বিধিনিষেধ সৃষ্টি না করে কয়েকটি সহজ আচরণযোগ্য নিয়ম মাধ্যমে শৃঙ্খলা-রক্ষার শিক্ষা একটা বড় শিক্ষা। সেদিকে যথোচিত দৃষ্টি দিতে হবে। কয়েকটি নিয়মের উদাহরণ এখানে দেওয়া গেল—

তার দায়িত্ব ও কাজ

১। "একে যবে কথা কয়, অন্য সবে মৌন রয়।"

২। আগে ভাগে নাহি যাবো, পালার জন্য সবুর সব।"

শ্রেণীমন্ত্রী শ্রেণীর শৃঙ্খলারক্ষা ও আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখার ব্যাপারে অন্য শিশুদের সহযোগী মনোভাব-সৃষ্টির দিকেই যাতে সচেষ্ট হয়, আইনের কড়াকড়ি না ঘটায়, সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দেবেন। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে কোন কোন শিশুর জন্য কঠোরতার প্রয়োজন ঘটতে পারে, তখন শ্রেণীমন্ত্রী সেই শিশুর আচরণের প্রতি বিচারসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

২। **সাফাই মন্ত্রী**—বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম পাঠই সুরু হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হতে—"নঈ তালিম সাফাই সে সুরু হোতি হায়।" প্রচলিত বিদ্যালয় ও তার আবেষ্টনীর অপরিচ্ছন্নতা বিচার করলে, পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এই প্রখর দৃষ্টির সার্থকতা সহজেই বোঝা যাবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে শুধু "সাফ" রাখলেই চলবে না, শিশুদের মনে পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে এমন চেতনাবোধ জাগাতে হবে যেন তারা আমাদের জাতীয় চরিত্রের অন্যতম প্রধান দুর্বলতা—অপরিচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারে এবং পরিচ্ছন্নতা তাদের জীবনের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়। শিক্ষকমহাশয়ের আচরণ এবিষয়ে আদর্শ হওয়া উচিত। সমগ্র ভারতের দৃষ্টিতে জাতির জীবনে এইরূপ পরিচ্ছন্নতা আনতে হলে প্রতি নাগরিককে ব্যক্তিগত সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা রক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। শৈশব থেকে তাদের অভ্যাসকে এর অনুকূলে গঠন কোরতে হবে। শ্রেণীগতভাবে উক্ত অভ্যাস সম্বন্ধে সজাগ থাকার কাজ হবে সাফাই-মন্ত্রীর। সে অপরের সহায়তায় শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখবে এবং সকলকে পরিচ্ছন্নতা-রক্ষার বিধান ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করবে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৩। **শিল্প-মন্ত্রী**—এই কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত শিশু বিভিন্ন শিল্প-সংক্রান্ত সরঞ্জাম রক্ষা, বিতরণ ও সংগ্রহের দায়িত্ব নেবে। শিল্প-সংক্রান্ত হিসাব রাখবে। সরঞ্জামাদির যাতে অপচয় না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেবে। মাল ফুরিয়ে গেলে আমদানির ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজন বুঝলে বিভিন্ন শিল্পকর্মের জন্য পৃথক মন্ত্রী নির্বাচন করা যেতে পারে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৪। **উদ্যান-মন্ত্রী**—কৃষি-জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়—এজন্য জীবনকেন্দ্রিক বুনিয়াদী শিক্ষায় কৃষিকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করা হয়। বলা বাহুল্য, শিশুরা বাগানের কাজ নিজেরাই করবে। কৃষি-মন্ত্রী এই কাজ পরিচালনা করবে। সে সময়-পত্রিকা (Time Table) রচনায় অংশগ্রহণ করবে। কৃষিকাজের জন্য দল ভাগ করবে—কাজের পরিকল্পনা করবে—সরঞ্জামাদির ব্যবস্থাপন করবে ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে—সারের ব্যবস্থা করবে ও সাফাই-মন্ত্রীর সহযোগিতায় আবর্জনা থেকে সার তৈরি করবে, উৎপন্ন সবজির হিসাব রাখবে ও বিক্রয় বা বিতরণ করবে—বীজ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে। সে অবশ্যই একা এইসব কাজ করবে না—তার পরিচালনাধীনে অন্য শিশুরাও অংশ নেবে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৫। **স্বাস্থ্য-মন্ত্রী**—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রোগের চিকিৎসা অপেক্ষা রোগের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার প্রতিই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়। এজন্য শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক নিয়মগুলি মান্য করানো অবশ্য প্রয়োজন। স্বাস্থ্য-মন্ত্রী এই কাজ পরিচালনা করবে। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার প্রাথমিক চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করাও স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর কাজ। স্বাস্থ্য-মন্ত্রী শিক্ষক ও শ্রেণীর শিশুদের সাহায্যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ করবে ও সেগুলি যথাযথ পালন করা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৬। **খাদ্য-মন্ত্রী**—সাধারণ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে দৈনন্দিন আহারের ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে, কিন্তু শিশুদের নাগরিক শিক্ষার জন্য ও আনন্দবিধানের জন্য মাঝে মাঝে সামুদায়িক ভোজন-ব্যবস্থা করা হবে। তাছাড়া যদি অভিভাবকদের সহযোগিতায় একবার জলযোগের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখা যায়, তবে খুবই ভাল হয়। বিশুদ্ধ পানীয়ের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকবে। খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ ব্যাপারে শৃঙ্খলারক্ষা, বিশুদ্ধতা-বিধান, অপচয়-নিবারণ প্রভৃতি কাজ খাদ্য-মন্ত্রীর দায়িত্বভুক্ত হবে। খাদ্য-মন্ত্রীর ঐসব দায়িত্ব প্রতিপালনে সাফাই-মন্ত্রী ও শ্রেণী-মন্ত্রীর সহায়তা লাগবে। তাছাড়া অন্য শিশুর সহযোগিতা তো পাবেই।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৭। **সময়-মন্ত্রী**—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সময়ানুবর্তিতা রক্ষার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এজন্য এই কাজের ভারও অন্য একজন মন্ত্রীকে দেওয়া ভালো। সে শ্রেণীকে সময়ানুবর্তী করার চেষ্টা করবে। কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের সময়-সংকেত প্রদান প্রভৃতি কাজ তাকেই করতে হবে। সময়ের অপচয়-নিবারণ ব্যাপারেও তাকে সচেষ্ট হতে হবে। যথাসময়ে যাতে শ্রেণীর কাজ সুরু হয় এবং শেষ হয়, তারও দায়িত্ব নিতে হবে সময়-মন্ত্রীকে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৮। **উৎসব-মন্ত্রী**—বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎসবের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। উৎসবকে শিক্ষণীয় করার কাজে পরিকল্পনা, প্রয়োগ ও বিচার এই তিনটি ব্যাপারেই যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। এইসব কাজ একজন মন্ত্রীর দায়িত্বে করার ব্যবস্থা থাকা খুবই ভালো। উৎসব-মন্ত্রী বৎসরের যথেষ্ট পূর্ব হতে প্রস্তুতির ব্যবস্থা করবে, সময়-পত্রিকা রচনার ব্যবস্থা করবে, বিভিন্ন উৎসবাঙ্গের সংযোগ স্থাপন করবে—সেই উদ্যোগী হয়ে সাফাই-মন্ত্রী, খাদ্য-মন্ত্রী, শ্রেণী-মন্ত্রী প্রভৃতির সহায়তা নিয়ে উৎসবকে পূর্ণ রূপ দেবে এবং উৎসবে সৌন্দর্য ও চারুকলার সংযোগবিধান করবে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

৯। **অতিথি-মন্ত্রী**—অতিথি-অভ্যাগতদের প্রতি শিষ্টাচার-প্রদর্শন শিক্ষার বিশিষ্ট অঙ্গ হবার যোগ্য। একাজের জন্য একজন অতিথি-মন্ত্রী নির্বাচন করতে পারা যায়। সে অতিথির যথোচিত সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করবে—তার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি দেবে—আবশ্যক হলে, তাঁর খাদ্য ও শয়ন-ব্যবস্থা করবে।

তার দায়িত্ব ও কাজ

এ ছাড়া সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একজন প্রধান-মন্ত্রী থাকা ভালো। এঁর কাজ হবে বিভিন্ন শ্রেণীর যৌথ ব্যাপারগুলি পরিচালনা ও মীমাংসা করা। বিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেশী হলে আবাসিক বা আধা-আবাসিক হলে, সমগ্র বিদ্যালয়ের বা ছাত্রাবাসের জন্য এইরকম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়ানো যায়।

প্রধান-মন্ত্রী ও তার কাজ

বিচার-সভা—সমগ্র বিদ্যালয়ের জন্য একটা বিচার-সভা থাকার প্রয়োজন। এটিও শিশুদের ভোটেই গঠিত হবে। এর গঠনব্যাপারে শিক্ষকমহাশয়ের যথেষ্ট কুশলতা-প্রদর্শন করা চাই। কোনও শিশুর বিসদৃশ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এই বিচার-সভার সহায়তা-গ্রহণ খুবই প্রয়োজন। এজন্য শিক্ষকমহাশয় দেখবেন বিচার-সভার সভ্যগণ যেন বিশেষ উদ্যোগী হয়।

নাগরিকতার শিক্ষা—বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পৌরশিক্ষার যে ব্যবস্থার কথা বলা হ'ল তা হচ্ছে পৌর শিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট পন্থা। এখানে পৌর শিক্ষা পুঁথিগত হচ্ছে না, বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমেই হচ্ছে। অথচ এর সহায়তায় তারা পৌরনীতির অনেক জ্ঞানই ভালভাবে পেতে পারবে। বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত শিশুসমাজ প্রথম থেকেই সম্পূর্ণভাবে গঠন করতে গেলে তা কৃত্রিম হবে। প্রথম শ্রেণীর শিশুরা তো অত ব্যাপার বুঝবেই না। তাদের মন্ত্রীসংখ্যাও কমই হবে—শ্রেণী-মন্ত্রী, শিল্প-মন্ত্রী, সাফাই-মন্ত্রী, উদ্যান-মন্ত্রী ও খাদ্য-মন্ত্রী হলেই চলবে। তারা মৌখিক বিবরণী দেবে—নির্বাচনও সপ্তাহান্তে হবে যেন মনে ক'রে কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিতে পারে। ক্রমেই জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসংখ্যা বাড়বে, মন্ত্রীদের কার্যকালও বাড়বে—তাদের দায়িত্ববোধ বাড়বে—তারা লিখিতভাবে বিবরণী দিতে চেষ্টা করবে—আত্মপ্রকাশে

কাজের মাধ্যমে বাস্তব পৌর শিক্ষা

প্রেরণা পাবে। আলোচনা ও প্রয়োজনবোধের মধ্য দিয়েই নাগরিকতার শিক্ষা জীবনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে—তারা চিন্তায় ও আচরণে আদর্শ নাগরিক হবে।

আনন্দ-উৎসব

বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎসবানুষ্ঠানকে শিক্ষাদানের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করা হোয়েছে। আনন্দোৎসব একদিকে যেমন শিশুকে আনন্দ দান করে ও তাকে কর্মোদ্যমে উদ্বুদ্ধ করে, অন্যদিকে তেমনি এগুলি শিশুমনে জিজ্ঞাসাবোধ জাগ্রত করে। আনন্দোৎসবের ভেতর দিয়ে শিক্ষায়তনের সঙ্গে পল্লীবাসীর ও শিক্ষক-ছাত্রের সঙ্গে অভিভাবকদের সংযোগ স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠান-সূচীতে বিভিন্ন রকমের কাজ থাকায় শিশুরা নিজ নিজ রুচি-প্রবৃত্তিসম্মত কাজ নির্বাচনের সুযোগ পায় এবং তাই উৎসবায়োজনের মধ্য দিয়ে শিক্ষকগণও শিশুদের রুচি-প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য অনুধাবন কোরতে পারেন। শিশুর বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করলে তাতে কোরে শিশুচিত্তকে তার ঘনিষ্ঠ পরিবেশ থেকে বৃহত্তর জাগতিক পরিবেশে নিয়ে যাওয়াও সহজ হয়। ফলে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক জ্ঞান শিশুর কাছে আর সংগৃহীত তথ্যনিচয় মাত্র থাকে না। এগুলো তার কাছে জীবন্ত হোয়ে ওঠে। আবার উৎসবায়োজনের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন শিল্পকলা ও কৃষ্টির স্বাভাবিক পরিবেশন-সহায়ে পল্লীবাসীর মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার কাজও ভালভাবে হোতে পারে। উৎসবানুষ্ঠানগুলি ভারতীয় কৃষ্টির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হওয়ায় এগুলি যে শিক্ষাদানের সুন্দর স্বাভাবিক মাধ্যম হোতে পারে তাতে আর সন্দেহ কি।

এগুলির প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য

শিক্ষকগণ যখন বিদ্যালয়ে আনন্দোৎসবের আয়োজন কোরবেন তখন উপরের কথাগুলি মনে রাখবেন। তাঁরা আরও মনে রাখবেন যে অনুষ্ঠান-সূচী রচনায় ও তার সম্পাদনায় শিশুদেরই সক্রিয় অংশ দিতে হবে। তাঁদের কাজ হবে পশ্চাতে থেকে সুকৌশলে পরিচালিত করা। উৎসবগুলি নির্বাচনকালে শিক্ষক শিশুর মানসিক ও বৌদ্ধিক অগ্রগতি ও তার পরিবেশকেও বিবেচনা কোরবেন। তিনি দেখবেন উৎসবগুলি যেন প্রাণহীন অনুষ্ঠান মাত্রে পর্যবসিত না হয়।

উৎসব পরিচালনায় শিক্ষকের সতর্কতা

অনুষ্ঠান-সূচী রচনায় উৎসবের উদ্দেশ্য সর্বদা মনে রাখতে হবে। অনুষ্ঠান-সূচী প্রস্তুতকালে দেখতে হবে যেন—

(১) অনুষ্ঠান দ্বারা শিশুদের ও গ্রামবাসীদের কৃষ্টিগত নৈতিক ও সামাজিক মান উন্নত হোতে পারে।

(২) এ যেন শিশুদের কাছে আনন্দদায়ক হয়।

(৩) ব্যয়বাহুল্য না হয়।

(৪) অনুষ্ঠানটির দ্বারা যেন এর উদ্দেশ্য সাধিত হোতে পারে।

শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন যেন উৎসবগুলিতে একঘেয়েমি না আসে। কেননা তাহলে একটি শুষ্ক প্রাণহীন প্রথায় মাত্র পর্যবসিত হবে। উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত কোরতে হোলে তার জন্য সময় দেওয়াও দরকার। তাই সময় থাকতে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কাজকর্মের অসুবিধা না কোরেই যতদূর সম্ভব কোনো অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হোতে হবে। উৎসবের ধরন অনুযায়ী শিল্প, চিত্র, নানারকমের সংগ্রহ এবং সঙ্গীত ও অভিনয় দিয়ে অনুষ্ঠানটিকে শিক্ষণীয় কোরে তুলতে হবে। ব্যায়াম-প্রদর্শনীর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। কিন্তু সব সময়েই ব্যয়বাহুল্য ও বাহ্যাড়ম্বর বর্জন কোরতে হবে। শিল্প ও চিত্র-প্রদর্শনী দ্বারা শিশুদের ও গ্রামবাসীদের শিল্প ও চিত্রকুশলতাকে উৎসাহ দেওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হবে।

উপযুক্ত প্রস্তুতি প্রয়োজন

সঙ্গীত ও অভিনয়ের উদ্দেশ্যও তেমনি কেবলমাত্র আনন্দ-উপভোগ হবে না; এতে যাতে শিশুরা ও গ্রামবাসীগণ শিক্ষালাভ করে ও কলাকৌশল অর্জন কোরতে পারে তা দেখতে হবে। এগুলিতে যাতে শিশুরা ও গ্রামবাসিগণই প্রধান অংশ নেয়, সেদিকেও নজর রেখে আয়োজন কোরতে হবে। সঙ্গীত ও অভিনয়-নির্বাচনকালে শিশুদের ও গ্রামবাসীদের বোধশক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে নির্বাচন কোরতে হবে। চিত্র, সঙ্গীত ও অভিনয়ের মধ্য দিয়ে আনন্দ পরিবেশনের স্থলে এমন কোন কিছু যেন না থাকে যা নৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নতির পরিপন্থী। শিল্প-প্রদর্শনীর সাহায্যে বিদ্যালয় ও গ্রামের শিল্পোদ্যমকে উৎসাহ দেওয়া হবে—শিক্ষামূলক প্রচারপত্র-প্রস্তুতি থেকে প্রদর্শনী পর্যন্ত নানাভাবে শিক্ষাপ্রদ হবে—ব্যায়াম-প্রদর্শনী স্বাস্থ্যবিচারে উৎসাহ সৃষ্টি কোরবে এবং সংগ্রহ-প্রদর্শনী প্রকৃতি-পাঠ—বিজ্ঞান থেকে সুরু কোরে প্রত্নতত্ত্ব, ভাস্কর্য অবধি শিক্ষার ক্ষেত্রকে বর্ধিত কোরবে। এ ক্ষেত্রে শিশুর ও গ্রামবাসীদের গ্রহণক্ষমতা ও আর্থিক সামর্থ্যকে দৃষ্টিপথে রাখতে হবে। ব্যায়াম নির্বাচনকালে শিশুর দৈহিক সামর্থ্যের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। একথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে যেন কোন ক্ষেত্রেই এই উৎসবায়োজনের মধ্যে শিশুর প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব না আসে। কোনও শিশুর উৎসাহের আধিক্য অন্য কোনো শিশুর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত না করে, সে বিষয়ও দেখা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত কৃতকার্যতার জন্য যেন কোন পুরস্কার দেওয়া না হয়।

সঙ্গীত ও অভিনয়ের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও শিক্ষাক্ষেত্রের পরিবর্ধন

পরিশেষে কোনও উৎসবানুষ্ঠান যেন ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ঘৃণার উদ্রেক না করে, সেদিকেও শিক্ষক নজর দেবেন। কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের ভাবধারাপুষ্ট উৎসবের অনুষ্ঠান না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সংকীর্ণতা পরিহার

পৌষপার্বণ, শ্রীপঞ্চমী, নবান্ন, চৈত্র-সংক্রান্তি প্রভৃতি বাংলায় সুপরিচিত উৎসব। বিদ্যালয়ে এগুলিকে শিক্ষণীয় ভাবে করা যেতে পারে। পৌষপার্বণে বিভিন্ন শস্যশীর্ষ-

সংগ্রহ-প্রথাকে প্রকৃতি-পাঠের সহায়করূপে ব্যবহার করা যায়।...চৈত্র-সংক্রান্তি প্রভৃতি কয়েকটি উৎসবে এমন অনেক প্রথা আছে যা নিষ্ঠুরতাব্যঞ্জক ও কৃষ্টিবিরোধী। শিশুরা যাতে এ সকল প্রথানুশীলনে প্রবৃত্ত না হয় শিক্ষক শিশুদের মধ্যে সেরূপ মনোভাবের সৃষ্টি কোরবেন। ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষকের বিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হোতে হবে যেন শিশুর বা অভিভাবকগণের মনে বিরোধী প্রতিক্রিয়া না আসে। পূর্বোক্ত ঋতু-উৎসবগুলি ছাড়া বৃক্ষরোপণ বা বর্ষোৎসব, নববর্ষোৎসব, উত্তরায়ণ-উৎসব প্রভৃতির অনুষ্ঠান করা যেতে পারে। অনুষ্ঠান-সূচী এমনভাবে রচনা কোরতে হবে যাতে শিশুরা প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সুপরিচিত হোতে পারে ও তাদের বৈজ্ঞানিক তথ্যানুশীলন-প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়।

সামাজিক ও প্রাকৃতিক উৎসবগুলির তাৎপর্য

"বোশেখ মাসে বৃক্ষে জলদান", "জলছত্র প্রদান" প্রভৃতি প্রথাকে সার্থক ও শিক্ষণীয় ভাবে ব্যবহার করা যায়।

পৌষ-উল্লাস প্রভৃতি প্রচলিত সামাজিক রন্ধন ও ভোজন-উৎসবকেও শিক্ষাপ্রদভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যান্য উৎসবেও রন্ধন ও একত্রে ভোজনের আয়োজন করা যায়। আবাসিক নয় এমন বিদ্যালয়ে এরূপভাবেই শিশুদের খাদ্যবিজ্ঞান-শিক্ষার সুযোগ দেওয়া সম্ভব হোতে পারে। এই রন্ধন ও ভোজন ব্যাপারে বিলাসিতা ও খাদ্যসামগ্রীর অপব্যবহার না হয়, শিশুরা অমিতভোজন না করে, শিক্ষক সেদিকেও নজর রাখবেন। সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত বিভেদ-প্রথাও এতে বর্জন কোরতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের বালিকাদের মধ্যে গোকল নামে একটি ব্রতানুষ্ঠান আছে। এই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে গৃহপালিত পশুর প্রতি শিশুদের মমত্ববোধ জাগাতে পারা যায় এবং সমস্ত পশু সম্বন্ধে তাদেরকে জ্ঞানদান করাও সহজ হয়।

রাষ্ট্রীয় উৎসবানুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমরা শিশুদের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন কোরতে পারি। শিশুদের ও গ্রামবাসিগণের রাষ্ট্রীয় ও সমাজিক শিক্ষার জন্য এগুলির একান্ত প্রয়োজন। পতাকা-অভিবাদন, সমবেত সূতাকাটা, সমবেত সাফাই, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি এই শ্রেণীর উৎসবানুষ্ঠান হোতে পারে।

রাষ্ট্রীয় উৎসবের তাৎপর্য

মহাপুরুষের প্রতি ব্যক্তিদের জন্ম ও মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন দ্বারা শিশুদের চেতনা ও জ্ঞানার্জন-স্পৃহা জাগ্রত করা যায়। বুদ্ধ, মোহম্মদ, যীশুখ্রীষ্ট, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীচৈতন্য, রামমোহন রায়, প্রভৃতি মহাপুরুষগণের স্মরণানুষ্ঠান দ্বারা শিশুমনে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা আনতেও পারা যায়। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক শিক্ষারত একটি স্বাভাবিক পটভূমিকা রচনা করা সম্ভব হোতে পারে। বিভিন্ন ধর্মগুরুর স্মরণানুষ্ঠানে ধর্মীয় কৃষ্টি অনুযায়ী অনুষ্ঠান-সজ্জা করে ও ঐ উপলক্ষে বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী সদব্যক্তিগণের সঙ্গে শিশুদের সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে ধর্মবিষয়ে শিশুদের দৃষ্টিভঙ্গীকে

উদ্ধার করা যায়। গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি রাষ্ট্র ও সমাজসেবক মহৎ ব্যক্তিগণের স্মরণানুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও অনুরূপভাবে শিশুকে জ্ঞান ও আদর্শনিষ্ঠা-অর্জনের সুযোগ দিতে হবে। এইসব অনুষ্ঠানে মহাপুরুষদের শিশুবোধ্য সরল এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের কর্মপরিচয়-সম্বলিত চিত্র, আলেখ্য প্রভৃতিকে অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উঁহাদের জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতা, সঙ্গীত বা অভিনয়-অনুষ্ঠানকে অনেকখানি সাফল্যযুক্ত কোরতে পারে। এই উপলক্ষে অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুরা তাদের রচনা পড়তে ও আবৃত্তি কোরতে পারে। চিত্র ও আলেখ্যও শিশুরাই কোরবে। অনুকরণশীল শিশুরা এ থেকে অঙ্কন করবার ও লিখবার আকাঙ্ক্ষা অর্জন কোরবে। শিশুদের বয়স, তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের পরিধি-বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে অতি-পরিচিত মহৎ ব্যক্তিগণের স্মরণানুষ্ঠান থেকে শুরু করে ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিতগণের জন্ম ও মৃত্যুতিথি পালনের ব্যবস্থা কোরতে হবে। এইসব অনুষ্ঠানে যে সকল প্রদর্শনী অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা হবে সেগুলি যেন এমন হয় যাতে উচ্চতর শ্রেণীর শিশুরা এইসব মহাপুরুষদের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম কোরতে সমর্থ হয়।

মহাপুরুষদের স্মরণানুষ্ঠান

উৎসবে যে অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি থাকবে সেগুলো এমন হওয়া উচিত যাতে এগুলি কোনও মানবগোষ্ঠীর প্রতি শিশুকে বীতশ্রদ্ধ না করে। কৌতুক অভিনয় সম্বন্ধে একথা ভালভাবে মনে রাখা উচিত। কেননা সাধারণতঃ কৌতুকসৃষ্টির জন্য কোনও অঞ্চলের অধিবাসীর কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণকে বিকৃত কোরে দেখান হয়। এতে শিশুমনে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠীর প্রতি অশ্রদ্ধা আসতে পারে। তাই এদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থানীয় উৎসব উপলক্ষে যে মেলা হয়ে থাকে শিশুরা যাতে সেখানে সুশৃঙ্খলভাবে যায়, শিক্ষক সেদিকে দেখবেন। শিশুরা এই সমস্ত কিছু কিছু জনসেবার কাজও করতে পারে।

সতর্কতা

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি উৎসবের নাম ও তাদের উদ্‌যাপন-দিনের তারিখ দেওয়া হোলো। বলা বাহুল্য, যে সকল বিদ্যালয়ে এই সবকয়টি উৎসবই যে অনুষ্ঠিত হবে এমন কোনোও বাধ্যবাধকতা নাই। পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষক এগুলির মধ্যে কোন্ কোন্‌টির অনুষ্ঠান করা চলে, তা ঠিক কোরবেন—

উৎসবের একটি তালিকা

(১) নববর্ষ উৎসব—১লা বৈশাখ।
(২) মোহম্মদ-জয়ন্তী—
(৩) রবীন্দ্র-জয়ন্তী—
(৪) বুদ্ধ-পূর্ণিমা—বৈশাখী-পূর্ণিমা।
(৫) বর্ষামঙ্গল—আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ (বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ)।
(৬) রাখীবন্ধন উৎসব—ভাদ্র-পূর্ণিমা।

(৭) স্বাধীনতা উৎসব—১৫ই আগস্ট।
(৮) জন্মাষ্টমী—ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী।
(৯) গান্ধী-জয়ন্তী—২রা অক্টোবর।
(১০) নবান্ন-উৎসব—অগ্রহায়ণ মাস।
(১১) নেতাজী জন্মতিথি—২৩শে জানুআরি।
(১২) গণতন্ত্র দিবস—২৬শে জানুআরি।
(১৩) মহাত্মাজীর তিরোধান-দিবস—৩০শে জানুআরি (সর্বোদয় দিবস)।
(১৪) বিবেক পুণ্যদিবস—মাঘী শুক্লা-সপ্তমী।
(১৫) শ্রীপঞ্চমী—মাঘী শুক্লা-পঞ্চমী।
(১৬) কস্তুরবা স্মৃতিদিবস—২২শে ফেব্রুআরি।
(১৭) জাতীয় সপ্তাহ—৬ হইতে ১৩ই এপ্রিল।

এছাড়া বিদ্যালয়ের বৌদ্ধিক মান যদি উন্নত হয়, তবে নিচের উৎসবগুলি সমগ্র বিদ্যালয়কে নিয়ে বা শ্রেণীগতভাবে পালন করা যেতে পারে। এতে কোরে শিশুমনকে বৃহত্তর আদর্শ ও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় নিয়ে যাওয়া যাবে—

(১) রামমোহন জন্মদিন—১০ই মে।
(২) সিরাজ জন্মদিন—৩রা জুলাই।
(৩) দেশবন্ধু ও আচার্য রায় স্মৃতিদিন—১৬ই জুন।
(৪) মাইকেল স্মৃতিদিবস—
(৫) তিলক স্মৃতিদিবস—১লা আগস্ট।
(৬) মহাবীর দিবস—১১ই এপ্রিল।
(৭) রামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—১৩ই মাঘ।
(৮) চৈতন্য-জয়ন্তী—ফাল্গুনী-পূর্ণিমা।
(৯) গুরুগোবিন্দ জন্মদিন—২৬শে ডিসেম্বর।
(১০) বিদ্যাসাগর স্মৃতি-দিবস—১৩ই শ্রাবণ।
(১১) শ্রীঅরবিন্দ জন্মদিন—১৫ই আগস্ট।
(১২) বঙ্কিম-স্মৃতিদিবস—২৬শে চৈত্র।
(১৩) ঈদ্—(পরিবর্তনশীল)।
(১৪) গুড্ ফ্রাইডে—পুণ্য শুক্রবার।
(১৫) শিবাজী-উৎসব—ভাদ্র শুক্লা-চতুর্থী।

অন্যান্য উৎসবের তারিখ—

(১) ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (রাখীবন্ধন)—কার্তিকী শুক্লা-দিবস।
(২) দীপালি-উৎসব—কার্তিকী অমাবস্যা।
(৩) চৈত্র-সংক্রান্তি—বৎসরের শেষ দিন

আমরা ইতিপূর্বে সমাজবিদ্যার শিক্ষণ-পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে প্রজেক্ট-পদ্ধতি, তার উপযোগিতা এবং শিক্ষাদান-ব্যবস্থায় তার যথাযোগ্য ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা

কোরেছি। বস্তুতঃ প্রজেক্ট কর্মধারাকে ব্যবহারিক কর্ম বলেই গণ্য করা উচিত। প্রজেক্টগুলি হবে সৃজনাত্মক কর্ম। এ প্রসঙ্গে 'শিক্ষণ-ব্যবহারিকা'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :—

"বুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিকে কর্মকেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে হলে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিশুদের বহুবিধ বিচিত্র কাজ করবার অবকাশ ও সুযোগ দিতে হবে। কোন্ শিশু ঠিক কি কাজ করবে তার কোথাও নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভবপর নয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মূলনীতিগুলি স্মরণ করে এবং বিশেষ বয়সের শিশুদের দৈহিক ও মানসিক প্রয়োজন ও সামর্থ্য বুঝে এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুসারে শিক্ষকমহাশয় বিভিন্ন কর্মের ব্যবস্থা কোরবেন। একটি শ্রেণীর সমস্ত কয়টি শিশুকে যে একই কাজ করতে হবে তার কোন অর্থ নেই। একই সাধারণ ব্যবস্থার মধ্যেও প্রত্যেকটি শিশুকে তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও পছন্দ অনুসারে স্বাধীনভাবে সৃজনাত্মক কার্য কোরতে দিলে ক্রমে তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হবে।"

স্বাধীন সৃজনাত্মক কার্য

এর সাথে নিম্নোদ্ধৃত অংশটিও বিচার করা দরকার। "অনেক সৃজনাত্মক কর্ম শিশুরা সংঘবদ্ধভাবে কোরতে পারে। ছয় সাত বৎসরের শিশু অপেক্ষা আট, নয়, দশ বৎসরের মধ্যে শিশুদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে কাজ করবার ক্ষমতা ও উৎসাহ বেশী দেখা যায়। এই সকল Project যেন শিক্ষকমহাশয় অনিচ্ছুক বা নিরুৎসাহ ছাত্রদের স্কন্ধে চাপিয়ে না দেন। শিশুদের নিজেদের উৎসাহ এবং ঔৎসুক্য অনুসারেই তারা কাজ কোরবে। তাদের সাহায্যকারী এবং বন্ধুহিসাবে শিক্ষকমহাশয় সকল সময়েই উপস্থিত থাকবেন। প্রয়োজন হোলে তাদের কার্যকলাপে তিনি সহায়তা কোরবেন এবং শিশুদের কৌতুহলোদ্দীপক বিষয়টির মধ্য দিয়ে তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহার সাহায্য নিয়ে তাদের নূতন বিষয়ে শিক্ষা দেবেন এবং বিভিন্ন শিল্পশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন কোরবেন। উপযুক্ত একটি Project-এর মধ্য দিয়ে একাধারে মাতৃভাষা, অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল ইত্যাদি বহু শিক্ষা অগ্রসর হোতে পারে এবং কাঠের কাজ, মাটির কাজ, কাগজ ও কার্ডবোর্ডের কাজ, সূচিশিল্প প্রভৃতি শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। এই সকল শিশুদের স্বাধীন ও স্বাভাবিক আগ্রহকে কেন্দ্র কোরে হয় বলে শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় এবং পাঠ্যবিষয় ও শিল্পকর্মের প্রতি শিশুদের আকর্ষণ ও ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায়। উচ্চতর শ্রেণীতে অথবা পরবর্তী জীবনে যখন তারা এর মধ্যে যে কোনও একটি পাঠ্যবিষয় বা হস্তশিল্পের চর্চা করে, তখন তার শিক্ষা এত দ্রুত অগ্রসর হয় যা অন্যথা সম্ভবপর হোতো না।"

সংঘবদ্ধভাবে কাজ

প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পশিক্ষা

বস্তুতঃ, এক একটি সৃজনাত্মক কর্ম শুধু নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না, পরন্তু শিশুর সমস্ত জ্ঞানরাজ্যকেই উদ্ভাসিত ও পূর্ণতর করে। একটি কর্ম বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে পূর্ণতর করে এবং শিশুর চিন্তা, কার্য, দক্ষতা

ও আচরণকে একত্র গ্রথিত করে। সমাজবিদ্যায় ব্যবহারিক শিক্ষাদানের গুরুত্ব এইজন্য সর্বাপেক্ষা বেশী। **আবার এই ব্যবহারিক কর্ম নির্বাচনের সময় সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতার ওপর যেমন জোর দেওয়া হবে, তেমনই ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচি-ভেদকেও স্বীকার কোরে নেওয়া হবে।** বাস্তব সমাজেও তো সকলেই এক কাজ করে না। সকলেই এক বিরাট সমাজসংগঠনের মধ্যে সংঘবদ্ধ, অথচ বিভিন্ন বৃত্তি-আচরণ কোরে সমাজের বহুমুখীন উদ্দেশ্য সফল করে ও সেগুলির পূর্ণতা দান করে। আমাদের সমাজবিদ্যা-পাঠের ব্যবহারিক কর্মগুলোও ঠিক একই উদ্দেশ্য সাধন কোরবে। তাছাড়া **সংঘবদ্ধতা ও সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচিভেদ আপাতঃ-দৃষ্টিতে দুটি পরস্পরবিরোধী নীতি হলেও তা নিয়ে উদ্বেগ অনুভব করার কিছু নেই। কারণ আমরা কোন Project-এর মধ্যে এই দুটি নীতিকেই একসাথে কাজে লাগাই।** ধরা যাক, আমাদের সুপরিচিত "রবীন্দ্র-উৎসব" প্রজেক্টের কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিমূর্তি-অঙ্কন, মূর্তিগঠন, মণ্ডপরচনা, রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে কবিতারচনা, তাঁর জীবনী ও সৃষ্টি-বিষয়ক প্রবন্ধরচনা, কবিতা-আবৃত্তি, সঙ্গীত-পরিবেশন, তাঁর বিভিন্ন রচনা থেকে বক্তৃতাদান প্রভৃতি বিষয়ে তো আমরা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচি অনুসারেই ভাগ কোরে দিয়ে থাকি। অথচ প্রত্যেকটি কাজই একটি সংঘবদ্ধ ও সহযোগিতামূলক প্রজেক্টের অঙ্গ। এর সাথে রবীন্দ্রনাথের নাটক ও প্রহসনের অভিনয়াদি যোগ করতে পারলে কর্মকাণ্ডটি যেমন বিচিত্র ও বহুমুখী হয়, তেমনি তার সুশৃঙ্খল পরিচালনার ফলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচির পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। Milton বলেছেন, "**They also serve who only stand and wait**"—সেই মূল্যবান শিক্ষাটিও এই প্রজেক্টের মাধ্যমেই নিষ্পন্ন হয়। ধরা যাক, এই প্রকল্পটি কার্যকরী কোরতে গিয়ে একটি শিক্ষার্থীকে একটি কোণে সারাক্ষণের জন্য একজন নিঃশব্দ প্রহরীর কাজ দেওয়া হলো, আর সে তা কর্তব্যপরায়ণ সৈনিকের মতো শেষ কোরলো। তার এই নীরব ধৈর্য-শিক্ষা সহস্র বাক্যের অপব্যয় থেকে যে মূল্যবান এবং উত্তরজীবনে এই শিক্ষা যে তাকে জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝাকে নীরব ধৈর্যের সাথে অতিক্রম করার শক্তি ও সাহস জোগাবে সেকথা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ যে কোনো Project বা ব্যবহারিক কর্মই সহযোগিতা ও ক্ষমতাভেদের নীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এই দুটো নীতিকে সুগ্রথিত করে শৃঙ্খলাবোধ ও সুসঙ্গত আচরণ যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে জন্ম দেয় সমাজবিবেক এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সামাজিক জ্ঞান আহরণে ও সামাজিক কর্তব্যপালনে উন্মুখ কোরে তোলে। উপরে "শিক্ষণ-ব্যবহারিকা" থেকে যে অংশগুলো উদ্ধৃত কোরেছি, মাধ্যমিক শিক্ষকমহাশয়েরা তার অন্তর্নিহিত নীতিগুলো ও দিকনির্দেশ অনুধাবন কোরলে যথেষ্ট লাভবান হবেন আশা করি। উচ্চতর শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যবহারিক কর্মের

ব্যবহারিক কাজের ভিত্তি—সংঘবদ্ধতা, সহযোগিতা, ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচিভেদ

একটি উদাহরণ

পরিকল্পনা ও পরিচালনা কিভাবে করা যেতে পারে তা বিবেচনা কোরে দেখা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমাদের বিদ্যালয়ের কর্মপ্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ কোরছি।

মাধ্যমিক স্তরে কতকগুলি কর্মপ্রচেষ্টা ও উহার ফলাফল

বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণীতে কিছু ব্যবহারিক কাজ করা হয়েছে। নবম শ্রেণীতে পাট আমাদের জাতীয় জীবনে কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তা আলোচনা-সভার মাধ্যমে উপস্থিত করা হয়। এই আলোচনা-সভার অনেক ত্রুটি ছিল যা ভবিষ্যতে আমরা সংশোধনের আশা রাখি। মানচিত্রের উপযুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার এই সভায় করা হয় নি। উপযুক্ত চিত্রাদি এবং মডেলের সাহায্য নেওয়া হয় নি। বস্তুতঃ, এই সভাটি ছিল ব্যবহারিক কার্যক্রম আরম্ভের প্রথম দিন। তাই পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে অপরিহার্য-ভাবেই অনেক ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। আমাদের বিদ্যালয় যে-গ্রামে অবস্থিত, তা ভাগীরথী-তীরবর্তী। এই অঞ্চলে পাটের প্রচুর চাষ এবং চাষের পরিমাণ প্রতিবৎসরই বাড়ছে। আবার এই ভাগীরথীর উভয় তীরেই পাটকল-গুলি ও পাট চালানের একমাত্র বন্দর কলকাতা অবস্থিত। এই নদীর একটি মানচিত্র অঙ্কন একান্ত প্রয়োজন ছিল। এর শাখানদী উপনদী অধ্যুষিত অববাহিকা-অঞ্চলে পাটচাষের ক্ষেত্রগুলি দেখানো উচিত ছিল, এই নদীর তীরবর্তী পাটকলগুলির অবস্থান এবং কলকাতা বন্দরের অবস্থান দেখানো দরকার ছিল। এছাড়া একটা পাটকলের মডেল এবং কলকাতা বন্দরের একটা মডেল তৈরি করাও চলত। তাহলে আমাদের কর্মধারাটি সম্পূর্ণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তথাপি সভার উদ্যোগে আলোচনায় অংশগ্রহন ইত্যাদি ব্যাপারে ছাত্রছাত্রীদের কম উৎসাহ দেখা যায় নি। সমস্ত শ্রেণীকে আটটা বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। দুটি দল পাটচাষ ও পাটচাষীর জীবন নিয়ে আলোচনা করে, দুটি দল আভ্যন্তরীণ পাটব্যবসায়ে লিপ্ত পাটব্যবসায়ী ও পরিবহণ-ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করে। দুটি দল পাটকল, তার পরিচালন-ব্যবস্থা ও পাটকল-শ্রমিকদের জীবন নিয়ে আলোচনা করে ; আর বাকী দুটি দল পাটের রপ্তানি-বাণিজ্য এবং আমাদের জাতীয় জীবনে সামগ্রিকভাবে পাটশিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে। এই আলোচনায় অংশগ্রহণ কোরবার জন্য ছাত্রছাত্রীরা পূর্ব থেকেই সবিশেষ প্রস্তুত হতে আরম্ভ করে এবং ভূগোল, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজনে সাহায্য নিতে আরম্ভ করে ; তাছাড়া যথেষ্ট প্রয়োজনীয় গ্রন্থের সাহায্যও তারা নেয়। এজন্যেই আলোচনার মান যথেষ্ট উন্নত ছিল। আলোচনা-সভায় পরিকল্পনাটা কিন্তু উল্লিখিত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। **প্রথমতঃ, সভায় প্রস্তাব কোরে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই তার আয়োজন করে এবং পরিচালনাও করে নিজেরাই। আমাদের ব্যবহারিক ক্লাশগুলোর এই দুইটি সর্বপ্রধান বিশেষত্ব।** এছাড়া House System-কে আমরা একটু

পাটশিল্প নিয়ে আলোচনাসভা—কার্যক্রম, আয়োজন, ফলাফল

দুটি বিশেষত্ব

পরিবর্তিত আকারে গ্রহণ করেছি। আমাদের নবম শ্রেণী ৪টি দলে এবং দশম শ্রেণী ৩টি দলে বিভক্ত। দলগুলির নাম—গান্ধীদল, সুভাষদল, বিধানদল প্রভৃতি। এর মধ্যে শ্রেণীতে প্রথম দলটির সংখ্যাধিক্য থাকে। তবে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা সব সময়ে রাখা হয় না। প্রথম দলই শ্রেণী-পরিচালক "সরকার" গঠন কোরে থাকে

দলগঠন, সরকারগঠন ও পরিচালনা

সরকারে অন্তত ৪টি মন্ত্রিপদ থাকে—প্রধান-মন্ত্রী, সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী এবং খাদ্য-মন্ত্রী। শেষোক্ত তিনজনের মধ্যে একজন আবার সহকারী প্রধান-মন্ত্রী রূপে কাজ করে। কোনো উৎসব, আলোচনা-সভা, অভিনয় বা প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে মন্ত্রীরা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে পরামর্শ কোরবে এবং সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে তা উপস্থিত কোরবে। পরিকল্পনাটি স্থির হলে অর্থমন্ত্রী তার আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব উপস্থিত কোরবে, তার মধ্যে আলোচনা-সভাতে অবশ্যই জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ শ্রমসাধ্য কাজ কোরবে, অন্ততঃ তাদের জন্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা থাকবে। এই ব্যবস্থা করবার দায়িত্ব থাকবে খাদ্য-মন্ত্রীর। অর্থসংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব অর্থ-মন্ত্রীর, তবে প্রধান-মন্ত্রীও তাকে এবিষয়ে সাহায্য কোরবেন। তবে ছাত্রছাত্রীরা প্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তাদের আর্থিক দায়িত্ব পালন করে। "অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত" —এই শিক্ষাটা তারা সানন্দে রপ্ত কোরেছে। প্রত্যেক শ্রেণীতে নির্দিষ্ট দলগুলি ছাড়াও থাকে একজন সভাপতি, কয়েকজন স্বতন্ত্র সদস্য, রিপোর্টার, সরকারী কর্মচারী প্রভৃতি। সরকারী কর্মচারীদের কাজ হচ্ছে সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা, রক্ষা করা, শৃঙ্খলারক্ষা ও অন্য নানাবিধ কাজে সরকারকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করা। সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী সাধারণতঃ বিভিন্ন উৎসব ও সভার পরিকল্পনাদি উপস্থিত করে এবং অন্যান্য মন্ত্রী ও শিক্ষার্থীদের সহায়তায় তাকে পূর্ণভাবে রূপ দেবার দায়িত্ব বহন করে।

অধিকার ও কর্তব্য

প্রথম দিনে পূর্বনির্দিষ্ট সময়ক্রম কিছু লঙ্ঘিত হয়েছিল। অবশ্য সভা-আরম্ভ এবং সভা-সমাপ্তি নির্দিষ্ট সময়েই ঘটেছিল। সেদিন জলযোগের ব্যবস্থা ছিল লুচি, তরকারি এবং মিষ্টির। এর জন্য উদ্যোগ স্থরু হওয়ার কথা ছিল ভোর পাঁচটায়। কিন্তু জলযোগের আয়োজনটা কিছু ভারাক্রান্ত হওয়ায় এবং সময়মত আরম্ভ না হওয়ায় সভার কাজ আরম্ভ কোরেও কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি রাখতে হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা এই ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে এবং ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা দ্বারা লাভবান হবে বলে আশা প্রকাশ করে, বস্তুতঃ এর পরেই আসে আমাদের রবীন্দ্র-উৎসবের প্রস্তুতি এবং উৎসবের দুইটি পর্ব। ছাত্রেরা তা সুশৃঙ্খলভাবে ও যথেষ্ট দক্ষতার সাথে পালন করে। নিজেদের অভিজ্ঞতা যে ফলপ্রসূ হয়েছে তা প্রমাণ করে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা

আলোচনা-সভার পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের সংঘবদ্ধতা, সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতাভেদে কার্যভেদের নীতি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে। এটা প্রথম প্রচেষ্টা

বলেই এর সাফল্য আমাদের আরও আশান্বিত করে। সভার পরেও এই আলোচনার রেশ চলতে থাকে। ছাত্রদের আলোচনা, কবিতা, প্রবন্ধ, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি প্রকাশের জন্য আমরা একটি কাঠের বোর্ডের ব্যবস্থা কোরেছি। এই আলোচনার অনুক্রম হিসাবে শ্রেণী-রিপোর্টারেরা পরপর ৩।৪টি রিপোর্ট প্রকাশ করে। তাতে তাদের মন্তব্যও ছিল। এই মন্তব্যে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতিরও যথেষ্ট সমালোচনা ছিল।

রিপোর্ট প্রকাশ

দশম শ্রেণীর জন্য এই বৎসর একটি প্রধান Project গ্রহণ করা হয়েছে। দশম শ্রেণী প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান-প্রণয়ন। এ পর্যন্ত এ বিষয়ের ওপর তিনটি ক্লাশ নেওয়া হয়েছে। শ্রেণীকক্ষকে সেদিন গণ-পরিষদের চেহারায় রূপান্তরিত করা হয়। শ্রেণীর নির্বাচিত সভাপতি সভাপতির আসন গ্রহণ করে। তারপর একটি একটি ক'রে বিল (Bill) উত্থাপিত হয়, তার আলোচনা চলতে থাকে এবং আলোচনান্তে যথাযোগ্য পদ্ধতিতে বিলটি গৃহীত হয়। সভার স্থায়িত্বকাল মোটামুটি ২ থেকে ৩ ঘণ্টা, মধ্যে জলযোগের জন্য বিরতি ৩০ থেকে ৪০ মিনিট। এই সভাগুলি সহযোগিতামূলক আচরণশিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থল। তাছাড়া শাসনতন্ত্রের নীরস ধারাগুলো একটা মানবিক তাৎপর্য নিয়ে যেন জীবন্ত চেহারায় দেখা দেয়। পশ্চাৎপদ ছাত্রেরাও এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করে, সমস্ত প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ করে এবং সহজে আলোচ্য বিষয়টি উপলব্ধি করে। এর সাথে অনুপূরকভাবে আসে গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সমাজ ও তার লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা ; তখন আমাদের বর্তমান ভারতীয় সমাজজীবনের তাৎপর্য তাদের কাছে বহুল পরিমাণে প্রকট হয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত গণতান্ত্রিক মনোভাবও সমাজবিবেক-সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সুসিদ্ধ হয়। এই সভাগুলিতে আমাদের যে যে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা হচ্ছে প্রজাতন্ত্র গঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, প্রজাতন্ত্র পরিচালনায় নির্দেশক নীতি এবং তার রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের প্রক্রিয়া, তাঁদের ক্ষমতা প্রভৃতি সম্পর্কিত। দশম শ্রেণী প্রজাতন্ত্রটিকে একটি একরাজ্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র (Unitary State) হিসেবে ধরে নিয়েই এই সকল আলোচনা চালানো হয়। এর পর গণ-পরিষদে চলে আসল গণ-পরিষদের কার্যাবলীর অভিনয়।

"গণ-পরিষদ" প্রকল্প

কিন্তু সব কাজ সব সময় শান্তিপূর্ণভাবে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবে বিধাতার এমন অভিপ্রায় নয়। মানুষের অন্তর-প্রবৃত্তির মধ্যে যেমন মোটের উপর একটা শৃঙ্খলা আছে, তেমনি আছে সংঘাত, ও সময়ে সময়ে তারই ফলে উপজাত হয় নৈরাজ্য। সমাজ-জীবনেও এর ঠিক প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। সকলের চিন্তা ও মানসিক প্রবণতা সমান নয়। এর মধ্যে আবার অহমিকাবোধের সংমিশ্রণ ঘটে বিষয়টা আরও জটিল হয়ে ওঠে। তখনই সমাজজীবনে আসে একটা ঝড়ঝঞ্ঝা। এই ঝড়ঝঞ্ঝাকে শান্ত ধৈর্যের সাথে স্থির বিচারবুদ্ধি ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কিভাবে অতিক্রম করা যায়

সংঘাত ও সমন্বয়—বাস্তব অভিজ্ঞতা

সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক ক্লাসে তারও পরীক্ষা হয়ে যায়। আমরা এবার আমাদের রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের উল্লেখ কোরেছি। উৎসব যতটা সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত হয়েছে, তার প্রস্তুতি-সভা কিন্তু ঠিক ততটা শান্ত ছিল না। বস্তুতঃ এই প্রস্তুতি-সভাতেই বহু-প্রকার রাগ-বিরাগ ও বিতর্কের সমাপ্তি হওয়ায় পরবর্তী কর্মধারা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পেরেছিল। বিশৃঙ্খল মনোভাব যে কেমন কোরে সামাজিক ন্যায়ধর্মী অনুশাসনের কাছে মাথা নত কোরতে বাধ্য হয় শিক্ষার্থীরা সেদিন তার এক চাক্ষুষ পরিচয় পেয়েছিল। সেই মুহূর্তে, নিজের নিজের কর্তব্য বেছে নিতে শিক্ষার্থীরা ভুল করেনি।

উৎসব উদ্‌যাপনের নিমিত্ত নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণীর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীগণের এবং পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীনায়কগণের (মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী) এক সভা আহ্বান করা হয়। এই সভাই রবীন্দ্র-উৎসব উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি-সভা। একাদশ শ্রেণী থেকে সমগ্র উৎসব পরিচালনার জন্য সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর অধ্যক্ষ, দশম শ্রেণী থেকে প্রধানমন্ত্রী ও সংস্কৃতি-বিষয়ক মন্ত্রী, নবম শ্রেণী থেকে অর্থমন্ত্রী এবং অষ্টম শ্রেণী থেকে দুইজন খাদ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করা হয়। তাছাড়া একটি কর্মীবাহিনী নিয়োগ করা হয়। কর্মীবাহিনী বিদ্যালয়ের A. C. C সদস্যদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হয়। একটা সাধারণ চাঁদার হার স্থিরীকৃত হয়। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র ১৫ পয়সা এবং নবম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্র ২৫ পয়সা দেবে। কিন্তু একাদশ শ্রেণীর ছাত্রেরা বলে যে মাত্র তারাই একটা নাটক অভিনয় কোরবে। তাদের সে দাবি মেনে নিয়ে ঠিক হয় অন্য ছাত্রেরা আর একটি নাটক এবং একটি প্রহসন অভিনয় কোরবে। তবে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষ সুবিধার বিনিময়ে তারা বিশেষ আর্থিক দায়িত্বও বহন কোরবে। এইটাই হোলো সভায় ক্ষোভসৃষ্টির একমাত্র কারণ। মাঝে একবার সভা স্থগিত রেখে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয় এবং ফলে যে মীমাংসা-প্রস্তাব গৃহীত হয়, একজন ছাত্রের ব্যবহারিক কার্য-বিবরণী লিপিবদ্ধ করার খাতা (Practical Works Note-Book) থেকে উদ্ধৃত করা হোলো :—

"একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণের "মুকুট" অভিনয় ও অর্থসংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া সভার মধ্যে তর্কবিতর্ক চলিতে থাকে, ফলে আমাদের অনেক সময় নষ্ট হয়।"

"একাদশ শ্রেণীর ছাত্রগণের অভিনয়-প্রসঙ্গে স্থির হইল যে, তাহারা বিশেষভাবে অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করিলে "মুকুট" নাটিকাটির অভিনয় হইতে পারে। তবে তাহাদের অভিনয় এবং তৎসংক্রান্ত ব্যবস্থা সমস্ত কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে পরিচালিত হইবে এবং তাহাদের বিশেষ বক্তব্য উপস্থিত করিবার জন্য তাহারা তাহাদের অর্থমন্ত্রী শ্রীজয়দেব চক্রবর্তীকে পরিচালকসভায় প্রেরণ করিতে পারিবেন।"

এর পর সভার ঢেউ শান্ত হয় এবং অনেক আত্মসমালোচনাও হয়। কাঠের বোর্ডটিতেও কয়েকদিন ধরে সভার বিবরণী প্রকাশিত হয় এবং তাতেও ছাত্রেরা

নিজেদের আচরণের দোষ-গুণ নিয়ে অনেক আলোচনা করে। ফল কিন্তু এর শুভই হয়েছিল। কারণ সকলে সর্বতোভাবে আন্তরিক চেষ্টায় ও পরিশ্রমে তাদের সর্ববিধ অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত কোরে তুলতে প্রয়াসী হয়। আমাদের রবীন্দ্র-উৎসবের ছিল দুটি পর্ব। ১৮ই মে সাধারণসভা ; সেখানে গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা ছিল। তার সাফল্য ও মূল্যায়ন সম্পর্কে মন্তব্য ছাত্রদের Practical Works Note Book থেকেই তুলে দিলাম।

আত্মসমালোচনা

"এই উৎসব যে আমরা সকল ছাত্রছাত্রীর ও শিক্ষকমণ্ডলীর সমবেত চেষ্টায় শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে উদ্‌যাপিত করিতে পারিয়াছি, ইহার জন্য আমি শিক্ষক-মহাশয়গণকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ছাত্রছাত্রীগণকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। এই উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কথা জানিতে পারিয়াছি ; এবং অনেক কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি।"

উৎসবের দ্বিতীয় পর্বে ছিল ২২শে মে "মুকুট" নাটিকার অভিনয়, এবং ২৩শে মে হাস্যকৌতুক থেকে "অন্ত্যেষ্টিসৎকার" ও "ডাকঘরের" অভিনয়। এগুলির সাফল্য ও শিক্ষা সম্পর্কে তাদের দুটো নোটবুক থেকেই উদ্ধার কোরছি :—

"এইভাবে ১৯৬৩ সালে অন্যান্য সালের চেয়ে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। সহঃ প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু মহাশয়ের উপদেশে সুন্দরভাবে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য শিক্ষকমহাশয়গণ যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং ছাত্রদেরও উদ্যম ছিল। তাহাদের উচিত তাহারা যেন এই প্রকার উদ্যম লইয়া প্রতি কার্যে অগ্রসর হয়। ইহাতে শুধু স্কুলের সুনাম নহে, এই অঞ্চলের সুনাম ঘটে এবং ছাত্রছাত্রীরাও যথেষ্ট কার্যকরী শিক্ষালাভ করে।"

অপর খাতা থেকে—

"খুব অল্প সময়ের মধ্যে যে এত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উৎসব পালন করা সম্ভব হইয়াছে তাহার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। এই উৎসব সকল ছাত্রছাত্রীর ও শিক্ষক-মহাশয়ের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করিয়াছে। ইহার জন্য আমি শিক্ষকমহাশয়দিগকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করিতেছি এবং ছাত্রছাত্রী সুহৃদবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

যাদের সন্ধানী চোখ আছে তারা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্তব্যগুলি থেকে ছাত্রদের অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার হদিস পাবেন। তবে আমার মনে হয় ছাত্রেরা এবার সব থেকে বড় যে শিক্ষা পেয়েছে তা হচ্ছে উদ্যম, সক্রিয়তা ও বলিষ্ঠ আশাবাদের দ্বারা হতাশা ও বিভেদপ্রবণতাকে জয় করা। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তারা বিদ্যালয় থেকে কতকগুলো মুখস্থ বুলি আর জীর্ণ পরিপাকযন্ত্র নিয়ে যাবে, না স্বাধীন মানবের যোগ্য বিঘ্নজয়ী আশাবাদ ও উদ্যম শিক্ষা কোরে যাবে? উত্তর যদি শেষটাই হয়, তবে সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মূল্য অপরিসীম

ফলশ্রুতি—উদ্যম, সক্রিয়তা আশাবাদ

এবং কোনো অজুহাতেই তা উপেক্ষা, অবহেলা বা সঙ্কুচিত করা উচিত নয়। আশা করি সে বিষয়ে শিক্ষকমাত্রেই আমার সাথে একমত হবেন।

ব্যবহারিক কাজকর্মের তালিকা ও ধরন এখানেই শেষ হোতে পারে না। এই প্রসঙ্গে আমি আবার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রচারিত সিলেবাসের প্রাসঙ্গিক অংশটির দিকে শিক্ষক-মহাশয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরছি :—

প. ব. মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নির্দেশিত কার্যক্রম

"The practical work should consist of the following :—

(*a*) Visits of educational value e.g. to factories, farms, ports, museums, industrial and agricultural fairs, National Library etc. and preparation of individual and group reports on visits.

(*b*) Educational project and activities and preparation of handwork, models, charts, graphs and short reports.

(*c*) Maintenance of individual scrap book.

(*d*) Organisation of cultural and educational functions including educational exhibition.

(*e*) Celebration of Independence Day and Republic Day. Two consecutive periods should be available when project work is undertaken.

আমরা অবশ্য দু' পিরিয়ডের বেশী সময় অন্ততঃ, দু ঘণ্টা একটানা ব্যবহারিক কাজের জন্য নির্দিষ্ট কোরে থাকি। জলযোগের কোন সময় দিলে তার জন্যে অতিরিক্ত সময় বরাদ্দ করা হয়।

ব্যক্তিগত ও দলগত রিপোর্টের গুরুত্ব

আমার বক্তব্য শেষ করার আগে individual scrap book or note book এবং individual and group reports-এর বিষয়ে সামান্য কিছু আলোচনা কোরবো। এ-প্রসঙ্গে আরও আলোচনা "পরীক্ষা" বা "মূল্যায়ন" পরিচ্ছেদে অবশ্যই কোরতে হবে। কোনো উৎসব, সভা, প্রদর্শনী বা ভ্রমণের ওপরে ব্যক্তিগত ও দলগত রিপোর্ট নানা কারণে খুবই প্রয়োজনীয়। **এই রিপোর্টকে ব্যবহারিক কাজকর্মের বাড়তি অঙ্গ বলে গণ্য কোরলে নিতান্ত ভুল করা হবে, এটা হচ্ছে এই কাজকর্মের একটা অত্যাবশ্যক পরিপূরক অঙ্গ।** এটিকে বাদ দিলে ব্যবহারিক কাজের অর্ধেক শিক্ষাই বাকী থেকে যাবে। এ যেন হবে ক্ষেতটিকে উপযুক্তভাবে চাষ করে, ফসল বুনে ও ফসল ফলিয়ে শস্যকর্তনে অবহেলা করা, ফলে অর্ধেক শস্যই যাবে ঝরে। এই রিপোর্টগুলি লেখায় নিজেদের লব্ধ-অভিজ্ঞতাকে কালি-কলমে সুস্পষ্ট চেহারা

অত্যাবশ্যক অঙ্গ

দেওয়া হয়, মনের কোঠায় সেগুলো একটা সুস্পষ্ট আকার ধারণ কোরে ফুটে ওঠে আর Note Book-এ তার একটা স্থায়ী কপি রেখে দিলে সে অভিজ্ঞতা সহজে পরিম্লান হবে না। তাছাড়া রিপোর্টগুলো বিদ্যালয়ের বোর্ডে সাথে সাথে অবশ্যই প্রকাশ করা চলে এবং তা থেকে অন্য ছাত্রেরাও সেই অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ অংশীদার হয়। উত্তম রিপোর্টগুলো বিদ্যালয়-পত্রিকায় প্রকাশ করা চলে এবং তা বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সকলের একটা স্থায়ী শিক্ষার উপকরণে ও আগ্রহের বস্তুতে পরিণত হয়। দলগত রিপোর্ট দু'ভাবে রচনা চলতে পারে। প্রথমতঃ, অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্রই এক-একটি পৃথক রিপোর্ট দিতে পারে এবং তা পাশাপাশি প্রকাশ করা যেতে পারে।

সুফল

এ থেকে একই দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য বিষয় থেকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা আহরণ করে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মিলবে এবং সকলেই এক বহুমুখী বিচিত্র অভিজ্ঞতার অংশীদার হবে। দ্বিতীয়তঃ, দলের প্রত্যেকে এক-একটি রিপোর্ট পৃথকভাবে দলপতির কাছে অর্পণ কোরতে পারে। দলপতি তা থেকে প্রয়োজনীয় মূল্যবান অংশগুলিকে একত্র কোরে এবং পুনরুক্তি বাদ দিয়ে প্রকাশ কোরতে পারে। এই রিপোর্টের চরিত্রটা হবে সংহত, সংক্ষিপ্ত এবং প্রাঞ্জল। জীবনে এই সংহত ও প্রাঞ্জল প্রকাশেরও যথেষ্ট অবদান আছে। অতএব এই দুই প্রকার দলগত রিপোর্টই মাঝে মাঝে প্রকাশ করা উচিত। দলগত রিপোর্ট সহযোগিতার ভিত্তিকে প্রশস্ত করে, ছাত্রদের ভিন্ন ভিন্ন মতের সম্মুখীন করে অথবা বিভিন্ন মতের যথোপযুক্ত গ্রহণ-বর্জনের শিক্ষা দেয়। গণতান্ত্রিক সমাজে এটি একটি অবশ্য শিক্ষণীয় আচরণ ও বিষয়। তাছাড়া এটা সমাজগত ভাবনার উৎপত্তি ও বিকাশে অমূল্য সাহায্য প্রদান করে।

Scrap Book এবং Practical Works Note Book.

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর একখানি কোরে ব্যবহারিক কাজের খাতা (Practical Works Note Book) থাকা দরকার। এটি সমাজবিদ্যা শিক্ষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই খাতাটিকে টুকিটাকি সংবাদ ও মন্তব্যের খাতা বা Scrap Book হিসেবেও ব্যবহার করা চলতে পারে। তবে টুকিটাকি জ্ঞাতব্যের জন্য আলাদা খাতা থাকাই ভালো। যে দলগত রিপোর্ট-রচনায় যে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ কোরেছে,

ইহার ব্যবহার ও গুরুত্ব

তার সম্পূর্ণ দলগত রিপোর্টটি এবং তার স্বকৃত মূল অংশটি খাতায় স্থান পাওয়া দরকার। Scrap Book-এর ভিত্তিতেই Practical Works Note Book তৈরি হওয়া দরকার। উল্লেখযোগ্য ব্যবহারিক কাজকর্মগুলোর—যথা, ভ্রমণ, দর্শন, সভা, উৎসব প্রভৃতির বিশদ বিবরণ ractical Works Note Book-এ লিপিবদ্ধ করা দরকার। মডেল, ম্যাপ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য বিষয় যা শিক্ষার্থীরা স্বহস্তে তৈরি কোরতে পারে তার গঠন-সৌকর্য প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যায়ন কোরে শিক্ষক ব্যবহারিক খাতায় মন্তব্য লিখে দেবেন। অভিনয়াদির

কৃতিত্বও অনুরূপ মন্তব্যের আকারে লিখে দেওয়া দরকার। **এতে সামগ্রিকভাবে একজন ছাত্রের কাজ, আচরণ ও জ্ঞানের একটা সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।** এখন সভা, উৎসব প্রভৃতির ওপরে ব্যবহারিক খাতায় কিভাবে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে তার একটি নিদর্শন দেওয়া গেল :—

বিবরণ লেখার ধরন

তারিখ—
সভার উদ্দেশ্য :—
গণপরিষদের শাসন-সংক্রান্ত অধিবেশন
সময়সূচী :—
(নির্দিষ্ট সময়—)
অধিবেশন আরম্ভের সময়—
জলযোগের জন্য বিরতি—
(নির্দিষ্ট সময়—)
অধিবেশনের সমাপ্তি—
(নির্দিষ্ট সময়—)
উপস্থিত সভ্যবৃন্দ :—
গান্ধীদলের ১২ জন
সুভাষদলের ৫ জন
বিধানদলের ৩ জন
নির্দলীয় ৪ জন।
শিক্ষক ৪ জন :—
(১)
(২)
(৩)
(৪)
উপস্থিত সাংবাদিক ৫ জন।
উপস্থিত অতিথি (দর্শক) ছিলেন মোট ৫ জন।
সভাপতি—

বিষয়সূচী :—

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির গুণাবলী, নির্বাচন-প্রক্রিয়া, ক্ষমতা এবং কার্যকাল।

এরপর থাকবে প্রতিটি বিষয়ের এক-একটি প্রস্তাব। সেটা উত্থাপিত হবে অন্ততঃ একজন প্রস্তাবক দ্বারা এবং সমর্থিত হবে অন্ততঃ একজন সমর্থকের দ্বারা। বিরুদ্ধ অথবা সংশোধনী প্রস্তাবাবলীও উপস্থাপিত করা যেতে পারে। সে-ক্ষেত্রেও প্রস্তাব উত্থাপনের নিয়ম একই হবে। প্রস্তাব, প্রস্তাবক ও সমর্থকের বিবরণ থাকবে ব্যবহারিক

খাতায়। প্রস্তাবের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনার বিবরণীও থাকবে। পরিশেষে শিক্ষার্থী তার নিজের মন্তব্যাদিও সংযোজিত কোরতে পারে। মন্তব্য থাকা বরং ভাল।

কোন উৎসব বা প্রদর্শনী সম্পর্কে বিবরণী লেখার বিষয়ও অনুরূপভাবে করা যেতে পারে। অবস্থানুযায়ী শিক্ষকমহাশয় ব্যবহারিক খাতায় লেখবার ধরন সম্পর্কে নির্দেশ দেবেন।

ব্যবহারিক খাতায় বিবরণী লেখার মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংহতি লাভ করে এবং অভিজ্ঞতার যথাযথ বিবরণ দেবার ক্ষমতাও বাড়ে। শিক্ষার্থীদের মন্তব্য লেখার ভিতর দিয়ে বিচার-শক্তি ও সমালোচনা-শক্তির বিকাশ ঘটে। তাছাড়া সময়মত খাতা জমা দেওয়ার মধ্যে সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুন্দর ও সচিত্রভাবে খাতা তৈরি কোরলে সুষ্ঠুভাবে কাজ সম্পাদনের ক্ষমতা যেমন বাড়ে, তেমনি পরিচ্ছন্ন রুচি ও শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাই ব্যবহারিক কাজকর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ব্যবহারিক খাতা—তাতে সুন্দর পরিচ্ছন্ন ও সংহতভাবে ঐ কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা, যা ভবিষ্যৎ জীবনেও শিক্ষার্থীর কাছে প্রেরণার উৎস হবে, সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণ যেন এ-কথা বিস্মৃত না হন।

বিবরণ লেখার সুফল

ব্যবহারিক কাজ ও শিক্ষার আধুনিকীকরণ

আমরা ব্যবহারিক কাজকর্ম সম্পর্কে অনেকটা বিশদভাবে আলোচনা করার চেষ্টা কোরেছি। তবুও এগুলি একটা দিক্-নির্দেশ মাত্র। এবিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও নতুন নতুন কার্যকরী পন্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজন রয়েছে। সুযোগ্য উৎসাহী শিক্ষকগণ ভবিষ্যতে এবিষয়ে আরও আলোকপাত কোরবেন আশা করি। **সমাজবিদ্যার শিক্ষণ-পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের আহ্বান জানাচ্ছে—এ কথাটা আমরা যেন কখনও না ভুলি। শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং শিক্ষা ব্যবস্থা সকলই যেন আধুনিক চেতনাসম্পন্ন হয় এবং শিক্ষার্থীদের কথায় ও কাজে যেন সঙ্গতি থাকে—সমাজবিদ্যা যে একটি আচরণমূলক-বিদ্যা এ কথা তারা যেন বিস্মৃত না হয়। সমাজবিদ্যায় ব্যবহারিক কাজকর্মের প্রধান গুরুত্ব এইখানে।** আচরণ পরিবর্তনশীল, তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষাদানে বিশেষতঃ ব্যবহারিক শিক্ষাদানে, সচলতা ও পরিবর্তনশীলতা অবশ্যই থাকবে একথা বলা বাহুল্য। পূর্ব থেকেই যখন ব্যবহারিক কাজের পরিকল্পনা করা হবে, তখন একদিকে যেমন কাজের নিয়মশৃঙ্খলা ও সময়নিষ্ঠার পরিচয় থাকবে অন্যদিকে আচরণের সচল ও পরিবর্তনশীল ধর্মটির কথাও মনে রাখতে হবে। তাই সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক কাজের ক্ষেত্রে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার-অবকাশ রয়ে গেছে, অনেক কথা বলার পরেও এই কথাটা বলে নিতে হচ্ছে।

আধুনিক চেতনা

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতিতে কাজ কোরতে আমাদের বহু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে, তবে ক্রমে ক্রমে এই নতুন চিন্তা ও কর্মধারা অভ্যস্ত হয়ে যাবে এবং অসুবিধা তখন আপনা থেকেই দূরীভূত হয়ে যাবে বলে আমরা আশা কোরতে পারি। আপাততঃ এর বেশী বলার নেই।

Questions

1. What are the Basic Considerations that we should take care of to make provision for practical work in Social Studies ?

2. What is the necessity of practical work in Social Studies ?

3. How can we provide social, cultural and political education through practical work in Social Studies ?

4. What are the influences of social and religious celeberations on the minds of the young children ? How do they mould their character and thinking ?

5. Why should the pupils celeberate the birth-day celebrations of great men ? Say how as a teacher you will help them to organise such a celeberation.

6. Bring out the implications of the maxim in the field at Social Studies "They also serve who only stand and wait."

7. Describe a Social Studies practical class of your school.

8. Describe the utility of the school magagine and such things as the wooden board used for the publications of students' writings, reports, illustrations notices, etc.

9. Describe how practical class in Social Studies help to develop the sense of co-operation among the students, and the reasoning power and the faculty of critical judgement in them.

10. Mention some forms of practical work in Social Studies and discuss their usefulness.

11. Describe the importance of individual and group reports and excursions, meetings, celeberations, and social works etc.

12. Discuss the importance of Practical Note Book and Scrap Book in Social Studies. Give a specimen of a statement which you may prescribe for your pupils, of a practical work of Social Studies in your School.

13. "Behaviour is the pivot on which the practical class in Social Studies turns."—Discuss.

———

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (১)

(Teaching aids and appliances)

বিভিন্ন প্রকার উপকরণ ও ইহাদের প্রয়োজনীয়তা

লেখাপড়াকে আমরা একটা জীবন্ত প্রক্রিয়া কোরে তুলতে চাই। মুখস্থবিদ্যার দৌরাত্ম্য থেকে আমরা শিক্ষার্থীদের মুক্তি দিতে চাই, একথা এর আগে প্রায় প্রতি অধ্যায়েই বলেছি। শিক্ষাদান-প্রক্রিয়াকে জীবন্ত কোরে তুলতে হলে পারিপার্শ্বিক জীবনস্রোতের সাথে একে যুক্ত কোরতে হবে। শিক্ষণ-পদ্ধতি এবং ব্যবহারিক শিক্ষা-শীর্ষক অধ্যায়গুলিতে নূতন পথের দিশা নিয়ে আলোচনা কোরেছি। কোথায় কিভাবে মোড় নেওয়া চলতে পারে তাও তুলে ধরবার চেষ্টা কোরেছি। কিন্তু এছাড়াও শিক্ষার সজীব পরিবেশ-সৃষ্টির আর একটি অপরিহার্য অঙ্গ রয়েছে। তা হচ্ছে শিক্ষার বস্তুগত উপকরণাদি। এর মধ্যে আসে মানচিত্র, মডেল, চার্ট, অন্যান্য চিত্রাদি। উৎপন্ন শস্যাদির নমুনা, উদ্ভিদ, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ প্রভৃতির নমুনা, এককথায় শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট দ্রষ্টব্য বিষয়াদির নিদর্শন এবং দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়গুলির সহায়ক যন্ত্রাদি ও উপকরণসমূহ। এইসব উপকরণগুলির সার্থকতা সম্পর্কে Pinsent বলেছেন, যে উত্তম সচিত্র বিবরণসমূহ বুদ্ধির দিক থেকে নিষ্প্রাণ উপস্থাপন জীবন্ত কোরে তোলে (Good illustrating will "make intellectually dead presentations come to life")। কেন এমন হয়? কারণ চিত্রাদি শিক্ষার্থীর আগ্রহকে বহুল পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। শিক্ষণীয় বিষয়টি চিত্রাদির সাহায্যে মনোরম এবং সহজে ধারণাযোগ্য হয়ে ওঠে। চিত্রাদি শিক্ষার্থীর মনে সঠিক চিন্তাস্রোতকে জাগরিত করে, কারণ শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়সমূহের কাছে এরা প্রত্যক্ষ আবেদন জানায়। এইভাবে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থী সহজে বিস্মৃত হয় না। তার সামগ্রিক অভিজ্ঞতায় এই জ্ঞান সহজে অঙ্গীভূত হয়ে যায় এবং অধিকতর ফলপ্রসূ হয়। Raymont এই প্রকার শিক্ষা-সহায়ক নিদর্শনসমূহের পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ কোরেছেন :—

সজীব পরিবেশ-সৃষ্টির অঙ্গ

ইন্দ্রিয়াদির কাছে প্রত্যক্ষ আবেদন

পাঁচটি শ্রেণী

(১) প্রকৃত বস্তুসমূহ।
(২) বস্তুগুলির মডেল এবং কঠিন আয়তনবিশিষ্ট নিদর্শনসমূহ।
(৩) বস্তুগুলির ছবি এবং ফটোগ্রাফ নিদর্শনসমূহ,
(৪) অঙ্কিত নকশাদি এবং চিত্রসমূহ, এবং
(৫) মৌখিক তুলনামূলক বিচারসমূহ।

যখন প্রকৃত বস্তুগুলি উপস্থিত করা হয়, তখন তাদের সম্পর্কে ছাত্রদের সম্যক্ চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। আর তাদের মডেলসমূহ বস্তুগুলির সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা উপস্থিত কোরলেও তাদের প্রকৃত পরিচয়ের বিষয়ে কিছুটা অভাব থেকে যায়। এই অভাব আরও বেশী হয় ছবি এবং ফটোগ্রাফে, যদিও এদের শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর মূল্য রয়েছে। অঙ্কিত নকশা ও ক্ষেত্রাদি থেকেও প্রকৃত বস্তর একটা অস্পষ্ট ধারণা জন্মে, আর মৌখিক তুলনায় প্রকৃত বস্তু কিছুই দেখানো হয় না, সবটাই শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তির উপরে ছেড়ে দিয়ে তুলনামূলক বিচার কোরে দেখানো হয়। তবে এই পাঁচ শ্রেণীর নিদর্শনেরই আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুরভাবে প্রয়োজন হয়। প্রকৃত বস্তু আমরা সংগ্রহ করার চেষ্টা কোরতে পারি, কিন্তু সবসময়ে তা সম্ভব হয় না। তখন অন্যপ্রকার নিদর্শন-সমূহের ওপর আমাদের অবশ্যই নির্ভর কোরতে হয়। তাছাড়া শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণীভেদে এই নিদর্শনগুলিরও ব্যবহারভেদ প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে প্রকৃত বস্তুগুলি ও তাদের মডেলসমূহের শিক্ষামূল্যই বেশী, কারণ তখনও অন্যান্য ধরনের নিদর্শনগুলির তাৎপর্য বোঝাবার উপযুক্ত ক্ষমতা শিক্ষার্থীদের জন্মায়নি। কিন্তু তারপরে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণাশক্তি যতই বাড়তে থাকে ততই, অন্য শ্রেণীর নিদর্শনগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে। এইসব নিদর্শনের নিম্নোক্ত চারটি গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন :—

উহাদের কাজের তুলনা

চারটি আবশ্যক গুণ

(১) এগুলি যেন প্রাসঙ্গিক হয় এবং আলোচ্য বিষয়ের ওপর উপযুক্ত আলোক-সম্পাত কোরতে পারে ;

(২) এগুলি যেন আলোচ্য বিষয়ের অনুগামী হয় ;

(৩) এগুলি হবে সরল, সহজ, প্রাঞ্জল, এবং সুস্পষ্ট ; শিক্ষার্থীরা যেন এগুলিকে দেখেই চিনতে পারে এবং এদের উপযোগিতা সম্পর্কে ধারণা কোরতে পারে ;

(৪) আর এগুলো শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর সামনে তৈরি হলেই ভালো হয়। মানচিত্র এবং নকশাগুলো আগে থেকে তৈরি না কোরে শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থীর সামনে অঙ্কন করাই প্রয়োজন। তাতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও জ্ঞান দুই-ই বাড়ে।

শ্রবণ ও বীক্ষণ সহায়ক উপকরণসমূহ

ইহাদের গুরুত্ব

শুধু গ্রন্থ এবং মুখের কথায় শিক্ষাদান-শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াটি সহজ, সাবলীল ও সফল হতে পারে না। তা সম্ভবও নয়। Comenius বলেছেন, **"যেহেতু জ্ঞানের আরম্ভ ইন্দ্রিয়গুলির সহায়তা থেকে, সেই কারণেই শিক্ষারও আরম্ভ হবে প্রকৃতবস্তু দিয়ে।'**

শিক্ষার আরম্ভ

এই চিন্তারই পরিণতি হোলো বহু শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের সৃষ্টিতে। এই উপকরণগুলি প্রধানতঃ শ্রবণ ও বীক্ষণ ইন্দ্রিয়গুলিকে সহায়তা করে বলে এদের

নাম দেওয়া হয়েছে শ্রবণ ও বীক্ষণ সহায়ক উপকরণসমূহ (audio-visual aids)। এগুলি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। আগের অংশে যে নিদর্শনসমূহের কথা বলেছি, সেগুলি ছাড়াও এর মধ্যে আছে—স্থির চিত্রাদি, গতিশীল চিত্রাদি, গ্রামাফোন, রেডিও এবং সর্বাধুনিক কালে টেলিভিশন প্রভৃতি। এগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, "এই সহায়ক উপকরণগুলি হচ্ছে পরিপূরক প্রক্রিয়াসমূহ,—যাদের সাহায্যে শিক্ষক একাধিক ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে কাজে লাগাতে পারেন এবং তার ফলে ধারণাসমূহ, ব্যাখ্যাদি এবং উপলব্ধিকে সুস্পষ্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুসমন্বিত কোরতে পারেন।" এদের সাহায্যে আলোচ্য বিষয়ের সার্থক উপস্থাপন সম্ভব এবং শিক্ষার্থীরাও একটা সুস্পষ্ট ধারণা লাভ কোরতে পারে। শুধুমাত্র শিক্ষকের মুখের কথায় শিক্ষার্থীর মনে যে দাগ কাটে, এই উপকরণগুলি তার থেকে অধিকতর স্থায়ী প্রভাব রেখে যায়। তাছাড়া ছাত্রদের মনের ক্ষমতা বাড়ে, কাজে আগ্রহ বাড়ে, শিক্ষার প্রেরণা জন্মে এবং শিক্ষাকে প্রাঞ্জল ও ত্বরান্বিত করে। এই পথে শিক্ষার্থীর মনে যে আগ্রহ ও প্রেরণা আসে তার মূল্য অপরিসীম, কারণ এই প্রেরণা বহির্লব্ধ নয়, অন্তর্লব্ধ। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, শ্রবণ বীক্ষণ সহায়ক উপকরণগুলি যদি সুনির্বাচিত ও সুপ্রযুক্ত হয়, তবে তারা শিক্ষার্থীদের মনে তীব্র ও উপকারক আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকার্যে প্রেরণা দান করে। আর উপযুক্ত প্রেরণার ফলে শিক্ষার্থীরা লাভ করে উন্নত মনোভঙ্গী, স্থায়ী মানসিক প্রভাব, সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, এবং শেষ ফল হিসেবে উন্নততর জীবনযাত্রা।

পরিপূরক প্রক্রিয়া

উপযোগিতা

কতকগুলো উপকরণের পরিচয়

নিম্নে কতকগুলো আধুনিক শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের বিষয়ে আলোচনা করা হোলো :—

(১) **ম্যাজিক লণ্ঠন**—পর্দার ওপরে ছবি ফেলবার কাজে ম্যাজিক লণ্ঠন ব্যবহার করা হয়। আগে থেকে ছবির স্লাইড (slide) তৈরি কোরে নিতে হয় এবং তারপর এই যন্ত্রটির সাহায্যে পর্দার ওপরে ছবি ফুটিয়ে তুলতে হয়। প্রকৃত বস্তু থেকে ছবিটি হয় অনেক বড়, তাই সমস্ত শ্রেণীই একসাথে ছবিটি ভালভাবে দেখতে পারে ; ফলে শিক্ষাও সজীব ও ফলপ্রদ হয়।

(২) **এপিডায়াস্কোপ (Epidiascope)**—ম্যাজিক লণ্ঠনের একটা অসুবিধা এই যে, আগে থেকে slide তৈরি কোরতে হয়। কিন্তু এই যন্ত্রে তার দরকার হয় না। বইয়ে ছাপানো ম্যাপ বা ছবিকে সোজাসুজি পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়। এর ফলে শিক্ষকের সময় বাঁচে এবং কাজের জটিলতাও কমে।

(৩) **গ্রামোফোন**—এটিও একটি মূল্যবান শিক্ষা-সহায়ক যন্ত্র। আমরা একে শুধু আনন্দবর্ধক যন্ত্র বলেই জানি। কিন্তু শুধু রেকর্ড করা, গান শোনানো ছাড়াও

এর অনেক কাজ আছে। ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে শুদ্ধ উচ্চারণ, উপযুক্ত স্বরভঙ্গী এবং কথাবার্তা বলার ধরনধারণ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো যায়। গান, নাটক, বক্তৃতা ইত্যাদি বাজিয়ে সমাজবিদ্যার মূল্যবান শিক্ষা পাওয়া যায়। Bennet বলেছেন "উত্তম উপকরণ-সজ্জিত বিদ্যালয়ের কাছে একটা উপযুক্ত শব্দযন্ত্র হচ্ছে একটা প্রায় অপরিহার্য উপকরণ, এর ব্যবহার এত বহুবিধ, চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষামূলক, যে এর নিমিত্ত ব্যয়কে একটা লাভজনক ব্যয় বলেই মনে কোরতে হবে।"

(৪) **সিনেমা**—এটিও একটি উপযুক্ত শ্রবণ ও বীক্ষণ সহায়ক উপকরণ। শুধু আমোদপ্রমোদের উপকরণ বলে সিনেমাকে দূরে ঠেলে রাখা খুবই অন্যায় হবে। এটা বস্তুতপক্ষে শিক্ষার একটা অপরিহার্য উপকরণ এবং শিক্ষাদানের একটি চিত্তাকর্ষক ও বহুল উপযোগী মাধ্যম। কিন্তু শিক্ষা-উপযোগী সিনেমা-চিত্রের জন্য উপযুক্ত বাছাই প্রয়োজন। বস্তুতঃ শিক্ষা-উপযোগী সিনেমা-চিত্র কেন্দ্রীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে নির্মাণ কোরতে হবে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে তা প্রদর্শন কোরতে হবে। কোনো বিশেষ বিষয় শিক্ষাদানের জন্য উপযোগী বিষয়চিত্র নির্মাণ কোরতে হবে এবং সেই বিষয়ে পড়াবার সময়ে সেই চিত্র প্রদর্শন কোরতে হবে। চিত্র এবং বিষয়ে যেন প্রাসঙ্গিকতা বর্তমান থাকে। এই চিত্রগুলি ছাত্রদের মনের পরিধিকে বাড়িয়ে দেয় এবং শিক্ষাকার্যে ছাত্রদের আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি করে। আজকাল আমাদের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহ বহু শিক্ষা-বিষয়ক চিত্র নির্মাণ কোরছেন। বিদ্যালয়গুলি এই চিত্রগুলি তাদের ছাত্রদের দেখাবার জন্য ধার নিতে পারেন। এটা একটা অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য কোরতে হবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের পক্ষে এটা অপরিহার্য। চলচ্চিত্র ছাড়াও **খণ্ড ফিল্ম ছাব** (film strips) তৈরি করা হয়ে থাকে। চলচ্চিত্র থেকে এর একটা প্রধান সুবিধা এই যে, যতক্ষণ খুশী এটা শিক্ষার্থীদের সামনে দৃশ্যমান রাখা যায়। শিক্ষার্থীরা সম্মুখস্থ দৃশ্যটি অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগের সাথে দেখতে পারে এবং তার খুঁটিনাটি বিবরণটি পর্যন্ত জেনে নিতে পারে।

একাধারে শ্রবণ ও বীক্ষণ-উপকরণ

film strips

(৫) **বেতার**—শিক্ষাক্ষেত্রে বেতারের উপযোগিতাও অপরিসীম। বর্তমানে প্রায় সব বিদ্যালয়েই সরকারী প্রচারবিভাগ থেকে একটি কোরে বেতারসেট দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত বিদ্যার্থীমণ্ডলের আসর-প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া অন্য অনেক অনুষ্ঠানেও শিক্ষার্থীদের, বিশেষ কোরে সমাজবিদ্যা-শিক্ষার্থীদের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচারিত হয়ে থাকে। দেশবিদেশের অর্থনীতি, শিল্পনীতি, রাজনীতি অথবা বিশেষ দিবস উপলক্ষে যে সকল কথিকাদি, গান, নাটক, কথোপকথন প্রভৃতি প্রচারিত হয়, তা সমাজবিদ্যা-শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট অপরিহার্য জ্ঞাতব্য বিষয়। শিক্ষকমহাশয় পূর্ব থেকে বেতার-কর্মসূচীটি অনুধাবন কোরে শিক্ষার্থীদের সেই অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে শুনবার জন্যে নির্দেশ দেবেন। আমাদের দেশে চীনা

আক্রমণের পর বেতারের কর্মসূচীটি শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুবই উপকারক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ই বেতার-প্রচারে উপস্থিত করা হয়। গ্রামাঞ্চলেও বর্তমানে বেতারযন্ত্রের প্রচলন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই উপযুক্ত নির্দেশ পেলে এবং শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকলে উপযুক্ত অনুষ্ঠানাদি শোনা তাদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হয় না। তবে বেতার-বিবরণী শুনলে "ছাত্রেরা বয়ে যাবে" এই হাস্যকর ধারণা এখনও বহু শিক্ষক ও অভিভাবকের মনে বাসা বেঁধে আছে। তবে শিক্ষার্থীদেরও সময় সুযোগ ও প্রয়োজন বুঝে বেতার-বিবরণী শোনা দরকার। তাদের অন্য কাজের প্রয়োজনীয় সময় যেন এদিকে অপচয় করা না হয়।

বেতারযন্ত্রের ব্যবহার অনেকটা গ্রামাফোনযন্ত্রের মতই। তবে বেতারের কর্মসূচীতে থাকে বৈচিত্র্য। ছাত্রেরা বেতার শোনা থেকে ধৈর্য ধরে একটানা বসে থেকে শোনার অভ্যাস গঠন করে। শিক্ষকমহাশয়কে আগে থেকে বেতার-কর্মসূচীটি পাঠ কোরে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বাছাই কোরতে হবে এবং সে বিষয়ে আগে থেকে কিছু কিছু তথ্যও শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেওয়া দরকার যাতে বেতারপ্রচার শোনার সময়ে শিক্ষার্থীদের তা সম্যক্ অনুধাবন কোরতে অসুবিধা না হয়। বেতার-প্রচার শুনবার সময় কিন্তু কোনোপ্রকার বিঘ্ন বা ব্যাখ্যা উপস্থিত করা উচিত নয়। তা একেবারে বর্জন কোরতে হবে। বরং প্রচার শেষ হবার পরে সে বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন এবং সে বিষয়ে আরও পড়াশুনা করার নির্দেশ শিক্ষকমহাশয় দিতে পারেন। উপযুক্ত গ্রন্থাদির নামও তিনি বলে দেবেন। এইভাবে আলোচনার ধারাটা পরে অনুসরণ না কোরলে, ছাত্রদের আগ্রহ বাড়িয়ে না দিলে বেতার-আলোচনাটি অনেক পরিমাণে নিষ্ফল হয়ে যাবে। "বেতার-জগতে" অনেক প্রচারিত কথিকা মুদ্রিত হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বোর্ডে তাদের এক-একটা নকলও মাঝে মাঝে প্রকাশ করা যেতে পারে। "স্মৃতি-সহায়ক" হিসেবে এগুলি সকল শিক্ষার্থীদেরই বিশেষ কাজে লাগবে।

ফলপ্রদ ব্যবহার

(৬) **টেলিভিশন** (একাধারে শ্রবণ ও বীক্ষণ যন্ত্র)—এটা একটা সর্বাধুনিক আবিষ্কার। পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এর প্রচলন হয়েছে। আমাদের দেশে এর প্রবর্তন এখনও হয়নি বললেই হয়। দিল্লীতে একটিমাত্র স্টেশন স্থাপিত হয়েছে। তাও বিদেশের সাথে সংযোগ রাখবার জন্যেই। আশা করা যায়, কিছুকালের মধ্যেই বেতারের মত টেলিভিশন-যন্ত্রও আমাদের দেশে জনপ্রিয়তা লাভ কোরবে। বেতার-প্রচারে আমরা বক্তার কণ্ঠস্বর মাত্র শুনতে পাই, তাকে দেখতে পাইনে। টেলিভিশনে তাকে দেখাও চলবে। সেই সাথে প্রয়োজনীয় দৃশ্য এবং বস্তুগুলোও দেখা যাবে। শিক্ষার্থীদের কাছে দর্শনেন্দ্রিয়ের এই সাহায্য অত্যন্ত মূল্যবান্। এতে তাদের আগ্রহ আরও বাড়বে। শুধু জ্ঞাতব্য বিষয়াদি মাত্র নয়, ভাষাশিক্ষা

সর্বাধুনিক শ্রবণ ও দর্শন উপকরণ

প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাতেও এই যন্ত্রের সাহায্য অতীব মূল্যবান হবে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের কাজের বেশ কিছুটা সময়ে, "জাতীয় শিক্ষকগণের দ্বারা" টেলিভিশন-যন্ত্রের সহযোগিতায় পঠন-পাঠন অগ্রসর হতে পারবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পরে সেগুলি নিজেদের শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। তবে অন্যান্য বিষয়ে ক্ষেত্র যতটাই হোক, সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের সহায়তা স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ উপযোগী এবং মূল্যবান্ হবে।

ব্যবহার ও উপযোগিতা

(৭) **সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি**—সংবাদপত্রাদি ও সাময়িক পত্রাদি হচ্ছে সমাজবিদ্যার তথ্যের আকর। এখানে আজ যা পরিবেশিত হচ্ছে, আগামীকাল তা থেকেই দেশের অর্থনীতি, ভূগোল, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেক কিছু স্থান পাবে। সংবাদপত্রে বহুধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। তা যেমন ছাত্রদের মনে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়, তেমনই তাদের মনকে প্রাণবন্ত, স্বাস্থ্যবান্ ও দূরদর্শী কোরে তোলে। বহু বিষয়েই তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়; আবার কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষ পরিমাণে আগ্রহেরও সৃষ্টি হয়। কেউ অর্থ নৈতিক সংবাদ পছন্দ করে বেশী, কেউ রাজনৈতিক সংবাদ, কেউ বা ঐতিহাসিক তথ্যাদি, আবার কেউ বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। কেউ খেলাধুলার খবর, কেউ সাহিত্য ও অন্যান্য বহুবিধ সমাজচিন্তার খবর—আবার মোটের উপর সব বিষয়েই একটা সাধারণ আগ্রহও জন্মায়। সমাজবিদ্যার ছাত্রদের যদি নিয়মিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপাঠে আগ্রহ না জন্মে, তবে তা সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের একটা ব্যর্থতা বলেই গণ্য কোরতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদি পাঠের সুযোগ পায়, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণ সমাবেশে নিয়মিত দৈনিক সংবাদগুলি উপযুক্তভাবে সংক্ষিপ্ত কোরে পরিবেশন করা যেতে পারে। এ দায়িত্ব উপযুক্ত পরিচালনায় শিক্ষার্থীরাই বহন কোরতে পারে। তাছাড়া মূল্যবান্ সংবাদগুলি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বোর্ডে প্রকাশ করা যেতে পারে। আমরা যে সমাজ-বিবেক ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি কোরতে চাই, বর্তমান দুনিয়ার হালফিল সংবাদের খোঁজ না রেখে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সংবাদপত্র হচ্ছে আলোকের জগৎ। তা থেকে দূরে থাকার অর্থ হচ্ছে অন্ধকারের জগতে নিমজ্জিত থাকা। সংবাদপত্র বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের মনে এক বিচিত্র বিশ্ব-পরিচয়ের সৃষ্টি করে; যার ফলে প্রতি দেশ নিজের অঞ্চলে যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়, তেমনি সারা বিশ্বেরও ঐ একই চিত্র তার অধিবাসীদের মনে জেগে ওঠে - সারা বিশ্ববাসীর পারস্পরিক সহযোগিতা, পরস্পর নির্ভরতা ও পরিণামে এক বিশ্বরাষ্ট্র-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে স্থান পেতে থাকে। চীনা আক্রমণের পর আমাদের প্রতিরক্ষা-ভাণ্ডারে দানের জন্য আহ্বান আসে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহের বিকাশ

সমাজবিবেক ও বিশ্ববোধ ভ্রাতৃত্বের উন্মেষে সংবাদপত্র

আমাদের দেশের সর্বত্র থেকে এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের থেকেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অর্থ, স্বর্ণ প্রভৃতি দান পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলো কিছুদিন যাবৎ এই দানের অবদানে ভরপূর থাকতো। এই একটি সংবাদই ভারতবাসীদের মূলগত ঐক্যকে যেমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, তা হাজার বক্তৃতাতেও সম্ভবপর নয়। যুগোস্লাভিয়ায় সম্প্রতি ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেল। সেই সংবাদে আমরা সকলেই দুঃখিত হয়েছি। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকেই এবং আমাদের দেশ থেকেও সেখানে সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠানো হয়েছে। এই সংবাদটি বিশ্বনাগরিকতাবোধ-সৃষ্টির সহায়ক একটি মূল্যবান সংবাদ। এমনিভাবে প্রতিদিন অসংখ্য ছোট-বড় নানা সংবাদের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও বিশ্বনাগরিক মন তৈরি কোরে চলেছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর সাময়িক পত্র

সংবাদপত্রে আজকাল বহু দেশেরই সাহিত্য, জীবনযাত্রা, আচরণ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা থাকে। এগুলি অনেক সময়েই প্রবন্ধের আকারে পরিবেশিত হয়। তাই আজকাল সাময়িক পত্রের ভূমিকা অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। তথাপি বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিপাঠ বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। সাময়িক পত্রাদি বিভিন্ন ধরনের আছে ;—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি। এক শ্রেণীর সাময়িক পত্রে যে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়, সংবাদপত্রের কাছ থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যে বিদ্যালয়ে বাছাই কোরে সাময়িক পত্রাদি রাখার ব্যবস্থা করাও দরকার এবং শিক্ষার্থীরা যেন তা ব্যবহার কোরতে পায় ও ব্যবহার করে। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের কাছে সংবাদপত্রের ন্যায় সাময়িক পত্রাদির সাহায্যও খুবই মূল্যবান্।

সতর্কতা

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠে শিক্ষার্থীদের একটু সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচারের এক-একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। অনেক সময় সে উদ্দেশ্য হয় সংকীর্ণ, দলগত এবং বিভেদবুদ্ধিপ্রবণ। কোনো সংবাদপত্র হয়ত কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নিয়োজিত। কোনো সাময়িকপত্র হয়ত কোনো বিশেষ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর বা কোনো বিশেষ অর্থনীতিগত সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রচারিত। সেসব ক্ষেত্রে হয়ত বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হতে পারে এবং মন্তব্যাদিও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। এইজন্যেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মতাবলম্বী অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠের সুযোগ দেওয়া দরকার। তবে

স্বাধীন মতামত ও চিন্তাশক্তির উন্মেষ

তাদের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি যাতে জাগ্রত হয়, তার জন্যে শিক্ষকমহাশয় মাঝে মাঝে খুব সতর্ক ও নিরপেক্ষভাবে সাপ্তাহিক সংবাদাদি, বিভিন্ন মন্তব্য ও বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনা কোরতে পারেন এবং কিভাবে নিজস্ব স্বাধীন মতামত গঠন কোরতে হয়, এক-কথায় স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটাতে হয়, তার শিক্ষা দিতে পারেন।

প্রভৃতি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাতেও এই যন্ত্রের সাহায্য অতীব মূল্যবান হবে। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের কাজের বেশ কিছুটা সময়ে, "জাতীয় শিক্ষকগণের দ্বারা" টেলিভিশন-যন্ত্রের সহযোগিতায় পঠন-পাঠন অগ্রসর হতে পারবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ পরে সেগুলি নিজেদের শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে তা ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন। তবে অন্যান্য বিষয়ে ক্ষেত্র যতটাই হোক, সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে এই যন্ত্রের সহায়তা স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ উপযোগী এবং মূল্যবান্ হবে।

ব্যবহার ও উপযোগিতা

(৭) **সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি**—সংবাদপত্রাদি ও সাময়িক পত্রাদি হচ্ছে সমাজবিদ্যার তথ্যের আকর। এখানে আজ যা পরিবেশিত হচ্ছে, আগামীকাল তা থেকেই দেশের অর্থনীতি, ভূগোল, রাজনীতি, ইতিহাস প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেক কিছু স্থান পাবে। সংবাদপত্রে বহুধরনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। তা যেমন ছাত্রদের মনে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনে দেয়, তেমনই তাদের মনকে প্রাণবন্ত, স্বাস্থ্যবান্ ও দূরদর্শী কোরে তোলে। বহু বিষয়েই তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়; আবার কোনো বিশেষ বিষয়ে বিশেষ পরিমাণে আগ্রহেরও সৃষ্টি হয়। কেউ অর্থ নৈতিক সংবাদ পছন্দ করে বেশী, কেউ রাজনৈতিক সংবাদ, কেউ বা ঐতিহাসিক তথ্যাদি, আবার কেউ বা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করে। কেউ খেলাধূলার খবর, কেউ সাহিত্য ও অন্যান্য বহুবিধ সমাজচিন্তার খবর—আবার মোটের উপর সব বিষয়েই একটা সাধারণ আগ্রহও জন্মায়। সমাজবিদ্যার ছাত্রদের যদি নিয়মিত সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রপাঠে আগ্রহ না জন্মে, তবে তা সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের একটা ব্যর্থতা বলেই গণ্য কোরতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে বিদ্যালয়ে সংবাদপত্র ও বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদি পাঠের সুযোগ পায়, তা লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সাধারণ সমাবেশে নিয়মিত দৈনিক সংবাদগুলি উপযুক্তভাবে সংক্ষিপ্ত কোরে পরিবেশন করা যেতে পারে। এ দায়িত্ব উপযুক্ত পরিচালনায় শিক্ষার্থীরাই বহন কোরতে পারে। তাছাড়া মূল্যবান্ সংবাদগুলি বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বোর্ডে প্রকাশ করা যেতে পারে। আমরা যে সমাজ-বিবেক ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি কোরতে চাই, বর্তমান দুনিয়ার হালফিল সংবাদের খোঁজ না রেখে তা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সংবাদপত্র হচ্ছে আলোকের জগৎ। তা থেকে দূরে থাকার অর্থ হচ্ছে অন্ধকারের জগতে নিমজ্জিত থাকা। সংবাদপত্র বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীদের মনে এক বিচিত্র বিশ্ব-পরিচয়ের সৃষ্টি করে; যার ফলে প্রতি দেশ নিজের অঞ্চলে যেমন বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান পায়, তেমনি সারা বিশ্বেরও ঐ একই চিত্র তার অধিবাসীদের মনে জেগে ওঠে – সারা বিশ্ববাসীর পারস্পরিক সহযোগিতা, পরস্পর নির্ভরতা ও পরিণামে এক বিশ্বরাষ্ট্র-সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সকলের মনে স্থান পেতে থাকে। চীনা আক্রমণের পর আমাদের প্রতিরক্ষা-ভাণ্ডারে দানের জন্য আহ্বান আসে।

শিক্ষার্থীদের আগ্রহের বিকাশ

সমাজবিবেক ও বিশ্ববোধ
ভ্রাতৃত্বের উন্মেষে সংবাদপত্র

আমাদের দেশের সর্বত্র থেকে এবং বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের থেকেও অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রচুর অর্থ, স্বর্ণ প্রভৃতি দান পাওয়া যায়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাগুলো কিছুদিন যাবৎ এই দানের অবদানে ভরপুর থাকতো। এই একটি সংবাদই ভারতবাসীদের মূলগত ঐক্যকে যেমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, তা হাজার বক্তৃতাতেও সম্ভবপর নয়। যুগোস্লাভিয়ায় সম্প্রতি ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেল। সেই সংবাদে আমরা সকলেই দুঃখিত হয়েছি। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ থেকেই এবং আমাদের দেশ থেকেও সেখানে সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠানো হয়েছে। এই সংবাদটি বিশ্বনাগরিকতাবোধ-সৃষ্টির সহায়ক একটি মূল্যবান সংবাদ। এমনিভাবে প্রতিদিন অসংখ্য ছোট-বড় নানা সংবাদের মাধ্যমে সংবাদপত্রগুলো আমাদের শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও বিশ্বনাগরিক মন তৈরি কোরে চলেছে।

সংবাদপত্রে আজকাল বহু দেশেরই সাহিত্য, জীবনযাত্রা, আচরণ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, নৃতত্ত্ব, এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি নিয়ে আলোচনা থাকে। এগুলি অনেক সময়েই প্রবন্ধের আকারে পরিবেশিত হয়। তাই আজকাল সাময়িক পত্রের ভূমিকা অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। তথাপি বিভিন্ন সাময়িক পত্রাদিপাঠ বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। সাময়িক পত্রাদি বিভিন্ন ধরনের আছে ;—অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি। এক শ্রেণীর সাময়িক পত্রে যে তথ্যাদি প্রকাশিত হয়, সংবাদপত্রের কাছ থেকে তা পাওয়া সম্ভব নয়। এইজন্যে বিদ্যালয়ে বাছাই কোরে সাময়িক পত্রাদি রাখার ব্যবস্থা করাও দরকার এবং শিক্ষার্থীরা যেন তা ব্যবহার কোরতে পায় ও ব্যবহার করে। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের কাছে সংবাদপত্রের ন্যায় সাময়িক পত্রাদির সাহায্যও খুবই মূল্যবান্।

বিভিন্ন শ্রেণীর সাময়িক পত্র

সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠে শিক্ষার্থীদের একটু সতর্কতা শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। অধিকাংশ সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র প্রচারের এক-একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। অনেক সময় সে উদ্দেশ্য হয় সংকীর্ণ, দলগত এবং বিভেদবুদ্ধিপ্রবণ। কোনো সংবাদপত্র হয়ত কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য নিয়োজিত। কোনো সাময়িকপত্র হয়ত কোনো বিশেষ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর বা কোনো বিশেষ অর্থনীতিগত সম্প্রদায়ের স্বার্থে প্রচারিত। সেসব ক্ষেত্রে হয়ত বিকৃত তথ্য পরিবেশন করা হতে পারে এবং মন্তব্যাদিও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। এইজন্যেই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মতাবলম্বী অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পাঠের সুযোগ দেওয়া দরকার। তবে তাদের নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি যাতে জাগ্রত হয়, তার জন্যে শিক্ষকমহাশয় মাঝে মাঝে খুব সতর্ক ও নিরপেক্ষভাবে সাপ্তাহিক সংবাদাদি, বিভিন্ন মন্তব্য ও বিভিন্ন প্রবন্ধের আলোচনা কোরতে পারেন এবং কিভাবে নিজস্ব স্বাধীন মতামত গঠন কোরতে হয়, এক-কথায় স্বাধীন চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটাতে হয়, তার শিক্ষা দিতে পারেন।

সতর্কতা

স্বাধীন মতামত ও চিন্তাশক্তির উন্মেষ

সংবাদপত্র সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের হাতে এক শক্তিশালী অস্ত্র। এ যেমন স্বতঃই শিক্ষার্থীর মনে সমাজের যাবতীয় সমস্যার বিষয় আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং সেসব বিষয়ে প্রচুর আলোকপাতও করে, তেমনি আংশিকতা ও পক্ষপাতদোষ-দুষ্ট মন্তব্যগুলি ঈপ্সিত ফললাভের প্রচণ্ড বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষকমহাশয় নিজে নিরপেক্ষ মতামত দেওয়া ছাড়াও এবিষয়ে আরও দুটি কার্যকরী পন্থা গ্রহণ কোরতে পারেন। এই পন্থা দুটি প্রকৃত শিক্ষাকে অগ্রসর কোরবে, আবার অনাকাঙ্ক্ষিত বিঘ্নগুলোকেও অপসারণ কোরবে। (১) প্রতি ছাত্রকে তিনি একটি **দৈনিক সংবাদ-পঞ্জিকা** তৈরি কোরতে বলবেন। এই সংবাদ-পঞ্জী তৈরি কোরতে একাধিক সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। দেখা যাবে, অনেক বিকৃত অলীক সংবাদ পরবর্তী সমর্থনের অভাবে আংশিক বা সমগ্রভাবে নস্যাৎ হয়ে যাচ্ছে এবং সত্য সংবাদটি পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়া সংবাদগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত কোরে সাজানো যায়—যথা বিদেশী সংবাদ, খেলা-ধূলার সংবাদ, অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। বিদেশী এবং দেশী বিভাগে আবার পৃথক পৃথক স্তম্ভ (column) থাকবে ; তার কোনটিতে রাজনৈতিক-সংবাদ, কোনটিতে অর্থনৈতিক সংবাদ, কোনটিতে সমাজসমস্যামূলক অন্যবিধ সংবাদ প্রভৃতি। এর ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে। সংবাদপত্রে বহু মানচিত্র, নকশা, এবং ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। সেগুলির সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। দৈনিক সংবাদপঞ্জীতে তাদেরও স্থান হতে পারে এবং এগুলির ধারাবাহিক সংগ্রহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর বিচিত্র দৃশ্যপট সৃষ্টি কোরবে এবং দেশ ও বিশ্ব-সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাকে আরও সুস্পষ্ট কোরবে। (২) প্রতি সপ্তাহে এক একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপর **বিতর্ক-সভা** অথবা **আলোচনার আয়োজন** করা যেতে পারে। বিতর্ক-সভা এবিষয়ে খুবই সহায়ক। একটি সংবাদকে ভিত্তি কোরে যে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হবে, তার পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু বক্তার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে সংবাদের অলীকতা অথবা বিকৃতি আপনা থেকেই প্রকাশ পাবে এবং যা সত্য তা পূর্ণগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হবে। বিতর্ক-সভার লাভ এই যে, সংবাদটা বহু দৃষ্টিকোণ থেকে একটা সজীব তাৎপর্য লাভ করে। আলোচনা-সভাতেও বিভিন্ন জনের দ্বারা বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে সংবাদটি আলোচিত হয় বলে তার সত্যতা যাচাই হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা শিক্ষার্থীদের বিচারশক্তির উন্মেষ হয়, তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী-গ্রহণের শিক্ষা পায় এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। সংবাদপত্রের সদ্ব্যবহার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকের পক্ষে একটি মূল্যবান শিক্ষা এবং সে সম্পর্কে শিক্ষাদান সমাজবিদ্যার শিক্ষকের পক্ষেও একটি অপরিহার্য কর্তব্য। সমাজবিদ্যার শিক্ষাদানে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সাহায্যগ্রহণে আমরা যেন কখনও শৈথিল্য প্রদর্শন না করি।

দৈনিক সংবাদ-পঞ্জী—উপযোগিতা

বিতর্ক-সভা বা আলোচনা-সভার সাহায্য

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন (Field Trips)

শিক্ষামূলক ভ্রমণ একটি সহপাঠ্য কর্মসূচী। কিন্তু এটা ছাত্রদের চোখে দেখে বা কানে শুনে শিক্ষার একটা মূল্যবান উপায় বলে এ সম্পর্কে বর্তমান অধ্যায়ে আলোচনা বিশেষ প্রয়োজন। **বস্তুতঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণ একটা মূল্যবান্ শ্রবণ ও বীক্ষণ-সহায়ক প্রক্রিয়া।** সরকার থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য বিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সকল বিদ্যালয় এই সুযোগ উপযুক্তভাবে গ্রহণ কোরতে পারে না। তার প্রধান কারণ উপযুক্ত পরিকল্পনা, সুবিধাজনক সময়নির্ধারণ, উদ্যোগগ্রহণে অনিচ্ছা বা উৎসাহের অভাব প্রভৃতি। এই বাধাগুলোকে সমাজবিদ্যার শিক্ষককে অতিক্রম কোরতেই হবে। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ শিক্ষা শিক্ষার অপমৃত্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের প্রাণহীন শিক্ষাকে ব্যঙ্গ কোরেই রবীন্দ্রনাথ "তোতাকাহিনী" লিখেছেন। কাটা জলাশয়ে আবদ্ধ জল জলস্রোতের প্রবল প্রাণবেগ থেকে বঞ্চিত। তেমনি বাইরের জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ পুঁথি-পড়া শিক্ষা প্রাণহীন, নির্জীব আবৃত্তি মাত্র। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ছাত্রদের বাইরের জগতে টেনে আনে, কর্মক্ষেত্রে কর্মীর ও কর্মপ্রক্রিয়ার মুখোমুখি করে ; বইয়ে পড়া বিবরণী, হিসাব ও নীতিগুলো তখন তাদের কাছে মানবিক মূল্য গ্রহণ করে।

সহপাঠ্য কর্মসূচী

শিক্ষা-মূলক ভ্রমণে পরিকল্পনা একটি বড় কথা। এখানে ভ্রমণটা বড় হয়ে 'শিক্ষা' কথাটাকে আমরা যেন আদৌ বিস্মৃত না হই। দূরপাল্লার কোন একটা বড় ভ্রমণের চেয়ে নিকট অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে নানা ছোটখাট ভ্রমণ শিক্ষার্থীগণকে অনেক বেশী পরিবেশ-সচেতন ও সমাজ-সচেতন কোরে তুলতে পারে। উদাহরণস্বরূপ আমাদের বিদ্যালয়ের কথাই ধরা যাক। আমাদের বিদ্যালয়টি বর্ধমান জেলার এক প্রান্তে অবস্থিত। নদীয়া, হুগলী ও মুর্শিদাবাদ জেলায় অনেক দর্শনীয় স্থান এর নিকটেই। হাওড়া এবং কোলকাতাও এখান থেকে বেশী দূরে নয়। হাওড়াস্টেশন মাত্র ৫৬ মাইল। ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানগুলির মধ্যে আছে বাংলাদেশের দুটো পুরাতন রাজধানী—নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ। তাছাড়া আছে কাটোয়া, পলাশী, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, বর্ধমান, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, কোলকাতা প্রভৃতি। অর্থনৈতিক দিক থেকে নূতন ও পুরাতন শিল্পাঞ্চলগুলি রয়েছে বেশী দূরে নয়—একদিকে চিত্তরঞ্জন, মাইথন, দুর্গাপুর, অন্যদিকে ব্যাণ্ডেল, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেণী, কোলকাতা এবং তার শহরতলি। কারখানাগুলো গঙ্গার ধারে ধারে আরও এগিয়ে আসছে—নতুন কারখানাগুলো দেখতে দেখতে গড়ে উঠছে। আধুনিক অর্থনীতির এদিকটাও সহজেই আলোচনা কোরে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। তাছাড়া আছে কল্যাণী, ফুলিয়া, শান্তিপুর প্রভৃতি। প্রাচীন মন্দিরাদি দেখবার দিক থেকেও রয়েছে নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কালনা, গুপ্তিপাড়া, শ্রীপুর, বাঁশ-

পরিকল্পনা

ছোটখাট ভ্রমণ, পরিবেশ-সচেতনতা

বেড়িয়া প্রভৃতি। অনেক মহাপুরুষদের জন্মস্থানও আছে এই অঞ্চলের মধ্যেই ; নানা উপলক্ষেই এসব স্থানে ছোট ছোট ভ্রমণের আয়োজন করা যায় এবং সমাজবিদ্যার শিক্ষকের পক্ষে তা অবশ্য কর্তব্যও বটে। এছাড়া এই অঞ্চলের মধ্যেই জন্মে প্রচুর ধান, পাট, আলু, পেঁয়াজ, ইক্ষু প্রভৃতি। এইসব চাষ সম্পর্কেও ছাত্রেরা অতি সহজেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন কোরতে পারে। বস্তুতঃ অনেক শিক্ষার্থীই কৃষকঘরের ছেলে। তাদের শিক্ষা যেন তাদের পারিবারিক বৃত্তির প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করে তা সমাজবিদ্যার শিক্ষককে দেখতে হবে। তাদের পুঁথিগত জ্ঞান ও হাতে-কলমে চাষের ক্ষেতের জ্ঞান পরস্পরের সহগামী হলে তার থেকে আনন্দের বিষয় আর কিছু হতে পারে না।

শিক্ষামূলক ভ্রমণে পরিকল্পনার কথা বলেছি। এইবার কিভাবে একটি ভ্রমণের লাভজনক পরিকল্পনা করা যেতে পারে তা আলোচনা করা যাক। ধরা যাক্, মুর্শিদাবাদ যাওয়া স্থির হোলো। প্রাক্-ব্রিটিশ পর্বে মুর্শিদাবাদের বিয়োগান্ত কাহিনীগুলো এই শহরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতি বছর যখন ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা-দিবসটি ঘুরে আসে, তখনই মুর্শিদাবাদ-পলাশী-কাটোয়ার বিষণ্ণ কাহিনীগুলো আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩শে জুলাই হয় পলাশীর যুদ্ধ। তাই জুলাই-আগস্ট মাসে মুর্শিদাবাদ ও সেই সাথে পলাশী এবং কাটোয়া ঘুরে এলে খুবই ভালো হয়। স্বাধীনতা-দিবসের পূর্ণ মহিমা তখন আমাদের সামনে প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর এই ভ্রমণের আগে নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ-কাহিনী" বইখানি শিক্ষার্থীরা পড়ে নিতে পারে। শ্রেণীকক্ষে সমষ্টিগতভাবেও বইটা পড়ে নেওয়া চলতে পারে। মুর্শিদাবাদ-কাহিনী বইখানা আগে থাকতে পড়ে নিলে মুর্শিদাবাদের সকল প্রাসাদ ও ভগ্নাবশেষগুলো সেখানে পদক্ষেপমাত্রেই যেন আপন-কথা শিক্ষার্থীদের কানে কানে বলতে থাকবে। তাছাড়া উপযুক্ত গাইডের সাহায্য নেওয়া দরকার। যেসব শিক্ষকমহাশয়ের এ সকল স্থান আগে থেকে দেখা আছে, এবং বিবরণসকল পড়া ও জানা আছে, তাঁরা ভালভাবেই গাইডের কাজ কোরতে পারেন। স্থানীয় গাইড (Guide) পাওয়া যায় তো ভালই। তাছাড়া সেখানে গিয়ে দ্রষ্টব্য স্থান, দ্রব্য ও প্রাসাদগুলো শুধু একনজর দেখে নেওয়াই কোনো কাজের কথা নয়। ধীরে-সুস্থে সেসব দেখা এবং সংক্ষেপে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাটিও আলোচনা কোরে নেওয়া দরকার। রক্ষক এবং গাইডের সাথে ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করে জ্ঞাতব্য-বিষয়গুলো জানা দরকার। শিক্ষার্থীরা যা যা দেখলো, শুনলো বা আলোচনা কোরলো, উপস্থিতক্ষেত্রে তার নোট নেবে। তাদের বিবরণী থেকে তাদের সংঘবদ্ধ যাত্রা, থাকা-খাওয়া, চলা-ফেরা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো যেন বাদ না পড়ে। কারণ সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের কাছে এগুলির মূল্যই সর্বাগ্রে। সহযোগিতা-ভিত্তিক সংঘবদ্ধ সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা ও কর্মধারা সর্বাগ্রে আমাদের কাম্য বিষয়। তাই শিক্ষামূলক ভ্রমণের বিবরণে এদিকটা যেন কোনক্রমেই উপেক্ষিত না হয়।

লাভজনক পরিকল্পনা—একটি উদাহরণ (ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য)

ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে শিক্ষার্থীরা স্বভাবতঃই যা যা দেখে এসেছে তা আলোচনা কোরতে চায়। এই আলোচনাকে উৎসাহিত কোরতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত নোট এবং অভিজ্ঞতা থেকে এক-একটি বিবরণী লিখবে। গ্রুপ-লিডার (Group leader) তার নিজস্ব গ্রুপের সকল বিবরণ নিজে একটা গ্রুপ রিপোর্ট (Group report) তৈরি কোরবে। একটি আলোচনা-সভার আয়োজন কোরে (অথবা শ্রেণীর সাধারণ ক্লাসে) এই রিপোর্টগুলি পড়া যেতে পারে এবং তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রিপোর্টে অতিরঞ্জন বা অন্য কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে আলোচনার মাধ্যমে তা সংশোধন কোরতে হবে। পরে রিপোর্টগুলো ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট বোর্ডে এবং সব থেকে ভালো রিপোর্টটি প্রবন্ধের আকারে বিদ্যালয়-পত্রিকায় প্রকাশ করা যেতে পারে। এইজন্য ভ্রমণের আয়োজন থেকে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়কে সুপরিকল্পিত ও লাভজনক কোরে তুলতে হবে।

ভ্রমণ-পরবর্তী আলোচনা ও রিপোর্ট

অন্যদিকে, আর একটি অর্থনৈতিক শিক্ষামূলক ভ্রমণের কথা ধরা যাক। পশ্চিম-বঙ্গের প্রধান কৃষিজ দ্রব্যের মধ্যে ধান, পাট, চা প্রভৃতি প্রধান। আমাদের এলাকায় ধান, এবং পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। অল্প খরচে চায়ের বাগান আমরা দেখাতে পারি নে। তবে ধান এবং পাটের চাষ আমাদের শিক্ষার্থীরা স্বচক্ষেই দেখছে। ধানকল কালনাতে গিয়েই তাদের দেখানো যায় এবং তারা তা হামেশাই দেখছে। ধান উৎপাদন থেকে চাউল তৈরি পর্যন্ত প্রক্রিয়া তারা সহজেই দেখছে এবং চাউলের ব্যবহারও তারা স্বচক্ষে দেখছে। কালনা চাউলকলে এবং চাউলের আড়তগুলোতে একবার পরিভ্রমণের দ্বারা তারা চাউলের উৎপাদন ও তার ব্যবসায় সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পেতে পারবে। এর জন্যে খুব অল্পই অর্থ এবং সময়ের প্রয়োজন। এইটুকু ভ্রমণের দ্বারা অল্পায়াসে ছাত্রদের পূর্বজ্ঞানকে বর্ধিত ও সংহত করা যায়। এর পরে আসে পাটের ব্যবহার। পাটচাষ ও পাটশিল্প সম্পর্কে আমরা একটা আলোচনা-সভার আয়োজন কোরতে পারি। পাট তৈরি হবার পর, অর্থাৎ ধুয়ে সাফ করে পাটের আঁশ গাঁট-বন্দী হয়ে এই এলাকা ছেড়ে যাবার পর কি হয় শিক্ষার্থীদের স্বচক্ষে তা দেখা নেই। আলোচনা-সভায় তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। রেললাইন, নদীপথ, পাটকল ও বন্দরের চিত্র দিয়ে পাট কোথা থেকে কি কোরে কোন্ রূপান্তর গ্রহণ কোরে কোথায় যাচ্ছে আলোচনা-সভায় তা দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। আর তার পরেই কোনো পাটকল,—ধরা যাক, বাঁশবেড়িয়ার কলে যাওয়া যেতে পারে। পাটকলের মালিক-কর্মচারী-মজুরদের কথা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-আলোচনার দ্বারাই জানতে পারি। তাদের বাসস্থান ও জীবনযাত্রা-প্রণালী স্বচক্ষে দেখতে পারি। কলের প্রত্যেকটি বিভাগ ঘুরে দেখে পাট কিভাবে চট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে রূপান্তরিত হয় তা বুঝতে পারি। মালিক এবং মজুরদের সংগঠনের কথাও এই সাথে জানতে পারি। আরও জানতে

অর্থনৈতিক শিক্ষাসংক্রান্ত ভ্রমণ

পারি কয়লা ও বিদ্যুতের সহায়তার কথা, রেলপথ, নদীপথ ও সড়ক পরিবহণের সহায়তার কথা। তারপর কোলকাতা বন্দরে জাহাজ-বোঝাই হওয়া দেখে পাটের শেষ গতি আমরা জানতে পারি। পাট যে বৈদেশিক মুদ্রা আনে তাও আমরা জানতে পারি। আর সেই সাথে পাটশিল্প সম্পর্কে সরকারী আগ্রহের গুরুত্বও বুঝতে পারি। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী শ্রম-দপ্তরেও একবার যাওয়া যেতে পারে। পাট-শিল্পের অন্য বহুবিধ সমস্যা সম্পর্কে তাঁরা আলোচনাও কোরতে পারেন। তারপর এই পরিভ্রমণশেষে আবার বিদ্যালয়ে আলোচনা-সভা, মডেল ও চিত্রনির্মাণ প্রভৃতি চলতে পারে। তাতে সমাজবিদ্যার জাদুঘরটাও সমৃদ্ধ হবে এবং বিদ্যালয়-পত্রিকা (সমাজবিদ্যার জন্য পৃথক পত্রিকা থাকা দরকার, তা থাকলে সেটি-ও) সমৃদ্ধ হতে পারবে। মোট কথা, শিক্ষামূলক পরিভ্রমণ সর্বাংশে সুপরিকল্পিত হতে হবে।

কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন

শিক্ষামূলক ভ্রমণগুলি আসলে কর্মক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শনের নামান্তর। মানুষের অতীত ও বর্তমান কর্মক্ষেত্রগুলিই আমরা শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দেখে থাকি, আর তার দ্বারা মানুষের অতীত ও বর্তমান জীবনযাত্রার সাথে নিজেদের সংযোগসাধন করি। অতীতের কর্মক্ষেত্রগুলোই আজ ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান, আর বর্তমান কর্মক্ষেত্রগুলোই বর্তমান সমাজের হৃৎপিণ্ড, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধির উৎস। তাই বর্তমানের শিল্প-প্রকল্পের ক্ষেত্রগুলিকে শ্রীনেহরু নবভারতের নতুন তীর্থস্থান বলে বর্ণনা কোরেছেন। এই তীর্থস্থানগুলি স্বচক্ষে দেখে আসা এবং সেখানকার কর্মরত কর্মীদের সাথে আলাপ কোরে আসা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অবশ্য কর্তব্য বলেই আমরা বিবেচনা করি। কৃষি-গবেষণাগারগুলি এবং নতুন পদ্ধতিতে কৃষিকার্য-সংগঠন-ক্ষেত্রগুলিও ঠিক এই পর্যায়েই পড়ে। নতুন দেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে উপযুক্ত ধারণা-সৃষ্টির জন্যে এগুলি হচ্ছে অমূল্য শ্রবণ-বীক্ষণ-সহায়ক ক্ষেত্র। কর্মক্ষেত্রে গিয়ে কর্মরত মানুষ ও কর্মপ্রক্রিয়াগুলো

গ্রন্থলব্ধ তথ্যের মানবিক মূল্য

দেখে কর্মীদের সাথে কথাবার্তা বলে পুঁথিতে পড়া তথ্য-গুলির মানবিক মূল্য অনুধাবন করা আমাদের সমাজবিদ্যার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পরম কর্তব্য,—একথা আমরা যেন কখনও ভুলে না যাই।

যেসব ক্ষেত্রগুলো আমরা স্বল্পব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে দেখতে পারি তার একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল :—

দ্রষ্টব্য তালিকা

কাছাকাছি কোনো বড় বাজার, গঞ্জ, বন্দর, রেলস্টেশন প্রভৃতি। ইটভাঁটা, নির্মীয়মান রাস্তা-সেতু-কারখানা-শহর প্রভৃতি। বড় বড় কৃষিক্ষেত্র, ডেয়ারী, পোল্ট্রি, মৎস্যচাষকেন্দ্র, ফল-ফুলের বাগান প্রভৃতি ; মন্দির, মসজিদ, গির্জা, হোটেল, থিয়েটার, বেতারকেন্দ্র, স্টুডিও প্রভৃতি ; ব্যাঙ্ক, থানা, টেলিফোন-এক্সচেঞ্জ, এয়ারপোর্ট প্রভৃতি ; মিউজিয়াম, লাইব্রেরী, টাউনহল, কাছাকাছি কোন পৌরসভার কর্মকেন্দ্র, আদালতভবন, বিধানসভাভবন প্রভৃতি ; খনি-অঞ্চলও অবশ্য দ্রষ্টব্য। স্থানীয় তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প ও অন্যান্য কুটিরশিল্প-কেন্দ্রগুলিও অবশ্য পরিদর্শন করা দরকার। সংক্ষেপে সমাজবিদ্যার শিক্ষক তাঁর

শিক্ষার্থীদের পরিবেশকে বিচার কোরে সমাজের দ্রষ্টব্য কর্মক্ষেত্রগুলিকে বাছাই কোরবেন এবং উপযুক্ত পরিকল্পনানুযায়ী সেগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা কোরবেন।

(৯) সমাজকর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন

উপরে আমরা যেসব কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনের কথা বলেছি, সেখান থেকে কর্মীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ কোরে আনাটাও একটা মূল্যবান্ শিক্ষাসহায়ক উপায়। ধরা যাক, আমরা রানীগঞ্জের খনি-অঞ্চল থেকে একজন দক্ষ খনি-শ্রমিককে আমাদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানালুম। তাকে দেখে এবং তার জীবনযাত্রার পরিচয় পেয়ে শিক্ষার্থীদের স্বভাবতঃই খনি-অঞ্চলের কাজ ও সেখানকার মানুষের সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে। তার কথা শুনতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃই আগ্রহশীল হবে। তার বক্তৃতার সাথে যদি সেই অঞ্চলের কর্মপ্রক্রিয়া ও জীবনযাত্রার চিত্রাদি প্রদর্শন করা যায়, তবে তা শিক্ষার্থীদের মনে গভীর প্রভাব সৃষ্টি কোরবে এবং জ্ঞাত বিষয়টি তাদের মনে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়ে যাবে ; পঞ্চায়েত-প্রধানদের এবং পৌরপতিদেরও বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করার অনেক সুফল আছে। গ্রামীণ জীবনের উন্নয়ন, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্যবিধি এবং উচ্চতর স্তরের সাথে গ্রামীণ শাসনব্যবস্থার সংযোগ প্রভৃতি বিষয়ে অঞ্চল-প্রধান নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আলোচনা কোরতে পারেন। আর বিদ্যালয়ে তাঁর উপস্থিতিই শিক্ষার্থীদের মনে এসব বিষয়ে আপনা থেকে কৌতুহল জাগায়। নগর-ব্যবস্থা সম্পর্কে জানবার তেমনি স্বাভাবিক আগ্রহ আসে পৌরপতিদের উপস্থিতি থেকে। এছাড়া আঞ্চলিক কৃষিবিভাগের পরিচালকেরা, স্থানীয় স্থপতিরা, শিল্পপতি অথবা কুটিরশিল্পের পরিচালক ও কর্মীরাও বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উপস্থিত কোরতে পারেন। দেশবিদেশের শিক্ষাব্রতীদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ এবং বিনিময়ের মূল্যও অসীম। শিক্ষাব্রতীদের আমন্ত্রণ এবং শিক্ষার্থী-বিনিময় শিক্ষার নবদিগন্ত উদ্ভাসিত কোরে তোলে, দেশবিদেশের সামাজিক পরিচয় এবং হৃদ্যতা-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে রাষ্ট্র ও বিশ্বসংসার প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সমাজবিবেক ও বিশ্বচেতনা-সৃষ্টির জন্য আমাদের চেষ্টা, বিদ্যালয়ে নানা কর্মক্ষেত্র থেকে অতিথি-আমন্ত্রণ এবং দেশবিদেশের বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী-বিনিময়ের দ্বারা তা বহুল পরিমাণে সার্থক হোতে পারে। তবে এর জন্যে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের কর্মীগণ, অভিভাবকগণ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষগণের মনে উপযুক্ত সচেতনতা ও সহযোগিতার মনোভাব থাকা দরকার। নিজেদের মনের নানাপ্রকার শৈথিল্য ও সঙ্কোচ এই প্রচেষ্টার অন্তরায়। সেগুলো সর্বপ্রথমে দূর কোরতে হবে।

পরিকল্পনা ও সুফল

(১০) স্থানীয় মেলা, স্থানীয় ও জাতীয় উৎসবাদি

মেলা এবং উৎসবগুলো শ্রবণ এবং বীক্ষণ সহায়কের কাজ করে। বলা হোয়েছে, মানুষের শিক্ষার স্থল অনেক—গ্রন্থ, বিদ্যালয়, মনুষ্য-সমাজ ও বাহ্যজগৎ প্রভৃতি।

মেলা ও উৎসবগুলি এই মনুষ্যসমাজ ও বাস্তবজগতের পরিচয় বহুল কোরে আনে। একটি মেলা উপলক্ষে নানাদিক থেকে হাজার হাজার লোক এসে উপস্থিত হয়। তারা কেন আসে? কোথা থেকে কোন্ পথে কেমন কোরে আসছে? মেলায় তারা কি দেখছে, কি কোরছে, কি বলছে বা কি শুনছে?

মেলার প্রকৃতি ও প্রভাব

হরেকরকম মানুষ, পণ্য ও আমোদপ্রমোদের সমাবেশ—স্থানীয় সমাজে এই মেলার প্রভাব কি? এই মেলায় গেলে এবং মেলার কর্মব্যস্ততা স্বচক্ষে দেখলে তার সামাজিক তাৎপর্য ও স্থানীয় সমাজের গড়নটিও শিক্ষার্থীদের কাছে স্বতঃই প্রত্যক্ষ হোয়ে উঠবে। এই মেলার মধ্যে অনেকগুলি আছে সংস্কৃতি ও ধর্মবিষয়ক মেলা। বীরভূমের জয়দেব-মেলা এ বিষয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলার কথাও আমরা জানি। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই চৈত্রমাসে চড়ক-মেলা এবং আশ্বিন বা কার্তিক মাসে বিজয়া-দশমী উপলক্ষেও মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক স্থানে উত্তরায়ণ-মেলা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাসাগরে মকর-সংক্রান্তির মেলা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষকমহাশয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে মেলা দেখতে যাবার আগে মেলাটি সম্পর্কে একটি আলোচনা কোরে নেবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরা ঘুরে ঘুরে মেলাটি দেখবে, মেলায় আগত লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনা কোরবে এবং আরও নানাভাবে সেখান থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ কোরবে। মেলা থেকে ফিরে এসেও নিজেদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা দরকার।

সামাজিক, ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক উৎসবাদি

অনেকগুলো উৎসব আছে যা আমাদের দেশের সাধারণ সামাজিক অবস্থা এবং ধর্মীয় আচরণ ও ইতিহাস সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষা দেয়। নবান্ন, পৌষপার্বণ, শ্রীপঞ্চমী, অন্নপূর্ণাপূজা, চড়কপূজা, শিবরাত্রি, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, সবে-বরাত, ইদুজ্জোহা, গুডফ্রাইডে, খ্রীষ্টমাস প্রভৃতি বহু উৎসব আছে যা শিক্ষার্থীরা চাক্ষুষ দেখতে পারে এবং সেই সব অনুষ্ঠানাদির ইতিবৃত্ত জানতে পারে। আজকাল বেতারে এই সকল উৎসব উপলক্ষে তাদের ইতিবৃত্ত বলা হয়ে থাকে এবং প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি থেকে মূল্যবান বক্তব্যাদি প্রচারিত হয়ে থাকে। শিক্ষকমহাশয় এইসব উৎসবের প্রাক্কালে উৎসবগুলির সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দেবেন এবং বেতারে প্রচারিত তথ্যাদি শুনতে ছাত্রদের উৎসাহিত কোরবেন। তাছাড়া, ছাত্ররা এইসব উৎসবে যোগদান কোরে যাতে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ করে, সে সম্পর্কেও তাদের অবহিত কোরবেন।

রাষ্ট্রীয় উৎসবাদি

আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনেও আমরা কতকগুলো উৎসব পালন কোরে থাকি। ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা-দিবস পালন, ২রা অক্টোবর গান্ধী-জয়ন্তী অনুষ্ঠান, ২৩শে জানুআরি নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্মদিবস পালন, ২৬শে জানুআরি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান, ৩০শে জানুআরি গান্ধীজীর মৃত্যুদিনে শহীদ-দিবস পালন প্রভৃতি উৎসব আমরা কোরে থাকি।

এছাড়াও আমরা আরও অনেক দেশবরেণ্য নেতার ও স্বাধীনতা-সৈনিকের জন্মতিথি পালন কোরতে পারি। এই অনুষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহণ কোরলে এই দিনগুলোর তাৎপর্য আপনা থেকেই তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শিক্ষকমহাশয় আগে থেকে এই দিনগুলোর অনুষ্ঠান বিষয়ে আলোচনা কোরবেন, শিক্ষার্থীদের নিয়ে অনুষ্ঠানাদির কর্মসূচী নির্ধারণ কোরবেন এবং উৎসব-পালনের পরও নিজেদের কাজের গুরুত্ব, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা কোরবেন।

জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠানসমূহ

এছাড়া আমাদের দেশের অন্যান্য মহাপুরুষদের জন্ম-জয়ন্তী অনুষ্ঠান কোরতে পারি। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জয়ন্তী, রামকৃষ্ণ আবির্ভাব উৎসব; বিবেকানন্দ জন্মোৎসব প্রভৃতি আমাদের সমাজ-জীবনে গভীর তাৎপর্য বহন করে। এগুলি এবং অনুরূপ জয়ন্তী-অনুষ্ঠানগুলো পালন আমাদের একটি বিশেষ কর্তব্য এবং এগুলি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীদের নিজেদের সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান ও গভীর উপলব্ধি দান করে।

(১১) *ইতিহাসপাঠের বিশেষ সহায়ক উপকরণসমূহ ঃ—*

অতীতের সীমিত আবেদন

ইতিহাস মানব-সমাজের অতীত জীবনযাত্রার পরিচয়বাহী। বর্তমান ঘটনা-স্রোতের যে তরঙ্গ ও বৈচিত্র্য আমাদের চঞ্চল কোরে তোলে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট করে, অতীতের সে শক্তি নেই, তার সে শক্তি বহুলাংশে খর্বিত। তাই অতীতের ঘটনাগুলি নব নব দৃশ্যপট, সংকেত, প্রতীক প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত কোরতে হয়। শিক্ষককে এখানে খুবই কুশলী ও মনোযোগী হোতে হয়। ঐতিহাসিক স্থানগুলিতে ভ্রমণের গুরুত্ব নিয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা কোরেছি। এগুলি হচ্ছে প্রত্যক্ষভাবে অতীতের কর্মক্ষেত্রের দৃশ্যাবলী ও উপকরণাদি পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু অতীতের সব কর্মক্ষেত্রই আজ যথাযথ অবস্থিত নেই। অনেক স্থান বা নদী সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত, অনেক স্থান মাটির তলায় বা দুর্ভেদ্য অরণ্যে হারিয়ে গেছে, অনেক স্থানের কোন চিহ্নই আমাদের কাছে অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া সকল ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে ভ্রমণ আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই আশ্রয় নিতে হয় ঐতিহাসিক নাটকাদির অভিনয়ের। অভিনয়ের মাধ্যমে আমরা অতীতের দৃশ্যাবলী ও ঘটনাগুলিকে পুনরনুষ্ঠিত করি। তাই দেখতে হবে যে সময়, সমাজ ও কার্যাবলীকে আমরা নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থিত কোরতে চাই, তা যেন সেই সময়, সমাজ, ও ঘটনাবলীর প্রকৃত ও যথাযথ পরিচয়বাহী হয়। নতুবা অভিনেতা ও শ্রোতাদের মনে বিকৃত ও ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। ইতিহাসে বা সমাজবিদ্যার শিক্ষককে

ঐতিহাসিক নাটকাদির অভিনয়

নাটক-নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তাছাড়া সে সময়ের জীবন-যাত্রার যাতে যথাযথ পরিচয় পাওয়া যায় তার জন্য অভিনেতাদের বেশভূষা, উপকরণ ও দৃশ্যাবলী প্রভৃতি যেন সেই সময়ের উপযোগী হয়। একথায়, অভিনয়ের পরিকল্পনা ও পরিবেশ যেন উপস্থাপিত অতীতকে তার নিজস্ব পরিচয়েই প্রতিষ্ঠিত করে।

সব সময় শিক্ষার্থীদের পক্ষে বড় বড় নাটকের অভিনয় সম্ভবপর নয়। তাই মাঝে মাঝে একাঙ্ক নাটকের বা তার চেয়েও সংক্ষিপ্ত দৃশ্য-নাট্যের অভিনয় করা দরকার। এই ধরনের অভিনয়ের উপযোগী নাটিকা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা নিজেদের চেষ্টাতেই রচনা কোরতে পারেন এবং তার প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা, উপকরণ প্রভৃতি কোরে নিতে পারেন। বিদ্যালয়ে যদি একটি স্থায়ী অভিনয়ের উপযুক্ত মঞ্চ (auditorium) থাকে, তবে এই কার্যসূচীগুলিকে রূপায়িত করা বেশ সহজ হয়। নতুবা প্রত্যেকবারের জন্য মঞ্চ ইত্যাদি নির্মাণে প্রভূত সময় ও পরিশ্রম প্রয়োজন হয়। কার্যসূচী রূপায়ণে বিলম্ব ও ব্যয় দুইই বেশী হয়। এই সমস্ত সুসজ্জিত অভিনয় ছাড়াও অন্য নানাপ্রকার অনুমানমূলক (suggestive) অভিনয়ের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। কৌতুকযাত্রা (pantomime) দৃশ্যাদির মূক অভিনয় (tableau), স্বগতোক্তি, রাজদরবার বা পার্লামেণ্ট-সভার প্রতীক অভিনয় প্রভৃতিও ঐতিহাসিক বিষয়াদি শিক্ষাদানের মূল্যবান সহায়ক।

অন্যান্য অভিনয়

আমাদের দেশে ধর্ম, পুরাণ এবং ইতিহাসাশ্রিত নাটকের অভাব নেই। তা থেকে উপযোগী বই এবং দৃশ্যাদি আমরা বাছাই কোরে নিতে পারি বা সেগুলির ভিত্তিতে ছোট ছোট নাটিকা তৈরি কোরেও নিতে পারি। দু-একটা এমন হওয়া দরকার যা শ্রেণীকক্ষে এবং অল্প সময়ের মধ্যে অভিনয় করা যায়। এগুলি অবশ্য কিছুটা প্রতীকধর্মী হতে বাধ্য। তবে এগুলির একটা উপযোগিতাও আছে। শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি অন্যান্য অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অভিনয়গুলির উপযুক্ত পরিবেশ কল্পনা কোরে নেয়। এতে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ঘটে। তবে যাই হোক, অভিনয় খুব ঘন ঘন কোরতে নেই এবং তা সব সময়ে এক ধরনের হওয়াও উচিত নয়।

সতর্কতা

ইতিহাসপাঠের আরও কতকগুলি মূল্যবান সহায়ক আছে। **ঐতিহাসিক মানচিত্রাদি** তার মধ্যে সর্বপ্রধান। ঐতিহাসিক মানচিত্রে অতীতের ঘটনাবলী সংঘটনের স্থানগুলি সঠিকভাবে নির্দিষ্ট থাকে। শিক্ষার্থীদের যেমন বর্তমান পৃথিবীর মানচিত্রে প্রসিদ্ধ নগরাদির অবস্থান নির্দেশ কোরতে দেওয়া হয়, তেমনি অতীত ঐতিহাসিক মানচিত্র অঙ্কন কোরে তাতে ঐতিহাসিক স্থানাদি নির্দেশ কোরতে দেওয়া যেতে পারে। সেই সাথে তাদের সন্নিকটে বর্তমান প্রসিদ্ধ স্থানগুলির কয়েকটিও নির্দেশ কোরতে বলা যেতে পারে। সমাজবিদ্যাকক্ষের অতীত জীবন-যাত্রার অংশটি উপযুক্ত ঐতিহাসিক মানচিত্রাদি দ্বারা শোভিত হওয়া দরকার। সঙ্গে সঙ্গে অতীত জীবনযাত্রার চিত্রসংগ্রহ, ঐতিহাসিক মহামানবদের ও কীর্তিগুলোর

চিত্র ইতিহাসপাঠের মূল্যবান সহায়ক। এক-একজন মহামানব বা এক-একটি কীর্তিও কখন কখন এক-একটি যুগের ধারক, বাহক ও স্মারক হয়ে ওঠে। আমাদের সদ্য অতীত ইতিহাসে গান্ধীজীর একখানি চিত্র আমাদের কাছে এইরূপ একটি যুগের ধারক, বাহক ও স্মারক। জেমস ওয়াটের আবিষ্কৃত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের একটি মডেল বা চিত্র আধুনিক শিল্প-বিপ্লবের একটি মূল্যবান প্রতীক। ফিউডাল যুগের জীবন-যাত্রার ছবিগুলো সে সম্পর্কে বক্তব্যের মূল্যবান অনুপূরক। ঐতিহাসিক মহামানবদের ও কীর্তিগুলোর মডেল এবং চিত্র শিক্ষার্থীদের নিজহাতেও তৈরি কোরতে দেওয়া যেতে পারে। এর দ্বারা ইতিহাস সম্পর্কে তাদের কল্পনাশ্রয়ী ও অনুমানমূলক ধারণা মানবাশ্রয়ী ও সমাজমুখী হয়। তারা এই মডেল ও চিত্র-গুলিকে অবলম্বন কোরে স্থান ও কলের স্পষ্ট ধারণা কোরতে শেখে। বিভিন্ন ঘটনা ও কালের তুলনামূলক বিচার কোরতেও শেখে।

ঐতিহাসিক মানচিত্র, মডেল ও চিত্র

ইতিহাসের ঘটনা ও কালের স্পষ্ট ধারণা কোরতে নানাবিধ চার্ট ও তুলনা-মূলক চিত্র-বিবরণীর সাহায্য প্রয়োজন। ধরা যাক, আমরা মুঘল-আমলের ইতিহাস চার্টের সাহায্যে উপস্থিত কোরতে চাই। একটা চার্টে আমরা মুঘল-সম্রাট্‌দের নাম, তাদের শাসনকাল ও তাদের প্রত্যেকের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি দিয়ে একটা চার্ট তৈরি কোরতে পারি। তার পাশাপাশি অন্য একটা চার্টে স্থান ও সময়ক্রম অনুসারে ভারতের নানাস্থানে কয়েকজন বড় বড় মুঘল শত্রুর উল্লেখ কোরতে পারি। অন্য একটা চার্টে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, ধর্ম ও সমাজ-নায়কদের ক্রমান্বয়ী আবির্ভাব দেখাতে পারি। অন্য আর একটা চার্টে বিদেশী বণিকদের আগমন ও বিদেশী ভ্রমণকারীদের আগমন দেখাতে পারি। আবার এগুলির সমন্বয় কোরে তুলনামূলক চার্টও উপস্থিত কোরতে পারি। বাবর এবং হুমায়ুনের রাজত্বকালের বিভিন্ন বিষয়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি ক্রমান্বয়ে এবং পাশাপাশি (সম্ভবপরক্ষেত্রে দু'একটি চিত্রসমেত) উপস্থিত করা যেতে পারে। (ছবির ক্ষেত্রে বাবর, হুমায়ুন শের শাহের ছবি সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে)। আকবরের রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার রাজত্বকাল নিয়ে পৃথকভাবেই একটি তুলনামূলক চার্ট তৈরি করা দরকার। তারপর জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের রাজত্বকালের বিবরণ। ঔরংজীবের রাজত্বকাল নিয়েও একটা পৃথক তুলনামূলক চার্ট উপস্থিত করা যায়। পরবর্তী মুঘলদের বিবরণ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তবে ভারত-ইতিহাসের অন্যান্য ঘটনার সাথে তুলনামূলক বিচারে তাদের নাম ও কাল উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে সমাজবিদ্যার শিক্ষক মানবসমাজের অগ্রগতির সাথেই প্রধানভাবে জড়িত। তাই রাজারাজড়াদের এবং তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলির জন্যে বেশী সময় এবং পরিশ্রম ব্যয় না কোরে সামাজিক অগ্রগতির যারা নায়ক অথবা সামাজিক অগ্রগতির

চার্ট ও তুলনামূলক বিবরণীর ব্যবহার

বিবরণাদি যাঁরা লিখে গেছেন তাঁদের দিকেই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ কোরবেন। চার্ট, ডায়াগ্রাম এবং তুলনামূলক চার্টে ঘটনা ও চিত্রের বাহুল্য অবশ্যই বর্জনীয়। **সব সময় মনে রাখতে হবে এগুলি অতীতকে শিক্ষার্থীদের সামনে পুনরুজ্জীবিত করার সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তার অধিক মূল্য এগুলিকে দেওয়া চলবে না। এরা পাঠ্যপুস্তকের বিকল্প নয়, সহায়ক।** ইতিহাস ও সমাজবিদ্যার শিক্ষকেরা এই কথাটি সর্বদা অবশ্যই স্মরণ রাখবেন।

সতর্কতা

এবার **সময়রেখার** কথা। অপর রেখার কথা সকলের শেষে বললেও এর প্রয়োজন কিন্তু ইতিহাস পড়াবার প্রতি পদক্ষেপে। অতীতের ঘটনা বুঝতে হলে কালের ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। কিন্তু কাল একটি নিয়ত প্রবাহ—কালস্রোত। সেখানে দু'একটা খুঁটি না পুঁতলে কোন অবলম্বন থাকে না, একেবারেই ভেসে যেতে হয়। **দুটো প্রধান খুঁটি হচ্ছে আজ**—বর্তমান (এই মুহূর্তে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) আর **যীশুখ্রীষ্টের জন্মকাল**, যখন থেকে খ্রীষ্টাব্দের গণনা আরম্ভ। আকবর রাজ্য লাভ কোরেছিলেন ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে ৪০৭ বছর আগে, আর যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ১৫৫৬ বছর পরে। আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ কোরেছিলেন খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ অব্দে অর্থাৎ খ্রীষ্ট জন্মাবার ২৭৩ বছর আগে এবং আজ থেকে ২২৩৬ বছর আগে। এইভাবে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিকে সময়রেখায় নির্দেশ করা যেতে পারে এবং একটি ঘটনার সাথে আরেকটি ঘটনার কালগত দূরত্ব (কত বছর আগে বা পরে) বিচার করা যেতে পারে। ধরা যাক, তিনটি পানিপথ যুদ্ধের কথাই,—১৫২৬, ১৫৫৬ আর ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দগুলিতে এগুলি ঘটেছিল। প্রথমটির ৩০ বছর পরে, দ্বিতীয়টি, আর তার ২০৫ বছর পরে তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধ—যেখানে মারাঠাসাম্রাজ্য-গঠনের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল এবং মারাঠাদের ক্রমিক পতন ও ভবিষ্যতে ইংরেজ-শক্তির ক্রমিক উত্থানের পথ (আহমদ শাহ্ আবদালীর আক্রমণের পরোক্ষ ফল হিসেবে) কার্যতঃ উন্মোচিত হয়ে গেল। এরই মাত্র চার বছর আগে ভারত-ইতিহাসের আর একটি ঘটনা ঘটেছিল পলাশীর প্রান্তরে—১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ। মোগল আমল, মারাঠা-শক্তির উত্থান-পতন, পারসিক আক্রমণ এবং ইংরেজ শক্তির অভ্যুদয়—সময়রেখায় মাত্র এই চারটি-খ্রীষ্টাব্দ উল্লেখ কোরে কত সুস্পষ্ট কোরে তোলা যায়। এই সঙ্গে একথা মনে রাখতে হবে সময়রেখার বহু ঘটনার ভিড় বাঞ্ছনীয় নয়। **সময়রেখার সর্বপ্রধান উপযোগিতা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ন কালস্রোতে শিক্ষার্থী যেন তলিয়ে না যায়, কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার তারিখ যেন তাকে ভেসে থাকবার অবলম্বন দেয়। সেই তারিখগুলি মনে রেখে অন্যান্য ঘটনা তার কত আগে বা পরে তা যেন শিক্ষার্থী স্থির কোরে নিতে পারে।**

সময়রেখা

উপযোগিতা

দু'প্রকার সময়রেখা

সময়রেখা আছে দু'প্রকার—Proggressive Time-line (নিয়ত সময়প্রবাহ-রেখা) এবং Regressive Time-line (বিপরীতমুখী প্রবাহরেখা)। Proggressive Time-lineএ অতীতের ঘটনাগুলি পর পর সাজিয়ে দেখানো হয়। তার গতি অতীত থেকে বর্তমানের দিকে। এর সুবিধে সময়ের ধারণা একটা ক্রমানুযায়ী হয়, পরের পর ঘটনাগুলি তারা চোখের সামনে সাজিয়ে নেবার ইঙ্গিত পায়। এতে পরের ঘটনাগুলি আগে নির্দেশ করার জন্য উল্টাপাল্টা ধারণা হওয়ার যে ভুল, তা থাকে না। কারণ সময় যে নিয়ত প্রবাহে চলে এসেছে, ঘটনার ধারাকেও ঠিক সেই প্রবাহ ধরে সন্নিবেশিত কোরে আসা হয়।

(১) নিয়ত সময়প্রবাহ-রেখা

কিন্তু Regressive Time-lineএ বর্তমানকে সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ করানো হয়। আজ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। পলাশীর যুদ্ধ ঘটেছিল আজ থেকে ২০৬ বছর আগে। অথবা বুদ্ধ জন্মেছিলেন খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকে। অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্ট জন্মাবার প্রায় ৬০০ বছর আগে এবং আজ থেকে প্রায় ২৫০০ বছর আগে। সম্প্রতি আমরা (১৯৬১ খ্রীঃ) বুদ্ধ-পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের ২৫০০-তম জন্ম-জয়ন্তী পালন কোরেছি। এই বিপরীতমুখী সময়প্রবাহ-রেখাটি খুবই মনোবিজ্ঞানসম্মত। এর সাহায্যে শিক্ষার্থী অনায়াসেই সময়ের ধারণা কোরে নিতে পারে। কারণ বর্তমান তো তার জানা ; বর্তমান থেকে কত আগে—এইভাবে অতীতের ধারণা করা হচ্ছে, জানা থেকে অজানায় পৌছানো (from known to unknown) হচ্ছে। বস্তুতঃ ঐতিহাসিক পাঠে আমাদের "নিয়ত সময়প্রবাহ-রেখা" এবং "বিপরীতমুখী সময়প্রবাহ-রেখা" দুইয়েরই ব্যবহার আবশ্যক। এরা অতীত সময়ের ধারণা উপস্থিত করায় পরস্পরের সহায়ক।

বিপরীতমুখী সময়প্রবাহ-রেখা

(১২) ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির পাঠ-সহায়ক বিশেষ উপকরণসমূহ ঃ—

ভৌগোলিক বিষয়াদির পাঠে স্থানের ধারণা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। এর জন্য ভৌগোলিক এবং নানা শ্রেণীর মানচিত্রের প্রয়োজন। ভূগোলক পৃথিবীর চেহারা ও গোলাকার ভূপৃষ্ঠের ওপর বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্দেশ করে। উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ, বিষুবরেখা, মূল দ্রাঘিমারেখা প্রভৃতি সম্পর্কে আমরা ভূগোলক থেকে স্পষ্ট ধারণা পাই। পৃথিবী ও তার নানা দেশের বিবরণপাঠে দেয়াল-মানচিত্রের সাহায্য আমাদের নিতে হবে। তবে ভূগোলক থেকে আমরা যে ধারণা পাই, তার তুলনায় তাদের থেকে প্রাপ্ত ধারণা অনেকটা অসম্পূর্ণ। এইজন্যেই মাঝে মাঝে ভূগোলকটা শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত করা দরকার। কলম্বাস স্পেন থেকে কেন যে পশ্চিমমুখী সমুদ্রযাত্রার সিদ্ধান্ত কোরেছিলেন, সেটা ভূগোলকের সাহায্যে

ভূগোলক

শিক্ষার্থীদের বুঝতে বিশেষ সুবিধে হয়। আমেরিকা থেকে চীন, জাপান বা ফিলিপাইন যেতে হোলে শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম কোরলেই যথেষ্ট, আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরের বুক চিরে উত্তমাশা অন্তরীপ, কলম্বো ও সিঙ্গাপুর বন্দর ছুঁয়ে যাবার দরকার হয় না, সেটা দেয়াল-মানচিত্র অপেক্ষা ভূগোলকের সাহায্যেই ভাল বোঝা যায়। আর এই দেশগুলোর আপেক্ষিক অবস্থানের সাথেই অর্থনৈতিক স্বার্থের স্রোত এবং বিশ্বরাজনীতির অনেক ঘোঁট জড়িয়ে আছে তাও স্পষ্ট কোরে দেওয়া যায়। তাছাড়া পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, ঋতু-পরিবর্তন প্রভৃতি এই গোলকের সাহায্যেই সহজে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। তবে শ্রেণীকক্ষে যে গোলকটি ব্যবহার করা হবে, তা যেন এমন আকারের হয় যাতে পিছন সারির শিক্ষার্থীরাও যা দেখানো হচ্ছে তা স্পষ্ট দেখতে পারে।

ভূগোলকের একটা বড় মডেল-তৈরি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একটা প্রকল্প (Project) হিসেবে গ্রহণ কোরতে পারেন।

দেয়াল-মানচিত্র ও অন্যান্য দেয়াল-চিত্রাদির ব্যবহার

দেয়াল-মানচিত্র এবং অন্যান্য দেয়াল-চিত্র ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদির পাঠের অপরিহার্য সহায়ক। ভূগোলকে অনিবার্য কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে নিতান্ত ছোট আকারে দেখাতে হয়। এইজন্যই পৃথক পৃথক মহাদেশ, দেশ এবং আরও ক্ষুদ্রতর অঞ্চলের দেয়াল-মানচিত্র তৈরি কোরতে হয়। মানচিত্রে ঈপ্সিত অঞ্চলের প্রতিকৃতি ভূগোলকে প্রদর্শিত প্রতিকৃতি অপেক্ষা বড় হয়। এইজন্যে যখন শুধুমাত্র ভারত ইউনিয়নের বিষয় শিক্ষার্থীদের পাঠ কোরতে হয়, তখন ভূগোলক অথবা এশিয়া মহাদেশের মানচিত্র অপেক্ষা ভারত ইউনিয়নের একখানি বৃহৎ মানচিত্র অনুধাবন করাই লাভজনক। ভারতের হিমালয় পর্বত, বিন্ধ্য পর্বত, গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কৃষ্ণা-কাবেরী প্রভৃতি নদী, কানপুর-গোরক্ষপুর-রাঁচি-দুর্গাপুর-বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চল ভারতের বৃহৎ দেয়াল-মানচিত্র থেকেই স্পষ্টতরভাবে ও অধিকতর সঠিকভাবে নির্দেশিত হোতে পারে। এই ধরনের মানচিত্র থেকে আমরা যখন বৃষ্টি-পাতের পরিমাণ অনুসারে নানা অঞ্চল ভাগ করি, মৃত্তিকার গুণাগুণ অনুসারে অঞ্চল ভেদ করি—আর তাদের ভিত্তিতে কৃষিজ খনিজ শিল্পজ বনজ সম্পদের হিসাব করি, তখন ভূগোল এবং অর্থনীতির সূত্রগুলো একসাথে আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত হয়। কেন দুর্গাপুরে একটি নতুন শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হোলো, ভারতের পূর্বাঞ্চলের একখানা মানচিত্র থেকে আমরা তা স্পষ্ট বুঝিয়ে দিতে পারি। এই সাথে ভারতের একখানি পরিবহণ-মানচিত্র—রেল, সড়ক, আভ্যন্তরীণ জলপথ এবং সমুদ্রপথ—ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক সূত্রগুলিকে আরও সুস্পষ্ট কোরে তুলবে। এই সাথে একখানি রাজনৈতিক মানচিত্র ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চেহারাটি স্পষ্ট কোরে দেবে। আর সবশুদ্ধ আমরা বর্তমান ভারতীয় সমাজের গতিপ্রকৃতির একটা হদিস পাবো।

ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান দৃঢ়ভিত্তিক করার জন্য শিক্ষার্থীদের মানচিত্র-অঙ্কনের ও তাতে নানা স্থান, উৎপাদন-অঞ্চল, পথ, সেচব্যবস্থা

প্রভৃতি নির্দেশ করা দরকার। শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ স্থানীয় অঞ্চলের মডেল মাটি এবং অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি কোরতে পারে এবং তাতে স্থানীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো, নদী-খাল-বিল-রেলপথ, সেচখাল ও অন্যান্য সেচব্যবস্থা এবং কারখানা প্রভৃতির অবস্থান নির্দেশ করা যেতে পারে। তেমনি নিজ রাজ্যের এবং নিজ দেশের মডেলও তৈরি করা যেতে পারে। এতে ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান দেশ এবং অঞ্চলের তিন-আয়তনবিশিষ্ট প্রতিকৃতি (three dimension model) অবলম্বনে বেশ স্পষ্টতা ও প্রাঞ্জলতা লাভ করে। এসব প্রকল্প হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের বিদ্যালয়গুলোর বর্তমান টাইম-টেবল যেমনভাবে তৈরি হয়, তাতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবসরসময় এই কাজে ব্যবহার কোরলে ভাল হয়। টাইম-টেবলের দোষ, কিংবা আমাদের শিক্ষাই লক্ষ্যভ্রষ্ট,—তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে অবসর-সময়টায় শিক্ষার্থীদের সাহায্যে কাজে লাগিয়ে বর্তমান শিক্ষাকে ধাতস্থ করা দরকার।

মানচিত্র-অঙ্কন ও মডেল-নির্মাণ

মানচিত্র এবং অন্যান্য সহায়ক চিত্র সম্পর্কে প্রধান কথা এই যে, এগুলো শিক্ষণীয় বিষয়ের যেন অনুগামী হয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে স্পষ্ট, প্রাঞ্জল এবং চিত্তাকর্ষক করার জন্যই যেন এগুলির ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এগুলো যেন তথ্যনিষ্ঠ এবং সঠিক হয়। অযথা বাহুল্যের যেন ভিড় না হয়।

মডেল সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে নানা স্থানে আলোচনা কোরেছি। তাদের উপযোগিতা কি তাও অনেক বলা হোয়েছে। সব থেকে বড় কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষার মধ্যে আমরা একটা বাস্তব সচেতনতা আনতে চাই। অথচ সকল প্রকৃত বস্তুই শিক্ষাগৃহে আসা বা প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। তাই তাদের মডেল তৈরি কোরে দেখালে বস্তুটি সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান-অর্জনে প্রভূত সাহায্য হয়। তাছাড়া মডেলের তিনটি আয়তন আছে—দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা। এর ফলে কঠিন বস্তু-সমূহকে মডেলের মাধ্যমে উপস্থিত করার খুবই স্থবিধে হয়, শিক্ষার্থীদের তিন আয়তনের আনুপাতিক ধারণাও সুস্পষ্ট হয়। তরল পদার্থগুলো তো আমরা সহজেই সামান্য পরিমাণে কোনো আধারে কোরে শ্রেণীকক্ষে দেখাতে পারি। এগুলোর জন্য মডেল অচল। তেমনি বায়বীয় পদার্থকেও মডেল সাহায্যে দেখানো যায় না। হয় তাদের ল্যাবরেটরীতে যেমন কোরে দেখানো হয়, তেমনি-ভাবে দেখানো চলে, নতুবা রঙের কাজ দিয়ে মডেল বা চিত্রে সংকেতিত করা যায়। মডেল যেন বস্তুনিষ্ঠ হয়, তার আনুপাতিক গড়নটা এবং তাতে বিভিন্ন বিষয়ের নির্দেশ যেন ঠিক ঠিক বজায় থাকে। মডেল আদপে প্রকৃত বস্তুর ক্ষুদ্রতর সংস্করণ—একথাটা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

মডেল ব্যবহারের স্থবিধা

রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়াদির পঠন-পাঠনে, আমরা এ পর্যন্ত যেসব শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ও প্রক্রিয়ার আলোচনা কোরেছি তা কম-বেশি প্রযোজ্য। প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে

আমরা তা উল্লেখও কোরেছি। তবে এখনও কয়েকটি মূল্যবান শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ও প্রক্রিয়ার আলোচনা বাকী রয়েছে। তার মধ্যে "সমাজবিদ্যার পত্রিকা" সম্পর্কে আমরা বর্তমান অধ্যায়েই আলোচনা কোরব। আর সমাজবিদ্যার প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার এবং সমাজবিদ্যার সুসজ্জিত কক্ষ সম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা কোরবো।

(১৩) **সমাজবিদ্যার পত্রিকা**—আমার মতে সমাজবিদ্যার পত্রিকা ঠিক কোন পৃথক প্রকল্প নয়। এটি সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন প্রক্রিয়ায় আপনা থেকেই প্রস্তুত হবে। শিক্ষার্থীরা শ্রেণীকক্ষে, আলোচনা-সভায়, পরিদর্শন-ক্ষেত্রে এবং অন্য নানাপ্রকার যে অভিজ্ঞতাগুলো লাভ কোরবে তাদের মধ্যে যেগুলি উল্লেখযোগ্য তাদের বিবরণ তারা অবশ্যই রাখবে। বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যা-পত্রিকার জন্য এইগুলি তারা নিবন্ধের আকারে রচনা কোরবে এবং সেগুলো থেকে বাছাই কোরে পত্রিকায় ছাপা হবে। তাছাড়া পত্রিকায় থাকবে পরিদর্শনক্ষেত্রে গৃহীত ফটোর প্রতিলিপি, ছাত্রদের স্বহস্তে তৈরী সুন্দর সুন্দর মানচিত্র, অন্য নানা ছবি ও মডেলের প্রতিকৃতি। তাতে থাকবে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিজেদের সমাজজীবন সম্পর্কে নানা তথ্য, সমাজবিদ্যার প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও আলোচনাসমূহ। তাছাড়া এতে নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে শিক্ষকদের আলোচনা থাকবে, স্থানীয় সমাজের নানা কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বক্তব্যও এতে স্থান পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সংক্ষেপে, সমাজবিদ্যার পত্রিকাটি যেন শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের সমাজ ও পরিবেশের একটা সঠিক পরিচয়গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারে। এই পত্রিকার বার্ষিক প্রকাশনই ভালো, কারণ তা না হলে অত্যধিক কাজের চাপ বাড়ে, আর তাতে পত্রিকার গুণের ও আয়তনের হ্রাস ঘটতে পারে। তাছাড়া অত্যধিক ব্যয়ের প্রশ্নও আছে। অনেক বিদ্যালয়ে আবার প্রতি বছর বিদ্যালয়-পত্রিকার একটি বা দুইটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়ে থাকে। সেইজন্যই সমাজবিদ্যার পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে উল্লিখিত প্রকার সংযম থাকা দরকার।

অভিজ্ঞতার বিবরণ

ছবি, ফটো, মানচিত্র

সমাজ ও পরিবেশের সঠিক পরিচয়দান

প্রকাশনা

পত্রিকাটি শিক্ষার্থীদের আগ্রহবর্ধক হবে। শ্রেণীকক্ষে আলোচিত তথ্যগুলো নিবন্ধাকারে সাজাতে গিয়ে শিক্ষার্থী হয়ত অনেক অভাব অনুভব কোরবে। সেই অভাবগুলো পূরণের জন্য সে সাহায্য নেবে গ্রন্থাগারের; স্থানীয় সমাজের থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণের মাধ্যমে অথবা শিক্ষকের কাছ থেকে প্রশ্ন কোরে সে জ্ঞাতব্য বিষয়টি জেনে নেবে। শিক্ষকমহাশয়ের অবশ্য এক্ষেত্রে খুব কম বলাই উচিত। তিনি প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ ও পত্রিকা নির্দেশ কোরবেন এবং স্থানীয় সমাজ থেকে তথ্য আহরণ কোরতে সাহায্য কোরবেন।

শিক্ষার্থীর আগ্রহ-বৃদ্ধি, অভাববোধ ও অভাবপূরণ

স্থানীয় সমাজ সম্পর্কে নানা বিবরণ বার কোরবার কথা আগেই বলেছি। সমাজের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের থেকে দু'চারটে লেখা নেওয়া যেতে পারে। তবে সব থেকে ভালো হয় শিক্ষার্থীরা তাদের মুখ থেকে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য তথ্য জেনে নিয়ে যদি তা পত্রিকায় রিপোর্টের বা নিবন্ধের আকারে প্রকাশ করে। এর দ্বারা সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভ হয় এবং পরোক্ষভাবে সাংবাদিকতা ও গবেষণাবৃত্তি শিক্ষার সূচনা হয়। বিচিত্র পরিচয়ে তার নিজের অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য জন্মায় এবং ব্যক্তিগত সত্তাও সুগঠিত ও সুপরিস্ফুট হয়। পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদাদি অবশ্যই একটা উল্লেখযোগ্য অংশ লাভ কোরবে। আর থাকবে স্থানীয় শিল্প ও কৃষির খবর, হাট-বাজার-গঞ্জের সংবাদ, স্বাস্থ্য-সংবাদ, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, অন্য নানা উৎসব ও অনুষ্ঠানাদির সংবাদ, এই পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এবং নিবন্ধগুলিতে শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা-সম্পর্কে মন্তব্য কোরতে উৎসাহ দান করা হবে। কারণ এর দ্বারা তাদের চিন্তা ও বিচার-শক্তির উন্মেষ ও উৎকর্ষ সাধিত হবে। সমাজে নানা অপপ্রথা আছে, দুর্নীতি আছে, ভিক্ষাবৃত্তি, শ্রমবিমুখতা, উৎকোচগ্রহণ, মদ্যপান অথবা মামলা-মোকদ্দমা এবং নানাপ্রকার স্থানীয় অভাব-অভিযোগ আছে। এসব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের মত তৈরি কোরবে এবং ভবিষ্যতের সুনাগরিক এবং প্রকৃত জনসেবক ও জননায়ক হবার শিক্ষা গ্রহণ কোরবে।

সমাজের কর্মীদের বক্তব্য ও স্থানীয় সংবাদাদি প্রকাশ

পত্রিকার গুণগত ও সৌন্দর্যগত উৎকর্ষ রক্ষার কথা আগেই বলেছি। তবে এই গুণ ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হবে শিক্ষার্থীদের দ্বারা। তাদের দ্বারা যতটা উৎকর্ষ সম্ভব, সেটা লাভ কোরবার জন্যেই প্রয়াসী হতে হবে। যেন-তেন প্রকারেণ একটা পত্রিকা বার করা ভালো নয়, কারণ নিজেদের কাজের মান নিকৃষ্ট এমন ধারণা যদি হয়, তবে শিক্ষার্থীদের মন ও চরিত্রের ওপরে তা বিশেষ দাগ রেখে যায়। আবার ওপর থেকে জোর কোরে চাপিয়ে দেওয়া একটি বিশেষ উৎকর্ষ-সৃষ্টির চেষ্টাও ভালো নয়। তাতে হয়তো দেখা যাবে শিক্ষার্থীদের স্বচেষ্টার বদলে আছে কেবল নকলনবিসির প্রচেষ্টা অথবা শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা অনুল্লেখযোগ্য হয়ে সেখানে শিক্ষক ও অন্যান্যদের রচনার ভাগই প্রধান হয়ে উঠেছে। **বস্তুতঃ পত্রিকাটিতে শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা ও বাস্তব কর্মদক্ষতার সহজ, সরল, স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন অভিব্যক্তি থাকা চাই।**

শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা ও বাস্তব কার্যদক্ষতার অভিব্যক্তিও কাম্য

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা আরও কতকগুলি শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ নিয়ে আলোচনা কোরবো। এগুলি পৃথক আলোচনার বিশেষ উপযোগিতা আছে। আমাদের সজ্জাহীন মুখসর্বস্ব বিদ্যালয়গুলি আমাদের শীর্ণ ব্যক্তিত্বের সূতিকাগার। শুধু তাই নয়, এখানে প্রাণ-প্রাচুর্যের সৃষ্টি অপেক্ষা সংহারই হয়ে থাকে বেশী। রবীন্দ্রনাথের "তোতাকাহিনী" তার বিশেষ পরিচয় তুলে ধরেছে। আমার মতে শিক্ষক ও শিক্ষাগার হবে প্রাণ-প্রাচুর্যের নির্ঝর, গঠনোন্মুখ নবীন প্রাণগুলি এখন থেকে গ্রহণ কোরবে

স্বচ্ছ সুনির্মল বারিধারা—বর্ষার নববারিস্পর্শে গাছগুলো যেমন সতেজ ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তেমনি শিক্ষার্থীও হয়ে উঠবে তেজোময় ও প্রাণবান, তাদের ব্যক্তিত্ব হবে সুগঠিত ও বৈচিত্র্যসমৃদ্ধ। **সমাজবিদ্যার প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার এবং সমাজবিদ্যার সুসজ্জিত কক্ষ শিক্ষার্থীর মনকে সযত্নে মেলে ধরে।** তাকে জ্ঞান, শক্তি ও বৈচিত্র্যসংগ্রহে প্রেরণা দেয়। শিক্ষকও সেখানে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় নিজেদের পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করার সুযোগ পান। এগুলি যেন সমাজবিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োগশালা (Laboratory)। এখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কত সুযোগ। ব্যক্তিত্বের মূলে জলসিঞ্চনের এখানে পাওয়া যায় নানা মূল্যবান সুযোগ। মুখসর্বস্ব বিদ্যালয়গুলি এইসব উপকরণসজ্জিত কক্ষে কর্মব্যস্ত কর্মশালায় পরিণত হয়। এদের এই বিশেষ ভূমিকা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

Questions

1. Mention the different kinds of teaching aids and their respective utilities.

2. Describe the rule of the teaching aids in the art of teaching.

3. What are the psychological grounds for the use of audio-visual aids in our schools ? What is their role in the teaching of Social Studies ?

4. Mention some of the important audio-visual aids and say how they help in teaching Social Studies ?

5. History is the description of life in the past. How can we invoke that past before the eyes of the students ? What are the special teaching aids to acquaint the pupils with the past ?

6. What are the important teaching aids with the help of which we can bring the pupils face to face with the problems of modern life ?

7. What are the special teaching aids which help to make students conscious of their own environment in the locality ? Describe the importance of local fairs, festivals and social studies magazine of your school in this respect.

8. What are the different kinds of training you can impart to your pupils with the help of teaching aids in Social Studies ? Describe the importance of radio, educational excursions and field trips, study of current events, influence of resourceful visitors and Social Studies magazine in this respect.

অষ্টম অধ্যায়

শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ (২)

তত্ত্ব ও সূত্রাবলম্বী শিক্ষার পরিণতি

আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে আমি পূর্ব-অধ্যায়ে শীর্ণ ব্যক্তিত্বের স্মৃতিকাগার বলেছি। কারণ এখানে প্রকৃত বস্তু ও হাতের কাজের (শিক্ষার্থীদের নিজেদের হাতে তৈরি-করা কোন বস্তু প্রভৃতির) সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় অতি অল্প। আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে বস্তু ও কাজের পরিবর্তে তত্ত্ব ও স্থত্রেরই অপ্রতিহত প্রভুত্ব। সেখানে আজও চলেছে শ্রুতি, স্মৃতি ও অনুশাসনের যুগ। ফলটাও একদেশনির্ভর হতে বাধ্য। আমরাও তাই কতকগুলি প্রত্যুৎপন্নমতিত্বশূন্য, বিচারবুদ্ধিহীন কর্মশক্তিহীন, নির্জীব "মুখস্থবিদ্যার খনি" স্থষ্টি কোরে থাকি। আর তাতেও খাদ থাকে প্রচুর। আর খাদের পরিমাণ বর্তমানে এত বেশী যে বাজারে চলেছে অসংখ্য গুরুগিরির বিপণি, নোটবইয়ের ও Last Minute Preparation-এর ছড়াছড়ি—তারও ওপরে পরীক্ষার হলে প্রচুর অসদুপায় গ্রহণ। তাতেও শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত পর্ষদ্ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আছে "গ্রেসমার্ক" রূপী "ডিসগ্রেসের" কলঙ্ক-তিলক। অর্থাৎ তত্ত্ব ও স্থত্রাবলম্বী শিক্ষা তার সংকীর্ণ উদ্দেশ্যকেও পরাভূত কোরেছে।

বর্তমান শিক্ষার কুফল—অসৎ ব্যক্তিত্বের স্থষ্টি

আজ যদি প্রশ্ন করা যায় বর্তমান শিক্ষার বড় কুফল কি—আমার মনে হয় নির্দ্বিধায় উত্তর দেওয়া যায়, "অসৎ ব্যক্তিত্বের স্থষ্টি"। বাল্যকালে সে দেখে অসাধুতা অবলম্বনের দৃষ্টান্ত, কৈশোরের কাঁচা হাতে অসাধুতা অবলম্বনের চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত একটা পাকা অসাধু ডিগ্রিধারীতে পরিণত হয়। তার ওপরে আবার আছে ভেজাল ডিগ্রির সমস্যা। দেশে ভেজাল ডিগ্রিধারীদের সংখ্যাও নাকি নেহাত অল্প নয়। আর গুরুগিরির বিপণিগুলিও নাকি শুধু এসবের সহায়তা করে তাই নয়, অনেকগুলি তো ভেজাল মাল তৈরির আড়ত বিশেষ। অবস্থা দেখে মনে হয় পুরাতন মুখস্থবিদ্যা-প্রক্রিয়ার অনেকদিন আগে অপঘাতমৃত্যু হয়েছে—এখন তার শবদেহটা প্রোথিত করাই বাকী। অনেকদিন ধরে এই শবদেহটা পড়ে আছে বলে সে এখন পচে গলে পুতিগন্ধ ছড়াচ্ছে। আর দেরী নয়। ওকে এখন বিসর্জন দিয়ে শিক্ষা-জগতে এখন দিকবদল করাই শ্রেয়। বস্তুতঃ বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনায় গান্ধীজ সেই ডাকই দিয়েছিলেন। ডঃ মুদালিয়রের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে এই দিক্‌বদলের নির্দেশই দেওয়া হয়েছে এবং সে সংক্রান্ত বহু সমস্যার আলোচনা করা হয়েছে। ডঃ রাধাকৃষ্ণণের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকমিশনও সেই নতুন দিগন্ত উন্মোচনের নির্দেশ দিয়েছেন।

আমার মনে হয় আমাদের সাহসের বড় অভাব। ইংরেজ জাতটা সংরক্ষণশীল, কিন্তু সাহসী। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করার সাহস তাদের আছে। আমরা তাদের চেয়েও সংরক্ষণশীল এবং সাহসশূন্য—উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত কাজ করার পরিবর্তে কাজ করার কথাটা মন্ত্রের মত হাজারবার আওড়াতে বসি। লক্ষবার রামনাম জপ করা আমাদের অনেকের অভ্যাস, কিন্তু একবারের জন্যও একটা ছোট সৎকাজ কোরতে আমরা বহুবার পিছিয়ে আসি। অর্থাৎ কাজের চেয়ে কাজের মন্ত্রটাই আমাদের বেশী মনঃপূত। হয়ত ভবিষ্যতে আমার ক্ষেত্রেই একথাটা প্রযোজ্য হবে—"মশাই আপনিও তো কাজের মন্ত্রগুলোই মুখে না বলে আপনার পুঁথিতে আউড়ে গেলেন। আপনি নিজে কি কোরলেন?" এই অপবাদটা এড়াবার জন্যেই আমি ছোটো ছোটো কাজ কোরতেও প্রয়াসী। আসুন, আমরা সবাই নিজের নিজের বিদ্যালয়ে সাধ্যানুসারে ছোট ছোট কাজ কোরে শিক্ষাক্ষেত্রে দিক্‌বদলের প্রয়াসটাকে সম্পূর্ণ করি।

আমাদের অভাব সাহসের

পর্ষদ্‌, বিশ্ববিদ্যালয়, নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী, বহিঃপরীক্ষা ও শিক্ষক

কিন্তু ওপর থেকেও কিছু করার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কারের। পর্ষদ্‌ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষার মূল্যায়নের ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা দিতে হবে। **প্রত্যক্ষভাবে যিনি গুরু, শিক্ষার্থীর শিক্ষা-যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তাঁরই সর্বাগ্রে এবং সর্বাপেক্ষা অধিকার বেশী**; যিনি প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার্থীর কাজ দেখছেন, পড়াশুনার অগ্রগতি এবং আচরণের বিকাশ লক্ষ্য কোরছেন, একমাত্র তিনি ছাড়া সেই শিক্ষার্থীর লব্ধ শিক্ষার যথার্থ মূল্যায়ন কোরতে পারেন? বর্তমানে বহিঃস্থ পরীক্ষার (External Examination) ওপরেই জোর দেওয়া হয় বেশী। এর মধ্যে একটা গুরুতর ত্রুটি এবং অবিশ্বাস নিহিত রয়েছে। সে অবিশ্বাস হচ্ছে প্রতিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককুলের প্রতি অবিশ্বাস। আর সেইটাই হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা-প্রক্রিয়ার সব থেকে বড় ত্রুটি। যাকে আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করতে পারি না, তার হাতে শিক্ষা কোনদিন প্রকৃত ফলদর্শী ও তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে না। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাও তা হতে পারেনি। আর তারই অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে শিক্ষার গলিত মৃতদেহটা কেবলই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একটা অস্বাস্থ্যকর অশুচি পরিমণ্ডলের সৃষ্টি কোরেছে। মুদালিয়র কমিশনও শিক্ষকদের ওপর বেশী পরিমাণে নির্ভর করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন, "In his sense of responsibility the average Indian teacher does not yield to any teacher in any other country. What he needs is clear direction, eucouragement and sympathy."

শিক্ষা-যাচাইয়ে প্রত্যক্ষ গুরুর অধিকার

সব থেকে বড় ত্রুটি—শিক্ষকদের প্রতি অবিশ্বাস

পরীক্ষাসংক্রান্ত আলোচনা শিক্ষার্থীদের কার্যের মূল্যায়ন শীর্ষক অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে করা হবে। এখন কয়েকটি কথা বলে নেবার দরকার হোলো এই কারণে যে, বর্তমানে শিক্ষকদের স্বাধীন প্রচেষ্টার অন্তরায় আসলে কোথায়—শিক্ষার্থীদের প্রীতি কেন শিক্ষক, গ্রন্থাদি এবং কাজের ওপর বর্ধিত না হয়ে মাত্র পাসের নম্বরের ওপর তাদের লোভ জন্মায় এবং তাদের শিক্ষার জগৎ থেকে সকল শুভ প্রচেষ্টা কেন উবে যায় আর নানা প্রকার অস্বস্তিকর অবস্থার উদ্ভব হয়, তা বুঝে দেখা দরকার। শিক্ষাজগতের এই অস্বাস্থ্যকর মানসিকতা সকল শুভ উদ্যোগকেই গিলে খায় এবং সকল প্রকার মূল্যবান কথা, কাজ এবং উপকরণকেই নস্যাৎ কোরে দেয় ও তাদের ভূমিকাচ্যুত করে। সেখানে শুধু পরীক্ষাপাসই একমাত্র কাম্য, ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। **কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্ববিকাশই মুখ্যকথা—তার মধ্যে অবশ্য জ্ঞানেরও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আছে—সেখানে শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ-যোগ্যতা বিচার হবে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের, তার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার উপযুক্ত বাস্তব রূপায়ণের মাপকাঠিতে।** এই মাপকাঠি সার্থকভাবে প্রয়োগ কোরতে পারেন—যাঁরা শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ গুরু—একমাত্র তাঁরাই। প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আমরা অনেক সাধুবাদ শুনে থাকি। কিন্তু তার মূলে আছে একটা নির্দয় সত্য—**গুরু-শিষ্যর প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্যে সেখানে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদ্ হস্তক্ষেপ করেনি।** কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদের পূর্ণ দৈর্ঘ্য সিলেবাস যদি পড়াতে হোতো এবং নিজের বিচারবুদ্ধির ওপর নির্ভর না কোরে বাইরের কোন সংস্থার ওপরে যদি তার শিষ্যের যোগ্যতা বিচারের ভার ছেড়ে দিতে হোতো, তবে কোনো প্রাচীন গুরু আরুণির মত তার শিষ্যকে বর্ষার দিনে জমির জল আটকাতে বা উপমন্যুর মত তাকে গরু চরাতে পাঠাতে পারতেন না, আর শিষ্যও এইসব কর্তব্য কোরতে রাজী হোতো না, প্রাচীন ভারতের বহুকথিত গুরুভক্তিতে নিশ্চয়ই ভাঁটা পড়ে যেত। আজিও তো তাই হয়েছে। আজকাল তো শিষ্যদের মনোভাব, "পরীক্ষা পাসের জন্য এসেছি, তার জন্যে যা কোরতে হয় বলুন, কোরছি। (এমন কি আপনি যেটা বলবেন না সেটাও আমি কোরবো অর্থাৎ পরীক্ষার সুযোগ পেলে ও দরকার বুঝলে অসদুপায় অবলম্বন কোরবো)। অন্য কোন মূল্যবান উপদেশ শুনতে আসিনি, শুনবোও না।" পর্ষদ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পরবর্তীকালের সৃষ্টি। কালের অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন হয়েছে, তাদের নিজস্ব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও রয়েছে। কিন্তু তাই বলে প্রথম আমরা যে সত্যটি শিখেছি অপরের হস্তক্ষেপে গুরু-শিষ্যের সাক্ষাৎ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া, তাকে আমরা কেন বিসর্জন দেব? গুরুকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা কোরতে কেন আমরা ভুলবো? শিষ্যকে কেন তার পর

শিক্ষাক্ষেত্রে সকল শুভ প্রচেষ্টা কেন উবে যায়

শিক্ষার্থীর উত্তীর্ণ-যোগ্যতা বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার একটি নির্দয় সত্য

কোরে তুলবো এবং অন্যদের অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার বিষ মিশিয়ে কেন গুরুর প্রতি তাদের শ্রদ্ধাহীন ও বিশ্বাসহীন কোরে তুলবো? **শিক্ষার্থীদের ওপরে অধিকার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও পর্ষদ্ কর্তৃপক্ষগুলি নিজেদেরকে যেন শিক্ষকের প্রতিদ্বন্দ্বী কোরে তুলেছেন, এবং নিজেদের উন্নততর ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষকদের অসহায় পুতুল, চাকরির কলের অংশমাত্র কোরে তুলেছেন। কিন্তু এতে কার কি কল্যাণ হয়েছে? আর শিক্ষারই বা কতটুকু শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে? আরুণি ও উপমন্যু হয়ত দুপাতা সংস্কৃত শ্লোক কম পড়েছিল, কিন্তু নিজেদের আচরণ দিয়ে গুরুকে তুষ্ট কোরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গিয়েছিল। আর তারা যে সমাজের উপযুক্ত নাগরিক হয়েছিল সে কথায় অবিশ্বাস করি না।**

প্রত্যক্ষ গুরুর ভূমিকা খর্ব করার কুফল

গুরু যদি হন শিক্ষার্থীর দৃষ্টিদাতা ও পরিচালক (philosopher and guide), তবে তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন কোরে তোলার দায়িত্বও শিক্ষকের, তার মনোরাজ্যকে উদ্ভাসিত কোরে তোলার দায়িত্বও শিক্ষকের, তার মনের মধ্যে শক্তি, বৃত্তি ও প্রবণতাগুলিকে ঠিকমত জাগিয়ে তুলে সেগুলি সুপরিচালিত করার দায়িত্বও শিক্ষকের, তাকে সমাজের সজাগ, সতর্ক ও বুদ্ধিমান নাগরিক কোরে গড়ে তোলার দায়িত্ব শিক্ষকের। **বস্তুতঃ এতখানি দায়িত্ব প্রতিপালন আমরা যার কাছ থেকে আশা করি, সেই শিক্ষককে আমরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করি কম—একথা আমাদের বর্তমান শিক্ষারাজ্যের নগ্ন সত্য।**

প্রত্যক্ষ গুরুর দায়িত্ব

অথচ গুরুর প্রতি আমাদের বিশ্বাস কম

শ্রবণ-বীক্ষণ-উপকরণগুলির সংগঠিত রূপ

(ক) প্রদর্শনী, (খ) সংগ্রহশালা, (গ) গ্রন্থাগার, (ঘ) সমাজবিদ্যার কক্ষ।

সে যাই হোক, শিক্ষক চোখ-কান খুলে দেবেন শিক্ষার্থীর, এই জগৎ দেখে শুনে বুঝে চলতে পারে এবং নিজেকে এ জগতের উপযুক্ত কোরে নিতে পারে শিক্ষার্থী—শিক্ষক তাকে সেভাবেই শিক্ষা দেবেন। তাই শিক্ষার্থীর পঞ্চেন্দ্রিয়কে সজাগ কোরে দেবেন এবং সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়ে নেবেন শিক্ষক। কিভাবে তা সম্ভব আমরা এতাবৎ নানা ক্ষেত্রে তা আলোচনা কোরে এসেছি, বিশেষ কোরে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে তা বিশেষভাবে উপস্থিত করা হোয়েছে। তবে **এইসবের একটা সাংগঠনিক, সামগ্রিক রূপ শিক্ষার্থীর কাছে পরিস্ফুট হোয়ে ওঠা বাঞ্ছনীয়। প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার, সমাজবিদ্যার কক্ষ ইত্যাদির মধ্য দিয়েই এই সংগঠন-রূপটা ফুটিয়ে তোলা যায়।** এই চারিটি মিলে কিন্তু আসলে একটি সংগঠন এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা যেসব শ্রবণ ও বীক্ষণ সহায়ক উপকরণের আলোচনা কোরেছি তারাও এর অঙ্গস্বরূপ।

সাংগঠনিক সামগ্রিক রূপ

(ক) **প্রদর্শনী** : সারা বছর শিক্ষার্থীরা যেসব প্রকল্প নিয়ে কাজ কোরলো এবং তার ফলে নিজেদের হাতে যা গড়লো, যা আঁকলো এবং যা লিখলো—অন্ততঃ তার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলোকে বিদ্যালয়ের একটা বার্ষিক প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা যেতে পারে। শিক্ষকমহাশয়ও যেসব আকর্ষণীয় উপকরণ নিজহাতে তৈরি কোরেছেন বা অন্যত্র থেকে সংগ্রহ কোরেছেন, তা এই প্রদর্শনীতে স্থান পেতে পারে। শিক্ষার্থীদের হাতের কাজ প্রদর্শনীতে সর্বাগ্রে অধিকার পাবে, তারপর শিক্ষকমহাশয় অন্য উপকরণ সরবরাহ কোরবেন। কিন্তু এছাড়াও বাইরের অনেক কর্মীর তৈরি-করা অনেক দ্রব্যও এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা দরকার হবে, বস্তুতঃ বিদ্যালয়ের সংগঠিত বার্ষিক প্রদর্শনীটি হবে বিদ্যালয়-সমাজের ও বাইরের সমাজের কাজ ও গতিধারার নির্দেশক ও মিলনক্ষেত্র। প্রদর্শনীটি কিন্তু অগোছালো কতকগুলো দ্রব্যের সমষ্টি হলে চলবে না, তা বিভিন্ন বিভাগে সংগঠিত হতে হবে। বিদ্যালয়-সমাজের নিজস্ব পরিচয় তাতে যেমন সুবিন্যস্তভাবে প্রদর্শিত হবে, তেমনি বাইরের সমাজের কর্মধারা ও জীবনযাত্রার পরিচয় তাতে ফুটে উঠবে। আর এই দুইয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র নির্দেশ কোরতে পারলে প্রদর্শনীটি সত্যই সার্থক ও শিক্ষাপ্রদ হোয়ে উঠবে। বিদ্যালয়ের এই প্রদর্শনীটি হোলো শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও সংগঠনী-শক্তির পরিচায়ক। দুর্বলতম শিশুটিরও এখানকার কাজে কিছু-না-কিছু অংশ আছে। আর এর প্রতিটি স্তরকে নিজের চোখের সামনে সকলের চেষ্টায় ও সহযোগিতায় মূর্ত হোয়ে তাতে দেখে সে যে অভিজ্ঞতা লাভ করে, এবং তা তার আচরণ ও জীবনধারাকে যেভাবে প্রভাবান্বিত করে, তা তাদের সহকর্মী শিক্ষকই একমাত্র উপলব্ধি কোরতে পারেন। প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ববিকাশের সূত্র ও পর্যায়টি তিনিই মোটামুটি সঠিকভাবে নির্দেশিত কোরতে পারেন এবং কোন বহিঃস্থ পরীক্ষা-সংস্থার দ্বারা একাজ মোটেই সম্ভব নয়।

বিদ্যালয়-সমাজ ও বাইরের সমাজের কাজের পরিচয়লাভ

শিক্ষার্থীদের নিজস্ব প্রতিভা, কর্মক্ষমতা ও সংগঠনী-শক্তির বিকাশ

বিদ্যালয়ে একটা প্রদর্শনী সংগঠন কোরে কি লাভ হয় আমরা আলোচনা কোরলাম, কিন্তু সেই প্রদর্শনী হচ্ছে একটা কর্মধারা বা জীবনধারার কোন একটি বা একাধিক পর্যায়ের অবস্থার সংগঠিত রূপ। একটা সুসংগঠিত প্রদর্শনী দেখলে শিক্ষার্থীদের মনে তাই সব প্রথমেই একটা সামগ্রিকতা ও সংগঠনী-বোধ জন্মে। জীবনটা যে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন নয়—তার যে একটা সামগ্রিক সাংগঠনিক রূপ আছে,—এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক বোধটি জন্মে। এদিক থেকে অন্য যে কোন শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের থেকে প্রদর্শনীর একটা বিশেষ মূল্য আছে। তাছাড়া আমরা প্রদর্শনী করি আমাদের উৎকৃষ্ট কাজগুলির। ধৈর্য, সংযম এবং নিষ্ঠা সহকারে এই কাজগুলো

জীবনের সামগ্রিক সংগঠনী-রূপের উপলব্ধি

কোরতে হয়। এই কাজগুলোর মধ্যে একটা শিল্প-চেতনা যাতে থাকে তাও দেখতে হয়। এই সুশ্রী ও উৎকৃষ্ট কাজগুলোর নিদর্শন দেখে শিক্ষার্থীরা নিজেদের হাতে উৎকৃষ্ট কাজ করার প্রেরণা পায়। তাছাড়া জীবনটা যে মাত্র কথার সমষ্টি নয়, তবে মূলে আছে প্রচণ্ড কর্মস্রোত,—তাও এই প্রদর্শনী দেখে শিক্ষার্থীরা স্বতঃই উপলব্ধি কোরতে পারে। পুরনো ধরনের কৃষিকর্ম আমাদের বর্তমান সমাজের পক্ষে খুবই অনুপযোগী হোয়ে পড়েছে। আধুনিক কৃষিব্যবস্থা আমরা কি কোরে প্রবর্তন কোরতে চাই তারই একটা প্রদর্শনীর কথা ধরা যাক। প্রদর্শনীটির নামকরণ যদি হয় "**চিত্রে কৃষি-প্রগতি**", তবে তার পরিকল্পনাটা হবে নিম্নরূপ :—

শিল্প-চেতনা ও কর্মপ্রীতির বিকাশ

একটি প্রদর্শনীর পরিকল্পনা

(১) ছোট ছোট টুকরো করা আইল-বাঁধা জমির দৃশ্য। তারই একপাশে মোট জমির বিবরণ ও আইলের জন্য নষ্ট জমির বিবরণ। সেই সাথে রেখাচিত্রের সাহায্যে এই অপচয়ের তুলনা কোরে দেখানো যেতে পারে।

(২) পরবর্তী চিত্রে জনৈক কৃষক, দুটি স্বাস্থ্যহীন বলদ, পুরনো লাঙ্গল ও অন্যান্য পুরনো কৃষি-যন্ত্রপাতির ছবি থাকবে। এই সাথে কতকগুলো বিবরণ লিখে দেওয়া ও রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রদর্শন করা হবে। যথা—(ক) কৃষক বৎসরে কতদিন কাজ করে, (খ) জমি কতটা গভীরভাবে চাষ করা হয়, (গ) এক একর জমিতে পুরনো সেচ-ডিঙির সাহায্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জলসেচন কোরতে কতটা সময় ও কয়জনের পরিশ্রম লাগে এবং (ঘ) অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে কতটা কাজ কত সময়ে কত জনের দ্বারা করা হয়—যেমন পুরনো নিড়নির দ্বারা এক একর জমি নিড়িয়ে দিতে কত সময় ও পরিশ্রম ব্যয় হয়।

(৩) তারপরের চিত্রে থাকবে পুরনো সেচ-ব্যবস্থা ও পতিত জমির দৃশ্য। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির এলাকায় কতটা জলসরবরাহের ব্যবস্থা আছে তার লিখিত পরিমাণ ও রেখাচিত্রের বিবরণের সাথে পতিত জমি, একফসলী, দোফসলী ও তিনফসলী (যদি থাকে) জমির লিখিত ও চিত্র-বিবরণ থাকবে।

(৪) এটি হবে কৃষিকার্যের পরিবহন-মানচিত্র। সরু সরু রাস্তা, আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাস্তার অভাব এবং একটা গরুর গাড়ী ও দুটো শীর্ণ বলদ দিয়ে এই চিত্রটি অঙ্কিত হবে। উপযুক্ত লিখিত ও চিত্রবিবরণও সম্ভব হলে এখানে দিতে হবে। বিল অঞ্চলে ডিঙ্গি-নৌকার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তাও দেখানো যেতে পারে।

(৫) এবার দেখতে হবে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ। প্রতি-একরে উৎপাদন-হিসাবের তুলনা থাকবে অন্যান্য দেশের অনুরূপ উৎপাদনের সাথে। লিখিত ও চিত্রবিবরণ দুই-ই থাকবে।

(৬) এর পরে থাকবে আমাদের জনসংখ্যার চিত্র। বৎসরে আমাদের কৃষি-পণ্যের কতটা প্রয়োজন তাও চিত্রের সাহায্যে দেখানো হবে। চা ও পাটের মত

রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সাহায্যে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা-অর্জনের দৃশ্য। পুরনো উৎপাদন-ব্যবস্থায় আমাদের কৃষি-পণ্যের অপ্রতুলতা, বিদেশ থেকে খাদ্য-আমদানি প্রভৃতি চিত্রের সাহায্যে ও লিখিত বিবরণের সাহায্যে উপস্থিত করা হবে।

মোটামুটি এই ধরনের চিত্র-প্রদর্শনী দ্বারা আমাদের দেশে প্রচলিত আবহমান-কালের কৃষি-ব্যবস্থার অনুপযোগিতা সম্যক্ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব। প্রদর্শনীর পরবর্তী অংশে থাকবে আমাদের পরিবর্তন-প্রচেষ্টা। তাতে থাকবে—

(১) একটি সমবায় কৃষি-খামারের দৃশ্য। ধরা যাক, ২০ জন কৃষক ও তাদের ১০০ একর জমি একত্রিত হয়েছে—চিত্রে প্রথমে মানুষ ও জমির এই মিলন-চিত্রটি দেখানো হবে। এই সাথে এই ১০০ একর জমিকে একটানা পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দেওয়ার দৃশ্যটাও উপস্থিত করা হবে। তার উদ্দেশ্যটাও লেখা থাকবে—"বাহিরের উপদ্রব হইতে শস্যরক্ষা"।

(২) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই ১০০ একর জমিতে গৃহীত ব্যবস্থা :—

(ক) বড় রাস্তার ধারে মূল ফটকের পাশে নির্মিত গোলাবাড়ী, এখানে মাড়াই, বাছাই ও জমা হয়। শস্য-সংরক্ষণাগারটিতে থাকবে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা অথবা এখান থেকে স্থানীয় বৃহৎ সংরক্ষণাগারে তা প্রেরণ করা হবে। তবে ছোটখাট একটি শস্য-সংরক্ষণাগার সমবায় কৃষি-খামারটিতে থাকবে।

(খ) একটি গভীর নলকূপ অথবা বৃহৎ সেচখাল থেকে কৃষিক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশে জলসেচের ব্যবস্থা দেখানো হবে।

(৩) আধুনিক যন্ত্রপাতির চিত্রাবলী এবং সংক্ষেপে তাদের ব্যবহারের বিবরণ।

(৪) বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন সার ব্যবহারের দৃশ্যাবলী। বিভিন্ন প্রকার সারের বিবরণ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত কয়েকটি সার-কারখানার চিত্র।

(৫) কৃষকদিগের শ্রমবিভাগ ও কাজ বণ্টনের চিত্র।

(৬) আধুনিক কৃষি-পরিবহণের চিত্র।

(৭) কৃষি উৎপাদনের পরিমাণের চিত্র। পুরাতন উৎপাদনের সাথে তুলনামূলক চিত্র ও বিবরণ। অন্য দু'চারটি দেশের সাথে উৎপাদনের তুলনামূলক চিত্র-বিবরণ।

(৮) কৃষকদের স্বাস্থ্য ও জীবনের নিরাপত্তাবিধানের আধুনিক ব্যবস্থাদির চিত্র-সমূহ। এই প্রসঙ্গে সমবায় খামারগুলির উদ্যোগ ও ভূমিকা চিত্রে দেখানো হইবে।

(৯) সরকারী কৃষি-পরিকল্পনার চিত্রাবলী।

বস্তুতঃ শিক্ষকমহাশয়েরা স্থানীয় খণ্ড উন্নয়ন অফিসের কর্মিবৃন্দ ও স্থানীয় কৃষক-গণের সহায়তায় একটি উপযুক্ত "চিত্রে কৃষি-প্রগতি" প্রদর্শনী সংগঠন কোরতে পারেন।

স্থানীয় সমাজের সহযোগিতা

বাস্তব কৃষি-উপকরণের প্রদর্শনী সংগঠন কোরতে পারলে আরও ভালো হয়। সমাজজীবনের অন্যান্য কর্মধারা —যথা "শিল্প-প্রগতি" "শিক্ষা-প্রগতি" প্রভৃতি বিষয়েও প্রদর্শনী সংগঠন করা যেতে

পারে। **এতে হাতেকলমে এবং দেখে-শুনে শিক্ষাটা বেশ ভালভাবেই হয়। সমাজবোধ-চিন্তার বিস্তার এবং ব্যক্তিত্ব-স্ফুরণের প্রেরণা শিক্ষার্থীরা এখান থেকে বেশ ভালভাবেই লাভ কোরতে পারে।**

(খ) সংগ্রহশালা—

সংগ্রহশালাও বস্তুতঃ একটি প্রদর্শনী বিশেষ। তবে এর মূল লক্ষ্য হচ্ছে এর স্থায়িত্ব। সংগ্রহশালাকে বলা যায় "প্রয়োজনীয় নিদর্শনসমূহের একটি স্থায়ী প্রদর্শনী। সারা বছর বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা যে সকল কাজ করে, তার উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি এই সংগ্রহশালায় স্থান পেতে পারে। বিদ্যালয়ে বা অন্যত্র যে সকল প্রদর্শনী হয় তা থেকে উৎকৃষ্ট এবং প্রয়োজনীয় নিদর্শন-সমূহ সংগ্রহ কোরে সংগ্রহশালায় রাখা দরকার। সমাজবিদ্যার সংগ্রহশালায় ঐতিহাসিক উপাদান থেকে আরম্ভ কোরে আধুনিক অর্থনৈতিক ও সমাজ-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের নিদর্শনসমূহ স্থান পেতে পারে। এইসব নিদর্শন সরকারী ও বেসরকারী নানা মহল থেকে সংগ্রহ করা যায়। কোথাও কোন স্থান পরিদর্শন কোরতে গিয়ে, মেলা বা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে অনেক প্রয়োজনীয় নিদর্শন সংগ্রহ করা যায়। শিক্ষার্থীদের সংগ্রহ-প্রবৃত্তি বড় প্রবল। এই সংগ্রহ-প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত কোরে সংগ্রহশালার জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে হবে। আর শুধু সংগ্রহ কোরে এনে যেন-তেন-প্রকারেণ কক্ষে ফেলে রাখলে চলবে না। সেগুলো শিক্ষার্থীদের সহযোগিতাতেই উপযুক্তভাবে লেবেল এঁটে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে হবে। সাজানো-গোছানোটা সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। বস্তুতঃ সংগ্রহশালাটা একটা স্থায়ী প্রদর্শনী ; প্রদর্শনী সংগঠনের নিয়মকানুনগুলো এখানেও প্রযোজ্য। কোলকাতার জাদুঘর প্রায় সকল শিক্ষকমহাশয়ই দেখেছেন। সেখানকার বিভিন্ন বিভাগের বিন্যাস-কৌশল একটু অনুধাবন কোরে থাকলে শিক্ষকমহাশয় ও শিক্ষার্থীরা নিজেদের ছোট্ট সংগ্রহশালাটিকেও সেইভাবে সুবিন্যস্ত কোরতে পারবেন। প্রদর্শনীর ন্যায় সংগ্রহ-শালাকেও আমরা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও শক্তির স্ফুরণের সহায়ক ক্ষেত্র হিসেবে দেখতে চাই। বিদ্যালয়ে বছরের পর বছর নতুন নতুন শিক্ষার্থীর দল আসে। নানা প্রকল্প এবং অন্য নানা কাজ তারা নিজেদের হাতে কোরতে পারে এবং কোরে থাকে। সেইসব কাজ থেকে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রহ কোরে গেলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পায়। অন্যদিকে বিদ্যালয়ের নিজস্ব একটি কর্ম-ইতিহাসও গড়ে ওঠে—যা বিদ্যালয়ের ট্রাডিশনের একটা মূল্যবান অঙ্গ হয়ে ওঠে। **একটু ধৈর্য ও পরিকল্পনা সহকারে চলতে পারলে বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালাটি শুধু সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিদর্শন-কেন্দ্র হয়ে উঠবে তাই নয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মূর্ত করে তুলবে।**

সংজ্ঞা ও সংগঠন

বিদ্যালয়ের নিজস্ব ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারকক্ষেত্র

তাদের নিজেদের হাতে-তৈরী নানা মডেল, ম্যাপ, চার্ট ও অন্য বহুবিধ চিত্র ও সংগৃহীত উপকরণে তাদের সংগ্রহশালাটি তাদের ধ্যানধারণাকে বাস্তবের গণ্ডীতে টেনে আনবে। কল্পনা যেন বাস্তব রূপ নেবে। কথার শিক্ষা কাজ ও বস্তুকে আশ্রয় কোরবে—কায়াহীন কথামালা কর্মাশ্রয়ী শিক্ষামালায় পরিণত হবে।

কায়াহীন কথামালার কর্মাশ্রয়ী শিক্ষামালায় রূপান্তর

(গ) *গ্রন্থাগার—*

সংগ্রহশালার আর একটি মূল্যবান অংশ হচ্ছে গ্রন্থাগার। এ যেন একটি "স্তব্ধ-বাণী সমুদ্র"—মানুষের বহুবিধ অভিজ্ঞতার লিখিত বিবরণ-সংগ্রহ। শিক্ষার্থীরা জ্ঞান ও কর্মরাজ্যের পথিক—সেই পথে যেসব পূর্বসূরীরা ভ্রমণ কোরেছেন, তাদের অভিজ্ঞতাগুলো জানবার ও তা থেকে পাথেয় সংগ্রহ কোরবার প্রধান উপায় হচ্ছে তাদের লিখিত বিবরণগুলো পাঠ করা। এই লিখিত বিবরণগুলোকে আমরা নানা শ্রেণীতে ভাগ কোরেছি :—সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, ভূগোল, দর্শন, ধর্মগ্রন্থ, ভ্রমণ ও আবিষ্কার কাহিনী, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক গ্রন্থাদি, চিকিৎসা ও শরীরতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থাদি এবং অন্য নানা বিবরণসমৃদ্ধ গ্রন্থাদি। সমাজবিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে থাকবে সমাজবিদ্যার বিভিন্ন বই (বিভিন্ন গ্রন্থকার দ্বারা লিখিত ও বিভিন্ন শ্রেণীর উপযুক্ত), অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল, রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিষয়ের উচ্চতর গ্রন্থাদি যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা রেফারেন্স-বই হিসাবে ব্যবহার কোরবেন, ভ্রমণ ও আবিষ্কার বিষয়ক নানা কাহিনী, ঐতিহাসিক আলোচনাদি—যা সমাজবিদ্যা আলোচনার মৌলিক উপকরণ বা মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা চলে, সমাজবিদ্যা সংক্রান্ত নানা সাময়িক পত্রাদি ও সংবাদপত্রাদি। আমাদের দেশের বর্তমান উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডসংক্রান্ত আলোচনা, পরিকল্পনা ও সে সম্পর্কে সচিত্র গ্রন্থাদিও সমাজবিদ্যার গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। সমাজে শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনামূলক গ্রন্থাদি সেখানে থাকবে। এককথায়, সেখানে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের সহায়ক গ্রন্থাদি ও পত্র-পত্রিকাদি রাখা হবে, তবে তা উপযুক্তভাবে বাছাই কোরে রাখতে হবে। কারণ বইয়ের সংখ্যাটাই বড় কথা নয়, তাদের অন্তর্নিহিত গুণের দিকেও নজর দিয়ে বই বাছাই করা দরকার। তাছাড়া ছাত্রদের সর্বক্ষণ ব্যবহারের উপযোগী বইগুলি উপযুক্ত চিত্রসহকারে মুদ্রিত হওয়া চাই। **সমাজবিদ্যার বই অবশ্যই সচিত্র হওয়া প্রয়োজন। সচিত্র বইগুলোর একটা মনস্তাত্ত্বিক ও পৃথক শিক্ষাগত মূল্য আছে।** মানুষ ছবি ভালবাসে আর ছবি তার চিন্তা ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে। তাছাড়া, লেখা ও বলা কথার চেয়ে ছবির স্মৃতি হয় দীর্ঘস্থায়ী। পড়া ও শোনা কথা আমরা অনেক

সমাজবিদ্যার গ্রন্থাগারে কি থাকবে

সচিত্র গ্রন্থের মনস্তাত্ত্বিক মূল্য

পরিমাণে এবং হয়ত তাড়াতাড়ি ভুলে যাই, কিন্তু ছবিকে অত তাড়াতাড়ি ভুলি না। তাছাড়া বলার মধ্যে যা পরিস্ফুট হয় না, অনেক সময় ছবির সাহায্যে তা সহজে ব্যক্ত করা যায়। তাছাড়া, **একখানা সচিত্র বই একখানা সার্থক audio-visual aid এর কাজ করে।** সচিত্র বই সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখতে হোলো, তার কারণ আমাদের শিশুপাঠ্য ও কিশোরপাঠ্য বইগুলো প্রায়ই চিত্রবর্জিত। আজকাল অবশ্য শিক্ষাবিভাগের নির্দেশে চিত্র অল্প কিছু দেওয়া হয়—তবে তা যেভাবে দেওয়া হয় তা অত্যন্ত আপত্তিকর। যেন শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ পালনের জন্যেই তা করা হয়েছে, নতুবা প্রকাশক ও গ্রন্থকাররা চিত্রগুলো না দিতে হলেই বেঁচে যেতেন। অধিকাংশ গ্রন্থেই চিত্রগুলো সুদৃশ্য নয়, বড়ও নয়, তাছাড়া এমনভাবে ছাপা যা চোখকে পীড়া দেয়। শিশুমনকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করার ক্ষেত্রে আমাদের লাভের লোভ কী কৃপণতাই না করে। এ বিষয়ে বিদেশী গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের কাছ থেকে আমাদের গ্রন্থকার ও প্রকাশকদের বিশেষ শিক্ষা নেওয়া দরকার।

গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংরক্ষণই কিন্তু আসল কথা নয়। কোলকাতায় এমন একটা নামজাদা স্কুল আছে যার গ্রন্থাগারে অনেক দিনের সঞ্চিত অনেক ভালো ভালো বই আছে। কিন্তু ছাত্র হিসেবে আমরা তার থেকে একটা বইও ধার পাইনি। ছাত্রেরা বই যত্ন সহকারে রাখে না, নষ্ট করে, যথাসময়ে ফেরত দেয় না এবং হারিয়ে ফেলে—এইসব অভিযোগে ছাত্রদের বই দেওয়া হোতো না। তবে গ্রন্থাগার কেন? ওটাও শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ মানবার জন্যে। সবাই বলবেন—অমন গ্রন্থাগার থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো। পল্লীগ্রামের বহু স্কুলে আবার উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকদের অভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রন্থবিতরণের সুব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়গুলিতে একজন কোরে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক দেবার ব্যাপারে এখনও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট ঔদাসীন্য আছে। অথচ এর দ্বারা আমরা শিক্ষার একটা মূল সূত্রকেই—"স্বচেষ্টায় শিক্ষালাভ"—লঙ্ঘন কোরছি। আমাদের বিদ্যালয়গুলির এবং শিক্ষাব্যবস্থার এই সকল ত্রুটির কথা মনে রেখেই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে একটা অতিরিক্ত দায়িত্ব বহন কোরতে হবে। তা হচ্ছে সমাজবিদ্যা শিক্ষার্থীদের জন্য একটি গ্রন্থাগার পরিচালনা। শিক্ষার্থীরা যেন প্রতি সপ্তাহে গ্রন্থ পেতে পারে, প্রতিদিন গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকাদি ও অন্য নানা প্রয়োজনীয় অথচ চিত্তাকর্ষক গ্রন্থাদি গ্রন্থাগারে বসে পড়তে পারে এবং তাদের সাহায্য নিয়েই গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থ-নির্বাচন, গ্রন্থ-ক্রয়, জন্ম-পঞ্জীরচনা ও গ্রন্থাগারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ নিষ্পন্ন হয় তার ব্যবস্থা সমাজবিদ্যা-শিক্ষককে কোরতে হবে। গ্রন্থ-ক্রয়ের সময় একই কথা মনে রাখতে হবে—শিক্ষার্থীদের নিত্যব্যবহার্য বইগুলো যেন এক কপি কোরে না কিনে বেশীসংখ্যায় কেনা হয়—যাতে একশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সকলেই ৩।৪ সপ্তাহের মধ্যে এক একখানা বই পড়ে নিতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের সাধারণ প্রয়োজন মেটে এবং মনের বিকাশের একটা সাধারণ স্তরও রক্ষিত হয়

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারের কাজের অব্যবস্থা

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের একটি অতিরিক্ত কর্তব্য

(শ্রেণীশিক্ষার ক্ষেত্রে যেটা অপরিহার্য)। তাছাড়া, শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রন্থাগারকে অবলম্বন কোরতে পারে। আমাদের গ্রন্থাগার-গুলোকে "Out book" পড়বার কেন্দ্র বলে মনে করা হয়—এই মনোভাব শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকমহলেও আছে। এর ফল হচ্ছে নিরুৎসাহজনক। অভিভাবকেরা দেন ধমক, শিক্ষকেরা দেখান উৎসাহের অভাব এবং অনেক ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করেন, আর শিক্ষার্থীরাও ওটাকে এড়িয়ে চলাই ওদের অনুকূল কাজ বলে মনে করে। শিক্ষাজগতের একটি অতিপ্রয়োজনীয় অঙ্গ সম্পর্কে আমাদের কী বিচিত্র মনোভাব এবং তার কী বিচিত্র পরিণতি! একাধিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নিয়ে হাতেকলমে আমায় কাজ কোরতে হয়েছে এবং তার থেকে প্রাপ্ত করুণ ও শোকাবহ অভিজ্ঞতার ইঙ্গিতমাত্র এখানে তুলে দিলাম।

অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বর্তমান মনোভাব

পশ্চিমদেশের স্কুলগুলোতে পড়াবার চেয়েও গোড়াতে জোর দেওয়া হয় "কেমন কোরে পড়তে হবে" (how to study) শেখানোর ব্যাপারে। আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলো হয় যেন how to study শেখানোর কেন্দ্র। আর তারপর একটু একটু কোরে শিক্ষার্থীকে ঠেলে এগিয়ে দিতে হবে অনন্ত জ্ঞানসমুদ্রের বেলাভূমিতে, ডুব দিয়ে রত্ন কুড়িয়ে আনবার সাহস শক্তি ও উদ্যম সঞ্চয় কোরবে শিক্ষার্থী নিজেই। এ বিষয়ে সমাজবিদ্যার শিক্ষককেই উপযুক্ত উদ্যোগ নিতে হবে এবং বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শ্রেণীর "পড়ুয়াসমাজ" তৈরী করার ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিবেন।

How to study

বিদ্যালয়ে পড়ুয়াসমাজ" তৈরীতে অগ্রণী ভূমিকা

গ্রন্থাগারে আমাদের "how to study" আন্দোলনেরই একটা পরিণত রূপ হবে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গ্রন্থরচনার কাজে। শিক্ষার্থীরা প্রথম প্রথম নিজেদের "miscellany" তৈরি কোরতে পারে। এতে থাকবে প্রধানতঃ তিনটি অংশ :—(১) গ্রন্থাগারে তারা যা পড়লো তার উল্লেখযোগ্য অংশগুলোর নিজেদের হাতে তৈরী সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং তার ওপরে নিজেদের আলোচনা। (২) নিজেদের পারিপার্শ্বিক ও অন্য নানাবিধ অভিজ্ঞতার বিবরণ এবং (৩) নিজেদের সমালোচনামূলক মন্তব্যাদি এবং নিজেদের অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন। ক্রমে এই "miscellany" থেকে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার "নিজস্ব গ্রন্থ" রচনা কোরতে পারে। অর্থাৎ গ্রন্থাদি পারিপার্শ্বিক সমাজ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা কোরতে পারে। গ্রন্থাগারে এগুলি উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে সংরক্ষণ করা দরকার। একজন শিক্ষার্থীর কাজ আরেক জন শিক্ষার্থী খুবই আগ্রহ ও কৌতুহলেরও সাথে পড়ে থাকে। পরবর্তী শিক্ষার্থীরা তাদের অগ্রবর্তী শিক্ষার্থীদের মনের চিন্তা ও কাজের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীদের নিজস্ব গ্রন্থ রচনা ও তাদের Miscellanyর ব্যবহার

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত স্মৃতি যেমন এর দ্বারা বিদ্যালয়ে রক্ষিত হয়, তেমনি বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার-সৃষ্টিতেও এই প্রক্রিয়া বিশেষ মূল্যবান। এই প্রক্রিয়ার অনেক অসুবিধা আছে, তথাপি অল্পমাত্রায় এর সদ্ব্যবহার বিদ্যালয় ও তার শিক্ষার্থী-সমাজের পক্ষে খুবই উপকারক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জ্ঞানের রাজ্যে শিক্ষার্থীদের আজ আত্মপ্রত্যয় ও স্বনির্ভরতার বড় অভাব ; এই প্রক্রিয়া তার একটি মস্ত বড় প্রতিষেধক। জ্ঞানের রাজ্য থেকে বিশৃঙ্খলা ও দুর্নীতি দূর কোরবার জন্য সমাজবিদ্যার শিক্ষককে অবশ্যই অগ্রণীর ভূমিকা নিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়া তার হাতে একটি মূল্যবান অস্ত্র বলে পরিগণিত হবে।

এই প্রক্রিয়ার সুফল

এককথায়, গ্রন্থাগারকে আমরা সাধারণতঃ যেভাবে রেখেছি এবং যেভাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি—যেন সেটা পরিত্যাগ করি। **গ্রন্থাগার "মৃতবাণীর স্তূপ" (a grave of the silent messages) নয়,—সে হচ্ছে একটি চলমান মনোরম দৃশ্যসমূহ, জ্ঞানরাজ্যে মানবসভ্যতার বিচিত্র জীবন্ত মিছিল। এই চিন্তা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত কোরে দেওয়ার এবং তার থেকে তাদের জীবনের অবলম্বনকে লাভ করার শিক্ষা দেওয়া আমাদের একটি অপরিহার্য পবিত্র কর্তব্য বলে গণ্য কোরতে হবে।** সমাজবিদ্যার শিক্ষক এবিষয়ে কখনই অমনোযোগী হতে পারেন না।

গ্রন্থাগার মানবসভ্যতার বিচিত্র জীবন্ত মিছিল

গ্রন্থাগার সম্পর্কে আর একটি বড় কথা এই যে, **আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে যে বিরাট, বিস্তৃত জগৎ পড়ে রয়েছে, তার পরিচয় আমরা প্রধানতঃ এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই পেতে পারি। কি বর্তমান সময়ের কথা, কি অতীত কালের কথা—যে রাজ্য আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরে, তার সংবাদ প্রধানতঃ এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই লাভ কোরতে হবে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগার একটি "alternative aid" (পরিবর্ত-সহায়ক) নয়, এর একটি সুচিহ্নিত বিশেষ আসন আছে।** শিক্ষার্থীদের গ্রন্থাগারে এবং গ্রন্থরাজ্যে প্রবেশ কোরতে অবশ্যই উৎসাহ দিতে হবে—আবার তারা একবার এরাজ্যে প্রবেশ কোরলে নিজেরা স্বতঃই আরও অগ্রসর হবার প্রেরণা লাভ কোরবে। এখানে তারা পাবে জগতের খবর, জীবনের খবর, মনের খবর—অজানা কত রাজ্যের ইঙ্গিত —উপযুক্তভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা কোরতে পারলে শিক্ষার্থীরা তাদের জ্ঞানের ও জীবনের তৃষ্ণা এখানে থেকে আপনারাই মিটিয়ে নিতে শিখবে। **পরনির্ভর শিক্ষার্থী স্বনির্ভর জ্ঞানী হয়ে উঠবে, সেই সাথে তাকে আমরা উপযুক্ত কর্মী কোরেও গড়ে দেব, একথাটা যেন ভুলে না যাই। শিক্ষার্থীর মন ও ব্যক্তিত্ববিকাশের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দান সত্যই অপরিসীম।**

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বাইরের জগতের পরিচয় দেয় গ্রন্থাগার

(ঘ) সমাজবিদ্যার কক্ষ ঃ—

প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার এবং সমাজবিদ্যার কক্ষ সবগুলো মিলে আমার চোখে একটি সংগঠন। **শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাজের প্রদর্শনী থেকেই গড়ে উঠবে বিদ্যালয়ের একটি বৃহৎ অংশ, এই সংগ্রহশালারই আর একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে গ্রন্থাগার—আর এই সকলের সুসজ্জিত ও সুসমন্বিত রূপ হচ্ছে বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার কক্ষ**। বস্তুতঃ এটি হবে একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ, একটি বৃহৎ সংগঠনের আগার। **এটি হবে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের প্রয়োগশালা বা Laboratory, যার মূল উদ্দেশ্য হবে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের একটি উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা।**

ইহার সংগঠন

ইহার পরিবেশ

এখানে প্রবেশ কোরেই শিক্ষার্থী সহজে ও স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান আহরণে ও কর্মে প্রবৃত্ত হবে। আর পরিবেশটা এমনই চিত্তাকর্ষক ও উপযোগী হওয়া দরকার যাতে শিক্ষার্থীরা একদিকে এখানে যেমন অধিক সময় থাকতে চাইবে, অন্যদিকে তেমনি সময়টা শুধু হালকা কাজেই নষ্ট হোলো একথা মনে কোরবে না। সমাজ-সত্য শিক্ষা ও কর্ম-প্রক্রিয়াগুলোর মধ্য দিয়ে স্বতঃই এখানে শিক্ষার্থীর মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এবং জীবনের প্রতি তার গভীর আকর্ষণ ও মমত্ববোধ জেগে উঠবে। সমাজবিদ্যার কক্ষ-সজ্জায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে নজর দিতে হবে এবং এর থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে কেন সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ও সমাজবিদ্যার কক্ষকে আমি একটি মাত্র সংগঠন—সমাজবিদ্যার প্রয়োগশালা বলে অভিহিত কোরেছি। সমাজবিদ্যার কক্ষে থাকবে ঃ—

ইহার সজ্জা ও উপকরণ

(১) বিভিন্ন শ্রেণীর বই—যা হবে সাধারণ প্রয়োজনের এবং রেফারেন্স হিসাবে উপযোগী। বইগুলো হবে এমন চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ যা সহজেই শিক্ষার্থীদের সেদিকে আকৃষ্ট কোরবে।

(২) প্রায়শঃ চিত্রাদি দেখাবার জন্যে সেখানে একটি পর্দা রাখতে হবে। একটা অভিনয়-মঞ্চও থাকা দরকার যেখানে মাঝে মাঝে অন্ততঃ একটা ছোটখাট অভিনয় পরিচালনা করা যায়। বিভিন্ন শব্দ-যন্ত্র ও দর্শন-সহায়ক উপকরণের কথা আমরা বলে এসেছি। সেগুলো এই কক্ষেই সজ্জিত থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে সত্বর কাজে লাগানো হবে। রেডিও, গ্রামোফোন, টেপ-রেকর্ডার, প্রজেক্টর এবং ফিল্ম, বিভিন্ন ছবি ও স্লাইড এখানে সংগৃহীত থাকবে।

(৩) পৃথিবীর গোলক ও মানচিত্র, নানা দেশের মানচিত্র, বিভিন্ন তথ্যসম্মত উপযোগী চার্ট ও বিবরণসমূহ এখানে প্রদর্শিত হবে।

(৪) সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য সংগৃহীত উপযুক্ত ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক উপকরণ ও নিদর্শন-সমূহের প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে।

সমাজবিদ্যার প্রদর্শনী, সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার নিয়ে আমরা আলোচনা কোরেছি। তবু সমাজবিদ্যার কক্ষ বা প্রয়োগশালা নিয়ে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন

এই যে, শুধু সংগ্রহ ও সঞ্চয় কোরে রাখা, সেগুলো প্রদর্শন করা, সেগুলো দেখে যাওয়াই শিক্ষা-ব্যাপারের সবটা নয়। ওগুলো শিক্ষার একটা উপযোগী বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করে মাত্র। সমাজবিদ্যার কক্ষকে প্রয়োগশালা হিসেবে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত প্রেরণা সৃষ্টি কোরতে হবে এবং তাকে কাজে লাগাতে হবে। ছাত্রদের অবকাশ ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দিতে হবে যাতে তারা এখানে বসে লিখতে, পড়তে, ছবি আঁকতে, রেকর্ড ও বিভিন্ন বিবরণ, চার্ট-গ্রাফ প্রভৃতি তৈরি কোরতে শেখে। তারা এখানে বসে কাজের পরিকল্পনা কোরবে এবং এখানে বসে সে কাজের যতখানি করা সম্ভব তাও কোরবে। তাদের বাইরের কাজও হবে এখানকার কাজের অনুপূরক। আবার বাইরের কাজে যেসব অংশ অনালোচিত, অনুপলব্ধ এবং অসমাপ্ত থেকে যায় তা এখানে বসে তারা সমাপ্ত কোরবে। এককথায় শিক্ষার্থীরা এই কক্ষটিকে যেন নিজেদের সম্পদ বলে বোধ করে এবং এটাকে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার কোরতে উদ্বুদ্ধ হয় এবং ব্যবহার করার সুযোগ পায়। আলো, বাতাস, বসার আসন, কাজ কোরবার টেবিল, আলমারি বাক্স, নানা স্ট্যাণ্ড প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব যেন না থাকে। আলো-বাতাসের অভাব পরিবেশকে নিরানন্দ ও বিমর্ষ কোরে তোলে, কাজ করার অসুবিধা তো হয়ই। আসবাবপত্রের অভাব কাজের প্রেরণাকে বাধা দেয় এবং কাজের স্বতঃস্ফূর্ততা-বোধ নষ্ট করে ও অন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই প্রয়োগশালায় শিক্ষার্থীদের সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগত উভয় প্রকার শিক্ষা ও কাজের দিকেই লক্ষ্য রাখতে হবে। একদিকে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য যেমন উপযুক্ত অগ্রগতি লাভ করার সুযোগ থাকবে, তেমনই সাধারণ ও পশ্চাৎপদ ছাত্রদেরও উপযুক্ত সুযোগের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। বস্তুতঃ প্রত্যেকেই একটা সংগঠনের অংশ এই কথাটা শিক্ষার্থীরা যেমন বুঝবে, তেমনই নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী কাজ ও পড়াশুনা কোরে যেতে পারবে— এই কক্ষে যেমন তদনুযায়ী ব্যবস্থা থাকবে, তেমনি সেই ব্যবস্থার সদ্ব্যবহারের নিমিত্ত উদ্দীপনা-সৃষ্টির ব্যবস্থাও থাকবে। সমাজবিদ্যার নিপুণ শিক্ষক কখনই একথাটা ভুলতে পারেন না।

ইহার ব্যবহার

কাজের স্বতঃস্ফূর্ততা

ব্যক্তিগত প্রয়োজনানুসারে কাজ

তদুপরি, এই প্রয়োগশালার সকল কাজ ও তার ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীদেরই প্রধান ভূমিকা দিতে হবে। **এর থেকে তারা শিখবে জীবনে দায়িত্বশীল হোতে, অর্জন কোরবে দায়িত্ব-বহনের যোগ্যতা, পরস্পরের অভাব-অভিযোগের প্রতি সচেতন হবে এবং সহযোগিতামূলক আচরণ কোরবে, প্রকৃতপক্ষে এটি হবে দেশের ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক গঠনের প্রয়োগশালা। আমরা আমাদের চিন্তা ও কর্ম-শক্তিকে বিদ্যালয়ে যতখানি মুক্তি দিতে পারবো, ঠিক সেই অনুপাতেই ভবিষ্যৎ সমাজকে বিবেকবান, আত্মপ্রত্যয়শীল,**

ভবিষ্যৎ সমাজের নাগরিক গঠনের প্রয়োগশালা

আত্মশক্তিনির্ভর এবং সহযোগিতাভিত্তিক বা সমবায়চেতনাসম্পন্ন কোরে গড়ে তুলতে পারবো। এখানে শ্রম ও অর্থের কার্পণ্য করার অর্থ জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিকে আগামী কালের জন্য পঙ্গু কোরে রাখা ;—সমাজবিদ্যার শিক্ষক এবং শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ কেউই সেটা বাঞ্ছনীয় বলে বোধ করেন না, এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে। আমাদের বিদ্যালয়গুলি ক্রমেই বৈজ্ঞানিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত প্রয়োগ-পদ্ধতি ও উপকরণসমূহ ব্যবহার করার পূর্ণতর সুযোগ পাবে, আমরা অবশ্যই এ আশা প্রকাশ কোরতে পারি।

উপকরণগুলি ব্যবহারে সংযম-বিধি

এইবার শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির ব্যবহারে কতকগুলি সংযমবিধির উল্লেখ কোরে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা আমরা শেষ করবো। সব বিষয়েই সংযমবিধি উপকারক, এক্ষেত্রেও তাই। **প্রথম সংযমবিধি এই যে, প্রয়োজন হলে তবে এই উপকরণগুলো ব্যবহার কোরতে হবে।** ক্ষিদে না পেলে শিশুকে খাওয়ানো যেমন তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়, তেমনি অভাব অনুভূত না হলে সহায়ক-উপকরণ-ব্যবহার বাহুল্য ও সময় অপচয়ের কারণ হয়। এর ফলে উপকরণগুলির আকর্ষণও হ্রাস পায়। **তাছাড়া যেন-তেন-প্রকারেণ যে-কোন একটা উপকরণ ব্যবহার কোরলেও তা ক্ষতির কারণ হয়।** উপকরণগুলো থেকে আপনা-আপনিই শিক্ষা পাওয়া যায় না—এগুলো শিক্ষা-উপযোগী অবস্থা-সৃষ্টির অঙ্গ। তাদেরকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার কোরতে পারলে তবেই সুফল পাওয়া যায়। (২) **এর জন্যে পূর্ব পরিকল্পনা চাই।** কোন্ বিষয় শেখানো হবে এবং তার জন্য কোন্ উপকরণটি সবচেয়ে বেশী যুতসই, তা আগে থেকে স্থির কোরতে হবে। **এক একটি বিশেষ পাঠে বিশেষ উপকরণ ব্যবহার কোরতে হবে এবং উপকরণ-বাহুল্য বর্জন কোরতে হবে।** আবার শিক্ষাদানের কোন্ পর্যায়ে তা ব্যবহার কোরতে হবে তাও আগে থেকে স্থির কোরতে হবে। নতুবা শিক্ষাদান অনাবশ্যকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হোতে পারে এবং তা ক্ষতির কারণও হোতে পারে। (৩) **সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ও সুসঙ্গতভাবে উপকরণগুলির ব্যবহার হচ্ছে তৃতীয় সংযমবিধি।** শিক্ষার্থীদের যতটা সময় প্রয়োজন ততটা সময় দিয়ে যেভাবে দেখানো ও বোঝানো দরকার, ঠিক সেইভাবে তা করা প্রয়োজন। ফিল্ম স্লাইড এবং অন্যান্য দৃশ্য-চিত্রাদি দেখার ব্যাপারে এই সকল সংযম একান্ত প্রয়োজন। (৪) **চতুর্থ সংযমবিধি হচ্ছে শিক্ষকমহাশয় এই উপকরণগুলির ব্যবহার আগে থেকে শিখবেন, দেখবেন এবং কবে, কখন কিভাবে ব্যবহার কোরবেন তা আগে থেকে ঠিক কোরে নিজে প্রস্তুত হোয়ে নেবেন।** খড়ি, ঝাড়ন এবং ব্ল্যাকবোর্ড শিক্ষকমহাশয়ের নিত্যসঙ্গী, কিন্তু অন্য

প্রয়োজনে ব্যবহার

উপযুক্ত ও সুসঙ্গত ব্যবহার

শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি ও সতর্কতা

উপকরণগুলো সম্পর্কে ঠিক তা বলা যায় না। সেগুলির ব্যবহারে তাই শিক্ষক-মহাশয়কে সতর্ক হতে হবে এবং উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন কোরতে হবে। (৫) **এরই পরিপূরক বিধি হচ্ছে শিক্ষার্থীদের মনকেও আগে থেকে এই উপকরণগুলোর জন্য প্রস্তুত কোরে রাখা দরকার।** আগে থেকে তাদের কৌতূহল যথেষ্ট পরিমাণে জাগ্রত কোরতে পারলে এবং বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি কোরতে পারলে উপকরণ-গুলোর ব্যবহার সুফলপ্রসূ হবে। তাছাড়া কখন শিক্ষার্থীদের ক্লাসে বসতে হবে, প্রদর্শনীতে যেতে হবে, গ্রন্থাগারে পড়তে হবে, বাইরে কোনো তথ্যানুসন্ধানে বা অন্য প্রয়োজনীয় কাজে যেতে হবে, আবার সে সব নিয়ে কখন ক্লাসে আলোচনায় বোসতে হবে, তা উপযুক্তভাবে ঠিক হওয়া দরকার। এর জন্য শিক্ষকমহাশয়ের পরিকল্পনার সাথে যথেষ্ট পরিমাণে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও থাকা দরকার।

আগে থেকেই শিক্ষার্থীদের মন প্রস্তুত করা দরকার

(৬) **আর সর্বশেষে বললেও অন্য একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে, যে কোন সহায়ক উপায় অথবা উপকরণ ব্যবহার করার পর তার থেকে সুফল পাবার জন্যে অনুষঙ্গী কাজে (follow-up work) হতে দেওয়া দরকার।** শিক্ষামূলক ভ্রমণবিষয়ে আলোচনার সময়ে এ প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা কোরেছি। গ্রন্থাগার-বিষয়ে ছাত্রদের নিজেদের Miscellany অথবা গ্রন্থরচনার কাজের যে কথা বলেছি তাতেও এই সূত্রটি নিহিত রয়েছে। একটা ফিল্ম দেখাবার আগে ছাত্রদের মন যেমন প্রস্তুত কোরে নেওয়া দরকার, তেমনই তা দেখাবার পর তা নিয়ে আলোচনা হওয়াও দরকার। তাছাড়া **এই সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহারে ছাত্রদের কৌতূহল, আগ্রহ, প্রশ্ন এবং তা নিয়ে আলোচনাই হবে এই সকল উপায়-উপকরণ ব্যবহারের সার্থকতার মাপকাঠি।** তাই শিক্ষকমহাশয়কে শুধু এগুলি ব্যবহারের আগে নয়, ব্যবহারের সময় এবং তারপরও সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের কৌতূহল তাঁর সাহায্যে প্রতিটি পর্যায়ে পরিতৃপ্ত কোরতে পারে।

অনুষঙ্গী কাজের (follow-up work) প্রয়োজনীয়তা

উপকরণাদি ব্যবহারে শিক্ষকের ভূমিকা

শেষ কথা সকল উপায়-উপকরণ শিক্ষাদান সহজতর কোরেছে একথা মনে করা ভুল। বরং শিক্ষকমহাশয়কে এইগুলি থেকে উপকার আদায়ের জন্য আরও বেশী সজাগ, সতর্ক, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও জ্ঞানবান হবার প্রয়োজন রয়েছে। **বিজ্ঞান জীবনকে সুখী করে, কিন্তু সহজ করে না। আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানও শিক্ষকদের কাজকে চিত্তাকর্ষক কোরেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা কঠিনতর ও জটিল-তর হয়েছে।** একখানি নীরস গ্রন্থ আর বেত ছিল আদি শিক্ষা-উপকরণ, তাদের প্রয়োগে তেমন জটিলতা ছিল না আর, ব্যবহারও ছিল সহজ ; ব্যবহারে মাঝে মাঝে

শিক্ষকের কাজ চিত্তাকর্ষক, কিন্তু জটিলতর

অসতর্কতা ঘটলেও বেশী একটা অসুবিধা হোতো, তা নয়। কিন্তু আজ যেমন অনেক উপকরণ, তেমনি যথেষ্ট সতর্কতা আবশ্যক। জটিল জীবন সুখী হতে পারে, সহজ কখনই নয়। আধুনিক সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাজও তাই সহজ নয়, এই সতর্কবাণী উল্লেখ কোরে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা শেষ করছি।

Questions

1. How will you organise Social Studies Exhibition in your school and make useful to your pupils ?

2. How will you organise your School Museum and make it useful to Social Studies pupils ?

3. What are the present defects of our Library Organisation ? How can we remove them and make our library quite useful to our pupils ?

4. Describe the uses of a Social Studies Room and tell how you will utilise it as a Social Studies Laboratory.

5. What are the restraints you should observe to use audio-visual aids and why ?

6. You should remember the psychological grounds when you utilise any audio-visual aid—what are these grounds and which restraints do they set forth ?

7. Audio-visual aids are the instruments, the teacher is to use them. —Discuss.

8. Modern education is a scientific but complex process, the teaching aids are also many and complex. The teacher is to discuss these complexities and varieties and to use those aids in their proper perspective. —Discuss

---

নবম অধ্যায়

সমাজ-সম্পদ ও তার ব্যবহার

Community Resources and It's Use

বিদ্যালয় ও স্থানীয় সমাজ

সমাজবিদ্যা সমাজ-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে কাজ করে। তাই সমাজের সাথে বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ সংযোগ খুবই প্রয়োজন। সমাজের প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, কাজকর্ম এবং সম্পদ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রয়োজন। সমাজ বলতে আমরা এখানে স্থানীয় সমাজকেই (community) বোঝাচ্ছি। কারণ, বিদ্যালয় স্থানীয় সমাজের অঙ্গ এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের স্থানীয় সমাজ-সম্পদে প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার রয়েছে, সেগুলির সাথে তাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় রয়েছে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভে তারা মুখ্যত সেগুলিই ব্যবহার কোরতে পারে। তাছাড়া স্থানীয় সমাজেরও বিদ্যালয় সম্পর্কে স্বাভাবিক আগ্রহ রয়েছে। কারণ এটা তাদেরই সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান এবং তাদেরই সন্তান-সন্ততিরা ভবিষ্যৎ সমাজ-জীবনের উপযোগী হবার শিক্ষা এখানে পায়। বিদ্যালয়-সমাজ স্থানীয় জন-সমাজের জীবন-প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা সমাজ-সম্পদ ব্যবহারের কথা যখন তুলি, তখন এই মূল সত্যটির ওপরেই জোর দিই। বিদ্যালয় একটি কৃত্রিম-সমাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তার কৃত্রিমতা ল্যাবরেটরীর কৃত্রিমতা ; বাস্তবে যা ঘটে তাই-ই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে এখানে ঘটানো হয় এবং বাস্তব উন্নতির জন্যে যে পরিবর্তন কাম্য, এখানে তারই অনুশীলন করা হয়। বস্তুতঃ অনেকে বিদ্যালয়কে স্থানীয় জনসমাজের "প্রয়োগশালা" হিসেবেই উল্লেখ কোরেছেন। বৈজ্ঞানিককে যেমন তাঁর তথ্য ও উপাদান-সংগ্রহের জন্য এবং তাঁর আবিষ্কারের ফলাফল প্রয়োগের জন্য জনসমাজের কাছেই যেতে হয়, তেমনি শিক্ষার্থীদের শিক্ষিতব্য তথ্য ও উপাদান সরবরাহ করে স্থানীয় সমাজ, এবং সে শিক্ষার প্রয়োগক্ষেত্রেও আবার সেই সমাজ। যে সমাজ শিক্ষার মূলে এবং শিক্ষার শেষে যে সমাজই তার প্রয়োগ-ক্ষেত্র, তার থেকে বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কোরে নেওয়া কখনই কাম্য হতে পারে না। তাই শিক্ষা-বিজ্ঞানের নতুন চিন্তা সমাজ ও বিদ্যালয়ের সংযোগস্থাপন, শিক্ষার বাস্তব ভিত্তি ও শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের সাথে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করানো। সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কাছে এই কাজ সবচেয়ে বেশী অভিনন্দনযোগ্য, কারণ এর দ্বারা তাঁর শিক্ষাদানে কাজ সঠিক লক্ষ্যানুসারী হয়।

বিদ্যালয় স্থানীয় সমাজের অঙ্গ ও প্রয়োগশালা

একটি নতুন চিন্তা—সমাজ ও বিদ্যালয়ের সংযোগস্থাপন

সমাজ-সম্পদ কাকে বলে

আমরা পূর্ববর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে নানা সমাজ-সম্পদের ব্যবহারের কথা বলে এসেছি। তাই আমরা এখানে আলোচনাকে বিস্তৃত কোরবো না। প্রথমে দেখা যাক, সমাজ-সম্পদ বলতে আমরা কি বুঝি? সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কাছে **সমাজ-সম্পদ হচ্ছে স্থানীয় সমাজের জ্ঞানভাণ্ডার, অভিজ্ঞতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, আচার-আচরণ, কর্মপ্রণালী, বিভিন্ন উপাদান, উপকরণ ও উৎপন্ন দ্রব্য ইত্যাদি। অন্যকথায়, সমাজ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা-লাভের আনুকূল্য করে যেসব সামাজিক উপায়-উপকরণ, তাই হচ্ছে সমাজ-সম্পদ।** এই সম্পদ বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের, ভিন্ন পরিবেশে ভিন্নতর। কোন স্থানীয় সমাজে এর প্রাচুর্য আছে, কোথাও স্বল্পতা। নগরে-শহরে এক ধরনের সম্পদ, গ্রামে অন্য ধরনের। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে এগুলি উপযুক্তভাবে ব্যবহারের জন্য পরিকল্পনা প্রস্তুত কোরতে হবে এবং স্থানীয় সমাজ-সম্পদ অল্প হলেও তিনি বিচক্ষণতার সাথে তা বহু কাজে লাগাবেন। পরিকল্পনাহীন কাজ এখানে অর্থহীন। কারণ, তাতে লব্ধ অভিজ্ঞতাগুলি সংহত না হয়ে শিক্ষার্থীকে উদ্‌ভ্রান্ত কোরতে পারে। এইবার যতটা সম্ভব সমাজ-সম্পদকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কোরে দেখানো গেল :—

সমাজ-সম্পদের সংজ্ঞা

বিভিন্ন শ্রেণীর সমাজ-সম্পদ

(১) ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও কর্মকেন্দ্র সমূহ—নদী, পর্বত, রেলপথ, সড়ক-পথ, খাল, যোগাযোগের কেন্দ্রসমূহ, শহর, গঞ্জ, বন্দর, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের কেন্দ্রসমূহ, বিমান-বন্দর, খনি, কল-কারখানা, বিভিন্ন কৃষিপণ্য উৎপন্নের ক্ষেত্রসমূহ, পণ্য-চলাচল, স্বাস্থ্যনিবাস, গ্রীষ্মাবাস ইত্যাদি।

(২) অর্থনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্র-সমূহ—বাণিজ্যকেন্দ্রসমূহ, বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান-সমূহ, ব্যাঙ্ক, বাজার, খনি, কৃষিক্ষেত্র, কল-কারখানা, পশুপালন-কেন্দ্র, কুটীর-শিল্পের কেন্দ্রসমূহ, ইট-ভাঁটা, কাষ্ঠ-শিল্পের কারখানা ইত্যাদি।

(৩) সরকারী প্রতিষ্ঠান ও কর্মকেন্দ্রসমূহ—পৌর প্রতিষ্ঠানাদি, জিলা-পরিষদ, অঞ্চল-পঞ্চায়েত, সমষ্টি-উন্নয়ন সংস্থাগুলি (Block Development Centres), মহাকরণ, বিচারালয়, থানা, দমকল-কেন্দ্রগুলি, হাসপাতাল, জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান-সমূহ, ডাকঘর, বেতার-কেন্দ্রসমূহ, বিধানমণ্ডলী ও পার্লামেন্টভবনসমূহ, উল্লেখযোগ্য সরকারী আবাসকেন্দ্রসমূহ ইত্যাদি।

(৪) নির্মীয়মাণ প্রকল্পকেন্দ্রসমূহ—নির্মীয়মাণ শিল্পকেন্দ্রসমূহ, কৃষি-খামার ও গবেষণাকেন্দ্রসমূহ, নির্মীয়মাণ সেতু ও জলাধার, বিদ্যুৎকেন্দ্রসমূহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গারসমূহ, গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আদান-প্রদানের কেন্দ্রসমূহ ইত্যাদি।

(৫) ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ—মন্দির, মসজিদ, স্মৃতিস্তম্ভ, জাদুঘর, ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষসমূহ, নূতন ও পুরাতন প্রাসাদসমূহ, মহাপুরুষদের জন্মস্থান-সমূহ, ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত জড়িত স্থানসমূহ ইত্যাদি।

(৬) গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রসমূহ—জাদুঘর, গ্রন্থাগার, শিল্প-নিদর্শন প্রদর্শনীর কথাসমূহ, বেতার-কেন্দ্র, সংবাদপত্র-প্রকাশনকেন্দ্রসমূহ, শারীরিক ও মানসিক গুণ-সমূহ বিকাশের নিমিত্ত সংগঠিত নানা প্রতিষ্ঠানসমূহ, যুবসংগঠনসমূহ, সামাজিক সংস্কার ও আন্দোলনের কেন্দ্রসমূহ, বিশ্ববিদ্যালয়, স্টুডিও ইত্যাদি।

(৭) সামাজিক অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিসমূহ—লোকসংস্কৃতি, মেলা, যাত্রা, সামাজিক আচার-ব্যবহার, নানা সামাজিক প্রথা ও ঐতিহ্যসমূহ, বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সামাজিক উৎসবসমূহ ইত্যাদি।

বস্তুতঃ বাস্তব সমাজজীবন যত বিচিত্র ও বহুমুখী, সমাজ-সম্পদও তত বিচিত্র ও বহুমুখী। উপরের তালিকাটি সমাজ-সম্পদ নির্ণয়ের একটি ধাঁচ মাত্র, সম্পূর্ণ তালিকা নয়। স্থানীয় সমাজ থেকে অনায়াসলব্ধ ও অনায়াসসাধ্য উপায়-উপকরণগুলি বাছাই কোরে নিজ-পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষকমহাশয় কাজে লাগাবেন।

সমাজ-সম্পদগুলি কিভাবে কাজে লাগানো যায়

নানা সমাজ-সম্পদ তো কম-বেশি সর্বত্রই আছে। কিন্তু সেগুলিকে কিভাবে ব্যবহার কোরে শিক্ষাপ্রদ কোরে তোলা যায় সেইটিই প্রধান প্রশ্ন। এক্ষেত্রে দুটি ব্যবস্থা আলোচিত হয়েছে (১) বিদ্যালয় যাবে সমাজের কাছে—অর্থাৎ বিদ্যালয়ের চার দেওয়াল পেরিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যাবেন স্থানীয় সমাজের নানা ক্ষেত্রে ও নানা ব্যক্তির কাছে, এবং (২) স্থানীয় সমাজ আসবে বিদ্যালয়ের কাছে—অর্থাৎ স্থানীয় সমাজের নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা নানা বৃত্তিধারী লোকেরা, জনশিক্ষকেরা এবং স্থানীয় সমাজের নানা কর্মের নিদর্শনসমূহ আসবে বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের চার দেওয়াল তার স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ কোরবে ঠিকই, কিন্তু স্থানীয় সমাজের সাথে তার সমপ্রাণতা ও সজীব যোগসূত্র কখনই বিচ্ছিন্ন কোরবে না। স্থানীয় সমাজের প্রবহমান বিচিত্র কর্মস্রোতের সাথে বিদ্যালয়-সমাজের সংযোগ রাখতে হবে।

বিদ্যালয় ও সমাজের সংযোগ-সাধনের দুটি উপায়

(১) *বিদ্যালয় কিভাবে সমাজের কাছে যেতে পারে*

পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যবহারে যে শিক্ষা, তার তুলনা নেই। কোনো ঘটনা বা অবস্থা বাস্তবে পর্যবেক্ষণ করার চেয়ে অভিজ্ঞতালাভের কোনো সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা নেই। তাই শিক্ষার্থীদের সমাজের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ প্রাথমিক অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ দিতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষামূলক **ভ্রমণ ও কর্মক্ষেত্রসমূহ পরিদর্শন** (Field Trips) প্রক্রিয়াটি খুবই উপযোগী। (এ সম্পর্কে "শিক্ষা-সহায়ক" অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে পুনরালোচনা পরিহার করা গেল।) **সমীক্ষা ও তথ্যসংগ্রহ** হচ্ছে আর একটি উপযোগী উপায়। উঁচু ক্লাশের

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও কর্মক্ষেত্র পরিদর্শন

ছাত্রদের নিয়ে স্থানীয় সমাজ সম্পর্কে মাঝে মাঝে সমীক্ষা ও তথ্যসংগ্রহের কাজ চালানো যেতে পারে। বিদ্যালয়ের বা স্থানীয় সমাজের কোনো চলতি সমস্যা এর উপলক্ষ হতে পারে। তাতে শিক্ষার্থীদের কাজে আগ্রহ হবে আরও বেশী। ধরা যাক, স্থানীয় অঞ্চলের সেচ-সমস্যা। গত দু'তিন বছর যথাসময়ে উপযুক্ত বৃষ্টি না হওয়ায় পল্লী-অঞ্চলে ব্যাপক শস্যহানি হচ্ছে। কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হতে বসেছে। পল্লী-অঞ্চলের সবাই একবাক্যে বলছে উপযুক্ত সেচ ও জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাবে "হয় ভরায় নয় খরায়" শস্যহানি হচ্ছে। পল্লী-অঞ্চলের প্রতিটি পরিবার প্রত্যক্ষভাবে ভুক্তভোগী, তাই তাদের ঘরের ছেলেরা এ বিষয়ে সমীক্ষা ও তথ্যানুসন্ধানে স্বতঃই জোর আগ্রহ বোধ কোরবে। এ বিষয়ে শিক্ষক উপযুক্ত পরিকল্পনাসহ অগ্রসর হোলে তাঁর নিজ অঞ্চলের একটি পূর্ণাঙ্গ কৃষিচিত্র উপস্থিত কোরতে পারবেন। এ বিষয়ে সাহায্য কোরতে পারবেন ভূমি-রাজস্ব অফিসারেরা, সমষ্টি-উন্নয়নের অফিসার ও কর্মীরা, গ্রামসেবকেরা, অঞ্চল-প্রধান ও গ্রামাধ্যক্ষেরা এবং স্থানীয় কৃষকসম্প্রদায়। শুধু যে তথ্য-সংগ্রহ হবে তাই নয়, এর প্রতিকারের পরিকল্পনাও আলোচিত হবে এবং সে বিষয়ে কিছু করা হচ্ছে কিনা তাও জানা যাবে। এই ধরনের সমীক্ষা থেকে স্থানীয় সমাজের অতীত ইতিহাস, বর্তমান অবস্থা, আর্থিক সচ্ছলতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, আচার-আচরণ-প্রথা-ঐতিহ্য, এমনকি লোক-সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কেও পূর্ণতর চিত্র পাওয়া যাবে। শিক্ষার্থীদের একাজে শুধু লোকজনের সাথে দেখা কোরলেও চলবে না; পুরনো রিপোর্ট ও রেকর্ড ইত্যাদি ব্যবহার করা শিখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় স্থানগুলি নিজেদের চোখে দেখে আসতে হবে। ম্যাপ, নকশা, ডায়াগ্রাম, চার্ট ইত্যাদি অঙ্কনও শেখার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, এক বিবরণের সাথে অন্য বিবরণের তুলনা ও মতামতের সমন্বয়সাধন ইত্যাদিও শিক্ষা কোরতে হবে। (পূর্বেও স্থানান্তরে এধরনের সমীক্ষার উদাহরণ দিয়েছি।)

সমীক্ষা ও তথ্যসংগ্রহ

স্থানীয় সমাজ কিভাবে বিদ্যালয়ের কাছে আসতে পারে

বাইরের সমাজের ছবি তুলে এনে আমরা বিদ্যালয়ে দেখাতে পারি। টেপরেকর্ডার দিয়ে তাদের শব্দও ধরে আনতে পারি। পুরোদস্তুর ফিল্ম তৈরি কোরেও আনতে পারি। আর তাছাড়া পারি বিশিষ্ট স্থানীয় নেতাদের, সমাজকর্মীদের এবং বিভিন্ন বৃত্তিধারী লোকদের বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ কোরে আনতে। ধরা যাক, "অধিক শস্য ফলাও" আন্দোলন কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় কিভাবে অগ্রসর হচ্ছে? এবিষয়ে সরকার থেকে কোনো তথ্যচিত্র তোলা হোয়ে থাকলে আমরা তা শিক্ষার্থীদের প্রদর্শন কোরতে পারি; নতুবা নিজেরাই বিভিন্ন কৃষি-উন্নয়নমূলক কাজের ছবি তুলে আনতে পারি। তার সাথে সমষ্টি-উন্নয়ন-কেন্দ্র ও সরকারী কৃষি-বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় ম্যাপ, তথ্য ও চিত্রসমূহ সংগ্রহ কোরে আনতে পারি। তাছাড়া

ছবি, টেপরেকর্ডার, ফিল্ম ইত্যাদির ব্যবহার ও সমাজকর্মীদের আমন্ত্রণ

পারি A. E. O. (Agriculture Extension Officer)-কে বিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ কোরে আনতে ও তাঁর কাজ এবং তার ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মুখ থেকে অনেক কিছু জানতে পারি। সেই সাথে স্থানীয় কৃষক-নেতাদের আমন্ত্রণ কোরে আনলে আরও ভালো হয়। তাঁরাও অতীতের অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার তুলনা কোরে "কৃষি-প্রগতি" কিভাবে কার্যকর হচ্ছে তা বুঝতে সাহায্য কোরতে পারেন। (এবিষয়ে আমরা শিক্ষা-সহায়ক-উপকরণ অধ্যায়ে "সমাজকর্মীদের বিদ্যালয় পরিদর্শন" প্রসঙ্গে আলোচনা কোরেছি। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।)

সমাজ-সম্পদ-ব্যবহারের সুফল

সমাজ-সম্পদ-ব্যবহারে শিক্ষকের কুশলতা

সমাজ-সম্পদ-ব্যবহারের সুফল নির্ভর করে কেমন কোরে তা ব্যবহার করা হচ্ছে তার ওপরে। এবিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার যথেষ্ট দক্ষতাও থাকা চাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সমাজ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কোরতে গিয়ে অনেক অন্যায়-অনাচারের চিত্র সামনে আসবে। তা এড়িয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে? মনস্তত্ত্বসম্মত উত্তর হচ্ছে—"না"। তবে কি শিক্ষক চান, সেই নোংরা চিত্রের সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হোক? এইখানেই শিক্ষকের কুশলতার অগ্নিপরীক্ষা ; নোংরা চিত্রকে এড়িয়ে যাওয়া হবে না, অথচ পরিচয়টি এমন ধরনেরও হবে না যাতে শিক্ষার্থীদের তরুণ মনে অন্যায়ের প্রভাব পড়ে। সমাজের নোংরামির সাথে মৃদু পরিচয় যেন শিক্ষার্থীর মনে অন্যায়ের প্রতিষেধক রূপে কাজ করে, তার ন্যায়বোধ উত্তেজিত হয় এবং অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পৃহা বাড়ে। বিদ্যালয়ের কৃত্রিম সমাজ থেকে স্থানীয় জনসমাজের বাস্তব জীবনে প্রবেশ কোরলে এইসব জটিল অবস্থা আসবে—তা দেখে ঘাবড়ালে চলবে না। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিয়ে উপযুক্ত সমাধান নির্ণয় কোরতে হবে এবং প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই শিক্ষার্থীর সর্বাধিক উপকারের কথা মনে রাখতে হবে। অবশ্য পূর্বপরিকল্পনামত অগ্রসর হোলে শিক্ষক অনেক অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে পারবেন।

পরিকল্পনা এবং নির্বাচন, অন্বয়ীকরণ ও একীকরণের গুরুত্ব

তাছাড়া সর্বাধিক সুফল পেতে গেলে সমাজ-সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্বাচন, অন্বয়ীকরণ ও একীকরণের নীতি প্রয়োগ কোরতে হবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের ব্যবহার যেমন এখানে বড় কথা, তেমনি অভিজ্ঞতাসমূহের বাছাই, বিন্যাস ও একীকরণও বড় কথা। শিক্ষকের সকল কাজই যেন এই লক্ষ্য স্মরণ রেখে পরিচালিত হয়।

এবার **সমাজ-সম্পদ-ব্যবহারের সুফলগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হোলো :—**

(১) এই পন্থায় শিক্ষার্থীদের প্রকৃত সামাজিকীকরণ হয়।

(২) নিজের পরিবেশ থেকে তথ্যসংগ্রহের সাথে সাথে নিখুঁত পর্যবেক্ষণ-শক্তি জন্মে।

(৩) সমাজের বাস্তবজীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি জন্মে। সমাজ-স্বার্থ ও সমাজ-কল্যাণকর কাজের সাথে পরিচয় জন্মে। ফলে শিক্ষার্থীরা নাগরিক যোগ্যতাসমূহ অর্জন করে।

(৪) গ্রন্থে সংগৃহীত সামাজিক তথ্য ও বিবরণসমূহ যে বাস্তব জীবনের অস্তিত্ব ও সমস্যা থেকে উদ্ভূত সেই ধারণাটি সুস্পষ্ট হয় এবং সমাজ ও তার বিচিত্র কর্মপ্রণালী-সমূহ বাস্তব পরিবেশে উপলব্ধির ক্ষমতা জন্মে।

(৫) শিক্ষার্থীরা দেখা, শোনা, কথা বলা, পড়া এবং লেখা—সব ধরনের কাজেই উৎসাহিত হয়। বাস্তব জীবন আগ্রহের বিষয়। তাই সে সম্পর্কে দেখা, শোনা, বলা, পড়া এবং লেখা—সবই শিক্ষার্থীরা আগ্রহের সাথে কোরে থাকে।

(৬) সমাজ-পটভূমি তারা বিশ্লেষণ কোরতে শেখে।

(৭) সমাজে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের প্রভাব উপলব্ধি কোরতে শেখে।

(৮) সমাজ-পটভূমিতে আত্মসমীক্ষা কোরতে শেখে এবং নিজের যোগ্যতা-বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়।

(৯) শিক্ষার্থী নিজেও যে সমাজের একজন, সেই বোধ জাগ্রত হয়।

(১০) সমস্বার্থ-বোধ থেকে সমাজকল্যাণকর কাজে উৎসাহিত হয়।

(১১) নতুন নতুন তথ্যসংগ্রহের ফলে সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর সমৃদ্ধি ঘটে এবং নতুন আলোকসম্পাত ঘটে।

(১২) পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা, সামঞ্জস্য-বিধান, শ্রমের মূল্যবোধ ইত্যাদি ব্যাপারে বাস্তব শিক্ষালাভ হয়।

(১৩) সামাজিক ন্যায়বিচারবোধ জাগ্রত হয়। অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের স্পৃহা জন্মে।

(১৪) সামাজিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মে এবং নিজের সমাজ ও দেশ সম্পর্কে শ্লাঘা জন্মে।

(১৫) দেশ ও সমাজের ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি সম্পর্কে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে।

(১৬) স্থানীয় সমাজ, দেশ ও বিশ্ব-মানবসমাজের প্রতি সঠিক মনোভাব সৃষ্টি হয়।

সমাজধর্মী শিক্ষা

আমাদের চিরাচরিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় স্থানীয় সমাজের সম্পদ-ভাণ্ডার ব্যবহার কোরতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। ফলে আমাদের শিক্ষা জীবন ও বাস্তবতার সংস্পর্শ-শূন্য হয়ে একপেশে হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের শিক্ষা-কলে আমরা যাদের তৈরি করি, তারা চাকরি ছাড়া আর কিছু কোরতে পারে না। তাদের উদ্যোগ এবং স্বাধীনতার শক্তি যেন নষ্ট হোয়ে যায়। কেন এমন হয় সে কথা বহুজনেই চিন্তা

কোরেছেন এবং শিক্ষার বাস্তবতা-বর্জিত রূপের কথা উল্লেখ কোরেছেন। বস্তুতঃ, **শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হওয়া চাই এই দাবির পেছনে মনস্তাত্ত্বিক যুক্তি ছাড়াও একটা বড় সমাজ-সত্য রয়েছে;** তা হচ্ছে—শিক্ষার্থী হবে কর্মী এবং সমাজের প্রবহমান ও প্রয়োজনীয় কর্মধারায় অংশগ্রহণ কোরবার মত উপযুক্ত কর্মী। কথার শক্তি আছে অনেক, তবু একথা বলতেই হবে কর্ম ও বাস্তবতার মত সুদৃঢ় ভিত্তি তার নেই। তাই যে কথা আজ প্রচণ্ড শক্তিধর, আগামীকাল তা শূন্যগর্ভ; কিন্তু কর্ম চিরকালই আপন শক্তিতে সুন্দর ও মহীয়ান।

একটা বড় সমাজ-সত্য—শিক্ষার্থী হবে সমাজের যোগ্য কর্মী

শিক্ষার কেন্দ্র যে কর্ম, তার কেন্দ্র আবার সমাজের প্রাণস্রোতে, তাই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা শেষপর্যন্ত সমাজধর্মী শিক্ষা। আর সমাজধর্মী শিক্ষাই প্রকৃত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা, কারণ শিশুকে একদিন তার কর্মের মাধ্যমে এই সমাজে নিজের স্থান কোরে নিতে হবে। তাই শিক্ষা যদি সমাজধর্মী হয়, তবে শিশুর মনে নিঃসঙ্গতার আশঙ্কা জাগে না, সর্বদা সে সমাজের একজন হয়েই নিজেকে বিকশিত কোরে তুলতে পারে। তাই সমাজের বুক দিয়ে জ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অভিজ্ঞতা থেকে অভিজ্ঞতায়, নতুন নতুন আচরণ ও দক্ষতার পথে তাকে হাত ধরে সযত্ন পরিচালনায় এগিয়ে নিয়ে যাবেন সমাজবিদ্যার শিক্ষক। এ বিষয়ে তাঁর সুষ্ঠু নেতৃত্বদানের ক্ষমতা অবশ্যই থাকা চাই।

কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাই সমাজধর্মী শিক্ষা

Questions

1. Discuss the need for community participation in making Social Studies programmes successful in schools. Give a concrete plan for utilising community resources in teaching Social Studies in the Higher Secondary Classes of your school. (C. U. 1963)

2. Discuss the importance of utilising community resources in making Social Studies instruction effective. What ways would you follow for making use of these resources? (C. U. 1965)

3. Discuss the scope and utility of community resources. (C. U. 1967)

4. Discuss the importance of community resources in making Social Studies instruction effective in the schools. Suggest a concrete plan for utilising these resources in your school. (C. U. 1968)

5. What is the role of the Social Studies teacher in utilising the community resources?

6. Define community resources and classify them as far as possible.

7. Describe the role of planning in utilising community resources. What caution should the teacher pay heed to in this respect?

দশম অধ্যায়

সমাজবিদ্যা-পাঠে চলতি প্রসঙ্গ

চলতি বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ কাকে বলে ?

জীবন চলমান। তার গতি কোথাও কখনও থেমে নেই। সমাজে আদান-প্রদান চলেছে নিয়ত, মিলন-সংঘাতও চলেছে অহরহ। পৃথিবী যেন একটি রঙ্গমঞ্চ। ছোট-বড়, মিলন-বিরোধ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় নানা মধুর, তিক্ত, কষায় দৃশ্যের অবতারণা হয়ে চলেছে এখানে। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে কতকগুলি হয়ে উঠছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেইগুলিই হয়ে উঠছে খবর—স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক খবর। অর্থাৎ খবরগুলিই হচ্ছে বর্তমান স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসমূহের প্রতিবিম্বন। তাই খবরের কাগজকে বলা হয়েছে বর্তমান সমাজের দর্পণ। একখানি খবরের কাগজের বিভিন্ন পৃষ্ঠায় থাকে রাজনৈতিক খবর, ব্যবসায়-বাণিজ্যগত খবর, খেলাধূলার খবর, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের খবর, সিনেমা-থিয়েটার, গান ও নানাপ্রকার প্রচলিত আমোদ-প্রমোদের খবর, শিক্ষা, শিল্প, চাকুরি, জীবিকা-সংক্রান্ত খবর, নানাজাতীয় বিজ্ঞাপন—এককথায়, একখানা খবরের কাগজ নিয়মিত পড়লে দেখা যাবে মানবসমাজের এমন দিক নেই যেদিক সম্পর্কে কিছু-না-কিছু খবর সেই কাগজে না পাওয়া যায়। **বিভিন্ন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র ও বেতার ইত্যাদিতে পরিবেশিত এইসব সংবাদ ও তাদের ওপরে প্রকাশিত মতামতই হচ্ছে চলতি বা সমসাময়িক প্রসঙ্গ।** যেহেতু সমাজবিদ্যা একটি সজীব বিষয়, মানুষের চলমান সমাজজীবন সম্পর্কে চলমান অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার, অতএব সমসাময়িক প্রসঙ্গের আলোচনা এখানে অপরিহার্য। চলতি-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সমাজবিদ্যা পড়াশুনার অর্থ হচ্ছে মানবসমাজে প্রতিদিন যে অগ্রগতি ও পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে নিজেদের নাক-কান-চোখ-মুখ বন্ধ কোরে বসে থাকা। সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীর কাছে সেটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। শিক্ষা-পদ্ধতি, শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ও সমাজ-সম্পদের ব্যবহার ইত্যাদি অধ্যায়ে আমরা এবিষয়ে অনেক প্রাসঙ্গিক আলোচনাও কোরেছি। তাই আমরা এখানে সংক্ষিপ্তাকারে প্রয়োজনীয় আলোচনাটুকু কোরবো।

সমসাময়িক প্রসঙ্গের সংজ্ঞা

সমসাময়িক প্রসঙ্গ কিভাবে কাজে লাগান হবে ?

বর্তমান ঘটনা সম্পর্কে মানুষের অপরিসীম কৌতূহল। এই ঘটনাগুলি অতীতের ওপর আলোকসম্পাত করে ও অনাগত ভবিষ্যতের রূপরেখা নির্ধারণ করে। তাই

বর্তমান ঘটনাকে সমাজবিদ্যার ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রনৈতিক, ভৌগোলিক, অর্থ নৈতিক ইত্যাদি নানা সমস্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এটা মনস্তত্ত্বসম্মত পন্থাও বটে। যে কোনো পাঠ উপস্থাপনের আয়োজন-পর্বে সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা নির্দিষ্ট পাঠকে আরও আকর্ষণীয় ও কৌতূহলোদ্দীপক কোরে তোলে। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিষয়ে সমসাময়িক প্রসঙ্গ তো নিদারুণ বিতর্কের বিষয়। এগুলিকে সমস্যা-আকারে নানা-প্রকার আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্যও উপস্থিত করা যায়। তাছাড়া কোনো বিষয়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে পক্ষ-প্রতিপক্ষ সকলেই চলতি প্রসঙ্গ থেকে উদাহরণ দিয়ে নিজেদের বক্তব্যকে আকর্ষণীয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত কোরতে পারেন। তারা এই প্রয়াস কোরেও থাকেন। রাজনীতিক দলসমূহের অনুষ্ঠিত জনসভায় ও আলোচনাদিতে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইতিহাসপাঠের ক্ষেত্রেও এই প্রসঙ্গগুলি এমনভাবে বাছাই ও প্রয়োগ করা যায় যাতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে ইতিহাস কোনো প্রাণহীন শুষ্ক তথ্যরাজি নয়, এগুলি আজকে যেমন ঠিক তেমনই এককালে হাসি-কান্নায় মুখর মানুষের কাহিনী। গতকালের খবরই আজকের ইতিহাস। অর্থাৎ **চলতি প্রসঙ্গই আমাদের এক চোখকে ঠেলে দেয় অতীতের জীবন-প্রসঙ্গের দিকে, আর অন্য চোখকে নির্দেশ দেয় ভবিষ্যতের রূপরেখা কিভাবে অঙ্কিত হয়ে উঠছে এবং তা কিভাবে হওয়া উচিত তার দিকে।** এদিক দিয়ে সমসাময়িক প্রসঙ্গ আবার সমাজবিদ্যার পরিপূরক বিষয়। আমরা আমাদের অতীত সম্পর্কে যে জ্ঞানকে স্থির বলে ধরে নিয়েছি, নতুন নতুন ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তার পুনর্বিচার আমরা কোরে থাকি। তাছাড়া ভবিষ্যৎ কী রূপ নেবে বর্তমান ঘটনা-সমূহের ঘাত-প্রতিঘাতের গতিপ্রকৃতি ও ফলাফল আলোচনা ও প্রতি-আলোচনার মধ্য দিয়ে আমাদের তা বুঝে নিতে হয়। সমসাময়িক প্রসঙ্গকে আমরা শিক্ষা-পদ্ধতি হিসেবেও কাজে লাগাতে পারি। সমসাময়িক প্রসঙ্গকে ভিত্তি কোরে সমস্যা ও প্রকল্প ইত্যাদি পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা যেতে পারে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হিসাবেও এগুলি ব্যবহার করা চলে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে আমরা তা আলোচনা কোরেছি।

মনস্তত্ত্বসম্মত পন্থা

চলতি প্রসঙ্গই অতীত ও ভবিষ্যতের সংযোগ-সেতু

চলতি প্রসঙ্গ সমস্যা ও প্রকল্প পদ্ধতির ভিত্তি হতে পারে—শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ হিসেবে প্রযুক্ত হতে পারে

চলতি প্রসঙ্গ কিভাবে নির্বাচন করা হবে ?

যদি কেউ একখানা খবরের কাগজের প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পড়ে, তবে তার মাথা ঠিক আছে কিনা সে বিষয়ে আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি। অর্থাৎ খবরের কাগজে যত তথ্যই থাক, তার সবকিছু একজনের পঠনীয় নয়। তেমনি চলতি প্রসঙ্গ হিসেবে খবরের কাগজ, নানা সাময়িকপত্র, বেতার, বিভিন্ন জনসভা

ইত্যাদিতে যাই পরিবেশন করা হোক না, তাই সমাজবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। পরিবেশিত সংবাদের অনেক কিছুই থাকে জলের বুদ্বুদের মত, ক্ষণিকে উঠে ক্ষণিকেই মিলিয়ে যায়, বিরাট মানব-সমাজের দেহের ভেতরে বাইরে তার লক্ষণীয় কোন চিহ্নই থাকে না। **মানুষের মৌলিক প্রয়োজনগুলির ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ যেসব ঘটনা, যারা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ফল এবং বিভিন্ন পরিবর্তনের সম্ভাবনা-বাহী, তেমন ঘটনা ও প্রসঙ্গগুলিই বাছাই কোরে নিয়ে সমাজবিদ্যার শিক্ষার্থীদের সামনে হাজির কোরতে হবে।** সমাজবিদ্যার শিক্ষক বিশেষ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদের প্রচারক নন, তাই বলে তিনি সত্য নির্দেশ কোরবেন না এমন কোনো কথাও নেই। তিনি প্রচারবিদ্ নন, অসংলগ্ন কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাও তিনি উপস্থিত কোরবেন না। **তিনি বর্তমান প্রসঙ্গ থেকে ঘটনা ও তথ্যসমূহ এমনভাবে বাছাই কোরবেন যাতে শিক্ষার্থীরা অতীত পটভূমির সাথে বর্তমান প্রসঙ্গটির যোগসূত্র উপলব্ধি করে এবং ভবিষ্যৎকে তা কিভাবে প্রভাবিত কোরছে তা বুঝতে পারে। এইকাজ কোরতে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম শিক্ষার্থীদের শ্রেণী, বয়স, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি ও গ্রহণক্ষমতা অবশ্যই বিচার কোরবেন।** তুঁষ থেকে যেমন চালকে বাছাই করা হয়, তেমনি কোরে তিনি প্রচার ও গুজব থেকে সত্যকে বাছাই কোরবেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা মেটাবেন ঠিকই, কিন্তু তার জন্যে অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা কোরবেন না। চলতি প্রসঙ্গগুলি তিনি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার কোরতে চান তা আগে ঠিক কোরবেন এবং সেই উদ্দেশ্যের অনুবর্তী প্রসঙ্গগুলি বাছাই কোরে নিয়ে শিক্ষার্থীদের নিকট তা উপস্থিত কোরবেন। শিক্ষার্থীর অর্জিত অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি ও পুনর্মূল্যায়ন চলতি প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপনের একটি মস্তবড় মনস্তাত্ত্বিক কারণ। শিক্ষার্থী বর্তমান ঘটনাসমূহের স্রোতের আলোকে নিজের অর্জিত জ্ঞান ও মতামতের যথার্থ বিচার কোরতে চায়। শিক্ষকমহাশয় চলতি প্রসঙ্গগুলি উপস্থাপনের দ্বারা তাকে সেই সাহায্য দেবেন, তার ফলে শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ও নিজস্ব অভিমত গঠনের সুযোগ ঘটে, তাদের আত্মপ্রত্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এককথায়, **চলতি প্রসঙ্গ অবতারণার আগে শিক্ষকমহাশয়কে সেগুলির শিক্ষাগত মূল্য বেশ ভালভাবে বিচার কোরে দেখতে হবে।**

চলতি প্রসঙ্গ নির্বাচনের প্রধান উপায়

চলতি প্রসঙ্গের প্রয়োজনগত ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিসমূহ ও শিক্ষাগত মূল্যবিচার কোরতে হবে

চলতি প্রসঙ্গ আলোচনার উপযোগিতা কি ?

চলতি প্রসঙ্গ আলোচনার উপযোগিতা আমরা আগেই কিঞ্চিৎ আলোচনা কোরেছি। এর প্রধান উপযোগিতাগুলো হোলো :—

(১) জীবন যে নিয়তপ্রবহমান, শিক্ষার্থীর মনে এই ধারণা হয়।

(২) কোনো নির্দিষ্ট পুঁথিতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানই যে মানবজীবন ও মানবসমাজ সম্পর্কে শেষ কথা নয়, শিক্ষার্থী চলতি প্রসঙ্গ আলোচনা থেকে স্বাভাবিকভাবেই তা উপলব্ধি করে।

(৩) শিক্ষার্থী জীবন সম্পর্কে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন কোরতে শেখে, অতীত জীবনের পুনরাবিষ্কারে ও ভবিষ্যৎ জীবন ও সমাজগঠনে নিজের ভূমিকা-গ্রহণে আগ্রহ বোধ করে এবং তৎপর হয়।

(৪) ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা জন্মে।

(৫) যেহেতু সংবাদপত্র, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি চলতি প্রসঙ্গ পরিবেশনের মাধ্যম, অতএব শিক্ষার্থী এগুলি পড়তে, শুনতে বা দেখতে আগ্রহী হয়। এর ফলে সামাজিক অভিজ্ঞতা ছাড়াও ভাষাগত দক্ষতা, প্রকাশভঙ্গী, যুক্তিনিষ্ঠা ও বিচারবুদ্ধি ইত্যাদি আয়ত্ত কোরতে শেখে। শিক্ষার্থী পরস্পরবিরোধী মতবাদের মধ্য থেকে সত্যনিরূপণের ক্ষমতা অর্জন কোরতে শেখে এবং সে ক্রমশঃ সমন্বয়বাদী, সহনশীল ও সহানুভূতিপরায়ণ হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে তার মধ্যে অনেক কাম্য গুণাবলীর বিকাশ হয়।

(৬) যেহেতু শিক্ষার্থী সমাজের ভাবী নাগরিক ও কর্ণধার, অতএব তার নিকট বর্তমান প্রসঙ্গগুলির মধ্য থেকে ভাবী সমাজের যে রূপ ফুটে ওঠে, তা তার জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। আর তা বিশেষ কাম্যও বটে।

বস্তুতঃ উপযুক্ত নির্বাচিত প্রসঙ্গগুলি সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যগুলি পরিপূরণে যথেষ্ট সহায়তা করে।

শিক্ষকের ভূমিকা ও কর্তব্য কি?

(১) চলতি প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য তাঁকে স্থির কোরতে হবে।

(২) সেগুলি উপযুক্তভাবে তিনি নির্বাচন কোরবেন এবং সেগুলি লাভজনকভাবে ব্যবহারের উপায় তিনি স্থির কোরবেন।

(৩) যতদূর সম্ভব নিজস্ব অভিমত না দিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে সংবাদ ও অভিমত জানবার সুযোগ তিনি শিক্ষার্থীদের দেবেন। শিক্ষার্থীরা যতদূর সম্ভব নিজেরাই সত্য নিরূপণের চেষ্টা কোরবে। অনেক সময় শিক্ষকমহাশয়ও অভিমত দিতে বাধ্য হন; এরকম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী যেন শিক্ষকমহাশয়ের অভিমত পক্ষপাত-বিহীন এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে কোরতে পারে।

(৪) শিক্ষকমহাশয়কে একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি পড়ে নিজেকে সবসময়ে সকলপ্রকার সম্ভাব্য প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।

(৫) শিক্ষকমহাশয়কে যথেষ্ট দক্ষ, কৌশলী এবং অভিজ্ঞ হতে হবে। তাঁর পরিচালনা, প্রশ্নজিজ্ঞাসা এবং উত্তরদান ইত্যাদির মধ্যে যেন কোনও বিদ্বেষের বাষ্প

না থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানবসমাজ সম্পর্কে সত্য তথ্য পরিবেশন ও সত্যবিচার উপস্থাপন করাই তাঁর কাজ। শিক্ষার্থীদের মানস-গঠন ও আচরণ তিনি সেই দিকেই প্রভাবিত কোরবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিবেকবান, যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করাই তাঁর কাজ, একথা তাঁকে সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

Questions

1. What is meant by Current Affairs ? What is its role in teaching Social Studies ?

2. How can the Current Affairs be utilised with benefit in teaching Social Studies ?

3. What should be the principles of selection of materials from the Current Affairs for Social Studies classes ?

4. What should be the role of the teacher in introducing and utilising Current Affairs in Social Studies classes ? What restraints should be exercised in such cases ?

———

একাদশ অধ্যায়

সমাজবিজ্ঞানীর চোখে বর্তমান শিক্ষা-আদর্শ

শিক্ষা-সমস্যা, শিক্ষা-প্রক্রিয়া ও সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের ভূমিকা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আলোচনা—

শিক্ষাদান ব্যাপারটাই আজ একটা মস্ত বড় সামাজিক সমস্যা। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টি অনুযায়ী শিক্ষার বৈজ্ঞানিক চিন্তার কথা আমরা বারংবার উল্লেখ কোরে এসেছি। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আজকের শিক্ষা-আদর্শ, শিক্ষা-সমস্যা ও শিক্ষা-প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিচারের প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এটা মাত্র "দ্বিমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া" (biploar process) নয়। এমনকি পাঠদানের সময় শ্রেণীকক্ষেও সমাজচেতনা ও সামাজিক প্রক্রিয়াবলী নানাভাবে কার্যকর। তাছাড়া সমগ্র বিদ্যালয়, একটি সমাজ, তার একটা নিজস্ব সামাজিক জীবন, ঐতিহ্য ও আদর্শ আছে। তার সাথে আবার স্থানীয় বৃহত্তর সমাজের যোগ, যা আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজের সাথে সংযুক্ত ও আদান-প্রদান সম্বন্ধযুক্ত। **সমাজবিজ্ঞানীর চোখে শিক্ষা মানব-সমাজের লক্ষ্য, আদর্শ, উত্তরাধিকার, ধ্যান-ধারণা ও উন্নয়ন-প্রচেষ্টাসমূহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতালাভের বিষয়।** এর মাঝে প্রত্যেক মানুষের তথা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ভূমিকা আছে ; কিন্তু সে ভূমিকা বৃহত্তর সমাজের প্রবল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্রোতের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং বিপুল উন্নয়ন-প্রয়াসী জীবন-প্রচেষ্টার অংশীভূত। **তাই সমাজবিজ্ঞানীর চোখে শিক্ষা একটি "বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া"র** (multi-polar process) **ব্যাপার। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের দৃষ্টিতে শিক্ষা ঠিক তাই।** সমাজবিদ্যার শিক্ষক সমাজবিজ্ঞানেরই একজন কর্মী। তিনি শুধু একজন "শিক্ষা"-দাতা (পাঠদাতা অর্থে) নন, তিনি একজন সমাজকর্মী এবং ভবিষ্যৎ সমাজ-সংগঠনের কর্মী ও নেতৃবাহিনী তার তত্ত্বাবধানে সংগঠিত হয় ও শিক্ষা (সমাজ-জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতা) লাভ করে। তাই বর্তমান সমাজের অন্তঃস্রোত ও সেই অন্তঃস্রোত বিদ্যালয়সমাজকে ও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনকে কিভাবে প্রভাবান্বিত কোরছে তা তাঁকে উপলব্ধি কোরতে হবে এবং সে বিষয়ে সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। আধুনিক সমাজের ফিলজফি (philosophy) বা ধ্যানধারণা সম্পর্কে যিনি অজ্ঞ অথবা যাঁর মনোভাব অবেহেলাপূর্ণ, তিনি কখনই

সমাজবিজ্ঞানীর চোখে শিক্ষা—শিক্ষার একটি সংজ্ঞা

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কর্তব্যের রূপরেখা ও তাঁর যোগ্যতা

সমাজবিদ্যার শিক্ষক হবার যোগ্য নন। তেমনই সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কোরবার ক্ষমতা যাঁর নেই, তিনি সমাজবিদ্যার শিক্ষক হবার অযোগ্য। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের মধ্যে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের সত্যসন্ধানী অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কারবিমুক্ত মন থাকা চাই। তার সাথে থাকবে কিঞ্চিৎ ভূয়োদর্শিতা, ভবিষ্যতের জ্ঞান সম্পর্কে একটা মোটামুটি স্পষ্ট রূপরেখা। তিনি নিশ্চয়ই গণৎকার হবেন না, কিন্তু আমাদের স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমাজ কোন্ পথে কোন্ লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছে এবং একটা নির্দিষ্টকালের মধ্যে মোটামুটি কতটা ও কি ধরনের অগ্রগতি লাভ কোরছে, তার একটা পরিষ্কার ধারণা সমাজবিদ্যার শিক্ষকের মনে অবশ্যই থাকবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে আমরা জ্ঞানের কিঞ্চিৎ গভীরতা আশা করি। আবার তিনি জ্ঞানের ভারে ভারাক্রান্ত জড়ভরত হবেন না এটাও আশা করি। **তিনি হবেন একাধারে জ্ঞানী ও কর্মী।** "পণ্ডিতমূর্খ" ও "পণ্ডিতম্মন্য" ব্যক্তিদের আমরা বেশ সমীহ করি এবং তাদের থেকে বেশ কিছুটা দূর দিয়েই চলতে চাই। জ্ঞান আমাদের অস্ত্র, কর্মে সেই অস্ত্র হয় শাণিত ও আমাদের শক্তি হয় মূর্ত। আমাদের শিক্ষার্থীদের আমরা জ্ঞানের গভীরতা থেকে সহজেই অনুপ্রাণিত কোরবো; সহজ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ আবহাওয়ায় তাদের পরিচালিত কোরবো এবং অনাবিল কর্মপ্রেরণায় তাদের সাথে কর্মী হয়ে খাটব। কথাটা অনেকের কাছেই ধাঁধার মত মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। **জ্ঞানী অথচ জ্ঞানের ভারমুক্ত, সহজ স্বচ্ছন্দ গতি-সম্পন্ন প্রেরণাময় প্রাণবান কর্মী হবেন সমাজবিদ্যার শিক্ষক।** তাঁকে অবশ্যই শ্রমনিষ্ঠ ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। শিক্ষার যা লক্ষ্য, সমাজ শিক্ষা-জগতের নিকট যা আশা করে, বিদ্যালয়ে প্রত্যক্ষভাবে সর্বাগ্রে সমাজবিদ্যার শিক্ষককেই তার প্রধান দায় বহন কোরতে হবে। **তার ওপরে যে দায়িত্ব ন্যস্ত, তার মধ্যে সমাজের দাবি যেন প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়।** আর সে সমাজ শুধু আজকের খণ্ড, বিচ্ছিন্ন সমাজ নয়। কালের নিয়ত প্রবাহে যে বিচিত্র মানব-প্রবাহ-ধারন। প্রাগৈতিহাসিক অতীতকাল থেকে আরম্ভ কোরে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন পর্যায়ে যে বহুবিচিত্র জ্ঞান ও কর্মসাধনার ইতিহাস সৃষ্টি কোরেছে, তার প্রধান প্রধান পর্যায়গুলি সম্পর্কে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের ধারণা ও জ্ঞান থাকা চাই। তাদের অন্তঃপ্রেরণা সম্পর্কেও তিনি থাকবেন সচেতন, কারণ ইতিহাস বিভিন্ন সভ্যতার সেই অন্তঃপ্রেরণাকে আমাদের পূর্বপুরুষের ধ্যান ও কর্মপ্রয়াসের উত্তরাধিকার হিসেবে বর্তমান সমাজকে উপহার দিয়েছে। বর্তমান বিশ্বের ঐক্যচেতনা ও বিভেদপ্রবণতা —দুইই অতীত বিশ্বের উত্তরাধিকার। বিভিন্ন জাতির জীবনের ইতিহাস উত্থান-পতনের সংঘাতময় বিক্ষোভ-তরঙ্গ, জাতিতে জাতিতে হানাহানি অথচ তারই অন্তরালে মিলনের রাগিণী—বিভিন্ন যুগের মানবসভ্যতার সেই নীরব কণ্ঠ সমাজবিদ্যার শিক্ষকের

তিনি একাধারে জ্ঞানী ও কর্মী

তিনি ভারমুক্ত গতিসম্পন্ন প্রাণবান কর্মী

তার নিকট নিয়ত-প্রবাহী সমাজের প্রত্যক্ষ দাবি

কানের কাছে যেন অপূর্ব ধ্বনিময় হয়ে ওঠে, তার চোখে বর্তমান বিশ্বের বিরোধ-মিলনের বিপ্লবের ঘটনাবলী অতীত সংঘটনের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। এইভাবে বিভিন্ন কালের ব্যবধান-রেখা সত্ত্বেও নিয়ত কাল তার একটা সামগ্রিক মূর্তি নিয়ে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের চোখে প্রতিভাত হয়। অন্যদিকে তেমনি মানবসমাজের আবাসভূমি সমগ্র পৃথিবী বিভিন্ন স্থানীয় সমাজ ও দেশের বিচিত্র সমাজব্যবস্থা, রীতিনীতি ও অগ্রগতির বিভিন্ন স্তর সত্ত্বেও একটা সামগ্রিক মূর্তি পরিগ্রহ করে—সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে পৃথিবীর মানুষ এক গোষ্ঠী, এক পরিবার। এইসব বিভিন্ন মানবসমাজের উন্নতির স্তর ও জীবনযাত্রার রীতিনীতিতে বিস্তর পার্থক্য সত্ত্বেও মানবের মৌলিক ঐক্যের রীতিতে তারা পরস্পরের প্রতি আকর্ষণশীল, তাই সেখানে বিরোধের সংঘাত, মিলনের রাগিণী—লক্ষ্য আদান-প্রদানশীল সমপর্যায়ী বিশ্ব মানবসমাজের সৃষ্টি। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত, রাজনীতিগত, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় আদান-প্রদানের মোটামুটি খবর রাখতে হয়। বিভিন্ন দেশের নানাবিধ সামাজিক আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতির বিবর্তনের একটা মোটামুটি ধারণাও তাঁর থাকা চাই। কারণ এ সকলেরই লক্ষ্য হল বিশ্ব-মানব-সমাজসৃষ্টি। আর এইসব খবর না রাখলে আন্তর্জাতিক মৌলিক মানব-ঐক্যের প্রেরণা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কখনই স্পষ্ট হতে পারবে না। আর শিক্ষার্থীরাও তাঁর কাছ থেকে বর্তমান বিশ্বের উপযোগী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঐক্য-চেতনা লাভ কোরতে পারবে না—তার ফলে জাতীয় সমাজের উপযুক্ত স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিক যেমন সৃষ্টি হবে না, তেমনি তারা বিশ্বনাগরিকত্বের গুরুত্বও উপলব্ধি কোরতে পারবে না। কোনো সমাজবিদ্যার শিক্ষক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অগ্রগতির চেতনাবিহীন একথা কল্পনাই করা যায় না। আর এমন যদি কেউ থাকেন তবে তার হাতে উপযুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাগরিক সৃষ্টি হওয়ার আশা অর্থহীন আশাবিলাস মাত্র। **সমাজবিদ্যার শিক্ষকের একটি চোখ নিয়ত থাকবে অতীতের বিভিন্ন মানবসমাজের জ্ঞান ও কর্মসাধনার অনুসন্ধানরত, আর অন্য চোখটি থাকবে বর্তমান আন্তর্জাতিক ও শিক্ষার্থীর জাতীয় সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী ও অগ্রগতির প্রয়াসের অনুসরণব্যাপৃত। আর উভয় চোখই একযোগে ধাবিত হবে ভবিষ্যৎ সমাজের অভ্যুদয়ের পথ ধরে তার লক্ষ্যের রূপরেখা উপলব্ধিতে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের চোখের সামনে ফুটে উঠবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা-প্রসূত ভবিষ্যতের ধ্যানমূর্তি।** আবার বলছি, সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে আমরা জ্ঞানের এই গভীরতা ও বিস্তার আশা করি, কিন্তু তিনি কখনই যেন জ্ঞান-ভারাক্রান্ত হয়ে না পড়েন। তাকে স্বচ্ছন্দ, সহজ, অমায়িক, প্রাণবান ও কর্মনিষ্ঠ হতেই হবে।

তার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা ও জ্ঞান

আবশ্যক অতীতের অনুসন্ধান, বর্তমানের অনুসরণ এবং ভবিষ্যৎ সমাজ-চেহারার ধারণা

জ্ঞানের কিঞ্চিৎ গভীরতা ও বিস্তারের পরই সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে আমরা যে যোগ্যতা আশা করি তা হোলো তার সহজ সাবলীল প্রাণময়তা, কর্মনিষ্ঠা ও পরিশ্রমশক্তি। জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তারই একমাত্র কাম্য কখনও নয়, কারণ জীবনের অগ্রগতি নির্ভর করে মানুষের কর্মপ্রয়াসের ওপর। জ্ঞানের গভীরতা ও বিস্তার এবং সমাজ সম্পর্কে দৃষ্টিও আবার এই কর্মপ্রয়াসের থেকেই লাভ করা যায়।

তার প্রাণময়তা, কর্মনিষ্ঠা ও পরিশ্রমশক্তি

কর্মছাড়া জ্ঞান অর্থহীন। নতুন নতুন কর্মে উদ্যম না থাকলে নতুন জ্ঞানার্জনের পথও রুদ্ধ হয়। এককালের উন্নত মানবসমাজও বন্ধ্যা আচারের জঙ্গাল-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমাদের ভারতীয় জনসমাজে সে অভিজ্ঞতা আমরা হাড়ে হাড়েই লাভ কোরেছি। ভারতীয় শিক্ষককে সে কথা আর নতুন কোরে বলবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। তবু রবীন্দ্রনাথের প্রার্থনাটাই আবার এখানে তুলে দিচ্ছি। সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কর্মের লক্ষ্য ও আদর্শ এখানে সুস্পষ্টভাবে বিবৃত্ত হয়েছে। এই মন্ত্রে আমরা নিজেদেরকে দীক্ষিত কোরতে চাই :—

"চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস-শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি ;
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে যেথা নির্ঝরিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধি চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্বকর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজহস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।"

বস্তুতঃ সমাজবিদ্যার-শিক্ষকের সকল কর্মের লক্ষ্য হোলো এমন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নাগরিককুল সৃষ্টি করা যাদের চিত্ত নির্ভীক, উচ্চশির, মুক্ত-জ্ঞান, বিশ্ব-ঐক্যবোধ যাদের গৃহ, দেশ ও পৃথিবী এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত, যাদের বাক্য ন্যায় বিচারবোধে স্বতঃ উৎসারিত, যাদের কর্মস্রোত নিয়তপ্রবাহে নানা দেশ ও নানাদিক 'অজস্র সহস্রবিধি চরিতার্থতায় পরিপ্লুত কোরে তোলে—তার বিচার ও বিবেককে অবলম্বন কোরে

সমাজবিদ্যার-শিক্ষক যে নাগরিককুল সৃষ্টি কোরতে চান

অর্থহীন আচার ও অন্ধ-সংস্কারকে পর্যুদস্ত কোরছে। তাদের পৌরুষ বিপর্যস্ত হয় নি, বরং বুদ্ধি, বিচারশক্তি ও কর্মোদ্যমের উত্তাপে উদ্দীপিত হয়েছে, বিধাতার মহামিলনের মঙ্গল নির্দেশকে মেনে নিয়ে তারা তাদের সর্বকর্ম ও চিন্তাকে কোরেছে কল্যাণময় ও গভীর অর্থবহ, তাদের জীবনকে কোরেছে আনন্দময়। সমাজবিদ্যার শিক্ষক ঠিক চান এমনি উদ্দীপ্ত, পৌরুষ, জ্ঞান ও কর্মের অনির্বাণ প্রেরণাময়, কল্যাণ-আদর্শ অনুসরণকারী ব্যক্তিত্বশীল নাগরিকবৃন্দের সৃষ্টি। কবি বিধাতার কাছে প্রার্থনা কোরেছেন ভারতকে সেই কল্যাণ স্বর্গে নির্দয় আঘাত দিয়েই জাগরিত কোরতে—বিধাতার অভিপ্রায়সিদ্ধকারী কর্মিদল হিসেবে ভারতের শিক্ষককুলকে সেই ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদন কোরতে হবে। **সমাজবিদ্যার শিক্ষকসম্প্রদায় হবেন ভারতের এই নবচেতনা-উদ্বুদ্ধ শিক্ষকসমাজে অগ্রণী নেতৃসম্প্রদায়।**

তিনি বিদ্যালয়ের কর্মিসমাজের স্বাভাবিক নেতা

কিন্তু কথার নেতৃত্ব নয়, কাজের নেতৃত্ব। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে হতে হবে কঠোর পরিশ্রমী, যত্নশীল, অধ্যবসায়ী, উন্নতিপ্রয়াসী ও চিন্তাশীল। কিশোর শিক্ষার্থীরা স্বভাবতঃই কাজ ভালবাসে। আর **তিনি হবেন সেই কর্মিসমাজের স্বাভাবিক নেতা। শুধু পরিচালক, পরিদর্শক, নিয়ন্ত্রক ও বন্ধুর ভূমিকাই এখানে যথেষ্ট নয়। এখানে চাই শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কর্মের সহযোগ, আর এই সহযোগের মাধ্যমে মনের সাহচর্য। সমাজজীবনের সে মূলমন্ত্র—কর্মভিত্তিক সহযোগিতা, শিক্ষকের সাথে একযোগে কাজ করে তার আদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই শিক্ষার্থী তা শিখবে।** উপদেশ দিয়ে যেমন নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায় না, তেমনি শুধু কর্মের কথা বলে ও নির্দেশ দান কোরে কর্মী গ'ড়ে তোলা যায় না। কর্মী গঠিত হবে কর্মস্রোতের মধ্য থেকে, কর্মস্রোত থেকেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ হবে, লাভ হবে শিক্ষা। কর্মের যে বিভিন্ন অঙ্গ উদ্যম, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিশ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায় ও বিশ্ববিজয়েচ্ছু পৌরুষ, তা মাত্র কর্মস্রোতের মধ্য থেকেই লাভ করা যেতে পারে। আর কর্মস্রোতই দৃষ্টিকে স্বচ্ছতর করে। জ্ঞানকে বন্ধ্যাত্বের হাত থেকে অব্যাহতি দিয়ে শাণিততর কোরে তোলে। কিন্তু এই শিক্ষা কোন উপদেশে হয় না। আরও মজার কথা এই যে, কোনো উপদেশ-কাজ শিক্ষক এইসব কথা মুখস্থ কোরেও ঠিকমত তা আওড়াতে পারবেন না—আর তাঁর সে 'মন্ত্র-আওড়ানি' শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক বোধশক্তির বশেই ধরে ফেলবে। ফলশ্রুতি আজ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে যা হয়েছে তাই; —প্রেরণাবিহীন, উদ্যমবিহীন। পুঁথির পাতা-চর্বণকারী-নিরীহ মানবদলের সৃষ্টি, সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানীর পদপ্রাপ্তি যাদের কাছে মোক্ষ ফললাভ। স্বাধীন ভারতের শিক্ষক নিশ্চয়ই এই অগৌরবের অংশীদার হতে রাজী নন। মানবসমাজের ঐতিহ্যচেতনাসম্পন্ন সমাজবিদ্যার শিক্ষক তো ননই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কর্ম কি প্রকারের হবে? **সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কর্ম এক মূল উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, কিন্তু বহুমুখী। শিক্ষক হিসাবে তাঁর প্রথম কর্তব্য বিদ্যালয়-সমাজে উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি।** কর্মের মাধ্যমে শিক্ষ-নীতি যেন সেখানে বাস্তবে রূপায়িত হয়। শিক্ষার্থীরা যেন স্বতঃই মনন, চিন্তন ও কর্মে উদ্যমী হয়। এর জন্যে নানাপ্রকার কর্মের কথা আমরা পূর্ববর্তী কোনো কোনো অধ্যায়ে আলোচনা কোরেছি। সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের একটি প্রধান কর্তব্য এই যে, বিদ্যালয়ে আয়োজিত নানা উৎসব, অনুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজনে, সেগুলির উদ্‌যাপনে ও তাদের তাৎপর্য-অনুধাবনে তিনি অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব দান কোরবেন। কর্ম ও বাণীর সমন্বয়ে গঠিত হয় সুন্দর সুচারু জীবন। তাই শিক্ষার্থীদের আচরণ ও উপলব্ধি গড়ে তোলাই সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। আর সে কারণেই অন্যান্য শিক্ষকেরা যে সকল নিয়মিত কর্ম পরিচালনা করেন (যেমন ক্রীড়া শিক্ষাদান, শারীরিক শিক্ষাদান, সামরিক কুচকাওয়াজ, A. C. C. শিক্ষাদান, কল্যাণকর্মের শিক্ষাদান—Junior Red Cross প্রভৃতির কাজ) তাতে সমাজবিদ্যার শিক্ষক বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন কোরবেন ও তাঁর সহযোগিতা দান কোরবেন। এছাড়া স্থানীয় সামাজিক উৎসব, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস, বিদ্যালয়-জীবনের বিশেষ দিবসগুলি—পুরস্কারবিতরণ-দিবস, ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা-দিবস প্রভৃতির আয়োজনে ও অনুষ্ঠানে সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের সচেতন প্রয়াস ও সতর্ক পরিচালনা প্রয়োজন। এতে সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিমণ্ডল সুপরিকল্পিত, সুগঠিত, ও সুফল-প্রসূ হয়। এর জন্যেই এর সাথে আসে বিদ্যালয়-পত্রিকা দেয়ালপত্র-প্রকাশের এবং বিতর্ক-সভা, আলোচনা-সভা প্রভৃতির আয়োজনের কথা। বিদ্যালয়ের সমাজের সাথে বাইরের সমাজের যোগাযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সামাজিক তথ্যাদির অনুসন্ধান, বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানাদিতে অভ্যাগতদের আমন্ত্রণ-আপ্যায়ন প্রভৃতির মধ্যে। এই সকল এবং আরও অনেক অনুরূপ কাজের দ্বারা বিদ্যালয়সমাজের সামাজিক পশ্চাৎপট ও শিক্ষা-পরিবেশ উন্নত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়; আর তার দ্বারাই শিক্ষার্থীদের সকল সমাজজীবন-যাপনের শিক্ষা দেওয়া যায়। কি কোরে সমাজে বাস কোরতে হবে, তা কেবলমাত্র সমাজ গড়ে তোলা এবং সেই সমাজে সহযোগিতার ভিত্তিতে অনলস কর্মপ্রয়াসের দ্বারা বাস করাও সুখ-দুঃখ সমানভাবে বণ্টন কোরে নেবার মধ্য দিয়েই শেখানো যায়। কথা দিয়ে সামাজিক জীবন যাপন করা যায় না, সমাজে বাস করার মধ্য দিয়েই তার সার্থক নীতিগুলি আয়ত্ত কোরতে হয়। আর বিদ্যালয়ের সামাজিক জীবন ও শিক্ষা-জীবন অভিন্ন। **বিদ্যালয়ের সাথে বহিঃসমাজের সংযোগ এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব সামাজিক জীবন এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কোরতে হবে যা সত্যই উন্নত**

বহুমুখী কর্ম

বিদ্যালয়ের নানা কর্ম-পরিচালনায় সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের উপযোগিতা

বিদ্যালয়-সমাজের সামাজিক পশ্চাৎপট ও শিক্ষা-পরিবেশের উন্নতি ও নিয়ন্ত্রণ

ফলপ্রদ শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই কাজে বিত্মালয়ের অন্যান্য শিক্ষকেরা অবশ্যই সহযোগিতা কোরবেন, কারণ এতে অংশগ্রহণ করা তাঁদেরও কর্তব্য। তথাপি সমাজবিত্মার শিক্ষককে এটা তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য বলেই গ্রহণ কোরতে হবে। সমাজবিত্মা কখনই মাত্র পুঁথিগত জ্ঞান নয়, জ্ঞান ও আচরণ এখানে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—জ্ঞান আচরণের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠবে এবং আচরণ নতুন জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত কোরবে।

উপরে যা বলা হোলো, তার সাথেই একটি বড় প্রশ্ন জড়িত আছে যা সমাজবিত্মার শিক্ষক অবহেলা কোরতে পারল না। অন্যান্য শিক্ষকের ক্রীড়া-ব্যায়াম, সামরিক কুচকাওয়াজ, প্রভৃতি শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের কাজে তার সহযোগিতার কথাও এই প্রশ্নটির দিক থেকেই খুবই মূল্যবান ও তাৎপর্যপূর্ণ। এই প্রশ্নটি হোলো শৃঙ্খলা বা বিনয়ের প্রশ্ন। শৃঙ্খলার অভাব আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনকে যে কিভাবে বিপর্যস্ত কোরছে তা সকলেই নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েই উপলব্ধি কোরছেন। এটা প্রধানতঃ পরাধীন আমলের দায়িত্ববোধহীন, যেন-তেন প্রকারেণ কষ্ট-ক্লিষ্ট বিশৃঙ্খল জীবন-যাপন করাই উত্তরাধিকার। যেখানে সমাজ-চেতনা ও দায়িত্ববোধ প্রখর, সেখানে শৃঙ্খলার অভাব আমলই পেতে পারে না। কিন্তু এই সমাজচেতনা ও দায়িত্ববোধ কথার মধ্য দিয়ে নয়, কাজের মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে সঞ্চারিত হয়। এটা মুখে বলার ব্যাপার নয়, প্রাণ থেকে প্রাণে সঞ্চারিত করার ব্যাপার। এর দ্বারাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে "সজীব সংযোগ" গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকের "অস্মিতা" বা ব্যক্তিত্বই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। আর এই সমাজচেতনা ও দায়িত্ববোধ যার মাঝে যতখানি সঞ্চারিত বা উদ্বুদ্ধ হয়, তার ব্যক্তিত্বও ঠিক ততটা পরিমাণেই সুগঠিত হবার নিজস্ব পথ পায়। **আচরণ-শৃঙ্খলা—সমাজ-সচেতনতা—দায়িত্ববোধ—সজীব-সংযোগ—শ্রমশক্তির উদ্বোধন—ব্যক্তিত্বের সংগঠন—অভিজ্ঞতা লাভ ও প্রসার, এসবের জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন।** বিত্মালয়ের নিজস্ব সমাজে ও বহিঃসমাজের সাথে আদান-প্রদানে এই সংযোগ ও সাহচর্য হয় পরম মূল্যবান। শিক্ষার্থীর দৃষ্টি কোন্ পথ অবলম্বন কোরবে, তার আচরণ কোন্ ধারা অনুসরণ কোরবে, তার শ্রমশক্তি জীবনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরতে থাকে কিভাবে সমুৎসুক কোরবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মূল্যবান সংযোগ ও সাহচর্যে তা বহুল পরিমাণে নির্ধারিত হয়ে যায়। **শিক্ষক-শিক্ষার্থীর এই সংযোগ ও সাহচর্যের পথ প্রশস্ত কোরবেন সমাজবিদ্যার শিক্ষক এবং তার দ্বারাই তিনি শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাময় জীবনযাপনের ব্যবহারিক ও অভ্যাসগত শিক্ষা দেবেন।** শৃঙ্খলা কখনই একটা অজ্ঞানাত্মক কল্পনা (Negative Conception) নয়। গোলমাল কোরবে না, দুষ্টামি কোরবে না—

শৃঙ্খলা

সমাজচেতনা, দায়িত্ববোধ ও "অস্মিতা"

শৃঙ্খলাময় জীবনযাপনের ব্যবহারিক ও অভ্যাসগত শিক্ষাদান

প্রভৃতি শৃঙ্খলা নয়, এগুলিকে বড় জোর বিশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি বলা যায়। **শৃঙ্খলা একটি ভাবাত্মক কল্পনা এবং শিক্ষার্থীদের বাস্তব আচরণ-ধারাতেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে। পরিশ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায় নম্রতা, সংযম, আনুগত্য, সময় ও নিয়মের অনুবর্তিতা, সহযোগিতা, উদার দৃষ্টি, বিশুদ্ধ বিবেক, ন্যায়সঙ্গত আচরণ, প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বগ্রহণের শক্তি প্রভৃতি শৃঙ্খলার অঙ্গ।** শৃঙ্খলার এই অঙ্গগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা কতকগুলি "না"-এর সমষ্টিকে শৃঙ্খলা বলে কল্পনা কোরে এসেছি। তাই আমাদের শিক্ষা-কলে এতদিনের গড়া পুতুলগুলো "হাবাগোবা ভাল ছেলে" হয়েই পরমার্থ লাভ কোরেছে। এও পরাধীন আমলের উত্তরাধিকার। "আমরা কি কোরবো" ইংরেজশক্তি আমাদিগকে সেই পথ দেখাতে মোটেই আগ্রহী ছিল না ; আমরা কি কোরবো তার নির্দেশ দিয়েই তারা সন্তুষ্ট ছিল। কারণ এটাই ছিল তাদের স্বার্থের অনুকূল। আর তাদের স্থাপিত শিক্ষা-কলে শৃঙ্খলার ধারণাও ঐরকম একটা অভাবাত্মক কল্পনা হবে, আর তার মধ্য দিয়ে "নিরীহ ভদ্রলোক কেরানীকুল" সৃষ্টি হয়ে আসবে, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! কিন্তু স্বাধীন ভারতে আমরা এ ধরনের নাগরিক চাই না। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন :—

শৃঙ্খলার অঙ্গ

"মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিশেষ কাজ হচ্ছে এমন লোকদের শিক্ষিত কোরে তোলা যারা স্থানীয় এলাকায় বা নিজেদের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, শিল্প এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের দায়িত্ব গ্রহণ কোরতে পারবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের যথাযোগ্য নাগরিক গুণ এবং ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং এদের অনুষঙ্গী চারিত্রিক গুণসমূহ শিক্ষাদানের জন্য দায়ী, যাতে তারা জাতীয় জীবনের উন্নয়নে তাদের যোগ্য এবং উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ কোরতে পারে। তারা যেন আর এমন কতকগুলো অসহায় এবং নিরুপায় প্রাণীতে পরিণত না হয় যারা নিজেদের নিয়ে কী কোরবে না জেনে শুধু কলেজে এসে ভিড় কোরবার কথাই চিন্তা করে অথবা শেষপর্যন্ত অনিচ্ছাক্রমে কোনো কেরানীগিরি বা শিক্ষকতার কাজ, যার জন্যে তাদের কোনো স্বাভাবিক প্রবণতা নেই, তাই গ্রহণ করে।"

উপরের বক্তব্যের সাথে নিম্নোদ্ধৃত এই কয়েকটি কথা যোগ কোরলে শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশনের ধারণা বেশ স্পষ্ট হোয়ে ওঠে এবং সকল শিক্ষকের কাছেই তা লক্ষ্যস্বরূপ হওয়া উচিত—

শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন

"সে শিক্ষা শিক্ষা-নামের যোগ্যই নয় যা সহযোগী মানুষদের সাথে সহনীয়তা, ঐক্যবদ্ধতা এবং দক্ষতার সাথে বসবাস করার গুণগুলি শিক্ষা দেয় না। এই উদ্দেশ্যে যেসব গুণগুলির চর্চা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তা হোলো শৃঙ্খলা, সহযোগিতা, সামাজিক অনুভূতি-প্রবণতা এবং সহনশীলতা।"

আর শিক্ষার্থীদের উক্ত ধরনের চরিত্রগঠনে শৃঙ্খলার ভূমিকা কিরূপ এবং শিক্ষক মহাশয় তা কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে পারলে, সে সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন নিম্নরূপ আভাস দিতেছেন :—

শৃঙ্খলা-শিক্ষা

"সকল সংঘবদ্ধ কাজের জন্য শৃঙ্খলা হচ্ছে একটি মৌলিক শর্ত। একজন শৃঙ্খলাহীন ব্যক্তি কোনো সহযোগিতামূলক প্রকল্প-সম্পাদনে কোনো সার্থক অবদান দিতে পারে না বা নেতৃত্বের গুণগুলিও বিকশিত কোরতে পারে না। নানা কারণে শৃঙ্খলার মান সাম্প্রতিক দশকগুলিতে খুবই নেমে গিয়েছে এবং এর উন্নতির জন্যে বিশেষ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ··যদি বুদ্ধিসম্মত এবং উপযুক্ত মনস্তত্ত্বভিত্তিক পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হয়···তবে জাতীয় চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে তা হবে একটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অবদান এবং তা আমাদের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যারান্টি হবে।"

"শৃঙ্খলা শূন্যে বিকশিত হয় না ; এটা হচ্ছে ইচ্ছাসহকারে গৃহীত এবং দক্ষতা-সহকারে সম্পন্ন সহযোগিতামূলক কাজের মূল্যবান সহায়ক ফল (by-product)

দেখা যাচ্ছে, মুদালিয়র কমিশনের মতেও শৃঙ্খলা একটি ভাবাত্মক কল্পনা এবং শৃঙ্খলার সহায়ক অথবা অঙ্গীভূত গুণগুলি মানুষের চরিত্রের প্রধান সম্পদ। বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল আচরণ হচ্ছে সুসঙ্গত জীবনের ভিত্তি ও উন্নতির পথ-প্রস্তুতকারী ; আর বিশৃঙ্খল আচরণ হচ্ছে চরিত্রের অবনমনের প্রধান কারণ এবং তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির ঘোরতর পরিপন্থী। প্রয়োজনবোধেই **শৃঙ্খলার অঙ্গীভূত গুণগুলি** আবার উল্লেখ কোরছি—**পরিশ্রম, ধৈর্য, অধ্যবসায়, নম্রতা, সংযম, আনুগত্য, সময় ও নিয়মের অনুবর্তিতা, সহযোগিতা উদার দৃষ্টি, বিশুদ্ধ বিবেক, ন্যায়সঙ্গত আচরণ, প্রয়োজনবোধে নেতৃত্বগ্রহণের শক্তি প্রভৃতি।** এই শৃঙ্খলাবোধ জাগরণের পটভূমি হোলো সুবিস্তৃত সমাজজীবন। এই **সমাজজীবনে ন্যায়বোধ, সুবিচার, সমান সুযোগবণ্টন, অনুন্নতদের উন্নয়ন এবং ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, হিংসা ও অন্যান্য অপরাধজনক প্রবৃত্তিগুলির বিসর্জনের স্পৃহা হবে এই শৃঙ্খলাবোধের জন্মদাতা।** স্বাধীন গণতান্ত্রিক সমাজের নাগরিকগণের চরিত্রে এই শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ অপরিহার্য প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের কর্মজীবন থেকেই শিক্ষার্থীরা এটা আয়ত্ত কোরতে শিখবে ; আর তা শিখবে যাবতীয় কাজে শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সাহচর্য থেকেই। এই বিষয়টির দিকে সুতীক্ষ্ন নজর রাখতে হবে সমাজবিদ্যার শিক্ষককে এবং তিনি এই কাজে সব সময়েই অন্যান্য শিক্ষকগণকে ও শিক্ষার্থীদিগকে সহযোগিতা দান কোরবেন। এই সহযোগিতা হচ্ছে কর্ম ও নেতৃত্বের দ্বারা সহযোগ। শিক্ষার্থীদের কাজ ও বিদ্যার মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও চরিত্রের এই প্রধান সম্পদটি অর্জনের কথা মনে রাখতে হবে। বস্তুতঃ যে শিক্ষার্থী শৃঙ্খলার ধারণা ও

শৃঙ্খলার অঙ্গীভূত গুণগুলি এবং তা জাগরণের পটভূমি

বিদ্যালয়ের কাজেই শৃঙ্খলার শিক্ষা

সুশৃঙ্খল আচরণ আয়ত্ত কোরতে পারলো না, তার শিক্ষাই অসম্পূর্ণ ও অসার্থক থেকে গেল। শিক্ষার্থীদের কাজের মূল্যায়নে একথা অবশ্যই স্মর্তব্য।

আমরা প্রকল্প (Project)-পদ্ধতিতে শিক্ষা-পরিচালনা ও সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক কাজকর্মের কথা পূর্বেই আলোচনা কোরেছি। এই সকল কাজ সুপরিকল্পিত, সুপরিচালিত ও সুফলদায়ক হওয়া চাই। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অন্যান্য পদ্ধতিতে পাঠদানেরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু যে কোনো পদ্ধতিই প্রয়োগ করা হোক না কেন, এবং যে কোনো ব্যবহারিক কাজই হাতে নেওয়া হোক না কেন, তার জন্য আগে থেকে শিক্ষকের নিশ্চিত প্রস্তুতি থাকবে। এসব বিষয়ে পূর্ব থেকেই তার চিন্তা ও পরিচালনা না থাকলে পাঠদান ও কর্মপরিচালনা বিশৃঙ্খল হতে বাধ্য। ফলে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা-প্রসারের ক্ষেত্র সংকুচিত ও ভুল অভিজ্ঞতা হবার সম্ভাবনা খুবই বেড়ে যায়। তাছাড়া উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ দ্বারা শিক্ষার্থীরা বেশী শেখে, তাই শিক্ষকের পক্ষ থেকে সুশৃঙ্খল পরিচালনার অভাব থাকলে শিক্ষার্থীদের মধ্যেও উদ্যোগ ও উৎসাহে ভাঁটা আসে এবং বিশৃঙ্খল আচরণের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তাই কী পাঠ দেওয়া হবে শিক্ষকমহাশয় তা আগে থেকেই ভেবে দেখবেন এবং তার বিভিন্ন অংশ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা কোরবেন। দরকার বোধ কোরলে—এবং এ দরকার প্রায়ই হয়ে থাকে—নিজের চিন্তা, পাঠ-পরিকল্পনা ও কার্য-পরিচালনার ধারা সম্পর্কে নোট রাখবেন। বাস্তব কাজের বা পাঠ-দানের ক্ষেত্রে এগুলি অবশ্যই মানতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তথাপি এগুলি যে মূল্যবান্ সাহায্য দেবে এবং শিক্ষকের নিজের পরিকল্পনাটিকে একটি বিশেষ সীমার মধ্যে সুশৃঙ্খল পরিণতি দান কোরবে তাতে সন্দেহ নাই। পাঠদানের ক্ষেত্রে হার্বার্টের পদ্ধতির কথা এবং সেই সাথে সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে তথ্য ও তত্ত্বের গুরুত্বের কথা আসে। এখানে এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে, **শিক্ষকের পক্ষ থেকে আগে থেকে প্রস্তুতি চাই এবং পাঠ ও কার্য পরিচালনার মোটামুটি একটা পূর্ব-পরিকল্পনাও চাই; আর সেই পরিকল্পনাটা মোটের ওপর কাগজেকলমে আবদ্ধ থাকলে ভালোই হয় প্রত্যেক পাঠ ও কর্ম পরিচালনার পর শিক্ষার্থীরা তা থেকে কতটা লাভবান হোলো তাও শিক্ষকমহাশয় অবশ্যই যাচাই কোরে নেবেন। হার্বার্টের পদ্ধতির অভিযোজন-সূত্রটির কথা তিনি কোনক্রমেই ভুলে না যান।**

শিক্ষকের পাঠদান ও অন্যান্য কর্ম পরিচালনার কাজে শৃঙ্খলার ভূমিকা

হার্বার্ট-পদ্ধতির গুরুত্ব

পাঠ ও কর্ম-পরিকল্পনায় শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি যতই থাক, শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সে পরিকল্পনা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থিত হয়। এর জন্যে আসে হার্বার্টের আয়োজনের সূত্রটি। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের সাথে সঙ্গতি রেখে আলোচনাক্রমে নতুন পাঠ ও কর্ম-পরিকল্পনার কথা স্বাভাবিক ভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে হাজির হবে। এর জন্যে শিক্ষা-পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করার প্রশ্ন আসে। উপযুক্ত বাছাই, সংগ্রহ, আয়োজন

আয়োজন ও শিক্ষা-পরিবেশ

ও উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষকমহাশয় এই শিক্ষা-পরিবেশ সৃষ্টি কোরবেন। আর তার ফলে পূর্বজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতালাভের পথ সুগম হবে। শিক্ষার প্রকৃতি সম্পর্কে হার্বার্ট তিনটি কথা বলেছেন—"(১) শিক্ষার কাজ হচ্ছে মনের সামনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ধরে দেওয়া ; (২) সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-গুলোকে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সুসঙ্গতভাবে সমন্বিত কোরে সুসংবদ্ধ ধারণার মণ্ডল (circle of ideas) সম্পূর্ণ কোরে, আবেগ ও ইচ্ছাকে নীতিমুখী কোরে, শুভকর্মে প্রবৃত্ত করানো ; (৩) শিক্ষা, উপদেশ ও সুপরিচালনা (educative instruction) দ্বারা চরিত্রগঠন। উপযুক্ত শিক্ষক ছাত্রের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলোকে নিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত কোরে তার আবেগ ও ইচ্ছাকে গতিদান করেন, সংযত করেন এবং মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী ব্যবহার কোরে তার চরিত্রগঠন করেন।" (শিক্ষায় পথিকৃৎ পৃঃ ৬৮-৬৯)

শিক্ষার কাজ

অন্য আর একটি গ্রন্থে এই বিষয়টিই ব্যাখ্যা কোরে বলা হয়েছে, "আমাদের মনে একই ধরনের অভিজ্ঞতা বারবার উপস্থিত হলে পরস্পরের অন্বিত একটি পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হয়। হার্বার্ট বলেন, পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সংযোজনই শিক্ষার অন্বয়ীকরণ। পুরাতন অভিজ্ঞতার আলোকেই আমরা নূতন অভিজ্ঞতাকে যাচাই কোরে নিয়ে থাকি। এইভাবেই নূতন অভিজ্ঞতা পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্বিত হয়ে পড়ে এবং অভিজ্ঞতার পরিধি বর্ধিত হতে থাকে। হার্বার্ট তাঁর শিক্ষানীতিতে এই অন্বয়ীকরণকে একটি বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন। এদিক থেকে আধুনিক অনেক মনোবিদ্ হার্বার্টের মতকে সমর্থন করেছেন। হার্বার্ট বলেন, মানসিক গঠনভঙ্গীর দিক থেকে যেমন একটি শিশুর সঙ্গে অন্য একটি শিশুর পার্থক্য দেখা যায়, তেমনই তাদের গ্রহণ-ক্ষমতার দিক থেকেও তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকে। শিক্ষকের দায়িত্ব এইজন্যই অতি গুরুতর। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পরিধি এমনভাবে সৃষ্টি করবেন যেন শিক্ষার্থী অতি সহজেই এবং স্বাভাবিক ভাবেই নতুন অভিজ্ঞতাকে এই অভিজ্ঞতার পরিধির সঙ্গে অন্বিত করে এই পরিধিকে ক্রমবর্ধমান রূপ দান করতে পারে। হার্বার্টের মতে শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশসাধনে সহায়তা করা। শিক্ষক বাইরে থেকে কিছু জোর করে চাপিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীর সহায়তা করতে পারেন না। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তাঁকে শিক্ষার্থীর ধারণাকে সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। তাই শিক্ষককে হার্বার্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ কোরেছেন।" (দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্রতী ; পৃঃ ৫৫)

পুরাতন ও নূতন অভিজ্ঞতার অন্বয়ীকরণ

শিক্ষকের দায়িত্ব

তা হলে দেখা যাচ্ছে শিক্ষাকার্যের সূত্রপাতেই শিক্ষকের পক্ষ থেকে কতদূর প্রস্তুতি ও সতর্কতা থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ হবে ক্রমান্বয়ী, পূর্ব-

অভিজ্ঞতার সাথে পরবর্তী অভিজ্ঞতার মিলন এবং এইভাবে ক্রমাগত ধারণার পরিমণ্ডলের বৃদ্ধি। আর এই ধারণার পরিমণ্ডলেই জন্মায় ইচ্ছাশক্তি যা শিক্ষার্থীর চরিত্রকে গঠন করে, সংযত ও সংহত করে। "...Since character depends upon will, will upon desire, desire upon interest, and interest upon the circle of thought, in which "the whole inner activity has its abode", it follows that the main business of education lies here, **for a strong character can be formed only by cultivating an extensive and coherent "Circle of thought".** "Those only wield the full power of education", says Herbart, "who know how to cultivate in the you hful soul a large circle of thought **closely connected in all its parts**."...Let the unity of the circle of thought" be destroyed, and then farewell to unity and strength of character." (*The Principles of Education, Pages 182-3*)

ধারণার পরিমণ্ডল, ইচ্ছাশক্তি ও চরিত্রগঠন

ধারণার পরিমণ্ডলের ক্রমিক পরিবর্ধন ও তাকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত কোরে তোলাই কেন্দ্রীভূত শক্তিসম্পন্ন চরিত্র গড়ে তোলার উপায়। এই চরিত্র হবে উদার, কিন্তু তার পরিচালনা হবে একটিমাত্র ধারণার পরিমণ্ডল-কেন্দ্র থেকে। তা না হলে চরিত্র হোয়ে পড়বে পরস্পরবিরোধী শক্তিসম্পন্ন এবং অহেতুক আত্মসংগ্রামেই চরিত্রের সকল শক্তি অকার্যকর হোয়ে পড়বে। **শিক্ষককে তাই শিক্ষার সূত্রপাত থেকেই সতর্কভাবে অগ্রসর হোতে হবে এবং শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে প্রতি স্তরে সুপরিচালিত কোরে শিক্ষার্থীর ধারণার পরিমণ্ডলকে বিস্তৃততর অথচ সুসংহত কোরে তুলতে হবে। প্রতিটি কাজ, তথ্য ও তত্ত্ব শিক্ষার্থীর এই ধারণার পরিমণ্ডলের বিবর্ধনে ও সুসংহতিতে কাজে লাগাবেন শিক্ষক।** কাজ চরিত্রের জড়তার মূলে আঘাত কোরবে, নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দেবে, নতুন পথ পেয়ে শিক্ষার্থীর শক্তি কাজে ব্যাপৃত হবে, তথ্য এই কাজের উপকরণ ও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে, আর তাদের সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য থেকে নতুন তত্ত্ব উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। নতুন তত্ত্ব ধারণার পরিমণ্ডলকে বর্ধিত কোরবে ; শ্রমশক্তিকে কাজে লাগাবার বিস্তৃততর ক্ষেত্র হাজির কোরবে এবং শিক্ষার্থী সেখানে বিপুলতর তথ্য সমভারের সম্মুখে উপস্থিত হবে। তথ্য ও কর্মশক্তির যুগ্ম-প্রচেষ্টায় আবার হবে নতুন তত্ত্বের অভ্যুদয়। এমনি কোরেই মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস রচিত হয়েছে, এমনি কোরেই শিক্ষার্থীব ব্যক্তিগত জ্ঞান-সাধনা ও জীবন-প্রস্তুতির ইতিহাসও রচিত হয়। শিক্ষক হচ্ছেন এখানে তার সতর্ক সহায়ক, সহযোগী কর্মী এবং সস্নেহ পরিচালক। তাই পূর্ব-প্রস্তুতি এবং সুপরিকল্পনা ছাড়া শিক্ষক কখনই শিক্ষাদান-কার্যে অগ্রসর হোতে পারে না।

ধারণার পরিমণ্ডলে বিবর্ধন ও সংহতিসাধন

কাজ, তথ্য ও তত্ত্ব

সমাজবিদ্যার শিক্ষককেও তাই কর্ম-নির্বাচনে কিংবা তথ্য ও তত্ত্বের উপস্থাপনে যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি রাখতে হবে, ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সাহচর্য এবং যথেষ্ট ধৈর্য ও সতর্কতা দ্বারা শিক্ষার্থীদের পাঠ ও কর্ম পরিচালনা কোরতে হবে। **শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠন যখন তার সর্বপ্রধান কর্তব্য তখন তাদের ধারণার পরিমণ্ডলটির সযত্ন বিবর্ধন ও তার সুসমন্বয় সম্পর্কে তাকে সর্বদাই হুঁশিয়ার থাকতে হবে।**

সমাজবিদ্যার শিক্ষকের প্রয়োজনের দিক থেকে আমরা হার্বার্টের শিক্ষাতত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা কোরেছি। এবার তার শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। হার্বার্ট শিক্ষার্থীর মনের গঠন অনুযায়ী তার আগ্রহের ধারার ওপর ভিত্তি কোরে চারটে সোপান রচনা কোরেছিলেন। আগ্রহের ক্ষেত্রেও তিনি চারটে স্তর নির্দিষ্ট কোরেছেন—পর্যবেক্ষণ, ধারণা, প্রয়োজন ও কার্য। এই চারটে স্তর অনুযায়ী হার্বার্টের শিক্ষা-পদ্ধতির চারটে সোপান হোলো—(১) স্পষ্টতা, (২) পারস্পরিক সম্বন্ধ, (৩) ধারাবাহিকতা বা সমন্বয় ও (৪) সাধারণ সূত্রগঠন এবং তার ব্যবহার। হার্বার্টের এই চারটে সোপানই পরবর্তী কালে তার শিষ্যদের দ্বারা নতুনভাবে বিন্যস্ত হোয়েছে। এগুলো হোলো—(১) আয়োজন, (২) উপস্থাপন, (৩) সংযোগস্থাপন, (৪) সাধারণ সূত্রগঠন এবং (৫) অভিযোজন। আয়োজন সোপানটির একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হোলো শিক্ষকমহাশয়ের কাজ যেন দিশাহীন নাবিকের মত লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে না পড়ে। পূর্বার্জিত জ্ঞানের সাথে সংযোগ রেখে নতুন পাঠদানের প্রস্তুতি যেমন আবশ্যক, তেমনই সেই প্রস্তুতির একটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা হোলো পাঠদানের উদ্দেশ্যটিও আগে থেকে ভালভাবে স্থির কোরে নেওয়া। সমাজবিদ্যার শিক্ষক তার সমস্ত পাঠ ও কর্ম-পরিকল্পনার এই বিষয়টির প্রতি সর্বদাই সযত্ন দৃষ্টি রাখবেন এবং তা হলেই তিনি দেখতে পাবেন যে তার শিক্ষাদানের গুণগত উন্নতি সম্ভব হোয়েছে।

হার্বার্টের শিক্ষা-পদ্ধতি

তথ্য কি কোরে তত্ত্বে পরিণত হয় এবং তা সুসংহত চরিত্রগঠনের ভিত্তি হয়, তা হার্বার্টের প্রযোজিত শিক্ষা-সোপানগুলি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ কোরেছে। তাই এই সোপানগুলির পরস্পর সংযোগ ও কার্যকারিতা কিছুটা আলোচনা কোরে নেওয়া আবশ্যক।

"প্রস্তুতির স্তরটিই শিশুর আগ্রহসৃষ্টির দিক থেকে বিশেষ উপযোগী। এই স্তরে তার মনের পূর্বার্জিত জ্ঞানের উৎসকে জাগ্রত কোরে তোলা হবে। অনুরূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে তার অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগ্রত কোরে তুললে তবেই তাকে নূতন বিষয়ে জ্ঞানদান সার্থক হবে। পুরাতনের সঙ্গে নূতনের এই সংযোগস্থাপন বা অন্বয়ীকরণের ওপরেই শিক্ষাদানের সার্থকতা নির্ভর করে। এইভাবে শিশুর মনে পূর্ব-অভিজ্ঞতার স্মৃতি জাগ্রত কোরে আগ্রহবোধের সৃষ্টি কোরলে তার নূতন বিষয় আয়ত্তীকরণের ক্ষমতা জন্মাবে। তখন এই পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে তার কাছে নূতন বিষয়টিকে উপস্থাপিত কোরতে হবে।

প্রস্তুতি

এইভাবে পুরাতন ও নূতনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক থাকায় শিশুর কাছে আর নূতন বিষয় গ্রহণ করা অসুবিধাজনক হবে না। এই সংযোগসাধন শিক্ষাদান-কার্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বৈজ্ঞানিক মতে হার্বার্ট এইভাবে তাঁর শিক্ষানীতি মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত কোরেছেন, ছাত্রদের মনে শিক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত অবস্থার সৃষ্টি করা হবে প্রথম সোপান **প্রস্তুতির** মধ্য দিয়ে। তারপর তার কাছে নূতন বিষয়টি উপস্থাপিত করা হবে। এই **উপস্থাপনাও** সর্বতোভাবে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক। তারপর শিক্ষার্থী তার পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার আলোকে এই নবলব্ধ জ্ঞান তার কল্পনার

উপস্থাপন, সংযোগস্থাপন, সাধারণ সূত্রগঠন

সাহায্য গ্রহণ কোরবে এবং উভয়কে অন্বিত কোরে তুলবে। তার ফলে নূতন বিষয়টিও সে আয়ত্ত কোরে নিতে পারবে। শিক্ষা-পদ্ধতির এই তৃতীয় সোপানটির নাম দেওয়া হোয়েছে **সংযোগস্থাপন** (Association), হার্বার্টের মতে শিক্ষার চতুর্থ সোপান হল **সাধারণ সূত্রগঠন**, শিশু তার সাধারণ সূত্রকে স্বতন্ত্রভাবে বোঝবার চেষ্টা কোরবে। কোনও বিশেষ বিষয়ের মধ্য দিয়ে উদাহরণের সাহায্যে যে সাধারণ সূত্র শিক্ষা দেওয়া হোয়েছে, সেই সাধারণ সূত্রটিকে বিষয়-নিরপেক্ষভাবে স্বতন্ত্র কোরে এবার শিশু উপলব্ধি কোরতে শিখবে। এইভাবে শিশুর কল্পনা এবং ধারণাশক্তি বিকাশ লাভ কোরবে। সাধারণ সূত্রকে স্বীয় কল্পনার সাহায্যে যখন শিশু স্বতন্ত্রভাবে আয়ত্ত কোরে নিতে পারবে, তখন সে তাকে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত কোরে নিয়ে তার বহুধা প্রয়োগ কোরতে শিখবে। বিভিন্ন বিষয়ে এই সূত্র দেখবার ফলে শিশুর মনে সাধারণ সূত্র সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মাবে, তার সাহায্যে সে অনুরূপ অবস্থায় এই সূত্রের প্রয়োগ-কৌশল এবং তার ফল সম্পর্কেও ধারণা কোরে নিতে পারবে। বিভিন্ন অবস্থায় এই সূত্রের প্রয়োগের ফলে তার মনে ঐক্যবোধের সৃষ্টি হবে। হার্বার্ট **প্রয়োগকেই**

সাধারণ সূত্রের প্রয়োগ

(Method of Application) শিক্ষার শেষ সোপান বলে অভিহিত করেছেন। শিক্ষার্থী আবার এই সাধারণ সূত্রটিকে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অবস্থায় প্রয়োগ কোরবে। এই হোল হার্বার্টের উদ্ভাবিত শিক্ষা-পদ্ধতির শেষ সোপান। তিনি মনে করেন, **এই সোপানাশ্রয়ী পদ্ধতিতে শিক্ষাদানকার্যের জটিলতা হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য চরিত্রগঠন এবং ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশএর ফলে সম্ভব হবে।** (দেশ-বিদেশের শিক্ষাব্রতী, পৃঃ ৫৯-৬০)। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে হার্বার্টের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তথ্য সহজেই তত্ত্বে পরিণত হয় এবং তত্ত্ব গড়ে তোলে শিক্ষার্থীর চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব। **হার্বার্টের শিক্ষা-পদ্ধতির মূলকথা হচ্ছে শিক্ষার্থীর বহুমুখী আগ্রহ। অন্যান্য শিক্ষকের তো বটেই, বিশেষ কোরে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের এই বহুমুখী আগ্রহকে নিয়ে প্রতিপদে কাজ কোরতে**

শিক্ষার উৎপত্তি শিক্ষার্থীর বহুমুখী আগ্রহ

হয়। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষকের কাছে হার্বার্টের শিক্ষা-চিন্তা ও শিক্ষা-পদ্ধতির মূল্য অপরিসীম। আর সেই প্রয়োজনবোধেই হার্বার্টের তত্ত্ব ও পদ্ধতি

অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনার নিদর্শন আমরা অপর কোনো একটি অধ্যায়ে উপস্থিত কোরবো।

মন হচ্ছে শিক্ষার কর্মকেন্দ্র এবং মনোবিজ্ঞান হচ্ছে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের ভিত্তি। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে এবং তাকে শিক্ষাবিজ্ঞান হিসেবেই গ্রহণ কোরতে হবে। শিক্ষার আদর্শ, লক্ষ্য, তার কর্মক্ষেত্র ও কর্মপদ্ধতিকে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়েই তাকে পর্যবেক্ষণ ও বিচার কোরতে হবে। নতুবা তার সকল কর্মপ্রচেষ্টাই অঙ্কুরে বিফল হতে বাধ্য। **শিক্ষার্থীর মন এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানকে তিনি তার অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ কোরবেন, আধুনিক শিক্ষাদর্শের দ্বারা তিনি তার লক্ষ্য স্থির কোরবেন এবং সতত বিজ্ঞানী-সুলভ পর্যবেক্ষণ, মনন ও গবেষণা দ্বারা দৈনন্দিন কর্মধারা পরিচালনা কোরে তার স্থিরীকৃত লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা কোরবেন।** সমাজবিদ্যার শিক্ষকের ওপরে একটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে—তা হচ্ছে শিক্ষার্থীকে সমাজ ও তার বিভিন্ন শক্তিসমূহ সম্পর্কে সচেতন কোরে তোলা, শিক্ষার্থীর সমাজকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা, ব্যষ্টি ও সমষ্টির আদর্শগত পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ কোরে দেওয়া, সমাজবিবেক সৃষ্টি করা, বর্তমান গতি-প্রকৃতি বুঝে তার সাথে সামঞ্জস্যবিধানের শক্তি অর্জন করা ও শিক্ষার্থীর সুসমন্বিত কল্যাণকর চরিত্র গড়ে তোলা। এর জন্যে যেমন শিক্ষকের শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা চাই, তেমনি সমাজ সম্পর্কে তার চিন্তা বিজ্ঞানীসুলভ পরিচ্ছন্ন, যুক্তিনিষ্ঠ ও তথ্য-নির্ভর হওয়া চাই। সমাজ-বিশ্লেষণেও তার দৃষ্টিভঙ্গী হবে বৈজ্ঞানিক। একাজ খুব সহজসাধ্য, একথা মনে কোরলে ভুল করা হবে। আমাদের নিজেদেরই মনের আঁধারে যে কত অন্ধ বিশ্বাস, ভুল ধারণা, মিথ্যা সংস্কার প্রভৃতি জড়িয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। বিশেষ কোরে অনেককাল ধরে আমাদের মন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-পরাঙ্মুখ ছিল এবং তা নানা কুসংস্কারের আগাছায় অবাধে পূর্ণ হয়ে ছিল। আজ তার মূলোচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে এবং আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক জীবনের গোড়াপত্তন চলেছে। কাজটা মোটেই সহজসাধ্য নয় এবং আমাদের মন থেকে বহু মিথ্যা ও ভ্রান্ত সংস্কারকে তাড়ানোটাও সহজ হচ্ছে না। তারপরে ভারতবর্ষ আবার বহু জাতি, বহু শ্রেণী, বহু ধর্মসম্প্রদায় ও বিভিন্ন উন্নত ও অনুন্নত স্তরের মানবমণ্ডলীর আবাসভূমি। ভাষা, পোশাক, খাদ্য, আচার-ব্যবহার, সামাজিক রীতিনীতিতে তাদের কতই না পার্থক্য। এগুলি আমাদের মনে বিভিন্ন যুগে কত না ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি কোরে এসেছে, আজও কোরছে। এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরে মানবসমাজের মৌলিক ঐক্যকে উপলব্ধি কোরতে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তা

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের অবলম্বন

তার একটি প্রত্যক্ষ দায়িত্ব

আমাদের বিশেষ সমস্যা

সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যকতা

ও দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই অবলম্বন কোরতে হবে। যিনি নিজে সংস্কারের অন্ধ-কূপে বাস করেন এবং যুক্তিনিষ্ঠ তত্ত্বকে মাত্র প্রবল বিশ্বাস নিয়ে নস্যাৎ কোরতে চান, তিনি কখনই সমাজবিদ্যার শিক্ষক হতে পারেন না। **আমাদের কাজ হচ্ছে মন, তথ্য, যুক্তি এবং তাদেরই ওপর নির্ভর কোরে গঠিত তত্ত্ব নিয়ে আর তাদেরই সাহায্যে গঠিত হবে শিক্ষার্থীর চরিত্র, যে শিক্ষার্থী সমাজবিদ্যার শিক্ষকের হাতে সমাজ-বিবেক ও উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ও কল্যাণ-কর্মনিষ্ঠ হয়ে উঠবে।** যার নিজের মনের মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের খোঁটা, বিভেদবুদ্ধির প্রবণতা, স্বার্থের উগ্রচেতনা ও কলহপ্রিয়তা অতিমাত্রায় বর্তমান, তিনি কখনই সমাজবিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষক বলে বিবেচিত হতে পারেন না। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণের দ্বারাই শিক্ষার্থী বেশী শিক্ষালাভ করে, তাই এমন শিক্ষকের সংস্পর্শে শিক্ষার্থীদের মন বৈজ্ঞানিক চেতনামুখী ও মানবদরদসম্পন্ন হবার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হবে। আজ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বসমাজের গঠনের দিন। সেখানে মধ্যযুগীয় বিভেদপ্রবণ মন অচল। শিক্ষক হিসেবে তার অভিভাবকত্ব আরও বিড়ম্বনাকর ও বহু প্রতিবন্ধকতা-সৃষ্টিকারক। তাই "যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি"কে আমাদের সমাজবিদ্যায় শিক্ষকের আসন না পেলেও **বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন, মোটামুটি সচ্চরিত্র আদর্শনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে আমরা সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক হিসেবে পেতে চাই,** এরূপ দাবি নিসংশয়ে উপস্থিত করা যেতে পারে। আমাদের সমাজে তথ্য ও যুক্তি-নির্ভর চিন্তা অপেক্ষা কল্পনা ও সংস্কারের চাষ বড় বেশী, তাই আমাদের সমাজবিদ্যার শিক্ষক-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সতর্ক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আর এরূপ শিক্ষকের কর্তব্যও অতিশয় কঠোর, গুরুদায়িত্বপূর্ণ ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা আশা কোরবো, আমাদের সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণ তাঁদের সামনে উপস্থিত এই চ্যালেঞ্জ সাফল্যের সাথেই গ্রহণ কোরতে পারবেন এবং নিজের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপন কোরে আমাদের জাতীয় সমাজ-গঠনে তাদের অগ্রণী-ভূমিকা পালন কোরবেন। পরোক্ষভাবে এটা বিশ্বসমাজ-গঠনেরও মূল্যবান্ সহায়ক হবে।

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের মন, চিন্তা ও চরিত্র

সমাজবিদ্যা একটা স্থির জ্ঞান-সমষ্টি নয়, নিত্য এর চর্চা, অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন। সমাজ গতিশীল, সমাজবিদ্যাও তাই নিয়ত পরিবর্তনশীল। **সমাজবিদ্যার শিক্ষকও তাই আজীবন শিক্ষার্থী।** একটা শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু চলিষ্ণু মন না থাকলে সমাজসম্পর্কে সর্বাধুনিক তথ্য জানা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষাদানের সময়ে নতুন নতুন দিক থেকে আলোকসম্পাত করা এবং তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের আগ্রহকে বর্ধিত কোরে তোলা সম্ভব হয় না। নিজের শিক্ষাদান-পদ্ধতিকেও উন্নত করা সম্ভব হয় না। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে নিত্য-প্রবহমান জ্ঞানস্রোতের মধ্যে বাস কোরতে হবে, এবং তার দ্বারা নিজের শিক্ষাদানের ক্ষমতা ও দক্ষতাকে পূর্ণমাত্রায় নিয়ত বজায় রাখতে

নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজের জ্ঞান-আহরণ প্রয়োজন

হবে। এতে যেমন তথ্য ও তত্ত্বরাজির ওপরে তার অধিকার জন্মায়, তেমনি স্বনির্ভরতার বোধটিও তার মধ্যে সর্বদা জাগ্রত থাকে। এই স্বনির্ভরতার বোধটি না থাকলে কোন শিক্ষকই স্বচ্ছন্দে তার বিষয়ে শিক্ষাদান কোরতে ও তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সম্যক্‌ভাবে পালন কোরতে পারেন না। জ্ঞান-প্রবাহের সাথে নিত্যসংযোগ রাখবার জন্য সমাজবিদ্যার শিক্ষককে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, বা অন্য কোন প্রকার সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ভ্রমণ করা দরকার। বস্তুতঃ ভ্রমণের দ্বারা বহু অঞ্চলের মানুষ ও তাদের সম্পর্কিত বহু বিষয় সম্বন্ধে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে তা শিক্ষকমহাশয় পরম মূল্যবান সহায়ক উপকরণ হিসেবে ব্যবহার কোরতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও এরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ শুনতে সর্বদাই প্রস্তুত। এছাড়া বিভিন্ন মেলা, চিত্রকলা ও শিল্পপ্রদর্শনী, কলকারখানা প্রভৃতি মাঝে মাঝে দেখতে যাওয়া সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের বেশ প্রয়োজন। এর দ্বারা তাঁর সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডার যেমন বাড়ে, তেমনই শিক্ষাদানের সময় বহু উদাহরণও তিনি এইসব বিষয় থেকে সহজে উপস্থিত কোরতে পারেন। বস্তুতঃ ভ্রমণ ও অন্যান্য সহায়ক কাজের দ্বারা মানুষ ও তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জন্মে, তাঁর দ্বারা তার শিক্ষাদান সরস ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

সমাজবিদ্যার শিক্ষকদের একটা নিজস্ব সংগঠন থাকা আবশ্যক। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি সংগঠন আছে। প্রত্যেক সমাজবিদ্যার শিক্ষককে এই সংগঠনের সদস্য হওয়া কর্তব্য এবং তার সভাদিতে যোগদান কোরে নিজেদের পঠন-পাঠনের ও অন্যান্য কার্যাবলীর সমস্যাসমূহ ভালভাবে আলোচনা করা, নিজেদের বিষয়ের ওপর নতুন অনুসন্ধান-লব্ধ জ্ঞান ও গবেষণার সাথে পরিচিত হওয়া দরকার। সমাজের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ঐতিহাসিক বিষয়াদি, নৃতাত্ত্বিক ও অন্য নানাবিধ সামাজিক বিষয় ও সমস্যা নিয়ে যেসব পত্র-পত্রিকা আলোচনা কোরে থাকে, সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক তার অন্ততঃ দু'একটির গ্রাহক হবেন। বিদ্যালয় নিজেও এই ধরনের একাধিক পত্র-পত্রিকার গ্রাহক হবে—সে ব্যবস্থা সমাজবিদ্যার শিক্ষককেই কোরতে হবে। তা ছাড়া শিক্ষকমহাশয় নিজের বিষয়ে একটি ছোটখাট গ্রন্থাগারও তাঁর নিজের বাড়ীতে গড়ে তুলবেন। বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যার গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা আমরা আগেই বলেছি। কি বিদ্যালয়, কি গৃহে এইভাবে শিক্ষকমহাশয় সর্বদাই জ্ঞানস্রোতে নিমগ্ন থাকতে পারেন এবং নিজের জ্ঞানের গভীরতা ও চিন্তার স্বচ্ছতা থেকে শিক্ষার্থীদের সহজ ও সরল পন্থায় স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল ভাবে শিক্ষা দিতে পারেন। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের আত্ম-সমালোচনাও একটি অপরিহার্য গুণ। তিনি তাঁর দক্ষতা কতখানি বজায় রাখতে পারছেন, নিয়ত

নিয়ত আলোচনা অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রয়োজন

পত্র-পত্রিকায় গ্রাহক হতে হবে

গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা

পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে তিনি তাঁর শিক্ষাধারাকে কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন, তা প্রতিনিয়তই তাঁর একটা বিচার্য বিষয়। এ বিষয়ে অন্য অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও শিক্ষকদের সমালোচনাও তাঁকে প্রসন্নমনে গ্রহণ কোরতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনবোধে এরূপ সমালোচনাকে তিনি সাদরে স্বাগত জানাবেন।

প্রয়োজনীয় সমালোচনা

সমাজবিদ্যা হচ্ছে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষা (experiential learning)। এখানে আচরণের মূল্য কি তা আমরা আগেই আলোচনা কোরেছি। কর্ম ও আচরণের মাধ্যমেই গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত হয়। এই কাজে শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলির দান বড় কম নয়। "শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ" অধ্যায়ে আমরা তা আগেই আলোচনা কোরেছি। সমাজবিদ্যার শিক্ষকমহাশয়কে এই সকল আধুনিক শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারে কুশলী হতে হবে এবং তা যথার্থ শিক্ষাপ্রদভাবে তিনি ব্যবহার কোরবেন। এই সকল ব্যবহার-বিধি নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। তবু Taneja সাহেবের কতকগুলো কথা খুব কাজে লাগবে বলেই এখানে উদ্ধৃত কোরে দিলাম—An intelligent and profitabe use of teaching aids will result from teacher's posing himself the questions—Is this material accurate? Uptodate? Does it contribute meaningful content to the unit under study? Is it appropriate for the age, intelligence and backgrund of the learners? Will it arouse the critical sense of children?" (*Teaching of Social Studies, p. 165*)

সমাজবিদ্যার শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষা-উপকরণ ব্যবহারে কুশলী হতে হবে

তাছাড়া শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি কিভাবে কেনা যায় ও সংরক্ষণ করা যায় তাও সমাজবিদ্যার শিক্ষককে জানতে হবে। **সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কাজটা বড় কঠিন। তাকে একসাথে অভিন্ন কোরে ঐতিহাসিকের ইতিহাস, ভৌগোলিকের ভূগোল, অর্থনীতিজ্ঞের অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতিজ্ঞের রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিদের সমাজতত্ত্ব শিক্ষাদান কোরতে হবে।** তাই শিক্ষাদান-ক্ষেত্রে তাঁর বহুল বিবেচনা কোরতে হয় এবং বহু প্রকার শিক্ষা-উপকরণও ব্যবহার কোরতে হয়। সে সকলের "সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার তাই তার অবশ্য জ্ঞাতব্য।"

এবারে আর কতকগুলো গুণের কথা উল্লেখ কোরবো। এগুলো সকল শিক্ষকেরই থাকা চাই, সমাজবিদ্যার শিক্ষকেরও থাকা চাই। শিক্ষকমহাশয় নিয়মিত শিক্ষার্থীদের আচরণ লক্ষ্য কোরবেন। শিক্ষাকে আমরা আগেই "বহুমুখী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার" ব্যাপার বলে উল্লেখ কোরেছি। কারণ শিক্ষালয় সমাজের অঙ্গ এবং নিজেও একটি সমাজ। মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তিগুলি তাই এখানে স্বভাবতঃই ক্রিয়াশীল। **অনুভাবন, সহানুভূতি ও অনুকরণের ক্রিয়া এখানে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।**

তাই শিক্ষকমহাশয়কে নিজের আচরণ সম্পর্কে যেমন এখানে সতর্ক হতে হবে, তেমনি শিক্ষার্থীদের আচরণ ও তার বিকাশধারার প্রতি তাঁকে সর্বদা সযত্ন দৃষ্টি রাখতে হবে। বিদ্যালয় একই সাথে স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সমাজ। এই উক্তির তাৎপর্য সমাজবিদ্যার শিক্ষক কোনো সময়েই বিস্মৃত হতে পারবেন না, এই সমাজে সমষ্টি ও ব্যষ্টির কল্যাণকর বিকাশ দুই-ই তাকে এক সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে; আর তারই ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কাজের মূল্যায়নও শিক্ষকমহাশয়কে কোরতে হবে। তিনি তার রেকর্ড রাখবেন এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ক্রমিক উন্নতির চার্ট অঙ্কন কোরবেন। এপ্রসঙ্গে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে আলোচনা কোরবেন। তবে শিক্ষকের এটি একটি নিয়মিত কর্তব্য, এখানে এই কথাটুকু বলে রাখতে চাই।

শিক্ষার্থীর আচরণের অবকাশ লক্ষ্য কোরতে হবে

পাঠ ও কর্মে নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা-সাফল্যের একটি বড় অঙ্গ। এই নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষকের পক্ষেও থাকা চাই, শিক্ষার্থীদেরও অর্জন করা চাই। তাই শ্রেণীকক্ষে বা কর্মশালায় শিক্ষার্থীরা যাতে আপন আগ্রহের বশে নিয়মিত উপস্থিত হয়, শিক্ষকমহাশয় তেমন ব্যবস্থা কোরতে সর্বদাই প্রয়াসী হবেন। জোর কোরে কাউকে কিছু শেখানো যায় না একথা ঠিক, কিন্তু শিক্ষা-পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করা যায় এটি একটি অবধারিত সত্য। এ প্রসঙ্গে আমরা আগেও উল্লেখ কোরেছি। শিক্ষকমহাশয়কে বুদ্ধিমান ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন (ইংরাজীতে এককথায় যাকে বলে resourceful) হতে হবে, শিক্ষার্থীদের সকল অসুবিধায় তিনি যেন সাহায্য ও সহযোগিতার হস্ত প্রসারণ কোরতে পারেন। তবে কোন সময়েই তিনি শিক্ষার্থীদের কাজ নিজে হাতে কোরে দেবেন না। এখানে তার সংযম থাকা চাই। তিনি কতটা সাহায্য কোরবেন এবং কতটা কোরবেন না—তার ভেদরেখা তাঁর নিজেকেই টানতে হবে এবং সে কাজে বিশেষ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রয়োজন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমাজবিদ্যার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দেবেন সহকর্মীর মর্যাদা। অথচ তাদের প্রতি তাঁর মনোভাব হবে আপন পুত্রের প্রতি মনোভাবের অনুরূপ। শিক্ষার্থীদের জন্য পুত্রবৎ স্নেহ এবং প্রভূত সহানুভূতি তার মনে সর্বদাই সঞ্চিত থাকবে। এখানে কোনদিন অনটন দেখা দিলেই শিক্ষকতা-কার্যের একটি মৌলিক প্রয়োজনের অপহ্নব ঘটে, একথা কোনো শিক্ষকই কোনো কালে বিস্মৃত হতে পারেন না। একটা অত্যন্ত পরিতাপের কথা এই যে, আমাদের অনেক শিক্ষক অনেক শিক্ষার্থীদের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব ও বিরূপতা পোষণ কোরতে থাকেন এবং তা প্রকাশও কোরে থাকেন—এ যে কত বড় ক্ষতিকর তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীই সমাজের দরিদ্রতম অংশ থেকে আসে, তাদের অভিভাবকেরা

পাঠ ও কর্মে নিয়মানুবর্তিতা

শিক্ষার্থীদের সাহায্যদান

শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁর দরদী মনোভাব

অনেকেই নিরক্ষর, দু-সন্ধ্যা আহার জোটাতে অসমর্থ। শিক্ষার আগ্রহে এবং নানা সরকারী কল্যাণ-প্রচেষ্টায় এমন পরিবার থেকেও বহু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে ভিড় কোরছে। তাদের প্রতি বিরূপতা ও তাচ্ছিল্যের ভাব আমাদের সমাজের একটা ব্যাধি, সেই ব্যাধিতে আমাদের অনেক শিক্ষকও আক্রান্ত। কিন্তু এই ব্যাধিকে কোনোক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। প্রত্যেক শিক্ষকই নিজের মনকে এরূপ ব্যাধি থেকে মুক্ত কোরবেন এবং বিদ্যালয়-পরিবেশ যাতে এর কলুষমুক্ত হয় তার চেষ্টা কোরবেন। সমাজবিদ্যার শিক্ষক এ বিষয়ে সর্বপ্রকার প্রযত্ন গ্রহণ কোরবেন, তিনি নিজে কখনও এই প্রকার বিরূপতা ও তাচ্ছিল্য পোষণ কোরবেন না এবং কখনই বিদ্যালয়সমাজে এ প্রকার অবস্থা বরদাস্ত কোরবেন না। বরং সমাজের দরিদ্রতর ও অনুন্নত অংশ থেকে আজ যারা শিক্ষা গ্রহণ কোরতে আসছে, তাদের তিনি সর্বপ্রকার উৎসাহ দান কোরবেন, তাদের পিছিয়ে থাকা অবস্থার প্রতিকার কোরতে তাদের উৎসাহ দান কোরবেন এবং শিক্ষালয়-সমাজের মঙ্গলস্পর্শে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধানের কলুষ যাতে দূর হয় এবং সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও সমমর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা কোরবেন। গণতান্ত্রিক সমাজের সাফল্যের এটি একটি প্রধান শর্ত, সমাজবিদ্যার শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকেরা একথাটা যেন কখনও ভুলে না যান। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাক্ষেত্রে যারা পশ্চাৎপদ, শিক্ষকমহাশয় প্রয়োজনবোধে তাদের সাহায্য কোরবেন। এমনকি হাতে-কলমে কাজ কোরে তাদের দেখিয়েও দেবেন। পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে তিনি তাদের সেই কাজে অভ্যস্ত কোরে তুলবেন। **এককথায়, ধৈর্য, অধ্যবসায়, নিষ্ঠা, পরিশ্রম, বুদ্ধি, সহানুভূতি, মমত্ব-বোধ, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সংযম, বিনয়, জ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষকমহাশয়ের চরিত্রের ভূষণ হওয়া আবশ্যক**। তবে কথা হচ্ছে এই, অর্ডারমাফিক বিধাতার দোকান থেকে শিক্ষক তৈরী কোরে আনা যায় না। বিধাতার দোকান থেকে জন্মসূত্রে স্বল্পসংখ্যক যে দুই-একজনকে পাওয়া যায়, শিক্ষা-বুভুক্ষু আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা তাতে মেটে না। সমাজের পণ্যশালাতে যে সকল মানুষকে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদেরই বাছাই কোরে নিয়ে শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত কোরতে হবে। সরকার ও বর্তমান সমাজের অভিভাবকগণকে এমন অবস্থার সৃষ্টি কোরতে হবে যাতে শিক্ষকতা-কার্যে এই উৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণ যোগদান কোরতে অগ্রণী হন, শিক্ষাদানে আনন্দ পান এবং একাজে নিজেদের সাধ্য ও শ্রমকে সর্বপ্রযত্নে প্রয়োগ করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, স্বাধীনতালাভের ষোড়শ বৎসরেও শিক্ষকতা একটি দরিদ্র বৃত্তি এবং সমাজের প্রতিভাবান ও চরিত্র-সম্পদে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা এখনও এদিকে তেমন আকৃষ্ট হচ্ছেন না। একটা জাতির উন্নতির পক্ষে এটা একটি অন্তরায়কর অবস্থা। বর্তমানে যাঁরা শিক্ষাকার্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁদেরও গুণগত যোগ্যতা ও কর্মগত দক্ষতা-বৃদ্ধির পথে

একটি সামাজিক ব্যাধি

এ ব্যাধির প্রতিকার

শিক্ষকের চরিত্রের আবশ্যক গুণগুলি

একটি অন্তরায়কর অবস্থা

এটি সমান অন্তরায়-সৃষ্টিকারী অবস্থা। আমাদের বর্তমান শিক্ষকসমাজের প্রতি মুদালিয়র কমিশন অকুণ্ঠভাবেই আস্থা প্রকাশ কোরেছেন। তাদের যদি বিস্তৃততর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, তবে শিক্ষাজগতের বর্তমান সমস্যার বিশেষ সুরাহা হবে একথা বেশ জোরের সাথেই বলা যায়। সমাজবিদ্যার শিক্ষক একাধারে গবেষক ও কর্মী, তার জন্যে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ব্যাপক ও অনুকূল কর্মক্ষেত্র এবং প্রকৃত সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই চাই। এ বিষয়ে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ এবং তাদেরকে সাহায্যকারী সরকারী ও আধা-সরকারী যে সকল সংস্থা আছে তাদের দায়িত্ব সমধিক। তাঁরা যদি বিদ্যালয়ে অনুকূল কর্মক্ষেত্র এবং আর্থিক ও অন্যপ্রকার সাহায্য দান না করেন, তবে সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কর্তব্য সম্পর্কে আমরা যত বড় বড় কথাই লিখি না কেন, তা অনেক পরিমাণে বাধাগ্রস্ত হতে বাধ্য এবং সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের বহু প্রযত্নও অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যাবে। বস্তুত এমন ঘটনা আমাদের প্রচলিত বিদ্যালয়সমূহে হামেশাই ঘটছে ; এই অবস্থার প্রতিকার হওয়াও একান্ত আবশ্যক বলে আমার বর্তমান বক্তব্যের উপসংহার কোরছি। **জন্মসূত্রে তৈরী শিক্ষকের আমরা বেশী পেতে পারি না, সমাজের সাধারণ জনভাণ্ডার থেকেই আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক সংগ্রহ কোরতে হবে। কিন্তু সমাজের পরিবেশটাও যেন উপযুক্ত শিক্ষক-সৃষ্টির অনুকূল হয় এবং শিক্ষকদের কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধাও যেন উপযুক্ত চরিত্রবান ও দক্ষ শিক্ষক-সৃষ্টির সহায়ক হয়।** বর্তমান সমাজের সরকারী ও বেসরকারী অভিভাবকবর্গকে সে দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে। নতুবা তাঁদের সাধের গণতন্ত্রের সৌধ গড়ে তোলার চেষ্টার মূলেই গলদ থেকে যাবে, সেকথা বলাই বাহুল্য।

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কাজের অনুকূল অবস্থা চাই

উপযুক্ত শিক্ষক-সৃষ্টির অনুকূল সামাজিক পরিবেশ চাই

স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও আমরা বিদেশী-প্রবর্তিত শিক্ষাধারার জের টেনে চলেছি। হয়ত আরও অনেকদিন এর অনুবর্তন চলবে। সেইজন্যেই এর অভাব ও বিপদ সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সচেতন থাকা দরকার। আমরা তত্ত্বকথার আলোচনা এত ভালবাসি যে আমাদের ভাণ্ডারে আদপে কি আছে, কি নেই, তার খোঁজ তত রাখিনে। আর বিদেশীদের বুলি এত কপচাই যে দেশী বিজ্ঞজনের কথা আমাদের কানে উঠতেই চায় না। খাস রবিঠাকুরও অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু আমরা তাঁকে যত পূজা করি, তাঁর কথাকে তত আমল দিই না। কিন্তু সমাজবিদ্যার শিক্ষক তো এমন মনোভাবকে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দিতে পারেন না ; তাছাড়া stock-taking অর্থাৎ ভাঁড়ারের খোঁজ নেওয়া তাঁর একটি প্রধান কর্তব্য। আমাদের শিক্ষাজগতের প্রতিকূল স্রোতগুলি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত থাকতেই হবে। তাই তাঁদের সর্বদা বিবেচনার জন্য রবীন্দ্রনাথের "শিক্ষার হেরফের" থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত কোরে দিলাম। সমাজশিক্ষা-শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সম্পর্কে আমরা

আমাদের সমাজ ও শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ

আগে যা বলেছি, আলোচ্য অংশটুকু তার উপরে যথেষ্ট আলোকপাত কোরবে, এই ভরসা করি :—

"যখন আমরা একবার ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখি যে, আমরা যেভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার আনুপাতিক নহে, আমরা যে গৃহে আমৃত্যু বাস করিব, সে গৃহের উন্নতি-চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই, যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জন্মযাপন করিতেই হইবে সেই সমাজের কোনো উচ্চ আদর্শ, আমাদের পিতামাতা—আমাদের সুহৃদ-বন্ধু—আমাদের ভ্রাতা-ভগিনীকে তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ দেখি না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপ তাহার বর্ণনার মধ্যে কোনো স্থান পায় না, আমাদের আকাশ এবং দেশলক্ষ্মী স্রোতস্বিনীর কোনো সংগীত তাহার মধ্যে ধ্বনিত হয় না, তখন বুঝিতে পারি, আমাদের শিক্ষার সহিত আমাদের জীবনের তেমন নিবিড় মিলন হইবার কোনো স্বাভাবিক সম্ভাবনা নাই ; উভয়ের মাঝখানে একটা ব্যবধান থাকিবেই ; আমাদের শিক্ষা হইতে আমাদের জীবনের সমস্ত আবশ্যক অভাবের পূরণ হইতে পারিবেই না। আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে ; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থজগৎ একদিকে আর তাহাদের বসতিজগৎ অন্য প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। **তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পায় না।**

শিক্ষার সহিত জীবনের ব্যবধান

বিদ্যা ও ব্যবহারের মধ্যে ব্যবধান

আমাদের শিক্ষাকে আমরা যতই অশ্রদ্ধা করিতে থাকি, আমাদের শিক্ষাও আমাদের জীবনের প্রতি ততই বিমুখ হইতে থাকে। **আমাদের চরিত্রের উপর তাহার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।** এইরূপে আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে, প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসার-যাত্রা দুই-ই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।

"এইরূপে জীবনের এক-তৃতীয়াংশ কাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরকাল আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব ?

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্যসাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" (শিক্ষা, পৃঃ ১৫-১৬)

সমাজবিদ্যার শিক্ষক কাজের ক্ষেত্রে এই বক্তব্যকেই মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, তার প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই ধ্বনিত করি—

"আমাদেরও সেই প্রার্থনা। আমাদের হেরফের ঘুচিলেই আমরা চরিতার্থ হই। শীতের সহিত শীতবস্ত্র, গ্রীষ্মের সহিত গ্রীষ্মবস্ত্র, কেবল একত্র করিতে পারিতেছি না বলিয়াই আমাদের এত দৈন্য; নহিলে আছে সকলই। এখন আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও। আমরা আছি যেন—

পানীমে মীন পিয়াসী
শুনত শুনত লাগে হাসি।

আমাদের পানিও আছে পিয়াসও আছে দেখিয়া পৃথিবীর লোক হাসিতেছে এবং আমাদের চক্ষে অশ্রু আসিতেছে, কেবল আমরা পান করিতে পারিতেছি না।"

(শিক্ষা, পৃঃ ২১-২২)

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন শিক্ষার সহিত জীবনকে একত্র কারয়া দেন। তাহা হইলেই দেশবাসী তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন।

Questions

1. Rules of Social life are learnt by actullay living in the society. How will, then, Social Studies teacher organise the school society to train up the educands for social life ?

2. The school society is at the same time a natural and an artificial society. What is the special significance of this statement to the Social Studies teacher ? How will he help other members of the staff to free themselves of prejudices prevailing in the poesent society.

3. Why and how will the Social Studies teacher help other teachers of the school in their co-curricular activities ?

4. Our prayer to the Secial Studies teacher is that he should link our life with our education—describe the significance of this prayer in the light of the background of our present education. How will the Social Studies teacher link our education ?

5. After all, Social Studies teacher is a human being. We must not forget this when we place our many demands on him. What are these "many demands" ? What should be our practical expectations from him ?

6. School and other educational authorities have to do much to create a congenial condition for the Social Studies teacher to work in. Discuss.

7. Duties are reciprocal Society and educational authorities should expect as much from the Social Studies teacher as they give to him. On the other hand, he should prove his efficiency to draw the better attention of the society towards him. Discuss.

8. Discipline is the part and parcel of human life. What are its constituents, you suppose ? How will Social Studies teacher foster it among his charges ?

9. Discipline is a positive conception.—Discuss.

10. Modern democracy is underlined by discipline—Discuss. What is the importance of Herbartian doctrine to the Social Studies teacher ? How does fact become faculty and promote character ?

11. "Those only wield the full power of education who know how to cultivate in the youthful soul a large circle of thought closely connected in all its parts." Discuss the statement, explaining its full signi-ficanc and describe the duties of the Social Studies teacher to "wield the full power of education."

12. Describe the importance of planning the lessons according to Herbartian method. What is its special significance to the Social Studies teacher ?

দ্বাদশ অধ্যায়

সমাজবিত্থার শিক্ষক

The Teacher of the Social Studies

শিক্ষকের ভূমিকা

সমাজবিত্থা শিক্ষাদানের লক্ষ্য, আদর্শ, ধ্যান-ধারণা, উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে যা কিছু আমরা ইতিপূর্বে বলে এসেছি, তা সকলই বাস্তবে প্রয়োগ কোরে বাস্তব ফললাভের ব্যবস্থা কোরবেন সমাজবিত্থার শিক্ষকগণ। শিক্ষক নূতন ধ্যান-ধারণা, পদ্ধতি-প্রকরণ নূতন ভাবাদর্শে ও চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং নব-কর্মপ্রকরণে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ছাড়া প্রয়োগ সম্ভব নয়। পুরনো ধারায় "মুখস্থ রিত্থা"ই ছিল সব, তাই পড়ানো ব্যাপারটাও খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সহযোগমূলক ক্রিয়া, শিক্ষকের পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের পরিকল্পিত ও তাদের দ্বারা গড়ে তোলা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিবেশ। এখানে চাই নব-চেতনা-সম্পন্ন শিক্ষক, যাঁর ব্যক্তিত্ব, শিক্ষা-পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, কর্মসমূহ পরিচালনার দক্ষতা ও কৌশল সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াকে জীবন্ত ও অর্থবহ কোরে তুলবে। বস্তুতঃ সমস্ত শিক্ষা-প্রকল্পের সার্থকতা বা ব্যর্থতা শিক্ষকের ওপরেই নির্ভর করে। তিনিই হচ্ছেন শিক্ষাগারের প্রাণ। ("...the key to the success or failure of the whole project of education is the teacher himself. The teacher is the soul of the school"—*Bining and Bining. "Teaching the Social Studies in Secondary Sohools"*)

নব-চেতনাসম্পন্ন শিক্ষক চাই

তিনিই বিত্থালয়ের প্রাণ

এই নব চিন্তা ও চেতনা-সম্পন্ন শিক্ষক বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি? এই শিক্ষকের কাজ বর্তমান জটিল জগৎসংসার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত কোরে তোলা, এ বিষয়ে যথোপযুক্ত জ্ঞান দেওয়া, বুদ্ধিমান নাগরিক এবং কুশলী কর্মী হতে সাহায্য করা। তাই যদি হয়, তবে সমাজবিত্থার শিক্ষককে উন্নত গুণসম্পন্ন এবং সুশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে, এ কথাটা সর্বাগ্রে উল্লেখ কোরতে হয়। এর সাথে নিজের শিক্ষাদানের বিষয়গুলিতে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, সব অবস্থার জন্যে প্রস্তুত থাকা চাই, বিবেকবান ও এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হওয়া চাই যাতে তাঁর সহকর্মী শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীরা তাঁকে সহজেই শ্রদ্ধা কোরতে পারেন। তাঁর কাজ যৌথ ও ব্যক্তিগত জীবনের উপযুক্ত বিকাশ সাধন করা, সেই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের আচরণ, আদর্শ এবং মূল্যবোধের

শিক্ষক হবেন উন্নত গুণসম্পন্ন ও সুশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং সৃজনশীল

বিকাশ করা ; গণতন্ত্রের সাফল্য ও সমৃদ্ধি তাঁরই ওপর নির্ভর করে, কারণ উপযুক্ত নাগরিক তিনিই সৃষ্টি কোরবেন। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সমাজবিদ্যার শিক্ষক নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্কতা থাকা প্রয়োজন এবং যিনি এই শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ কোরবেন, তাঁকে তাঁর গুরুতর কর্তব্য স্মরণ রেখে প্রতিনিয়ত নিজের গুণাবলী এবং কর্মদক্ষতার বিকাশ কোরে যেতে হবে। তিনি হবেন একজন সৃজনশীল শিক্ষক। তিনি তাঁর নিজের সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত থাকবেন ঃ—

(১) **তাঁর কাজ,** (২) **তাঁর পেশাগত ও বিষয়গত জ্ঞান ও দক্ষতা,** (৩) **তাঁর মনোভাব,** (৪) **পরীক্ষামূলক কাজে ও জ্ঞানচর্চায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা,** এবং (৫) **নিজের কাজে তাঁর সদা-সচেতন আগ্রহ।**

(১) তাঁর কাজ

তাঁর কাজ হচ্ছে অনেক, বৈচিত্র্যময় এবং দায়িত্বপূর্ণ। তিনি জ্ঞান দান করেন, সমাজ-সংক্রান্ত অনুসন্ধান পরিচালনা করেন, শিক্ষার্থীদের সংগৃহীত তথ্যাদি বাছ-বিচার করেন, তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবন-গঠন সম্পর্কে উপদেশ দান করেন এবং সর্বদা তাঁদের পরিচালক, দার্শনিক এবং বন্ধু (guide, philosopher and friend) হিসেবে কাজ করেন। তিনি হচ্ছেন শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের সমাজ-পরিবেশের ব্যাখ্যাতা এবং সেই সমাজে তাদের উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণের যোগ্যতা-অর্জনের সহায়ক। সমাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিস্ময়, কৌতূহল ও আগ্রহ তিনি সৃষ্টি কোরবেন। তিনি তাদের মধ্যে কাম্য আচরণ, দক্ষতা ও জ্ঞানবিকাশের জন্য সর্বদা সকল প্রকার চেষ্টা কোরবেন। সর্বাধুনিক সামাজিক জ্ঞান ও দক্ষতা আয়ত্ত কোরতে তিনি শিক্ষার্থীদের সাহায্য কোরবেন। তাছাড়া যেহেতু সমাজবিদ্যা সমাজ সম্পর্কে একটি অখণ্ড পাঠ (integrated course), অতএব তাঁকে সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্যগুলিকে একাঙ্গীভূত পদ্ধতিতে বিন্যাসের এবং তা একটি অখণ্ড চেহারায় শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের ক্ষমতা তাঁর থাকা চাই। ঐতিহাসিকের ইতিহাস, ভৌগোলিকের ভূগোল, অর্থনীতিজ্ঞের অর্থনীতি, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানীর রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞানীর সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি মানব-সম্পর্ককে কেন্দ্র কোরে তাঁর চোখে একীভূত হয়ে উঠবে এবং তিনি শিক্ষার্থীর বয়স, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতা বিচার কোরে তাদের সামর্থ্যানুযায়ী সেগুলিকে নানা কর্ম ও তথ্যের মধ্য দিয়ে অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ কোরে উপস্থিত কোরবেন। একাজ কোরতে হোলে তাঁকে শুধু শিক্ষক হলেই চলবে না। উপযুক্ত মানবিক গুণসম্পন্নও হতে হবে। এজন্যে "সমাজবিদ্যার শিক্ষককে শিক্ষক হবার আগে একজন পুরো মানুষ হতে হবে এবং গ্রন্থ ও অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে তাঁকে জ্ঞান ও প্রেরণা আহরণ কোরতে হবে। তিনি বহু ক্ষেত্রে কাজ কোরবেন এবং বহু রকমের মানুষের বন্ধু

তিনি সমাজ-পরিবেশের ব্যাখ্যাতা ও শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা-অর্জনের সহায়ক

তিনি উপযুক্ত মানবিক গুণসম্পন্ন হবেন

হবেন, সকল বিদ্বেষমুক্ত হবেন এবং ক্রিয়াশীল সমাজবিবেকের অধিকারী হবেন।"
(K. Nessiah. "Social Studies in the School.")

(২) তাঁর পেশাগত ও বিষয়গত জ্ঞান ও দক্ষতা

শিক্ষক যে বিষয় বা বিষয়াবলী পড়াবেন, তাতে তার সবিশেষ জ্ঞান থাকা চাই। বর্তমানে একটা ধারণা চালু হচ্ছে যে বেশী পাণ্ডিত্যের চেয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ শিক্ষকের ক্ষেত্রে বেশী দরকার। আসলে কিন্তু প্রশ্নটা এভাবে উপস্থিত হওয়া আদৌ উচিত নয়। কারণ শিক্ষাদানে সফলতা লাভের জন্য শিক্ষকের যে **তিনটি মৌলিক যোগ্যতা** থাকা দরকার, সেগুলি হোলো **জ্ঞান, পেশাগত শিক্ষণ এবং ব্যক্তিত্ব।** কোনটার বেশী প্রয়োজন সে তর্ক নিরর্থক। কারণ শিক্ষকের এই তিনটি মৌলিক যোগ্যতার কোনো একটিতে ঘাটতি থাকলে তাঁর শিক্ষাদান উপযুক্ত ফলপ্রদ হোতে পারে না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে বলা যায়, শিক্ষক-মহাশয় তাঁর শিক্ষাদানের বিষয়ে বা বিষয়াবলীতে যথেষ্ট ব্যুৎপন্ন হবেন এবং তাঁর উদার, সার্বভৌম শিক্ষাও থাকবে। যে বিষয়বস্তু তাঁকে নাড়া-চাড়া কোরতে হয়, তার থেকে তাঁর জ্ঞানের পরিধি নিশ্চয়ই বিস্তৃততর হতে হবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে অনেক তথ্য নিয়ে কাজ কোরতে হয়, অতএব তাঁর জ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ হলে চলে না। তাছাড়া তাঁর নিজস্ব শিক্ষার বাস্তব এবং মানসিক পটভূমিটিও সুবিস্তীর্ণ হওয়া চাই।

তিনটি মৌলিক যোগ্যতা—জ্ঞান, পেশাগত শিক্ষণ ও ব্যক্তিত্ব

(১) জ্ঞান

শিক্ষকের দ্বিতীয় মৌলিক যোগ্যতা হচ্ছে পেশাগত শিক্ষণ। কখন, কতটা এবং কিভাবে এই শিক্ষণ তিনি লাভ কোরবেন সেটা একটা বড় প্রশ্ন। আমাদের দেশে এই শিক্ষণ-ব্যবস্থা এতই অপ্রতুল এবং এত অল্পসময়ব্যাপী যে, তার দ্বারা শিক্ষকদের তেমন কোনো বাস্তব উপকার হয় না। আমেরিকার চার বছরব্যাপী শিক্ষণ পাঠক্রমের বিরুদ্ধেই বিস্তর সমালোচনা, সেটাকে পাঁচবছর করা উচিত বলে প্রস্তাবও করা হচ্ছে—আর আমাদের দেশে এই শিক্ষণ-কাল হচ্ছে মাত্র সাড়ে দশ মাস। তার মধ্যে সমাজবিদ্যার মত নতুন দৃষ্টিভঙ্গীমূলক একটা নতুন পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের কতখানি চেতনা-সম্পন্ন করা যায় এবং বাস্তব কাজকর্মে কতখানি নির্দেশ দেওয়া যায় ও অভ্যস্ত করা যায়, তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ ওটা গঙ্গাজল আর তুলসীপাতা দিয়ে পূজো শেষ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অবস্থার অদূর ভবিষ্যতে যে কোনো পরিবর্তন হবে তা মনে হয় না। তাই এর মধ্যে শিক্ষককে নিজের উদ্যোগে এবং আগ্রহে এক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সমাধান কোরতে হবে। বস্তুতঃ শিক্ষণের কাল-পরিমাণ থেকে গুণগত পরিমাণটাই উল্লেখযোগ্য। শিক্ষণ ব্যবস্থায় তত্ত্বের সাথে তত্ত্বগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগ থাকা চাই। শিক্ষার্থী-শিক্ষক হাতে-কলমে এই তত্ত্বগুলির প্রয়োগ দেখবেন এবং প্রয়োগ কোরবেন

(২) পেশাগত শিক্ষণ

বস্তুতঃ যে কোনো শিক্ষক-শিক্ষণ পাঠক্রমে নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় সকল শিক্ষকের আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং তার দ্বারা প্রত্যেক শিক্ষকই উপকার পেয়ে থাকেন :—

(১) শিক্ষাদানে শিক্ষানবিসি (Practice Teaching)

(২) শিক্ষাদানে পর্যবেক্ষণ (Observation of Teaching)

(৩) সাধারণ এবং বিশেষ পদ্ধতিসমূহের পাঠক্রম (Courses in Methods, —General and Special)।

শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের পর্যবেক্ষণ ও হাতে-কলমে কাজের দ্বারা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতিসমূহে অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষণ লাভ করা দরকার। তবে এবিষয়ে ব্যবস্থা করার ভার সরকার ও শিক্ষণ-কর্তৃপক্ষসমূহের, সে কথা বলাই বাহুল্য। সমাজবিদ্যা যেহেতু প্রধানতঃ কর্মকেন্দ্রিক ও আচরণগত শিক্ষা, অতএব সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের পক্ষে এরূপ শিক্ষণ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থাতেও শিক্ষকের শিক্ষণ (in-service training) প্রয়োজন। শিক্ষাদান হচ্ছে একটা গতিশীল ব্যাপার, অতএব শিক্ষক হবেন আজীবন শিক্ষার্থী। সমাজবিদ্যার শিক্ষকের ক্ষেত্রে একথা সবচেয়ে বেশী সত্য। কারণ তিনি শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেবেন সামাজিক শক্তিসমূহের গতিধারা, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনশীলতা, জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিসমূহের নব নব বিকাশের সাথে। অতএব তিনি যদি সদা-পরিবর্তনশীল বর্তমান সমাজের গতি প্রকৃতি যত্নসহকারে নিয়ত অনুধাবন না করেন, তবে তাঁর কর্তব্য তিনি সুষ্ঠুভাবে পালন কোরতে পারেন না। তাঁকে নিয়ত নিত্য-নূতন সামাজিক অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত হতে হবে এবং সেগুলি থেকে বাছাই কোরে, স্তর অনুযায়ী সজ্জিত কোরে এবং সংগঠিত কোরে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত কোরতে হবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষক যদি নিজের কাজে সফল হতে চান, তবে তিনি একাজে কিছুতেই অবহেলা কোরতে পারেন না। তাঁকে দৈনিক সংবাদপত্রাদি এবং সাপ্তাহিক ও অন্যবিধ সাময়িক পত্রাদি অবশ্যই পড়তে হবে। তাঁর বিষয়টি যে গতিশীল (a dynamic subject), একথা মনে রেখেই তাঁকে সবসময়ে সম্ভবপর সকল উপায়ে শিক্ষণ-লাভ কোরতে হবে। তাঁকে সবসময়ে মনে রাখতে হবে **তিনি উপদেশক নন, ভাষ্যকার—আর সে ভাষ্য শুধু বচনে নয়, বচনে, কর্মে এবং আচরণে।** শুধু তাঁর বিষয়ে কেন, শিক্ষা-চিন্তা ও পদ্ধতিতেও নিয়ত গবেষণা ও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে ;—সে সব বিষয়েও তাঁর অবহিত থাকা দরকার।

বিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ (In-service training)

কর্মরত অবস্থায় শিক্ষণ-লাভের কয়েকটি উপায় নিম্নে উল্লেখ করা হোলো :—

(১) পড়াশুনা।

(২) কলেজের সান্ধ্য-পাঠক্রমে যোগদান।

(৩) দীর্ঘ অবকাশে (যথা গ্রীষ্মে বা পূজায়) সংগঠিত পাঠক্রমে যোগদান।

(৪) স্থানীয় এলাকার শিক্ষকদের নিয়মিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সংগঠনের কার্যাবলীতে যোগদান।

(৫) কর্মকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন।

(৬) শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

কোন একজন শিক্ষকের পক্ষে এই সবগুলি উপায়ের সাহায্য নেওয়া সম্ভব না হোলেও অধিকাংশ উপায়ের তিনি সদ্ব্যবহার কোরতে পারেন। আসল কথা, নিজের পেশাগত যোগ্যতা-বৃদ্ধিতে তিনি সবসময় যত্নবান থাকবেন। এ সম্পর্কে অধ্যক্ষ **তানেজা বলেছেন,** সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের "সমালোচনা থেকে আত্মরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে তথ্যসমূহের সুবিস্তৃত জ্ঞান, পেশাগত প্রয়োগ-কৌশলে নিপুণতা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কার ও প্রয়োগের আন্তরিক আগ্রহ। তিনি মনস্তাত্ত্বিক পন্থায় কাজে অগ্রসর হবেন। তার ফলে সঠিক সাড়া জাগাবার ও শিখবার সুযোগ হবে।"

ব্যক্তিত্ব

তৃতীয় মৌলিক যোগ্যতা হচ্ছে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব বা অস্মিতা (personality)। শিক্ষক শিক্ষা-পরিবেশের নিয়ামক। তাই তাঁর ব্যক্তিত্ব শিক্ষাদান-ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। শিক্ষা-জগতের অন্য যে কোন উপাদান বা প্রক্রিয়া থেকে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের ওপরে অনেক কিছু অনেক বেশী নির্ভরশীল। এই ব্যক্তিত্বের উপাদান বহু এবং বিচিত্র, কতকগুলি সাধারণ গুণসমন্বিত, কতকগুলি বিশেষ গুণবিশিষ্ট। বর্তমান প্রসঙ্গে এই সবগুলির হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই। শুধু যেসব গুণ এবং বৈশিষ্ট্য শিক্ষকের নিজকাজের সাফল্য-লাভের পক্ষে অপরিহার্য, আমরা এখানে সেগুলিরই উল্লেখ কোরবো। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত গুণগুলির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ত সম্ভব নয়, তবু চেষ্টার দ্বারা তারা যে নমনীয় হতে পারে এবং আচরণে কাম্য পরিবর্তন আনতে পারে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। তাই জাত শিক্ষক (born teacher) না হলেও শিক্ষক তৈরী কোরে নেওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক, সার্বজনীন শিক্ষার দিনে শুধু মুষ্টিমেয় জাত শিক্ষকের খোঁজ কোরলে চলে না, শিক্ষক তৈরী কোরে নেবার প্রয়োজনই বেশী। তাই সকল শিক্ষকতার জন্যে শিক্ষকের যে ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন হয়, তার আলোচনা আবশ্যক। যে প্রধান তিন ধরনের উপাদান এই ব্যক্তিত্বের মূলে রয়েছে তারা হোলো :—(১) দৈহিক আকৃতি, কারণ প্রথম দর্শনেই মনের মধ্যে অনুকূল বা প্রতিকূল ক্রিয়ার প্রভাব কম নয়। (২) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী, যাদের প্রভাব অপরের মনে অনুকূল সাড়া জাগায় এবং আকর্ষণ সৃষ্টি করে, এবং (৩) কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসমূহ, যা নেতৃত্বের সম্পদ এবং যা না থাকলে কোনো পরিস্থিতিতেই নেতৃত্বদান সম্ভব নয়।

শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের তিন ধরনের উপাদান

দৈহিক আকৃতি বিষয়ে বিচার কোরতে গিয়ে নিম্নোক্ত পাঁচটি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :—(১) চেহারা, (২) সৎস্বভাব, শিষ্টতা এবং রুচিবোধ, (৩) কণ্ঠস্বর, (৪) উত্তম ভাষাজ্ঞান এবং (৫) উত্তম স্বাস্থ্য। যদিও চেহারার ওপরে শিক্ষকের নিজের কোনো হাত নেই, তবু যতদূর সম্ভব তিনি সুশোভন হতে পারেন।

(১) দৈহিক আকৃতি

নিষ্ক্রিয় গুণাবলীর—অঙ্গস্বরূপ হচ্ছে (১) বন্ধুত্ব, (২) সহানুভূতি ও পরস্পরকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা, (৩) নিজের কাজে উন্নত আদর্শবোধ ও আন্তরিকতা, (৪) কুশলতা বা উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা, (৫) ন্যায়পরতা, (৬) স্বনির্ভরতা, (৭) আশাবাদ, (৮) উৎসাহ এবং (৯) ধৈর্য। এই নিষ্ক্রিয় গুণাবলীই বস্তুতঃ শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষকের চরিত্রের প্রভাবকে স্থায়ী করে। এইগুলির প্রভাবেই শিক্ষার্থী শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে ও তাঁর কাছে নিজের সমস্যাদি উপস্থিত কোরতে সাহস পায় এবং শিক্ষকের ধৈর্য, উৎসাহ এবং আশাবাদ ইত্যাদির প্রভাবে নিজের কাজে অনুপ্রাণিত হয়। বস্তুতঃ এই গুণগুলির অভাব থাকলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্বশর্তটি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

(২) নিষ্ক্রিয় গুণাবলী

কার্যনির্বাহী ক্ষমতাসমূহ বলতে বোঝায় (১) আত্মবিশ্বাস এবং আত্মনির্ভরতা, (২) স্বাধীন কাজে উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা, (৩) সমস্যায় মুখোমুখি হয়ে সামঞ্জস্য-বিধানের ও সমাধান নির্ণয়ের ক্ষমতা, (৪) সাংগঠনিক দক্ষতা (৫) পরিচালন-কুশলতা এবং (৬) কঠিন পরিশ্রম করার ক্ষমতা। শিক্ষক হচ্ছেন শিক্ষা-পরিবেশের নিয়ামক এবং নেতা। উপরি-উক্ত গুণগুলি হচ্ছে স্বাভাবিক নেতৃত্বের সম্পদ যা শিক্ষকের মধ্যে অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।

(৩) কার্য-নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ

(৩) তাঁর মনোভাব

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যসমূহের সাফল্য এই বিষয়টির প্রতি শিক্ষকের মনোভাবের ওপরে অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বস্তুতঃ একে যদি তিনি অগ্রগতির পথ-নির্দেশক অখণ্ড মানব-কাহিনী হিসেবে গ্রহণ কোরে শিক্ষার্থীদের মনে তদনুরূপ জ্ঞান, উপলব্ধি এবং সামাজিক যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জনের প্রেরণা দেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে সেই একই উদ্দেশ্যে হাতে-কলমে কাজ চালিয়ে যান, তবে তার ফল হবে উপযুক্ত, সুদক্ষ গণতান্ত্রিক নাগরিককুলের সৃষ্টি। আর তিনি যদি বিষয়টিকে অপ্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ কোরে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও সামাজিক কলা-কুশলতা বৃদ্ধিতে ঈপ্সিত পথে সাহায্য না করেন, তবে সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে এপ্রসঙ্গে একথাও বলতে হবে যে, অনেক বিদ্যালয়েই সমাজবিদ্যা-পাঠদানকে তেমন স্বাগত জানানো হয় না, আর আধুনিক পদ্ধতি-প্রকরণ-প্রয়োগের সুযোগ তো নেই বললেই

সঠিক মনোভাবের গুরুত্ব

হয়। যাই হোক, শিক্ষকমহাশয় নিজে থেকে আগ্রহী হলে এ অবস্থার অনেক পরিবর্তন হতে পারে। বস্তুতঃ শিক্ষকমহাশয়কে নিজের ওপরে, শিক্ষার্থীর ওপরে এবং নিজের বিষয়ের ওপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। এইটেই তাঁর কাছ থেকে সর্বাগ্রে চাওয়া হয়। মানবসমাজের প্রতি আগ্রহ এবং যুবশক্তির ওপরে বিশ্বাস না থাকলে সামাজিক যোগ্যতা ও দক্ষতা শিক্ষা দেওয়া যায় না। বিদ্যালয়কে গণতান্ত্রিক সমাজের প্রয়োগশালা বলে গণ্য কোরতে এবং অখণ্ড বিশ্বাস ও অদম্য উৎসাহ নিয়ে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের যোগ্যতা-অর্জনের সার্থক শিক্ষা দিতে হবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষককে কখনই একথা ভুললে চলবে না।

তাঁকে বিশ্বাস রাখতে হবে

(৪) পরীক্ষামূলক কাজে ও জ্ঞানচর্চায় তাঁর আগ্রহ

সমাজ গতিশীল, সমাজবিদ্যাও গতিশীল। আর এই বিদ্যা হচ্ছে নিয়ত পরিবর্তনশীল সমাজ-সম্পর্কিত লব্ধ বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমূহের সমষ্টি। এখানে বাঁধা-ধরা কোনো ছক নেই, থাকতে পারে না। কারণ এই অভিজ্ঞতাসমূহও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়, বর্তমানের কোন পরিবর্তন ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনাকে জন্ম দিচ্ছে তা নিজের সামাজিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার কোরে নিতে হয় এবং ভবিষ্যতের নাগরিকদের সেই অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেবার ক্ষমতা অর্জনের শিক্ষা দিতে হয়। এবিষয়ে নিয়ত অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রয়োজন। তাছাড়া, আধুনিক মনস্তত্ত্ব, শিক্ষা-চিন্তা এবং শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে নিয়ত বহুবিধ গবেষণা চলেছে, নব নব পদ্ধতির আবিষ্কার চলেছে, এ বিষয়ে শিক্ষককে অবহিত থাকতে হবে, তাদের প্রয়োগ সম্পর্কে নিজেও হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হবে। বস্তুতঃ শিক্ষা ও সমাজ-সংশ্লিষ্ট বহু বিষয়েই তাঁকে গবেষকের মন ও প্রস্তুতি নিয়ে নিজের কাজে আত্মনিয়োগ কোরতে হবে। তাঁর মনে সর্বদাই যেসব প্রশ্ন কাজ কোরবে তা হোলো :—

তাঁর থাকবে গবেষকের মন ও প্রস্তুতি

(১) এই তথ্যগুলি কি সর্বাধুনিক, সঠিক এবং নির্ভরযোগ্য ?

(২) এই তথ্যগুলি কি পাঠ্য বিষয়াংশের উপযুক্ত পরিপূরক হবে ?

(৩) এইগুলি কি শিক্ষার্থীদের বয়স, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপযোগী হবে ?

(৪) এইগুলি কি শিক্ষার্থীদের মনে যুক্তি ও বিচারবোধ উন্মেষের সহায়ক হবে ?

(৫) এইগুলি শিক্ষার্থীদের আর কি কি উপকারে লাগবে ?

(৬) কি কি উপায়ে এবং সব থেকে ভাল কি উপায়ে এই তথ্যগুলি তাদের সামনে উপস্থাপিত করা যেতে পারে ?

(৭) কি কি সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেগুলি সব থেকে ভালোভাবে ব্যবহার করার উপায় কি ?

বস্তুতঃ সমাজবিদ্যার শিক্ষকের মনে এই ধরনের প্রশ্নের জাগরণ ও তাঁর নিজস্ব সমাধান-প্রচেষ্টা থেকেই তাঁর সফলতা-লাভের সম্ভাবনা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়।

(৫) নিজের কাজে তাঁর সদা সচেতন আগ্রহ

বস্তুতঃ এই সূত্রটি শুধু শিক্ষক কেন, সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আগ্রহই তো জীবনের মূল। যার কোনো বিষয়ে আগ্রহ নেই, সে তো নির্জীব, নিষ্প্রাণ। আর সমাজে যিনি যে কাজের ভার নিয়েছেন বা যার ওপরে যে কাজের ভার ন্যস্ত হয়েছে, তিনি যদি তা আগ্রহ বা নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন না করেন, তবে তা হয় কর্তব্যচ্যুতি এবং তার থেকে সমাজে বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হয়। সমাজ-বিদ্যার শিক্ষকের পক্ষে এরকম অবস্থা কখনই কল্পনা করা যায় না। আগ্রহশূন্য শিক্ষক জীবনহীন কাষ্ঠখণ্ডের তুল্য। যিনি নিষ্প্রাণ, তিনি অপর প্রাণকে কিভাবে প্রজ্বলিত কোরবেন? তাই শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে জীবন-ধর্মী হওয়া, নিজের কাজ সম্পর্কে সর্বদা আগ্রহ ও নিষ্ঠা পোষণ করা, নিজের পেশাকে শ্রদ্ধা করা, নিজের পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতার বৃদ্ধিসাধনে সর্বদা তৎপর হওয়া। নিজের জ্ঞান, কর্মক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার পরিধিকে তিনি ক্রমশঃ বিস্তৃততর কোরবেন। এর জন্যে তাঁর পক্ষে প্রয়োজন :—

নিজকর্মে আগ্রহ ও নিষ্ঠার গুরুত্ব

(১) পেশাগত কারণে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া। রিফ্রেশার কোর্স, সেমিনার ইত্যাদিতে যোগদান করা।

(২) উদ্দেশ্যমূলক ভ্রমণ ও প্রদর্শনী ও কর্মকেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ও নানা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহিত পরিচিত হওয়া।

(৪) সুযোগমত নানাবিধ পৌর ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে যোগ দেওয়া।

(৫) নিজের গৃহে ছোট হলেও কাজে লাগে এমন একটি গ্রন্থাগার তৈরি করা।

(৬) মাঝে মাঝে আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্মসমীক্ষা, যার দ্বারা শিক্ষক নিজেই নিজের কাজের মূল্যায়ন কোরে আত্মসংশোধনের অবকাশ পাবেন।

(৭) শিক্ষকজীবনের সর্বপ্রধান যোগ্যতা—সৃষ্টিশীলতা, শিক্ষার এই সৃজনধর্ম তাঁর হাতে যেন কখনও ব্যাহত না হয়, এটা লক্ষ্য রাখা।

শিক্ষকের যোগ্যতা-বিচারে আরও কয়েকটি বিষয়

এইবার শিক্ষকের যোগ্যতা-বিচারে আমরা সংক্ষেপে **আরও কয়েকটি বিষয়ের** উল্লেখ কোরবো। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোলো—

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক ;
(খ) শিক্ষকের সাথে শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিচালন-কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক ;
(গ) শিক্ষকের নিজস্ব কাজকর্মের স্বাধীনতা ;
(ঘ) স্থানীয় সমাজের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক।

(ক) *শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক*

শিক্ষার্থীদের বিকাশে ও তাদের নিমিত্ত কল্যাণকর্মে শিক্ষকের আগ্রহ থাকবে এটা তো স্বাভাবিক। শিক্ষক এসবের জন্য নিয়মিত পরিকল্পনা কোরবেন এবং সুযোগ পেলেই শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত পরামর্শ ও পরিচালনা দান কোরবেন। শিক্ষার্থীরা অনেক সময়েই শিক্ষকের সাথে ঘনিষ্ঠ হতে চায়, তাদের সে সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে। তাদের কথা খুব প্রয়োজনীয় না হোলেও শুধু তাদের সান্নিধ্যে আসবার আগ্রহটুকু তৃপ্ত করারও যথেষ্ট মূল্য আছে। কারণ এতে পারস্পরিক বিশ্বাসের সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার্থী শিক্ষককে ভালোবাসতে ও শ্রদ্ধা কোরতে শেখে। যে শিক্ষকমহাশয় বিদ্যালয় শেষ হলেই বাড়ী যাবার জন্যে ছটফট করেন, তিনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সুসম্পর্ক গড়ে তোলার অনেক সুযোগ হারান। বিদ্যালয়ের বিতর্কসভা বা নিজ বিষয়-চর্চার নিমিত্ত সংঘ-সংগঠনাদি গড়ে তোলা এবং তাতে অংশগ্রহণ করা শিক্ষকের একটি বিশেষ কর্তব্য। এর মধ্যে বাঁধা-ধরা ছকের বাইরে শিক্ষার্থীদের সাথে একটা সহজ, সাবলীল সম্পর্ক গড়ে তোলা যায়। এর ফলাফল শ্রেণী-শিক্ষাদানের সময়েও বেশ অনুভূত হয়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য চাই

তবু দেখা যায়, শ্রেণীশিক্ষার সাথে প্রায়ই শৃঙ্খলার সমস্যা উপস্থিত হয়। এমন কি অনেক জনপ্রিয় শিক্ষকও নাজেহাল হবার অবস্থায় পড়েন। এই অবস্থার প্রতিকার শিক্ষকের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অভিজ্ঞতা ও দলীয় মনস্তত্ত্বের (group psychology) জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। শাস্তি একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা, সেটা কার্যতঃ শিক্ষকের ব্যর্থতারও দ্যোতক। তাই শিক্ষককে এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে তিনি শ্রেণীর অন্যান্য শিক্ষার্থীদের বিশ্বাসকে নিজের দিকে আকর্ষণ কোরতে পারেন এবং দোষী শিক্ষার্থী তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরুৎসাহ হয়, নিজের ভুল বুঝতে পারে এবং শিক্ষকের সহানুভূতি অর্জনের জন্য চেষ্টা করে। এর জন্যে অভিজ্ঞতাই সব থেকে বেশী কাজে লাগে, তবে সে অভিজ্ঞতার প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীর প্রতি অকুণ্ঠ মমত্ববোধ যেন সুপ্রকাশ থাকে। শিক্ষক যেন কোনো সময়েই শিক্ষার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বী না হোয়ে ওঠেন। তেমন ক্ষেত্রে, দোষী শিক্ষার্থীই কিন্তু "হিরো" হয়ে উঠবে। সমাজবিদ্যার শিক্ষক যেহেতু জ্ঞানার্জনের সাথে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ ও সামাজিক দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশসাধন কোরবেন, অতএব তাঁকে শৃঙ্খলার সমস্যা ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি বিষয়ে সর্বদা অবহিত থাকতে হবে ও তাদের সুসমাধানে ব্রতী হতে হবে।

শৃঙ্খলার সমস্যা ও তার সমাধানে শিক্ষকের দক্ষতা

(খ) *শিক্ষকের সাথে শিক্ষকমণ্ডলী ও পরিচালন কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক*

এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয়-সমাজে সমাজবিদ্যার শিক্ষকের স্থান-নির্দেশের প্রশ্ন আসে। অন্যান্য সহকর্মী শিক্ষক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতাই

এখানে বড় কথা। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকমহাশয় বিদ্যালয়-সমাজে নিজেকে কিভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন তা আগ্রহের সাথে লক্ষ্য করে। বাস্তবিক, উপদেশের চেয়ে উদাহরণ ভালো। শিক্ষকমহাশয়েরা বিদ্যালয়-সমাজে নিজেরা কিভাবে চলছেন তা দেখেই শিক্ষার্থীরা তাদের বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই বিনয় ও সংযমের সাথে সহকর্মী শিক্ষকদের সাথে আলাপ-আলোচনা করা দরকার। তাঁদের থেকে বিদ্যালয়-সমাজের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি জেনে নেওয়া, আবশ্যক ক্ষেত্রে মতামত দেওয়া, অন্যদের কর্মে সাহায্য করা এবং নিজের কর্মে অন্যদের সাহায্য প্রার্থনা করা দরকার। সমাজে কিভাবে বাস কোরতে হবে ও কাজ কোরতে হবে, বিদ্যালয়-সমাজে নিজের ভূমিকা দিয়েই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সেটা বুঝিয়ে দেবেন। আসল কথা. যেখান থেকে যতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যায় তা নিতে হবে এবং যতটুকু সাহায্য ও সহযোগিতা অন্যকে দেওয়া সম্ভব তা দিতে হবে।

শিক্ষকমণ্ডলীর পারস্পরিক সহযোগিতা

আজকাল দেখা যায়, অনেক সময়েই বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ ও সরকারী শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাথে শিক্ষকদের সংঘাত উপস্থিত হয়। স্বাস্থ্যকর মতবিরোধ ভাল, কিন্তু এই সংঘাতগুলি শিক্ষার্থীদের জীবনে বিষময় ফল প্রসব করে। তাই শিক্ষাজগতে যথার্থ গণতান্ত্রিক আবহাওয়া যাতে সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষা-পরিবেশ যাতে তিক্ত বিরোধ ও সংঘাতে কলুষিত না হয় তা শিক্ষকমহাশয় ও সকল কর্তৃপক্ষকেই দেখতে হবে। শিক্ষক যদি নিরাপত্তাবোধ-বিহীন মজুরে মাত্র পর্যবসিত হন, তবে তিনি শিক্ষার্থীর মনে নিরাপত্তা ও দায়িত্ববোধ কিভাবে সৃষ্টি কোরবেন? তেমনি তিনি যদি কর্তৃপক্ষের সাথে অযথা উগ্র অসহযোগিতা প্রদর্শন করেন, তবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহযোগিতা-বোধের সঞ্চার এবং নিজকর্তব্য-পালনে নিষ্ঠার জন্ম দেবেন কি কোরে? বস্তুতঃ শিক্ষক অন্যান্য সহকর্মীদের সাথে যেমন আলোচনার দ্বারা বিদ্যালয়-সমাজের সমস্যাগুলি ও তাদের সমাধান সম্পর্কে অবহিত হবেন, তেমনই তিনি তাঁর নিজের সমস্যাদি খোলা মনে বিদ্যালয়-প্রধানের কাছে উপস্থিত কোরবেন। বিদ্যালয়-প্রধানেরও উচিত সেই সব বক্তব্যের যথোচিত গুরুত্ব দান কোরে শিক্ষকের কাজের অসুবিধাগুলো সত্বর দূর করা ও তাঁর কাজের সুযোগ-সুবিধাকে প্রশস্ততর করা। যে সমস্ত সমস্যার সমাধান বিদ্যালয় প্রধানের পক্ষে সম্ভব নয়, সেগুলি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসমূহের গোচরে এনে সত্বর তা সমাধানের ব্যবস্থা কোরবেন। আসল কথা গণতান্ত্রিক সমাজের ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার মূলনীতিগুলি সম্পর্কে সকলে অবহিত থাকলে ও গণতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারে যত্নবান থাকলে শিক্ষকমহাশয়দের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক, বিদ্যালয়-প্রধানের সাথে সম্পর্ক, বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষও অন্যান্য শিক্ষা-কতৃপক্ষের সাথে সম্পর্ক সুসমন্বিত, সহযোগিতামূলক, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্যসাধক হতে পারে। একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে শিক্ষকের চেয়ে সংগঠন বড়,

শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষদিগের মতবিরোধ এড়ানো দরকার

শিক্ষা ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের মধ্যে সুষম সম্পর্ক চাই

শিক্ষক সংগঠনের এক অংশীদার মাত্র, তবু সংগঠন যেন শিক্ষককে সম্পূর্ণ গ্রাস না করে। সামূহিকতা ও ব্যক্তিতা—বিদ্যালয়-সমাজে দুইয়েরই যেন অবকাশ থাকে, শিক্ষকের ক্ষেত্রে, শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও।

(গ) শিক্ষকের নিজস্ব কাজকর্মের স্বাধীনতা

বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষকের নিজস্ব কাজকর্মের স্বাধীনতা তাঁর শিক্ষাদান-সাফল্যের একটি পূর্বশর্ত। এই স্বাধীনতা কি এবং কতটা, এবং কিভাবে তার প্রয়োগ হওয়া উচিত, তা অবশ্য সতর্ক বিচার-বিবেচনার অবকাশ রাখে। পরিচালন-কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। অভিভাবকমণ্ডলী ও স্থানীয় জনসমাজের সাথেও তাঁর সুস্থ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে। তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি তাঁর নিজস্ব মত ও পথ অবলম্বন কোরে চলবেন না, বা কেউ অসন্তুষ্ট হবেন এই ভয়ে নিজের নাগরিক স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার কোরবেন না। শিক্ষকের একাজ কোরতে নেই, সেকাজ কোরতে নেই—এই ধরনের নিষেধাত্মক বিধি-নির্দেশমাত্র তিনি মেনে চলবেন এটা কখনই সম্ভব নয় বা তা কাম্যও নয়। বিদ্যালয়-সমাজে তো বটেই, তার বাইরের স্থানীয় সমাজেও তাঁর একটা ভাবাত্মক ও ও ক্রিয়াত্মক ভূমিকা নিশ্চয়ই থাকবে। তবে তাঁর প্রতিটি কাজকর্মই এমনভাবে পরিচালিত হওয়া চাই যাতে তার ফলাফল শিক্ষক হিসাবে তাঁর যে বিশেষ মর্যাদা তার প্রতিকূল না হয়। জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমাত্রেই এবিষয়ে সচেতন থাকেন।

বিদ্যালয়-সমাজে ও বহিঃ-সমাজে তাঁর ভাবাত্মক ও ক্রিয়াত্মক ভূমিকা থাকবে

বিদ্যালয়-সমাজে শিক্ষকের স্বাধীনতার সীমা মোটামুটি সুনির্দিষ্ট থাকাই বাঞ্ছনীয়। পরিচালন-কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর দাবি হবে তাঁর কার্যকলাপকে অর্থবহ ও ফলপ্রদ করার উপযুক্ত পরিবেশ-সৃষ্টির সুযোগ-সুবিধা তাঁকে দিতে হবে। তাঁর জন্যে সময়, ঘর, উপকরণ, অর্থ সবই তিনি চাইতে পারেন, অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মীদের সহযোগিতাও তিনি চাইতে পারেন। বিদ্যালয়-প্রধান এইসব দাবিপূরণের ও বিভিন্ন প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা কোরবেন। শিক্ষকদের সাধারণ অবস্থার উন্নতির দাবিও এই প্রসঙ্গে উপস্থিত হতে পারে, যেটুকু বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের পক্ষে সমাধান সম্ভব, সেটুকু তাঁরা অবশ্যই কোরবেন আশা করা যায়। তাতে পারস্পরিক স্বাধীনতা দৃঢ়ভিত্তিক ও কাজের সুযোগ প্রশস্তর হয়।

শিক্ষকের স্বাধীনতার প্রশ্ন

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষকমহাশয় নিজের বিষয়ে বিজ্ঞ বলেই তাঁর শিক্ষাদান যতক্ষণ বিষয়-সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকে, ততক্ষণ তাঁর কাজে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ কোরতে পারেন, তাঁর কাজে কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর বিষয়ের আলোচনায় অনেক সময় মতান্তরের অবকাশ থাকে। সেক্ষেত্রে তিনি নিজের মত অবশ্যই বলতে পারেন, কিন্তু ভিন্নমত আলোচনারও যথেষ্ট অবকাশ দেবেন। সমস্ত শিক্ষাদান কাজটা এমনভাবে পরিচালনা কোরতে হবে যেন নিজের মত তিনি

শিক্ষার্থীদের ওপরে চাপিয়ে না দেন। মনে রাখতে হবে, শিক্ষার্থীরা স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষালাভ কোরবে, তথ্য এবং যুক্তি অনুসরণ কোরে তারা নিজেরাই নিজেদের সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। শিক্ষক যেন সে পথে প্রতিবন্ধক না হন। তাহলে শিক্ষার মূল আদর্শ ও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিটিই নষ্ট হয়ে যাবে। তাতে "গুরুগিরি" হবে, কিন্তু শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভ হবে না। শিক্ষার্থীদের ভিন্নমতকে উপেক্ষা করার বা দাবিয়ে দেওয়ার অধিকার শিক্ষকের নেই। নিজের মতামত প্রকাশের সময়ে অপরের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শনের পূর্বশর্ত যেন কখনও লঙ্ঘিত না হয়।

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতাকে আমল দিতে হবে

বস্তুতঃ, শ্রেণীকক্ষে, বিদ্যালয়ে বা বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষক নিজেকে এমনভাবে পরিচালিত কোরবেন যে, কি শিক্ষার্থী, কি বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ, কি স্থানীয় জনসমাজ, শিক্ষকের সাথে মতান্তর ঘটলেও, তাঁকে যেন সার্ববস্থায় শ্রদ্ধা কোরতে পারেন।

(ঘ) *স্থানীয় সমাজের সাথে শিক্ষকের সম্পর্ক*

বিদ্যালয় হচ্ছে স্থানীয় সমাজের সৃষ্ট একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে সেই সমাজের তরুণ সদস্যদের শিক্ষাদান করা হয়। তাই বিদ্যালয়ের ওপরে স্থানীয় সমাজের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য। শিক্ষক এই দাবিকে কখনও নস্যাৎ বা তাচ্ছিল্য কোরবেন না, পরন্তু স্থানীয় সমাজের সাথে তাঁর সংযোগ যাতে দৃঢ়তর হয় তার ব্যবস্থা কোরবেন। অভিভাবকেরা ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের কাজকর্ম সম্পর্কে খোঁজ নিতে আসবেন, নিজ নিজ পুত্রকন্যারা কেমন কাজ কোরছে, কি শিখছে, তাদের সাফল্য ও ব্যর্থতা কতটা ও কেন, তা তাঁরা অবশ্য জানতে চাইবেন এবং সেই চাওয়াটাই স্থানীয় সমাজের ও বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এগুলি শিক্ষকের কাজে হস্তক্ষেপ তো নয়ই, বরং প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক। কারণ, শিক্ষার্থীর শিক্ষায় গৃহ এবং বিদ্যালয়, দুয়েরই সহযোগিতামূলক ভূমিকা। অভিভাবকদের সাথে সাক্ষাতে এই গৃহের খবরাখবর শিক্ষক জানতে পারেন এবং শিক্ষার্থীর সম্পর্কে শিক্ষকের মতামত ও মূল্যায়ন জানতে পেরে অভিভাবকেরাও শিক্ষার্থীর শিক্ষানুকূল সহায়তা দান কোরতে পারেন। বস্তুতঃ এই উদ্দেশ্যে নিয়ে অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা গড়া হয়ে থাকে। এগুলি খুবই কাজে লাগে ; এগুলিতে শিক্ষকের কাজেরই সহায়তা হয় এবং অভিভাবকেরা অনেক ক্ষেত্রেই উদাসীন বলে শিক্ষকদের পক্ষ থেকেই গৃহ ও বিদ্যালয়ের মিলন ঘটাতে এই ধরনের শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা গড়ে তোলায় ও পরিচালনায় উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। মনে রাখতে হবে, শিক্ষকের সাথে অভিভাবক তথা স্থানীয় জনসমাজের বোঝাপড়ার অভাবে অনেক সময়েই শিক্ষা-প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিক্ষকদের পক্ষে তাই স্থানীয়

স্থানীয় সমাজের সাথে শিক্ষকের সুসম্পর্ক—গৃহ ও বিদ্যালয়ের কাজে পরস্পরের পরিপূরক

শিক্ষক-অভিভাবক সংস্থা

সমাজের সাথে সখ্য-চর্চা একান্ত বাঞ্ছনীয়। সংঘ ও নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের সংগঠনের দ্বারাও এই কাজের সহায়তা হয়ে থাকে। সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতেও শিক্ষকদের যোগদান, অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক সমাজের সাথে ঘনিষ্ঠ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। তবে একথা অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার যে, নিজের প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান কাজের চেয়ে এগুলি যেন বেশী গুরুত্ব না পায়।

সতর্কতা

মনে রাখতে হবে এগুলি সহায়ক কর্মমাত্র। তাছাড়া, সমাজে শুধু ঘুরে-ফিরে বেড়ানোটা আসল কথা নয়, আসল কাজ স্থানীয় সমাজের লোকদের জানা এবং বোঝা তাদের কিছু উপকার করা। সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের এই ভূমিকা শিক্ষার্থীদের কাছে নিশ্চয়ই উদাহরণস্থল হবে; নিজের কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের সাথে সাথে সমাজের সেবা কিভাবে করা যায় তা শিক্ষার্থীরা তাকে দেখেই শিখবে।

আমরা সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের গুণ ও যোগ্যতা নিয়ে মোটামুটি আলোচনা কোরেছি। উপসংহারে শুধু এই কথাই বলতে চাই, শিক্ষক সর্বদা নিজেকে নিজে সৃষ্টি কোরে চলবেন। মনুষ্যত্বের এটাই ধর্ম, শিক্ষারও তাই।

শিক্ষকদের গুণ, যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা বিচারের একটি সম্ভাব্য প্রক্রিয়া

(Bining & Bining "Teaching the Social Studies in Seconc ary Schools থেকে উদ্ধৃত"

প্রসঙ্গ (Items)	অত্যুত্তম Excellent	উত্তম Good	সাধারণ Average	নিকৃষ্ট Poor
(১) **জ্ঞান**				
(ক) নিজ বিষয়ের উত্তম জ্ঞান				
(খ) সাধারণ শিক্ষার ব্যাপকতা				
(গ) আধুনিক জীবন-সমস্যার সাথে পরিচিতি				
(ঘ) সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি পাঠ				
(ঙ) নিজ বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ				
(২) **পেশাগত পটভূমি**				
(ক) নিজ পেশার প্রতি মনোভাব				
(খ) উত্তম পেশাগত শিক্ষণ				
(গ) শিক্ষা-সংক্রান্ত পত্র-পত্রিকা পাঠ				
(ঘ) নিজ পেশা-সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ				
(ঙ) নিজ যোগ্যতা বৃদ্ধির আগ্রহ				

প্রসঙ্গ (Items)	অত্যুত্তম Excellent	উত্তম Good	সাধারণ Average	নিকৃষ্ট Poor
(৩) **ব্যক্তিত্ব**				
(ক) **দৈহিক আকৃতি**				
(১) নিজ চেহারা				
(২) জীবনের সুখ-সুবিধা বিষয়ে সচেতন				
(৩) কণ্ঠস্বরের গুণাগুণ				
(৪) উত্তম ভাষাজ্ঞান				
(৫) উত্তম স্বাস্থ্য				
(খ) **নিষ্ক্রিয় গুণাবলী**				
(১) বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব				
(২) সহানুভূতি ও পারস্পরিক উপলব্ধি				
(৩) আন্তরিকতা				
(৪) কৌশল				
(৫) ন্যায়পরতা				
(৬) আত্ম-সংযম				
(৭) আশাবাদ				
(৮) উৎসাহ				
(৯) ধৈর্য				
(গ) **কার্য নির্বাহী ক্ষমতাসমূহ**				
(১) আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা				
(২) উদ্যোগ				
(৩) সামঞ্জস্যবিধানের ক্ষমতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব				
(৪) সংগঠনী ক্ষমতা				
(৫) পরিচালনা দক্ষতা				
(৬) পরিশ্রম				
(৪) **শ্রেণীকক্ষে পাঠ-পরিচালন প্রণালী**				
(ক) পাঠদানের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য				
(খ) বিষয়াংশ শিক্ষাদানের লক্ষ্যের সহিত নির্দিষ্ট পাঠের লক্ষ্যের সম্পর্ক				
(গ) শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিষয়বস্তুর উপযুক্ত নির্বাচন				

প্রসঙ্গ (Items)	অত্যুত্তম Excellent	উত্তম Good	সাধারণ Average	নিকৃষ্ট Poor
(ঘ) শিক্ষাদানের নিমিত্ত বিষয়বস্তুর উপযুক্ত বিন্যাস				
(ঙ) শিক্ষালাভে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত প্রনোদনা সৃষ্টি				
(চ) সযত্ন পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্মভার অর্পণ				
(ছ) লক্ষ্যার্জনে বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহের প্রয়োগ				
(জ) নিপুণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা				
(ঝ) শ্রেণী-শৃঙ্খলা বজায় রাখার যোগ্যতা				
(ঞ) ব্যক্তিগত পার্থক্য-বিষয়ে সচেতনতা				
(ট) সময়তালিকানুযায়ী কর্ম-পরিচালনে যোগ্যতা				
(ঠ) শ্রেণীতে লক্ষ্যার্জনের দক্ষতা				
(ড) সুস্পষ্টভাবে বিষয় উপস্থাপনের দক্ষতা				

Questions

1. What are the qualifications and special equipments that go to make a Social Studies teacher ? Why does the Social Studies require the highest type of teachers ?

2. How will the Social Studies teacher treat the problem of teaching in modern days ?

3. Social Studies teacher is, in fact, a worker in the field of Social Sciences and Education—Discuss.

4. We try build up a new type of socity with new types of men—it is the main duty of the Social Studies teacher to train up such men for the new society. Elucidate.

5. Describe the importance and utility of in-service training of the Social Studies teacher ?

6, Describe the role of the Social Studies teacher in the scoool society and his relation with the pupils, the other numbers of the staff, the authority and the local community.

7. How can the efficiency of a teacher be rated and increased ?

8. What is the importance of of sound liberal education of Social Studies teacher ? How do his knowledge and attitude affect his teaching ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মূল্যায়ন

মূল্যায়ন শিক্ষাকার্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আর এটা একটা কঠিন কর্তব্যও বটে। বস্তুতঃ এটা শিক্ষাবিদ্, চিন্তানায়ক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের একটা নিত্য ভাবনার ব্যাপার। এতে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। সম্প্রতি এ বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ উদ্ধৃত কোরে দিচ্ছি। এতে বোঝা যাবে এবিষয়ে সংস্কার কত জরুরী এবং তা কিভাবে শিক্ষা-ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তরেও আলোড়ন তুলেছে।

জরুরী সংস্কার আবশ্যক

একটি জরুরী শিক্ষা-সমস্যা

"অকৃতকার্যতার বিপুল হার নিবারণে পরীক্ষা-গ্রহণ-ব্যবস্থার সংস্কার অত্যন্ত জরুরী।"

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ প্রতিনিধি-সম্মেলনে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার বক্তৃতা—"নয়াদিল্লী, ৩০শে নভেম্বর—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অঙ্গরূপে মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্যতার বিষয় বিবেচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম. সি. চাগলা আজ বিভিন্ন রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানান।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলার বক্তৃতা

"মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌সমূহের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিগণের পঞ্চম সম্মেলনে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রীচাগলা আরও বলেন যে, বহুসংখ্যক—শতকরা ৫১ জন ছাত্রের অকৃতকার্যতা যাহাতে নিবারণ করা যায়, তাহার জন্য পরীক্ষা-গ্রহণ-ব্যবস্থার সংস্কার "অত্যন্ত জরুরী" হইয়া পড়িয়াছে।

"শ্রীচাগলা বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষে অকৃতকার্যতার শতকরা বিপুল হার এ দেশের মানব-সম্পদের "একটা বিপর্যয়কর ও ভয়াবহ ব্যাপার।"

"তিনি বলেন, এই অবস্থা এড়াইতে হইবে। অকৃতকার্যতার "অবমাননা" ছাত্রদের প্রাপ্য নহে, তাহা বিদ্যালয়ের ও শিক্ষকের প্রাপ্য হইয়া থাকে।

"ছাত্রগণ অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যায় পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভিড় আরও বাড়িবে, তাহা স্বতন্ত্র ব্যাপার। যেসব ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে, তাহাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার "মর্যাদা বা বাজারদর"-এর পরিবর্তন করা আবশ্যক।

"শ্রীচাগলা এই সঙ্গে বলেন যে, মাধ্যমিক পরীক্ষা উচ্চতর শিক্ষার প্রবেশ-দ্বার বলিয়া ইহার মানও উচ্চতর হওয়া উচিত। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্ষতি হইতে বাধ্য"।

মৌখিক পরীক্ষার সম্ভাব্যতা

"শ্রীচাগলা বলেন যে, পরীক্ষার জন্যে যেসব প্রশ্ন রচনা করা হয়, তাহার উদ্দেশ্য কেবল ছাত্রদের স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা গ্রহণ হওয়া উচিত নহে ; পরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যোগ্যতা প্রদর্শনের মত তাহার মন তৈয়ারি হইয়াছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এইজন্যই তিনি মাধ্যমিক পরীক্ষার অঙ্গরূপে মৌখিক পরীক্ষা প্রবর্তনের সম্ভাব্যতার বিষয় ভাবিয়া দেখিতে বলেন।" (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা ডিসেম্বর, ১৯৬৩)।

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

উপরে যে সংবাদটা উদ্ধৃত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে পরীক্ষা বা মূল্যায়ন এখন শুধু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বা শিক্ষকদের শিরঃপীড়া নয়, তা সর্বোচ্চ সরকারী শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও অনিদ্রার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ শিক্ষার মূল্যায়ন শিক্ষাদান কার্যেরই অপরিহার্য অঙ্গ। অনেকে অবশ্য এ অবস্থার সংক্ষিপ্ততম প্রতিকার বলেছেন। পরীক্ষা-ব্যাপারটা শিক্ষাজগৎ থেকে তুলে দিলেই আর এ নিয়ে কোনো হাঙ্গামা থাকে না। এ যেন রোগ-সমেত রোগীকেই বিনাশ করা ; আশার কথা এই, শিক্ষাজগতের কোনো সুস্থ চিকিৎসকই এ অভিমত গ্রাহ্য করেননি। এ প্রসঙ্গে পরীক্ষা তথা মূল্যায়ন-ব্যবস্থার গুরুত্ব বোঝাতে পরীক্ষার শিক্ষাগত এবং সমাজগত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে M. Sultan Mohiyuddin বলেছেন—শিক্ষার্থীর কতটা শিক্ষা কাজে লাগলো আর তার দ্বারা সে কতটা লাভবান হোলো, তা তার শিক্ষকমহাশয়কে নিজের কাজের মূল্যায়ন ও সামঞ্জস্যসাধনের জন্য জানাতে হবে। বাপ-মা জানতে চান, তাঁরা যে এত কষ্ট কোরে ছেলেকে পড়াচ্ছেন তা সার্থক হচ্ছে কিনা, তাঁদের ত্যাগস্বীকারটা জলে যাচ্ছে না তো? তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে পুত্রকন্যারা সমপরিমাণ লাভবান হতে পারছে তো! কর্মকর্তা কর্মী চান, কিন্তু কর্মীর যে উপযুক্ত গুণ ও দক্ষতা আছে তা তিনি সহজে নির্ধারণ কোরবেন কেমন কোরে? এমন একটা সাধারণ মানের (General Standard) মূল্যায়ন-ব্যবস্থা না থাকলে তার কর্মী-বাছাইয়ের কাজটা নিতান্তই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। সমাজে বিভিন্ন দায়িত্ববহনের যোগ্যতা যাদের দেওয়া হয়, তারা যে সে বিষয়ে উপযুক্ত, তার কিছু নিদর্শনপত্র তো থাকা চাই। কোনো স্বীকৃত জনপ্রতিষ্ঠান তাদের গুণাবলী, যোগ্যতা ও দক্ষতা বিচার কোরে কমবেশি সন্তুষ্ট হয়েছেন এমন অভিজ্ঞানপত্র চাই। তাছাড়া ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একটা সাধারণ

পরীক্ষার শিক্ষাগত ও সমাজগত প্রয়োজনীয়তা

মানদণ্ডের ভিত্তিতে তুলনামূলক বিচারও প্রয়োজন হয়, অনুগ্রহবিতরণ বন্ধ করার প্রয়োজন হয়, গুণী ব্যক্তির যোগ্য সমাদর করার দরকার হয়—এসবের জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে বৈকি। তবে পরীক্ষার এত নিন্দা কেন? পরীক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটা আমাদের সকলের কাছে এমন শিরঃপীড়া হয়ে উঠেছেই বা কেন?

প্রচলিত পরীক্ষার ক্ষতিকর দিক

প্রচলিত পরীক্ষার প্রধান ক্ষতিকর দিকগুলো হোলো :

(১) বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও অন্যান্য কার্যের ওপরে পরীক্ষার ক্ষতিকর প্রভাব।

(২) প্রকৃত শিক্ষার বা উন্নততর লক্ষ্য তা পরীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না।

(৩) পরীক্ষার অনিশ্চয়তা (unreliabilty) এবং অসার্থকতা (invalidity)।

(৪) পরীক্ষার নম্বর প্রদানের ফারাক (variability)।

(৫) শিক্ষার্থীদের ওপর পরীক্ষার ক্ষতিকর শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক প্রভাব।

(৬) পরীক্ষা-গ্রহণে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব।

(৭) শিক্ষা ও পরীক্ষার মধ্যে কোনো আঙ্গিক সম্বন্ধ (organic relation) নেই।

পরীক্ষা একটি শিক্ষা-সহায়ক উপায়, কিন্তু বাস্তবে এটাই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে পড়েছে

পরীক্ষা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজে কতখানি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তা আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ কোরছি। পরীক্ষাই যেন শিক্ষার অন্তিম ধাপ এবং পরীক্ষায় সার্থকতা তা যে কোন মূল্যেই হোক, যেন একান্ত কাম্য। পরীক্ষা একটা শিক্ষা-সহায়ক উপায়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মাঝে মাঝে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কাজের সাফল্যের পরিমাপ এবং প্রয়োজনবোধে তার ভিত্তিতে তারা নতুন কোরে কাজের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি ঠিক কোরবেন। কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষাই হয়ে উঠেছে একমাত্র লক্ষ্য এবং পরীক্ষায় কি কোরে পাস করা যায় সেই চিন্তাই অন্য সকল কাজ ও ভাবনার ওপরে প্রভুত্ব কোরছে। শিক্ষকরা পরীক্ষার তাড়ায় শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা, প্রকৃত গুণাবলী ও যোগ্যতাবিকাশের দিকে তেমন লক্ষ্য দিতে পারেন না। ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য যৎপরোনাস্তি ব্যাহত হয়। আমাদের দেশে বেশ কিছুকাল ধরে প্রকৃত প্রস্তাবে গোটা ইংরেজ আমল ধরে এবং আজ পর্যন্ত—এই ঘটছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা ভাবেন দরকার কি জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টিলাভের কথা বিবেচনা কোরে? দরকার কি বিদ্যাকে কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা, রসাস্বাদন ও সমালোচনার শক্তিলাভের উপায় হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াসে? যেমন-তেমন কোরে পরীক্ষায় পাস কোরতে পারলেই শিক্ষার্থীর নিষ্কৃতি এবং

শিক্ষকমহাশয়েরও চাকরি ও গায়ের চামড়া বাঁচে। শিক্ষার বিপথের অবস্থাও হয়ে ওঠে তথৈবচ। একটা বিষয় বা বিষয়াংশ পরীক্ষায় পড়বে কিনা, সেইটাই হয়ে ওঠে প্রধান আলোচ্য বিষয়। যদি সেটা পরীক্ষায় পড়ার সম্ভাবনা থাকে তবে তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে, নচেৎ তাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে—তা তার শিক্ষাগত প্রকৃত তাৎপর্য যতই থাক। "Will this or that pay at the examination becomes the crucial question." তার ওপরে আবার একটা বিষয়ের জ্ঞানকে ভোঁতা কোরে দেবার পক্ষে পরীক্ষাস্ত্র একটি অমোঘ অস্ত্র।

শিক্ষালাভের পথে পরীক্ষার ক্ষতিকর প্রভাব

শিক্ষার্থীরা একটা বিষয় ভালোই শিখছিল; জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মশক্তি সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ কোরে তারা প্রকৃত শিক্ষালাভের পথে অগ্রসর হচ্ছিল। মাঝপথে এল পরীক্ষার তাড়া—আর যায় কোথায়? তখন সব ওলট-পালট কোরে, তাড়াহুড়ো কোরে, কি পড়ি আর না মড়ি চিন্তা কোরে মাথা খারাপ হবার উপক্রম। শেষ পর্যন্ত কিছু বাছাই কোরে কিছু বাদ দিয়ে কোন রকমে কিছু মুখস্থ কোরে তারা পরীক্ষার হলঘরে উপস্থিত হয়। আর সেখানে স্মৃতি থেকে উদ্ধার-করা বিদ্যাটাকে কক্ষচ্যুত কোরে দিয়েই খালাস। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আন্তরিক শিক্ষা-প্রয়াসও এই পরীক্ষার হাতে মার খেতে বাধ্য। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে বলে শুনেছি, "যদি কোনো কবির জনপ্রিয়তা নষ্ট কোরতে চাও, তবে তার কাব্যকে স্কুল-কলেজের পাঠ্য তালিকাভুক্ত কোরে দাও।" বস্তুতঃ বর্তমান পরীক্ষাবিধির কল্যাণেই এই আপ্ত বাক্যটি সার্থকতা লাভ কোরেছে।

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের সমালোচনা

রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্যের সাথে বর্তমান শিক্ষাদান-

শিক্ষা ও পরীক্ষা আঙ্গিক সম্বন্ধহীন

প্রক্রিয়ার আঙ্গিক সম্বন্ধ নেই এবং কেন তা নেই, তা নিজের মন্তব্যে বেশ সুস্পষ্ট কোরে দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে পরীক্ষার সাথে দুর্নীতির যে সংযোগ সাধিত হয়েছে তাও পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত কোরেছেন—

আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে যেন এক নৈরাজ্যের ও দুর্নীতি-চক্রের সৃষ্টি কোরেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষা—সকলেই এর কবলিত এবং এর দ্বারা উৎপীড়িত। এর ক্ষতিকর প্রভাব তাদের সর্বাঙ্গে। তার ওপরে পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হোলো মূল্যায়ন; কিন্তু কিসের মূল্যনিরূপণ তারই যেন ঠিক নেই। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচিত হয় যে তার দ্বারা পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানও পরিমাপ করা যায় না। তার ওপরে নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক সময়েই বেশ ফারাক বা পার্থক্য ঘটে যায়। পরীক্ষকের নিজস্ব মনোভাব নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ ক্রিয়াশীল। একই উত্তর লিখে বিভিন্ন ছাত্র তার কাছে বিভিন্ন নম্বর পেয়ে থাকে,

আবার একই ছাত্র একই উত্তর লিখে বিভিন্ন পরীক্ষকের হাতে বিভিন্ন নম্বর পেয়ে থাকে। বর্তমানে যে ধারায় পরীক্ষা চলেছে তাতে এর সংশোধন হওয়া দায়। আর তার ফলে এক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতিরও উদ্ভব হয়েছে। সম্প্রতি এইসব বিষয় নিয়ে আমাদের দেশের দৈনিক এবং সামাজিক পত্র-পত্রিকাদিতে অনেক আলোচনা প্রকাশিত হচ্ছে। এককথায় বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার চাই-ই। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের কথায়, "We are convinced that if we are to suggest one single reform in university education, it should be that of the examination." শুধু বিশ্ববিদ্যালয়-স্তরে নয়, প্রাথমিক থেকে উপরের সকল স্তর পর্যন্ত সর্বত্রই এই সংস্কারের আশু প্রয়োজন। অথচ সংস্কারটা যে ঠিক কি হবে, তা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করা শক্ত। তবে এ প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের বক্তব্য বিশ্লেষণ কোরে একটা মূল্যবান সূত্র লাভ করা যায়। তা হচ্ছে শিক্ষা ও পরীক্ষার মধ্যে থাকবে একটা Organic relation বা আঙ্গিক সম্বন্ধ—আর সেখানে পরীক্ষা প্রভু নয়, শিক্ষা প্রভু, পরীক্ষা ভৃত্য। এখন দেখা যাক, এক্ষেত্রে আমরা কি কি নির্দেশ পাই।

হওয়া উচিত—শিক্ষা প্রভু, পরীক্ষা ভৃত্য

মূল্যায়ন ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়

পরীক্ষা হচ্ছে মূল্যায়ন; কিন্তু কিসের মূল্যায়ন? **ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মূল্যায়ন করাই হচ্ছে পরীক্ষার লক্ষ্য। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা বা কেতাবী বিদ্যার পরিমাপ নয়, শিশুর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভগুলির সুসমঞ্জস বিকাশ, তার সামাজিক চরিত্র গঠন, সমাজের সাথে সামঞ্জস্যবিধান, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যগঠন এবং নানাবিধ প্রয়োজনীয় গুণের বিকাশ শিশুর শিক্ষার মূল্যায়নক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।**

ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মূল্যায়ন

প্রথমতঃ আমরা আমাদের কেতাবী বিদ্যার মূল্যায়নের কথাতেই আসি। কি করে এই মূল্যায়ন সুষ্ঠু ও সার্থক হতে পারে তা বিবেচ্য। অর্থাৎ, মূল্যায়ন উপযুক্ত এবং সার্থক হওয়া চাই। মূল্যায়নের উদ্দেশ্য যেন পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত হয়। যা পরিমাপ কোরতে চাওয়া হচ্ছে, তা যেন পরিমাপ করা সম্ভব হয়। মূল্যায়নের পদ্ধতি যেন নির্ভরযোগ্য হয় এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিমাপ করা হয়। নমুনাগুলো যেন বেশী সংখ্যায় সমস্ত পাঠ্য বিষয় থেকে সংগ্রহ করা হয়, ফলে প্রশ্ন বাছাইয়ের সম্ভাবনা কম থাকায় মূল্যায়নের যোগ্যতা ও সার্থকতা বৃদ্ধি পায়। আকাঙ্ক্ষিত বিদ্যালাভে শিক্ষার্থী কতদূর কৃতকার্য তাও সহজে বোঝা যাবে। **মূল্যায়ন হবে নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তি-বিশেষের মর্জি সেখানে যেন বাধার সৃষ্টি না করে।** আর মূল্যায়নের পদ্ধতিটা

কেতাবী বিদ্যার মূল্যায়ন

যেন সহজ হয়, নম্বর দেওয়াটা যেন সহজে এবং শীঘ্র সম্পন্ন হয়, আর সেই ফলাফলের ব্যাখ্যা যেন জটিলতামুক্ত হয়, যেন তা প্রত্যক্ষ এবং সহজেই বোধগম্য হয়। এইসব কারণে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ওপরেই জোর দিয়েছেন বেশী এবং তার জন্যে পশ্চিমী মানসিক পরিমাপের বৈজ্ঞানিক প্রথা এদেশে প্রবর্তন করার কথাও বলেছেন। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার পরিসীমার মধ্যে বুদ্ধির পরিমাপ (Intelligence tests) এবং কর্মসম্পাদনী পরীক্ষার ('Achievement tests) কথাও বলা হয়েছে। এই দুই ধরনের পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি, তা এদের চরিত্র থেকেই বোঝা যাবে।

সহজ ও নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন

বুদ্ধির পরিমাপ ও কর্ম-সম্পাদনী পরীক্ষাসকল

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও তার প্রয়োগ

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাসমূহের উপরে আলোচিত গুণাবলী ছাড়াও আরও দুটো যোগ্যতা রয়েছে। এই পরীক্ষাগুলো শিক্ষকের সহায়ক উপকরণ (পরীক্ষা এখানে প্রভু নয়, ভৃত্য) এবং কাজের গুণের উন্নতিবর্ধক। এই প্রসঙ্গে কমিশনের নির্দেশগুলো অনুসরণ করা শিক্ষক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের একান্ত কর্তব্য। কমিশন বলেছেন—"Besides helping in the selection and counselling of students, tests can be of a great help to the teacher. Fruitful and competent teaching depends very largely on knowing the facts" (ছাত্রদের সাহায্য এবং পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও শিক্ষকের কাছে এই পরীক্ষাগুলো খুবই সহায়ক। তথ্যসমূহের জ্ঞানের ওপরে দক্ষ এবং ফলপ্রদ শিক্ষাদান নির্ভর করে।)

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার যোগ্যতা

কিন্তু এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা সমূহের পরিচালনা উপযুক্ত শিক্ষণ ছাড়া শিক্ষকদের পক্ষে সহজ নয়। তাই এর জন্যে শিক্ষকদের উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। এর থেকে সন্তোষজনক ফলাফল লাভ কোরতে হলে এইরূপ শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষকদের মধ্যে এর অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের একটা অপরিহার্য কর্তব্য। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন যেখানে বলেছেন, পরীক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারই হচ্ছে শিক্ষাজগতের প্রথম শর্ত ও করণীয় বিষয়, সেখানে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে এ বিষয়ে উপযুক্ত চর্চা ও অনুশীলনের অভাব থাকলে তা বড়ই ক্ষোভের বিষয়। অথচ আমাদের দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণভাবে তাই ঘটছে। পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কতকগুলো বাঁধা সমালোচনা এবং তার সংস্কার সম্পর্কে কতকগুলো বাঁধা বুলি না শিখিয়ে যদি হাতেকলমে সংস্কারের কাজটা কিভাবে করা যায় তা দেখিয়ে দেওয়া যায়, তবে একটা কাজের মত কাজ হয়। বস্তুতঃ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাসমূহ সম্পর্কে আমাদের শিক্ষকসমাজের ধারণা অস্পষ্ট এবং

নৈর্বক্তিক পরীক্ষা পরিচালনায় আমাদের অসুবিধা

এর জন্য যে সকল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও যন্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন তার সম্পর্কেও তারা তেমন ওয়াকিবহাল নন। এ কাজের সূত্রপাত শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে হতে পারে এবং জাতীয় সাধারণ মানের ভিত্তিতে জাতীয় পরীক্ষা-সংস্থাও তারাই গড়ে তুলতে পারেন। তাদের উদ্যোগ থাকলে সরকারী শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের সাহায্যও তারা অনায়াসে লাভ কোরতে পারবেন। সরকারী শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও এদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আমরা শিক্ষকেরা তো বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-বিধি প্রচলন কোরতে চাই, কিন্তু তার জন্যে উপযুক্ত উপকরণ ও শিক্ষা কোথায় পাই? আমাদের দেশে যে এই অভাব পূরণের জন্য কিছু কিছু কাজ না হচ্ছে তা নয়। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোও যে একেবারে কিছু কোরছেন না, তাও নয়,—তবে প্রয়োজনের তুলনায় উদ্যোগ খুবই অল্প, আর তার প্রয়োগ অল্পতর। অথচ পরীক্ষা-বিধির উপরি-বর্ণিত বৈজ্ঞানিক সংস্কার সাধিত হলে শিক্ষাজগতের কী অমূল্য উপকারই না হোতো। আবার রাধকৃষ্ণণ কমিশনের কথাই উদ্ধৃত কোরছি—

বৈজ্ঞানিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক কলাকৌশল আয়ত্তীকরণের গুরুত্ব

"শিক্ষাগত পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষক-সমাজ যদি বৈজ্ঞানিক এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক কলাকৌশল আয়ত্ত কোরতে পারেন, তাহলে পাঠক্রমের নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের এবং শিক্ষাদানের ব্যবহারিক প্রক্রিয়াসমূহের সচেতন উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হবে। উন্নতি পরিমাপের নিমিত্ত প্রায় সূক্ষ্ম এবং নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শিক্ষকগণ তাঁদের কাজের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ অনুসরণে আগ্রহী হবেন এবং তাদের পরিমাপে বর্তমানে বহিঃ-পরীক্ষার ওপরে যে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তা হ্রাস করার পক্ষে সাধারণভাব খুবই উপযোগী হবে।" অর্থাৎ শিক্ষকদের শিক্ষা-পরিমাপের বৈজ্ঞানিক ও পরিসংখ্যানসম্মত প্রণালীগুলোতে শিক্ষিত কোরে তুলুন; তাঁরা সেই প্রণালীগুলো অবলম্বন কোরলেই পাঠ্য বিষয়-সমূহের একটা নৈর্ব্যক্তিক, বস্তুগত সমীক্ষার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং শিক্ষাদান-কাজের উন্নতিবিধানের একটা সচেতন প্রয়াসও তা থেকে সৃষ্টি হবে। সূক্ষ্ম এবং নির্ভরযোগ্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর উন্নতি পরিমাপ কোরতে হবে, অতএব শিক্ষকের কাজের লক্ষ্য কি, তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। এই ধরনের পরিমাপ বিশেষ কোরে বহিঃ-পরীক্ষায় যে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় তা কমিয়ে আনতে মূল্যবান সাহায্য দান কোরবে। এই ফলশ্রুতি অবশ্যই পরম সুখকর, কিন্তু সংস্কারের উদ্যোগটাই এখনও আদর্শে পরিস্ফুট নয়, সেটাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

রচনা-ধর্মী পরীক্ষার সংস্কার

এবার দেখা যাক, কেতাবী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচলিত রচনাধর্মী (essay type) পরীক্ষাকে কি ভাবে সংস্কার কোরে আমরা তার উপযোগিতা বাড়াতে পারি। একটা জিনিস পুরাতন, মাত্র এই অভিযোগে তাকে কখনই খারিজ করা যায় না।

তাকে দণ্ড দেবার আগে তার মামলা লড়বার উপযুক্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে এবং দেখতে হবে তার অপরাধের তুলনায় দণ্ড যেন গুরুতর না হয়। আর সংশোধনের যতটা অবকাশ আছে, তার সুবিধাও তাকে ততটা অবশ্যই দিতে হবে।

এর গুণাবলী কি কি, তাও দেখা যাক। "রচনাধর্মী পরীক্ষাগুলির আয়োজন এবং পরিচালনা সহজ, বস্তুতঃ পাঠক্রমের সকল বিষয়ের জন্য এগুলি ব্যবহার করা চলে এবং নৈর্ব্যক্তিক-পরীক্ষার যে গুণগুলো নেই, যথা—তুলনা করা, তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করা, সমালোচনা করা এবং অন্যান্য ধরনের উচ্চতর মানসিক ক্রিয়ার পরিমাপ করা, এই পরীক্ষা-পদ্ধতিতে সেই গুণগুলো আছে।" (রাধাকৃষ্ণন কমিশনের রিপোর্ট)।

রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণাবলী

এর সম্পর্কে বিচারের রায়টাও কমিশনের ভাষাতেই দেওয়া যাক—"এককভাবে এই পরীক্ষাপদ্ধতি সার্থক মূল্যায়নের মৌলিক শর্তগুলো পরিপূরণ কোরতে পারে না, তবে অন্যান্য নৈর্ব্যক্তিক প্রকরণসমূহের সহায়তায় একে খুবই উপযোগীভাবে প্রয়োগ করা যায়। উপরন্তু, যতদিন না শিক্ষার সর্বস্তরে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাসমূহ প্রবর্তন করা যাচ্ছে, ততদিন এই পদ্ধতিই চালু থাকবে। অতএব, এই পদ্ধতির উন্নতিসাধন সমস্ত শিক্ষা-সংগঠনগুলিরই অবশ্য কর্তব্য। পরীক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচনে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ধরনে এবং নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়ায় এই উন্নতি ঘটানো দরকার। পরীক্ষার সঠিক উদ্দেশ্যটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, উভয়েরই উপলব্ধি করা দরকার। এই পদ্ধতিতে পাঠক্রমের বিষয়াদি-সংশ্লিষ্ট চিন্তা, সূক্ষ্ম যুক্তি, সমালোচনামূলক বিবরণ সৃজনশীল ব্যাখ্যা এবং অন্যপ্রকার মানসিক ক্রিয়ার ওপরে সুস্পষ্টভাবে জোর দিতে হবে। প্রধানতঃ সমস্যা ও সম্পর্ক-নির্ণয় সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে এ পদ্ধতি প্রয়োগ কোরতে হবে।"

কি কি ক্ষেত্রে কিভাবে এই পরীক্ষার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়

এ ধরনের পরীক্ষার উপযোগিতা বৃদ্ধির জন্য প্রশ্নপত্র রচনার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি কমিশন মনোযোগ আকর্ষণ কোরেছেন—

(১) প্রশ্নটি কি বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়গুলির সাথে সম্পর্কান্বিত?

(২) প্রশ্নটি যদি সাধারণ খুঁটিনাটি সংক্রান্ত হয়, তবে তা ঐ বিষয়ের অন্যান্য তথ্য, ধারণা ও মতবাদগুলির সমন্বয়সাধনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কি না?

(৩) প্রশ্নটি মূল্যায়নের ওপরে জোর দিচ্ছে, না সম্পর্ক-নির্ণায়ক চিন্তার ওপরে জোর দিচ্ছে?

(৪) প্রশ্নটি কি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যাতে শিক্ষার্থীর চিন্তা উদ্বুদ্ধ হয় এবং তার আগ্রহ উদ্দীপিত হয়?

(৫) প্রশ্নটি শিক্ষার্থীর আগ্রহসমূহ কেন্দ্র কোরে তার ধারণাসমূহকে সংবদ্ধ কোরছে কি না?

(৬) প্রশ্নটি এমনভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে কি না যাতে শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞানের ও তথ্যের বিস্তৃত নমুনা উপস্থিত কোরতে বাধ্য হয়?

(৭) প্রশ্নটি কি শিক্ষার্থীকে তার চিন্তা-সংগঠনের ও প্রকাশের কোনো মৌলিকতা প্রদর্শন কোরতে উৎসাহিত করে ?

(৮) প্রশ্নটি কি বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে সংবদ্ধ কোরতে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রেরণা দেয় ?

(৯) শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশ্নটির যথাযোগ্য উত্তর লিখতে পারে এমনভাবে প্রশ্নটিকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে কি না ?

রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্য আর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য "রচনাধর্মী পরীক্ষার অন্যান্য গুরুতর ত্রুটিগুলি কমাবার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে হবে.। যথা, প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষায় ব্যক্তিগত অভিরুচি ও তার ফলে নম্বর দেওয়ার অসঙ্গতিকে বহুল পরিমাণে কমানো যায় যদি কতকগুলো সতর্কতা অবলম্বন করা যায় এবং খুব নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।"

নম্বর দেওয়ার ফারাক কমানো বিষয়ে সতর্কতা

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রচলিত রচনাধর্মী পরীক্ষাকে আমরা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি না। তাকে উপরে বর্ণিত উপায়ে সংশোধন কোরে নিয়ে নতুন জীবনের পরোয়ানা দিতে হবে। তাতে আমাদেরও আপত্তি নেই।

সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জী

এবার দেখা যাক, কেতাবী বিদ্যা (intellectual pursuits) ছাড়া শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিকাশকে আমরা কিভাবে পরিমাপ কোরতে পারি। শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ও উন্নতির পরিমাপের কথায় মুদালিয়র কমিশন বলেছেন, "এই উদ্দেশ্যে প্রতি শিক্ষার্থী প্রতি দিন, প্রতি মাস, প্রতি টার্ম, প্রতি বৎসর যে কাজ কোরেছে তা নির্দেশ করার জন্য স্কুল-রেকর্ড রাখার একটা উপযুক্ত প্রথা চালু কোরতে হবে। প্রতি শিক্ষার্থী তার শিক্ষার প্রতি স্তরে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানান্বেষণে কতখানি কৃতিত্ব অর্জন কোরেছে এই রেকর্ডে তার সুস্পষ্ট এবং ধারাবাহিক বিবরণ থাকবে। এতে তার অন্যান্য দিকের —যথা, তার আগ্রহাদি, প্রবণতা, ব্যক্তিত্বের গুণসমূহ, সামাজিক সামঞ্জস্য-বিধানের ক্ষমতা, ব্যবহারিক সামাজিক কার্যাবলীর উন্মেষ ও বিকাশের ধারাবাহিক মূল্যায়নও উল্লিখিত থাকবে। এগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্য কথায়, এই রেকর্ড হচ্ছে তার জীবনগঠনের নিমিত্ত সকলপ্রকার কাজের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। এমনি রেকর্ড······সমগ্র দেশের সকল স্কুলেই সাধারণভাবে প্রচলিত হওয়া উচিত।"

ইহার আবশ্যকতা

এই রেকর্ড সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা অপেক্ষা মুদালিয়র কমিশন এই রেকর্ডের যে নমুনা প্রস্তুত কোরেছেন, ঐ নমুনা অনুধাবন কোরলেই শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ পরিমাপের একটা রূপরেখা মনে এঁকে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তার সূত্রগুলির প্রয়োগ ও ব্যবহারই আসল কথা এবং বেশ কঠিন কাজ। আসলে পরীক্ষা

ইহা শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপের রূপরেখা

বা শিক্ষার মূল্যায়নকে আমরা যত সহজ কাজ বলে মনে করি, সেটা তা নয়। তার জন্যে শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের মনোযোগ, অভ্যাস, পরিশ্রম ও যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। এ জিনিসটাকে আমরা বর্তমানে "অতি সরলীকরণ" কোরে নিয়েছি, আর সেখানেই হয়েছে বিপদ। মুদালিয়র কমিশনের Cumulative Record-card (সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জী)-এর নমুনা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমিশন প্রস্তাবিত আরও কয়েকটি ছক সকল শিক্ষকের—বিশেষতঃ সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের পক্ষে পরম সহায়ক উপকরণ। এগুলি তাঁরা অবিলম্বে নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রবর্তন করার চেষ্টা কোরবেন বলে আমরা আশা করি।

অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃ-পরীক্ষা

এইবার পরীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি প্রধান বক্তব্য অবশিষ্ট থাকে। সেটা হচ্ছে অন্তঃ-পরীক্ষা ও বহিঃ-পরীক্ষা নিয়ে। অন্তঃ-পরীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি এবং বহিঃ-পরীক্ষার গুরুত্ব হ্রাসই হচ্ছে এই সমস্যার মূল বিষয়। সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জীর নীতি ও প্রয়োগকে স্বীকার কোরে নেওয়ার সাথে সাথে অন্তঃ-পরীক্ষার বিশিষ্ট স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। বস্তুতঃ অন্তঃ-পরীক্ষাকে আমাদের বর্তমান মূল্যায়ন-ব্যবস্থায় প্রায় উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। তাই বহিঃ-পরীক্ষার গুরুত্ব অস্বাভাবিক অস্বাস্থ্যকরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাসমূহের প্রয়োগ এবং সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জীর ব্যবহার এই অস্বাভাবিক অবস্থায় উপযুক্ত প্রতিষেধক বলে মনে করা যায়। এদের দ্বারা অন্তঃ-পরীক্ষার গুরুত্বও বৃদ্ধি পায় এবং বহিঃ-পরীক্ষার উপযুক্ত আসনটিও নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বহিঃ-পরীক্ষার প্রয়োজন কেন, রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের এই একটা কথাতেই তা স্পষ্ট : এখানে রয়েছে, the demand of society for the hall-mark. A final examination around will be seemed necessary." মুদালিয়র কমিশনের বক্তব্য বিস্তৃততর "শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওপরে বহিঃ-পরীক্ষার একটি উদ্দীপনা-সৃষ্টিকারী ক্ষমতা আছে। কারণ এর দ্বারা মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং নৈর্ব্যক্তিক মান উপস্থিত করা হয়। শিক্ষার্থীর কাছে পরীক্ষা হচ্ছে একটি লক্ষ্য যেখানে তাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পৌছবার জন্য চেষ্টা কোরতে হবে, তার জন্যে পরীক্ষা তাকে তাগিদ ও প্রেরণা দেয় এবং স্থির ও নিয়ত প্রচেষ্টায় দাবি করে। এর ফলে পঠন-পাঠনে উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট হয় এবং উপস্থাপন-পদ্ধতিও সুনির্দিষ্ট হয়। একটা বহিঃস্থ, নৈর্ব্যক্তিক (ব্যক্তিসম্পর্ক-শূন্য) পরীক্ষার মাধ্যমে তার বিচার হয়। এই পরীক্ষার ওপরে সে নিজে এবং তার ব্যাপারে আগ্রহী সকলেই নির্ভর কোরতে পারে। সর্বশেষে, এ তাকে সর্বজনস্বীকৃত একটি প্রমাণ-পত্র (hall-mark) প্রদান করে।

অন্তঃ-পরীক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি

বহিঃ-পরীক্ষার আবশ্যকতা

"শিক্ষকমহাশয়ের পক্ষেও একটা লক্ষ্য ও উদ্দীপনা তাঁর কাজের যথেষ্ট সহায়ক। এগুলি না থাকলে তাঁর কাজ সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারে এবং সুনির্দিষ্টতা হারাতে পারে। বহিঃ-পরীক্ষা সকল শিক্ষকের জন্য একটা সাধারণ মান উপস্থিত করে এবং তার ফলে এই পরীক্ষার চরিত্র হয় সার্বজনীন এবং সমরূপ-সম্পন্ন (universal and uniform)। তার নিজের শিক্ষার্থীদের কাজের ফলাফল বিচারের ভুলের হাত থেকেও এই বহিঃ-পরীক্ষা তাকে অব্যাহতি দান করে। সর্বশেষে, এ পরীক্ষার আর একটা মস্ত বড় সুবিধা আছে—তা হোল, একটা স্কুলের সাথে নিজের কাজের তুলনা করার সুযোগ পায়।"

ইহা শিক্ষকের কাজের সহায়ক

মৌখিক পরীক্ষা

এর পরে আসে আমাদের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবিত মৌখিক পরীক্ষার কথা। মৌখিক পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্রদের বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, জ্ঞান, কৌশল, সাহস, স্বাস্থ্য, আত্মনির্ভরতা ও অন্যান্য প্রকার মানসিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে আমাদের দেশে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা-সমূহের যথেষ্ট প্রচলন হোলে এবং সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জীর উপযুক্ত প্রয়োগ হলে পৃথক মৌখিক পরীক্ষার কোন আবশ্যকতা থাকবে বলে মনে হয় না। কারণ মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা যেসব উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া সম্ভব তা ঐ সকল ব্যবস্থা থেকেই লাভ করা যায়।

ইহার আবশ্যকতা

পরীক্ষা বনাম মূল্যায়ন

আমরা প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থার কি কি সংস্কার চাই এবং কি কি নতুন ব্যবস্থার প্রবর্তন চাই তা এতক্ষণ আলোচনা কোরেছি। এখন সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে এই নতুন মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ার কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তা বিচার কোরে দেখতে হবে। আমরা এতক্ষণ পরীক্ষা ও মূল্যায়নকে সমার্থক ধরেই আলোচনা কোরে এসেছি। কিন্তু সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে পরীক্ষা কথাটিকে আর উল্লেখ করা হচ্ছে না; তার পরিবর্তে মূল্যায়ন কথাটাই প্রচলিত হয়েছে। কেন? পরীক্ষা ও মূল্যায়নের তফাত কি? পরীক্ষার সার কথা হচ্ছে একটা বিষয়বস্তু পড়ে তা থেকে কি বিদ্যালাভ হোলো তা যাচাই করা। এ লাভটা খুবই সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে মূল্যায়ন হচ্ছে একটা প্রশস্ততর দৃষ্টিসঞ্জাত ধারণা, তা বোঝায় ব্যক্তির বুদ্ধি ও বিকাশের মূল্যায়ন। সমাজবিদ্যায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলি হোলো :—

পরীক্ষা ও মূল্যায়নের তফাত

(১) সমাজবিদ্যার বিষয়বস্তুর পঠন-পাঠনের উদ্দেশ্যসমূহ বিচার ও বিশ্লেষণ।

(২) শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্য দিয়ে সেগুলির রূপায়ণ (ঐ নিরূপিত উদ্দেশ্যগুলোর প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে কি ঈপ্সিত পরিবর্তন ঘটাবে)।

(৩) সার্থক, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রের নির্মাণ যার সাহায্যে শিক্ষার্থীর আচরণের বিশিষ্ট স্তরসমূহ, যথা—তার জ্ঞান, তথ্যসংগ্রহ, দক্ষতা, প্রবণতা, রসবোধ, ব্যক্তিগত ও সমাজগত সামঞ্জস্যবিধান, আগ্রহ এবং কার্যাভ্যাসসমূহ লক্ষ্য করা যেতে পারে। (Lindquist Educational Measurement)

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা

মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা কোথায়? মূল্যায়নের ফলেই আমরা জানতে পারি সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতখানি পূরণ হোলো। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়েই জানতে পারে শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞানলাভ কোরলো, কি কি কাম্য আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গী সে লাভ কোরলো, সামাজিক জীবনের উপযোগী কি কি দক্ষতা সে লাভ কোরলো—আর এইসব জানবার পর শিক্ষার্থী তার প্রয়াস বৃদ্ধি কোরতে পারে এবং শিক্ষক তার সমস্যা অনুধাবন কোরে তাকে অধিকতর সাহায্য কোরতে পারেন। তাছাড়া, সমাজবিদ্যার মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই শিক্ষক জানতে পারেন তার অনুসৃত পদ্ধতি ও প্রণালীগুলো ঠিক ঠিক কার্যকর হচ্ছে কিনা এবং তার পরিকল্পিত পাঠ্যতালিকা অনুসরণ কোরে তিনি পরীক্ষার্থীকে কতখানি সমাজ-সচেতন কোরে তুলতে পেরেছেন—তার পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে শিক্ষার্থী তার বয়স ও শ্রেণী অনুযায়ী উপযুক্ত জ্ঞান লাভ কোরেছে কিনা। মূল্যায়নের ফলেই তো কাজের ফাঁকগুলো ধরা পড়ে এবং তার থেকেই শিক্ষক নতুন কোরে আবার উপযুক্ত পরিকল্পনা গড়ে নিতে পারেন। আবার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই ধরা পড়ে। আর ঘন ঘন এরকম মূল্যায়ন হলে শিক্ষার্থীর উন্নতি-অবনতির দিকটা বেশ নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে।

শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষেই মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষার্থীর উন্নতির নির্ভরযোগ্য পরিমাপ

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে শিক্ষার যা প্রকৃত উদ্দেশ্য, মূল্যায়নের দ্বারা তারই সিদ্ধি কতটা সম্ভব হোলো তা পরিমাপ করা হয়। শিক্ষার্থীর জ্ঞান, কাম্য আচরণের বিকাশ, সমাজ-উপযোগী কাজের দক্ষতালাভ, উপযুক্ত রসবোধ, প্রয়োজনীয় অভ্যাসসমূহ ও আগ্রহ—এককথায় ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশের যা যা অঙ্গ, সমাজবিদ্যায় তার মূল্যায়ন করা হয়।

কিসের মূল্যায়ন

সমাজবিদ্যা শিক্ষাদানের লক্ষ্য শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ, "সমগ্র শিশু" ("whole child") হচ্ছে এর মূল কথা। এর মূল্যায়নের মূল কথাও তাই। শিক্ষা একটা গতিশীল নিয়ত ধারা, মূল্যায়নও হবে তার অনুরূপ আর একটি নিয়ত ধারা—সদা সর্বদা নানাবিধ পরিস্থিতির মধ্যে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ কোরতে হবে। এর জন্যে নানাবিধ উপায় চাই। অল্প দু'একটি অথবা একধরনের ব্যবস্থার

মূল্যায়ন হবে সমগ্র শিশুর

মধ্য দিয়ে শিশুর বিকাশের মূল্যায়ন করার চেষ্টা সঙ্গত হবে না। এর জন্য নানাবিধ উপায় নির্ধারণ কোরতে হবে। যথা—বুদ্ধির পরীক্ষা, সম্ভাবনা নিরূপণের পরীক্ষা, কর্মসম্পাদন পরীক্ষা, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা, রচনা-ধর্মী পরীক্ষা, সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জী রচনা প্রভৃতি। আমরা সাধারণভাবে পরীক্ষা-সংস্কারের কথা যখন আলোচনা কোরেছি তখন এই তালিকার প্রায় প্রত্যেকটি ধরনের পরীক্ষা সম্পর্কেই আলোচনা কোরেছি। সেগুলো নিয়ে নতুন কোরে আর বেশী আলোচনা করার অবকাশ নেই। শুধু কতকগুলো প্রয়োজনীয় সূত্র উপস্থিত কোরে বক্তব্য শেষ কোরবো।

মূল্যায়নের নানাবিধ উপায়

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা

সমাজবিদ্যার নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাসমূহের প্রয়োজনীয়তা কি? অধ্যক্ষ Taneja-র ভাষায় তারা শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত দক্ষতাসমূহ প্রকাশ করেঃ—

(১) সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষমতা ;

(২) উদাহরণ দানের ক্ষমতা ;

(৩) একটা বিবরণ বা ঘটনাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে বিচার করার ক্ষমতা ;

(৪) ম্যাপ, চার্ট, ডায়াগ্রাম, গ্রাফ এবং টেবল (তথ্যসমূহের শ্রেণীবদ্ধ সমাবেশ) ইত্যাদি অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা ; এবং

(৫) সঠিক অনুমান ও মন্তব্য করা এবং সাধারণ-সূত্র নির্ধারণ করার ক্ষমতা। (*Teaching of Social Studies, P-274*)

এই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র বিভিন্ন প্রকার রচিত হোতে পারে। আমি এখানে যে প্রকারগুলির নাম উপস্থিত কোরছি, সেগুলো অনুযায়ী প্রশ্নপত্রের নিদর্শন পরিশিষ্টে সংযোজিত করা হোয়েছে। বিভিন্ন ধরনের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নাম— (১) বক্তব্য পূরণ ; (২) সত্য-মিথ্যা অথবা হাঁ না নিশ্চয়, (৩) অনেক উত্তর থেকে সঠিক উত্তর নির্ণয় (Multiple choice) (৪) সমন্বয় (Matching) (৫) সংস্থাপনা কোনো নির্দেশিত নীতি অনুযায়ী ঘটনা বিষয় প্রভৃতি সাজানো (৬) সংজ্ঞা নির্ণয়, (৭) সম্পর্ক নির্ধারণ (৮) শ্রেণী বিচার (Classification Test) (৯) পার্থক্য নির্ণয় (Distinction), (১০) স্মৃতি-মন্থন (Recall) এবং (১১) মানচিত্র পরীক্ষা প্রভৃতি।

বিভিন্ন প্রকারগুলির নাম

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে রচনাধর্মী পরীক্ষা

রচনাধর্মী পরীক্ষার গুণাগুণ আমরা পূর্বেই আলোচনা কোরেছি। সে আলোচনা সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। রচনাধর্মী পরীক্ষায় এক প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মন অনেকখানি প্রকাশিত হত। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় সুনির্দিষ্ট দুই-একটি

শব্দের উত্তরের মধ্য দিয়ে তা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত হোয়েছে কিনা তা রচনাধর্মী পরীক্ষা থেকে ভালভাবে জানা যায়। তার মতামত যুক্তিতর্ক এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গীর হদিস পাওয়া যায়। আর বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী ছাত্রেরা নানা উৎস থেকে সংগৃহীত প্রচুর তথ্যাদি এবং বিভিন্ন যুক্তিতর্ক ব্যবহার করার সুযোগ পায় এবং তার থেকে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর জ্ঞান এবং তার পরিবেশ সম্পর্কে কতখানি সার্থক ধারণালাভ হয়েছে তা আমরা জানতে পারি। রচনাধর্মী পরীক্ষার আর একটা প্রকারভেদ সম্ভব। তা হচ্ছে মাঝে মাঝে কতকগুলো বিষয় নির্দিষ্ট কোরে শিক্ষার্থীকে তার ওপর প্রবন্ধ লিখতে দেওয়া। নিজের পাঠ্য এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বইগুলো থেকে শিক্ষার্থী সাহায্য নিয়ে তথ্য ও যুক্তিসমূহ উপযুক্তভাবে সাজিয়ে প্রতিপাদ্য বিষয়টি প্রতিপন্ন কোরবে। এর দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও রচনা-শক্তির হদিস পাওয়া যেমন সম্ভব, তেমনই তার চরিত্র ও অন্য নানাবিধ গুণ কি অর্জিত হয়েছে তা জানা যাবে। রচনাধর্মী পরীক্ষার একটা সহায়ক অঙ্গ হিসাবে এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। বস্তুতঃ বাড়ীর কাজ আমরা শিক্ষার্থীদের প্রায় প্রত্যহ দিয়ে থাকি। এটা তাকেই আরও সুনির্দিষ্ট এবং বিস্তৃততর কোরে দেওয়া ও তার একটা মূল্য নির্ধারণ করা, একথাও বলা যেতে পারে।

ইহার গুণ

একটা সহায়ক অঙ্গ

কাম্যদৃষ্টিভঙ্গী, আচরণ ও দক্ষতা-অর্জনের পরিমাপ

এইবার কাম্যদৃষ্টিভঙ্গী ও আচরণ এবং সমাজ-উপযোগী দক্ষতাসমূহ অর্জনের পরিমাপ কি কোরে করা যায় তার কথা। এগুলি সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের একটা মৌলিক লক্ষ্য। এগুলির সঠিক হদিস রাখা সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জীর দ্বারাই সম্ভব। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা এবং সমাজবিদ্যার ব্যবহারিক কাজকর্মের কথা আলোচনা কোরে এসেছি। সেখানে আমরা নানাবিধ ম্যাপ, মডেল, প্ল্যান, চার্ট তৈরি করা, আলোচনা, বিতর্ক-সভা ইত্যাদি করা, সকল পরীক্ষার্থীর সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজবিদ্যার পাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করা, বিদ্যালয়ের দেওয়াল-পত্র এবং সমাজবিদ্যা-পত্রিকা রচনা করা, ভ্রমণ করা ও ভ্রমণবিবরণ প্রস্তুত করা, স্থানীয় সামাজিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক তথ্যাদির অনুসন্ধান করা ও তার ভিত্তিতে স্থানীয় সমাজবিবরণ প্রস্তুত করা, প্রদর্শনী, খেলাধুলা, সমাজবিদ্যার কক্ষকে সুসজ্জিত করা প্রভৃতি বহু প্রকারের কাজের কথা উল্লেখ কোরে এসেছি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এইসব বিভিন্ন প্রকার কাজে ছাত্রের বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস, কুশলতা, যোগ্যতা, সহযোগিতার মনোভাব, নানাপ্রকার অনুকূল অথবা প্রতিকূল অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যসাধনের প্রয়াস প্রভৃতি শিক্ষকমহাশয়কে

সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জীর সাহায্যে মূল্যায়ন

প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মূল্যায়ন কোরে সঞ্চয়শীল তথ্য-পঞ্জীতে তার নিদর্শন রাখতে হবে। সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জী সমাজবিদ্যার শিক্ষকের পক্ষে এক অমূল্য উপকরণ, এর সদ্ব্যবহার দ্বারাই প্রতি শিক্ষার্থীর কাজের ও আচরণের (এবং সেই সাথে জ্ঞানেরও) উপযুক্ত মূল্যায়ন সম্ভব। আর তার বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষার্থীর পরবর্তী উন্নতির ব্যবস্থাও করা যায়। সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জীর নিদর্শন আমরা পরিশিষ্টে উপস্থিত কোরবো। অতএব এখানে এবিষয়ে আর অধিক আলোচনার আবশ্যকতা নেই।

প্রবণতা পরীক্ষা (Aptitude Test)

সমাজবিদ্যার মূল্যায়নের আর একটি মূল্যবান অঙ্গ হোলো শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গীর (অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণধারার) পরীক্ষা, ইংরাজীতে যাকে বলা হয় **Aptitude Test.** সমাজবিবেক, সমাজ-সচেতনতা ও সামাজিক যোগ্যতা অর্জন হচ্ছে সমাজবিদ্যা-শিক্ষার্থীর পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য। শিক্ষকমহাশয় শিক্ষার্থীর মধ্যে এই গুণগুলোর বিকাশ হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবেন এবং তাদের বিকাশ ও পরিণতির কাজে শিক্ষার্থীদের সাহায্য কোরবেন। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই গুণগুলোর বিকাশ পরীক্ষা করা যায় দৃষ্টিভঙ্গীর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। এদিক দিয়ে এটি একটি মূল্যবান মূল্যায়ন প্রক্রিয়া। নিচে উদাহরণগুলো থেকে এ কথাটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে—

অনুভূতি, চিন্তা ও আচরণ ধারার মূল্যায়ন

(১) একজন ট্রাক-ড্রাইভার দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে গাড়ী চালিয়ে কালনা-বর্ধমান রোডের ওপরে একজন লোককে চাপা দেয়। একদল লোক ক্রুদ্ধ হোয়ে তখন ড্রাইভারকে তাড়া করে; ড্রাইভারটি ভয় পেয়ে রাস্তার ধারে একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয় এবং সেখানে ডুবে মারা যায়।

তুমি ড্রাইভার এবং জনতার ব্যবহার সম্পর্কে কি মনে কর?

(২) সম্প্রতি কলিকাতা বেতার থেকে একটি যুবকের অপরাধ-জীবনের সূত্রপাত নিয়ে একটি নাটক প্রচারিত হয়েছে। বোম্বাই শহরে সে ছিল সহায়-সম্বল এবং আত্মীয়-বান্ধবশূন্য। তার মা ছিলেন অসুস্থ এবং সেই সময়ে তার চাকুরিটিও চলে যায়। সে এমন একজন লোকের সাথে পরিচিত হয়—যে ছিল পকেটমারদলের নেতা। অভাবের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত সে তারই সাহায্য নেয় এবং অপরাধীদলে যোগ দিয়ে অপরাধ-জীবন সুরু করে।

ঐ যুবকের আচরণ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? অনুরূপ অবস্থায় পড়লে তুমি কি কোরতে?

দেখা যাচ্ছে, সংক্ষিপ্ত উত্তর-ধর্মী প্রশ্ন এবং রচনাধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে দৃষ্টিভঙ্গীর পরীক্ষা নেওয়া চলে। তবে এক্ষেত্রে বড় কথা হচ্ছে শিক্ষার্থী যেন তার নিজের

মনোভাব ও চিন্তাধারাই প্রকাশ করে। শিক্ষকমহাশয় কি উত্তর পেলে খুশী হবেন সে চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে সে যেন নিজের মনোভাব গোপন না করে। তাহলে সে ধরনের পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্যটাই নষ্ট হবে।

সমাজবিদ্যায় মৌখিক পরীক্ষা

স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে মৌখিক পরীক্ষার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ সমাজবিদ্যা পরীক্ষায় মৌখিক প্রশ্নোত্তরের দ্বারা মূল্যায়নের একটা সুযোগ থাকা আবশ্যক। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মৌখিক আলোচনার দ্বারা শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী, সাধারণ চরিত্র, সমাজ-বিবেক, পরিবেশ-সচেতনতা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের পরিমাপ করা যায়। তবে এই ধরনের মৌখিক প্রশ্নোত্তরে ছাত্রেরা সাধারণতঃ সুবিধা কোরতে পারবে না। তাদের জন্য অন্যান্য প্রকার পরীক্ষাই উপযুক্ত হবে।

ইহার প্রয়োগ

মূল্যায়নে শিশুকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিগত পার্থক্য বিচার

বস্তুতঃ মূল্যায়নের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে উপযুক্তভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা। সকলের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতি সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে যে ধরনের প্রক্রিয়ায় উপযুক্ত সাড়া পাওয়া সম্ভব, তাকে সেই ধরনের প্রক্রিয়ার দ্বারাই পরীক্ষা কোরতে হবে। সহজে পাস ও ফেলের মার্ক দিয়ে দেওয়া মূল্যায়নের কাজ নয়—আসলে ওতে শিশুর শিক্ষা-সংহার হয়, উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী ঘটে। আধুনিক শিক্ষার ধারণা ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার মুল্যায়ণ কাজটিতেও তাই বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। তা না হলে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা paido centric না হয়ে exam - nation-centric হয়েই থাকবে। এটা শিক্ষার পরিহাস। সমাজবিদ্যার শিক্ষক এই পরিহাস কখনই মেনে নিতে পারেন না। গণতান্ত্রিক স্বাধীন-ভারতে ব্যক্তির সম্ভাবনা ও স্বাধীনতাকে আমরা কিছুতেই খর্ব কোরতে পারি না, প্রত্যেক শিশুর স্বতন্ত্র প্রয়োজন ও সম্ভাবনাকে মোটেই অবহেলা কোরতে পারি না। তাই শিক্ষার ন্যায় শিক্ষার মূল্যায়নকেও আজ আমাদের paido centric (শিশু-কেন্দ্রিক) কোরে তুলতে হবে।

প্রত্যেক শিশুর স্বতন্ত্র প্রয়োজন ও সম্ভাবনার মূল্যায়ন

দুটি সিলেবাসের মূল্যায়ন প্রসঙ্গ

সমাজবিদ্যার ক্ষেত্রে দুটি সিলেবাস চালু হয়েছে। একটা একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় এবং অপরটি দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে। প্রথম ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূল্যায়ন

বিদ্যালয়ের অন্তঃ-পরীক্ষার ওপরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত বহিঃ-পরীক্ষার দ্বারা উক্ত বিষয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মূল্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে শেষোক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজকর্মের সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আশা করি শিক্ষার্থীদের এই সকল কাজেও মূল্যায়ন করা হবে। আর তার ফলে অন্তঃ-পরীক্ষা ও বহিঃ-পরীক্ষার যুগ্ম নীতিটি এক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হবে। একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার শিক্ষক বহিঃ-শিক্ষার দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেয়ে অনেক স্বাধীনতা লাভ কোরেছেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ও নিজের পরিকল্পনানুযায়ী সমাজবিদ্যার পঠন-পাঠন ও মূল্যায়নের অবাধ স্বাধীনতা পেয়েছেন। শিক্ষকের এই স্বাধীনতা খুবই মূল্যবান জিনিস এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক নীতিও বটে। তবে স্বাধীনতার সার্থকতা নির্ভর করে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের ওপরে। সমাজবিদ্যার শিক্ষক এ কথাটা যেন সর্বদাই অবশ্য স্মরণ রাখেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ যা আশা করেন, অর্থাৎ সমাজবিদ্যা পঠন-পাঠনের মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি যেন তার দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয়। অনেক শিক্ষকের মধ্যে এবং অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যেও পুরনো ধারণার জের চলেছে। যেহেতু একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে সমাজবিদ্যা বহিঃ-পরীক্ষার বিষয় নয়, অতএব তার পঠন-পাঠনে যেন যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আধুনিক শিক্ষক বিষয়টি দেখবেন একেবারে বিপরীত দিক থেকে—বিষয়নির্বাচন, তার উপস্থাপন, পঠন-পাঠন ও নানাবিধ কর্মপরিকল্পনায় তিনি তাঁর সকল প্রয়াসকে শিশুকেন্দ্রিক কোরে তুলবার একটি অবাধ মূল্যবান সুযোগ পেয়েছেন। আমাদের উপেক্ষা ও শৈথিল্যের দ্বারা যেন এই মূল্যবান্ সুযোগ আমরা নষ্ট না করি। সমাজ-বিদ্যার শিক্ষক শিক্ষকতায় নিজের প্রাপ্ত স্বাধীনতার দায়িত্ব সম্পর্কে যেন সর্বদা সচেতন থাকেন। ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ সকলের কর্তব্য হচ্ছে—the training of the character to fit the students to participate creatively as citizens in the emerging democratic social order ; the improvement of their practical and vocational efficiency so that they may play their part in building up the economic prosperity of their country and the development of their literary, artistic and cultural interest, which are necessary for self-expression and for the full development of the human personality, without which a living national culture cannot come into being. (মুদালিয়র কমিশনে রিপোর্ট)। সমাজবিদ্যার শিক্ষকও এই কর্তব্যের প্রধান অংশীদার। এই কর্তব্যের নির্দেশ তার শিক্ষার্থীদের জীবনে তিনি কতখানি রূপায়িত কোরতে পারেন, তারই মূল্যায়ন তাকে কোরতে হবে—আর তার ফলাফলের দ্বারা সমাজও তার কাজের মূল্যায়ন কোরবে। সমাজ

সমাজবিদ্যা মূল্যায়নের দুই ব্যবস্থা

স্বাধীনতার সদ্ব্যবহারই কাম্য

আজ সমাজবিদ্যার শিক্ষককে সে স্বাধীনতা দিয়েছে, তার সদ্ব্যবহার ও সুফলের দ্বারা তিনি তার সার্থকতা প্রমাণ কোরবেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ নেই।

সমাজবিদ্যা-শিক্ষকের সহায়তা হোতে পারে এই বিবেচনায় একখানা নমুনা প্রশ্নপত্র পরিশিষ্টে সংযোজন করা হবে। এটা মোটেই আদর্শ প্রশ্নপত্র নয়, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে কেমনভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে তারই একটা নিদর্শন মাত্র। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার শিক্ষকের নিজেদের গবেষণা ও প্রয়াসের দ্বারা এ বিষয়ে যথেষ্ট নতুন আলোকসম্পাত কোরতে পারেন এবং মূল্যায়ন-প্রক্রিয়ার যথেষ্ট উন্নতিসাধন কোরতে পারেন। আমরা নিসংশয়ে এই আশা পোষণ করি।

Questions

1. What are the main charges against the present system of examinations ? What measures do you suggest to remove them ?

2. Do you think that examinations should be abolished from the field of education ? Give reasons for your answer.

3. What reforms do you suggest to essay-type examination to enhance its utility in evaluating the work of the pupils ?

4. Name of types of tests you will like to introduce in the educational world to evaluate the work of the pupils. What are their utilities ?

5. Discuss in full length about the objective type tests. Why do the modern educationists lend much support to them ?

6. Discuss the utility of the Cumulative Record Card, especially to the Social Studies teacher.

7. What measures do you propose to evaluate the work of your pupils in Social Studies ?

8. Discuss the merits and demerits of external examinations. How can internal examination, help to remove or minimise the harmful effects of external examinations ?

9. Social Studies has been introduced as an internal examination subject in class XI Schools. Discuss the underlying principles of this system and also point out the brighter aspects of it.

10. New education is paido-centric : new examination should also be paido-centric. How do you hope to achieve this and specially in the case of evaluation in Social Studies ?

11. Evaluation evaluates not only the work of the pupils but also that of the teacher. What importance does this remark lay upon the work of the Social Studies teacher ?

12. Evaluation in Social Studies will evaluate new types of citizens.—Discuss.

চতুর্দশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বিকাশের শিক্ষা

বিজ্ঞান, আধুনিক পৃথিবী ও শিক্ষা

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে বিশাল পৃথিবী আজ মানুষের কাছে ছোট হয়ে পড়েছে। বিমানপথে যোগাযোগ-ব্যবস্থার এতদূর উন্নতি হয়েছে যে কেউ ইচ্ছে কোরলে দিল্লীতে প্রাতরাশ, কায়রোতে মধ্যাহ্নভোজ এবং লণ্ডনে নৈশভোজ সম্পন্ন কোরতে পারে। রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি ব্যবস্থার এতদূর উন্নতি হয়েছে যে অত্যল্প সময়ের মধ্যে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সংবাদ জানতে পারি এবং আমাদের সংবাদ জানাতে পারি। মানুষে মানুষে এই মেলামেশার সুযোগ আজ শুধু জীবনের বহিরঙ্গে নয়, শুধু কয়েকজন মানুষের প্রমোদভ্রমণের জন্য নয়, সমস্ত বিশ্বসমাজের কর্ম-প্রবাহের সাথে তার নাড়ীর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের পরিমাণ এতদূর বেড়েছে যে কোনো দেশে শস্যহানি বা শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হলে বিশ্বের অন্যান্য স্থানে তার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ যন্ত্রশিল্পে তো যন্ত্রাংশ ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় হামেশাই চলছে।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত যোগাযোগের ফল

জলপথ ও বাষ্পীয় জাহাজ আবিষ্কারের সাথে সাথেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে আদান-প্রদান দ্রুততর হয়েছে; বিমানের গতি তাকে আরও দ্রুত কোরেছে। একদিন আধুনিক বিজ্ঞান উন্নত জাতিগুলো বিজ্ঞানের গতি ও শক্তিকে সাম্রাজ্যগঠনের কাজে নিয়োজিত করেছিল। সেদিন সাম্রাজ্যিক স্বার্থ বড় হয়েছিল এবং পৃথিবীর এক জাতির সাথে আরেক জাতির প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মানুষ দীর্ঘকাল এই জাতিতে-জাতিতে অসাম্যের বিরুদ্ধে লড়ে এসেছে এবং আজও লড়ছে। তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতিতে জাতিতে বৈষম্যের নীতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং সমস্ত জাতির সমানাধিকার নীতিতে স্বাধীন ও যৌথ বিশ্বসমাজ গড়ে তোলার নীতি স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুতঃ রাষ্ট্রসংঘ সনদে একথা ঘোষণাও করা হয়েছে। একথা ঠিক, বর্তমান বিশ্বে এই নীতির প্রয়োগের চেয়ে শক্তি ও জাতিদম্ভের প্রয়োগও কম নয়, তবু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে **জাতিতে জাতিতে ও মানুষে মানুষে সমানাধিকারের নীতি নির্মীয়মান বিশ্ব-সমাজের প্রেরণা** আর জাতিদম্ভ এবং অস্ত্র ও অর্থশক্তির অহঙ্কার ক্ষয়িষ্ণু অতীতের বেঁচে থাকার শেষ প্রচেষ্টা।

জাতিতে জাতিতে সমানাধিকার নীতি

বিজ্ঞান বাইরের দিক থেকে মানুষকে যত নিকট কোরেছে, মনের ক্ষেত্রে এখনও তা কোরতে পারেনি। সেটা যে শুধু বিজ্ঞানের দোষ তা নয়। হাজার হাজার বছর ধরে এক একটা দেশ ও অঞ্চলের মানুষ এক এক ধরনের চিন্তা ও শিক্ষায় অভ্যস্ত হয়েছে ; তার মধ্যে যেমন মানবসভ্যতার সম্পদ রয়েছে, তেমনি বহু ভ্রান্ত ধারণাও রয়েছে। কিন্তু মানুষের উত্তরাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ফলে সেসব ভ্রান্ত ধারণাও সহজে অপনোদন হয় না। তাছাড়া, এইসব ধারণা নানা ধরনের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংস্কার, রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের সাথে জড়িয়ে থাকায় তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষকে রক্ষা করা সহজ হয় না। বাস্তব জগতের বৈজ্ঞানিক বিপ্লবগুলোর সাথে তাল রেখে তাই মানুষের মনোজগতেও বিপ্লব ঘটানো দরকার। বৈজ্ঞানিক উপকরণগুলোই আমাদের সাহায্য কোরবে—যথা, দেশবিদেশের গ্রন্থ, সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সিনেমা, বেতার, টেলিভিশন ইত্যাদি। কিন্তু বৃহত্তর মানবসমাজে বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব গঠনের প্রতিকূল উদ্দেশ্যেও এগুলোর প্রয়োগ হয়ে থাকে, কারণ সেখানে আশু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিপূরণই বড় কথা। **তাই এমন একটি ক্ষেত্র বাছাই করা দরকার যেখানে এই আশু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থপূরণ বড় কথা নয়, যেখানে স্বভাবতঃই স্বার্থ অপেক্ষা ন্যায়বোধের প্রতি আগ্রহ প্রবল। এই ক্ষেত্র হোলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয়-সমূহ। এখানে শিক্ষা পায় বিশ্বের ভাবী নাগরিকেরা তাই আগামী বিশ্বসমাজের প্রস্তুতি এখানেই হওয়া উচিত এবং এখানেই তা ভালভাবে চলতে পারে।** তাছাড়া, তরুণ শিক্ষার্থীর গঠনশীল মনে আজ যে ছাপ পড়বে, আগামীকাল তার কাজে ও কথায় তাই মূর্ত হয়ে উঠবে। তাই আজ বিদ্যালয়গুলিতে আন্তর্জাতিক শিক্ষাদানের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

বহিরঙ্গের নৈকট্য মনোজগতেও সম্প্রসারিত করা আবশ্যক

এই কাজে বিশ্বের বিদ্যালয়-সমূহের বিশেষ ভূমিকা

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বিকাশের লক্ষণ

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব হচ্ছে একটি বোধ যার প্রকাশ হচ্ছে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও আচরণে। এই আগ্রহ ও আচরণ বিকাশের কতকগুলি লক্ষণ আছে যেগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে সন্নিবেশিত করা যেতে পারে :—

(১) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মানুষের সমাজ ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয়।

(২) বিশ্বের নানা সমস্যা সম্পর্কে আগ্রহপোষণ।

(৩) যে সকল অর্থ নৈতিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ সমগ্র পৃথিবীকে একসূত্রে গ্রথিত কোরছে এবং মানবজাতিকে একটিমাত্র অখণ্ড সত্তায় পরিণত কোরছে, সেগুলিকে জানা এবং উপলব্ধি করা।

(৪) দেশে দেশে সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার অন্তরালে যে মানব-ঐক্যের সুর প্রবহমান, তার সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ এবং সেই ঐক্য-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হওয়া।

(৫) বিশ্বের অখণ্ড মানব-সংস্কৃতি বিকাশে এবং বিশ্ব-নাগরিকত্ব-বোধ সৃষ্টিতে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের অবদানকেই সশ্রদ্ধভাবে স্বীকার কোরে নেওয়া।

(৬) দেশপ্রেমকে বিশ্বপ্রেমের বিরোধী না ভাবা এবং না কোরে তোলা। দেশপ্রেম যেন মিথ্যা দেশাভিমানে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে সজাগ থাকা।

(৭) দেশপ্রেম বিশ্বমানব-প্রেমেরই অঙ্গ একথা মনে রেখে সার্বভৌম সামাজিক চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্বসমস্যা সমাধানে সাহায্য করা।

(৮) পৃথিবীর মানবসমষ্টি যে একটি অখণ্ড সমাজ সর্বদা সেটা উপলব্ধি করা এবং কাজে ও কথায় তা প্রকাশ করা।

(৯) পৃথিবীর সকল মানুষের সমান মর্যাদা স্বীকার ও তাদের প্রত্যেকের যোগ্যতাকে সম্মানপ্রদর্শন। কাউকে অবজ্ঞা না করা।

(১০) পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের সমান অধিকার ও সুযোগের দাবি স্বীকার করা।

(১১) উন্নত এবং ন্যায্য বিশ্বসমাজ-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কাজ করা।

(১২) পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির দাবিকে জোরালো সমর্থন করা। এই সমর্থন হবে নৈতিক এবং ক্রিয়াত্মক দুই-ই।

(১৩) সমগ্র বিশ্ব-মানবসমাজের লক্ষ্য ও আদর্শ এক সেকথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা এবং সমগ্র মানবসমাজের সাধারণ মূল্যবোধ অর্জনের নিমিত্ত কাজ করা।

(১৪) সকল বিশ্বসমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক নীতি গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা এবং তার যৌক্তিকতা স্বীকার করা।

(১৫) "সত্যমেব জয়তে" এই নীতিতে বিশ্বাস রেখে সমগ্র মানবসমাজের উন্নতি ও প্রগতির জন্যে কাজ কোরে যাওয়া।

(১৬) যুদ্ধ-পরিহার এবং শান্তি-নীতি অনুসরণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া। যুদ্ধজয়ের লাভ থেকে শান্তিনীতি অনুসরণের লাভ, গুরুত্ব ও সার্থকতা যে অনেক বেশী তা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করা।

উপরে যেগুলি উল্লেখ করা হোলো সেগুলি হচ্ছে আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বিকাশের মূলনীতিস্বরূপ। মানবসমাজে এই মৌলিক ধারণাগুলির বিকাশ হোলে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া সহজসাধ্য হয়। অন্যদেশের মানুষের সম্পর্কে শ্রদ্ধা, তাদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুরাগ সম্পর্কে সপ্রশংস মূল্যায়ন আন্তর্জাতিকতা শিক্ষার প্রথম সোপান-স্বরূপ। জাতীয়তা বা সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাকে প্রাধান্য না দিয়ে এই মৌল ধারণাগুলোর ভিত্তি থেকে প্রত্যেক মানুষের আচরণকে বিচার কোরতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত আচরণ শিক্ষা দিতে হবে। এটা খুব সহজসাধ্য কাজ নয়, কারণ জাতীয় ও সাংস্কৃতিক অহমিকা ত্যাগ করা সহজ নয়; আর এইজন্যেই নিয়ত নিরবচ্ছিন্ন আন্তর্জাতিক-বোধ বিকাশের শিক্ষা চাই।

আন্তর্জাতিকতা-শিক্ষার প্রথম সোপান

এছাড়া, সমস্যাটি অন্যদিক থেকেও বিবেচনা করা দরকার। আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার বিকল্প আজ আন্তর্জাতিক সংহার। আজ সামগ্রিক বিশ্বশান্তির বিকল্প বিশ্ববাসীর সামগ্রিক সংহার। আন্তর্জাতিক সংযোগ বা আদান-প্রদান আজ এত ঘনিষ্ঠ যে, পারস্পরিক মৈত্রী ও শান্তির জন্যে মানুষ চেষ্টা কোরতে বাধ্য। এর অভাবে যদি মনোমালিন্য এবং যুদ্ধ বাধে তবে তা বিশ্বের সামগ্রিক ধ্বংসই ডেকে আনবে। তাই একথা আজ স্মরণ রাখা দরকার, উপযুক্ত আন্তর্জাতিক বোধ বিকাশের জন্য শিক্ষাদান আজ শিক্ষকসমাজের এক পবিত্র ও অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ এর ওপরেই মানবসমাজের অস্তিত্ব ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নির্ভর কোরছে।

আন্তর্জাতিক সংহার রোধ করার জন্ত আন্তর্জাতিক মৈত্রী অবশ্য চাই

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বিকাশের উপায়সমূহ

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব কেমন কোরে বিকাশ করা যায়, এবারে তা বিবেচনা কোরতে হবে। আগে এই সম্ভাব্য উপায়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল :—

(১) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার অন্তরায়মূলক কিছু যেন না করা হয়। বিভিন্ন জাতির লোকের মধ্যে সৌহার্দ্য স্বষ্টির পরিপন্থী কিছু যেন না করা হয়।

(২) সমাজবিদ্যার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সমাজ ও জীবনযাত্রার জ্ঞান বিতরণ কোরতে হবে।

(৩) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের সামাজিক তাৎপর্য কি, তা শিক্ষা দিতে হবে। মানবসমাজের অগ্রগতিতে ও তার বিপরীতটিতেও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহের ভূমিকা যথাযথ উপলব্ধি করাতে হবে।

(৪) প্রত্যেক দেশের শিল্প ও সাহিত্য স্বষ্টির মধ্যে যে সার্বভৌম মানব-প্রেরণা বিদ্যমান, তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৫) নিজের মাতৃভাষা ছাড়া একটা আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

(৬) আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি বিকাশের অনুকূল বৈজ্ঞানিক; যুক্তিবাদী, স্বাধীন চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে হবে।

(৭) শিক্ষার্থীদের মন থেকে অন্য জাতির মানুষদের সম্পর্কে ভয় ও অবিশ্বাস দূর কোরতে হবে।

(৮) আন্তর্জাতিকতা-শিক্ষায় বিশেষ পাঠের সাময়িক ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৯) এবিষয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা-অর্জনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

(১০) বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা পাঠ, ছায়াছবি প্রদর্শন ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক পরিচয় লাভের ব্যবস্থা কোরতে হবে।

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার অন্তরায়মূলক কাজ পৃথিবীতে অনেক হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। **সম্প্রীতি ও সৌভ্রাতৃত্ব স্বষ্টির গোড়ার কথা হচ্ছে অসম্ভাব**

সৃষ্টি বন্ধ করা। এটা নেতিবাচক কাজ বটে, তবে ইতিবাচক কাজের সোপান-স্বরূপ। আমরা আমাদের শিক্ষার্থীদের অপর দেশের মানুষ সম্পর্কে কোন ভুল সংবাদ দেব না, তাদের মনে ভুল ধারণা হতে পারে এমন কিছু বলব না বা কোরব না।

আন্তর্জাতিক অসদ্ভাব সৃষ্টি বন্ধ করার তাৎপর্য

অনেক সময় দেশে দেশে বিরোধের কাহিনী—আমাদের দরজায় এসে হানা দেয়। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনেও ঔৎসুক্য সৃষ্টি হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের অযথা বিদ্বেষ-সৃষ্টি পরিহার কোরে সত্য বার্তা পরিবেশন কোরতে হবে। সত্য বার্তা পরিবেশনের একটি নিজস্ব মূল্য আছে—এবং বিদ্বেষের স্থলটি না থাকলে তার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনে এই ধারণা সৃষ্টি করা সম্ভব যে বর্তমান বিরোধ নিতান্তই দুঃখকর ও দুর্ভাগ্যজনক, এরূপ ঘটনা আমাদের পরিহার করার জন্য যত্নবান হতে হবে।

সকল জাতি সম্পর্কে সম্ভ্রমবোধ ও সত্য বার্তা পরিবেশন

তাছাড়া, প্রত্যেক জাতির গুণ, যোগ্যতা ও সদিচ্ছা সম্পর্কে শিক্ষাদানকে প্রাধান্য দিলে জাতিতে জাতিতে ভয়, অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ দূরীভূত হবে এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ প্রশস্ততর হবে। শিক্ষার্থীদেরও এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে কোটন্‌া সত্য বার্তা ও কোন্‌টা অপপ্রচার তা তারা সহজে ধরতে পারে। শিক্ষার্থীরা যেন অপপ্রচার ও জাতিবিদ্বেষের শিকার না হয়। শ্রেণীকক্ষেও অন্যজাতি সম্পর্কে যেন কোনো ব্যঙ্গবিদ্রূপ না করা হয় এবং উত্তেজনা ও প্ররোচনা বৃদ্ধির সহায়ক কিছু না বলা হয়। যে কোনো মানব-সমাজের সমস্যাবলী বিচারের মাপকাঠি হবে সার্বভৌম মানবতা-বাদ, অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং তৎসঞ্জাত সাধারণ বুদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গী।

অবশ্য বিশ্ববোধ সৃষ্টি হতে পারে যদি বিশ্বের সর্বত্র আন্তর্জাতিক সদিচ্ছা সৃষ্টির প্রেরণা ক্রিয়াশীল হয়। একটি দেশও যদি এর বিপরীত আচরণ করে, অন্য দেশ সম্পর্কে অসত্য তথ্য ও বিদ্বেষ প্রচার করে, তবে স্বভাবতঃই আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া ব্যাহত হয়।

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বিকাশে সমাজবিদ্যা শিক্ষাদান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। কারণ সমাজবিদ্যা হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা শিক্ষার্থীর নিজের দেশের ও অন্যান্য দেশের বহু বিচিত্র সমাজের এবং বহু বিচিত্র মানব সম্পর্কে পরিচয় প্রদান করে এবং তাদের অন্তর্নিহিত সার্বভৌম মানব-সত্যকে প্রকাশ করে ও সার্বভৌম মানবতাবাদ প্রচার করে। কোন দেশ কি উৎপন্ন করে, কি রপ্তানি করে, কি আমদানী করে—শুধুমাত্র এই আন্তর্জাতিক আদান-প্রদানের দিকটাই যদি আমরা দেখি, তাহলেই বুঝতে পারব আমরা সমগ্র পৃথিবীর মানুষরা কতখানি পরস্পর নির্ভরশীল। উন্নততর শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণাদির বিষয়ে আজ আন্তর্জাতিক আদান-প্রদান একটি অপরিহার্য শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংস্কৃতি-বিনিময় আজ আর ফ্যাশন নয়, আধুনিক জীবন-বিজ্ঞানের একটি প্রয়োজনীয় সোপান। সমাজবিদ্যা

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব-বিকাশে সমাজবিদ্যা শিক্ষা-দানের গুরুত্ব

বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বাস্তব বিষয়ে শিক্ষা দান করে। এইগুলির বিচার-বিবেচনা থেকেই শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশের আচার-আচরণের পার্থক্য উপলব্ধি কোরতে পারে, সেই পার্থক্যের ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞানসঞ্চয় করে, মানবসমাজে বিভিন্ন জীবনযাত্রা-পদ্ধতির অস্তিত্ব স্বীকার কোরতে শেখে, তাদের মূল্যায়ন কোরতে পারে এবং তারই সাথে সাথে মৌলিক মানব-ঐক্য সম্পর্কে অবহিত হয়।

মানব-ঐক্য প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত

আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ার ব্যাপারে যে পরমতসহিষ্ণুতা এবং জীবনযাত্রা-ধারার পার্থক্য স্বীকার কোরে নিয়েই মানব-ঐক্য অনুসন্ধান কোরতে হয় এবং মানব-ঐক্য প্রতিষ্ঠা কোরতে হয় এইভাবেই শিক্ষার্থীরা সে সম্পর্কে অবহিত হয়। বিভিন্ন দেশের সমাজ, পরিবার, সরকার, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ইত্যাদি কিভাবে পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভের দ্বারাই শিক্ষার্থীরা উপরি-উক্ত শিক্ষা লাভ করে। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার:—

(১) আধুনিক সভ্যতা কোনো একক জাতি বা ব্যক্তির প্রতিভা দ্বারা সৃষ্ট নয়, তা সৃষ্ট হয়েছে বহু জাতির সহযোগিতায়, তাদের সম্মিলিত অবদানে।

(২) আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বও মানুষের কার্যকলাপের ওপরে তার প্রভাব সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কারণ এই ভৌগোলিক অবস্থান পৃথিবীতে মানুষের সমৃদ্ধি, সহযোগিতা ও সংঘর্ষের একটি প্রধান কারণ। ভৌগোলিক নৈকট্য যেমন অনেক সহযোগিতা ও সংঘর্ষের কারণ (যেমন চীন, ভারত এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রে), তেমনি ভৌগোলিক দূরত্ব অনেক অপরিচয় ও ভুল ধারণা সৃষ্টি হওয়ারও কারণ। এইসব বিদূরণের জন্য ইউনেস্কো (UNESCO) এবং অন্যান্য বিশ্ব-প্রতিষ্ঠান যেসব শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছেন তার সাথে সহযোগিতা কোরে বিশ্ব-নাগরিকত্ব বোধ-সৃষ্টিতে সাহায্য করা দরকার।

(৩) জাতিগত এবং সংস্কৃতিগত পার্থক্য এবং বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক অপরিচয় হচ্ছে জাতিগত সংঘর্ষের উৎসস্থল। ভৌগোলিক অবস্থিতি, শিল্প-বাণিজ্য, আমদানি-রপ্তানি, যাতায়াত, শিক্ষা-সংস্কৃতির বিনিময়সংক্রান্ত জ্ঞান এই অপরিচয় দূর করে এবং পার্থক্যের সঠিক কারণ এবং গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষাদান করে। বিশ্বসমাজে "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" এই নীতিকে অনুসরণ কোরতে হবে, যথার্থ গণতান্ত্রিকতাই যে এই "বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য" প্রতিষ্ঠার সহায়ক সে কথা বুঝিয়ে দিতে হবে।

(৪) যথার্থ গণতান্ত্রিকতা মানুষের আত্মাভিমান, জাত্যাভিমান, বর্ণাভিমান ও দেশাভিমান পরিত্যাগ কোরতে শেখায়। এইসব অভিমানকে প্রশ্রয় দিলে যথার্থ গণতান্ত্রিকতা ও বিশ্ববোধের প্রতিবন্ধকতা করা হয়। বিশ্বব্যাপী সহযোগিতা-ভিত্তিক যথার্থ গণতান্ত্রিক মানব-সমাজ গড়ে তোলাই আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য।

(৫) আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্বের উন্মেষে শিক্ষকের আন্তর্জাতিক চেতনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। যে শিক্ষক নিজে বিভিন্ন প্রকার অভিমানকে প্রশ্রয় দেন, তিনি কখনও আন্তর্জাতিকতার শিক্ষাদান কোরতে পারেন না। তাই সমাজবিদ্যার শিক্ষককে সদা-সর্বদা আন্তর্জাতিক ঘটনার ও সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে এবং সর্বপ্রকার বিদ্বেষমূলক মনোভাব পরিহার কোরতে হবে। তাঁর মনোভাব যেন এবিষয়ে ক্রিয়াত্মক ও সৃজনশীল হয়।

ভারতীয় সমাজ, বিদ্যালয়-পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষা পরিচালনার নীতি ও প্রক্রিয়াসমূহ

ভারতীয় সমাজ তার বিভিন্ন উৎকর্ষ সত্ত্বেও জাতি, ধর্ম ও বর্ণবিভাগের অভিশাপে জর্জরিত। বহুকাল থেকেই ভারতবর্ষে বহু জাতির বহু বর্ণের বহু শ্রেণীর মানুষের আগমন। এরা মিলে এখানে এক বিচিত্র মানবসমাজ সৃষ্টি কোরেছে যার মধ্যে পরিচয় এবং অপরিচয়, মৈত্রী এবং বিদ্বেষ দুই-ই সমানভাবে প্রকট। যে ভারতীয় সমাজে সার্বভৌম মানবতাবাদের অভ্যুদয় ঘটেছে, সেই ভারতেই আবার মানুষকে "অচ্ছুৎ" ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাকে পশুর চেয়েও হীন জীবন-যাপনে বাধ্য করা হয়েছে। এ-যে ভারতীয় হিসেবে আমাদের পক্ষে কত বড় লজ্জার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার পরে এই অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা হয়েছে, অনেকটা প্রতিকারও হয়েছে তবু সমাজ থেকে এর শিকড় উৎপাটিত হয়নি। ধর্মবিদ্বেষ, বর্ণবিদ্বেষ, ভাষা-বিদ্বেষ এখনও মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদগার সৃষ্টি করে। তবু একথা ঠিক, এগুলোকে অন্যায় বলে ঘোষণা করার এবং তার প্রতিকার করার মত সুস্থ মানসিকতাও দেশের মধ্যে অনেকখানি সৃষ্টি হয়েছে। সবচেয়ে আশার কথা, আমাদের দেশের শিক্ষকসমাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা অনেক পরিমাণে বিকাশ লাভ কোরেছে।

ভারতীয় সমাজে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা

স্বাধীনতালাভের পরে আমাদের বিদ্যালয়-পরিবেশে একটা প্রগতিশীলতার জোয়ার আসে। ধর্মভেদ ও বর্ণভেদ যে মানুষের লাঞ্ছনার কারণ হতে পারে না, অনেক প্রাচীনপন্থী শিক্ষক ও বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষও তা স্বীকার কোরে নেন। তার ফলে আমাদের শিক্ষার্থীর তথাকথিত নিম্নবর্ণের বা অন্যধর্মের শিক্ষার্থীদের সাথে অসংকোচে শিক্ষাগ্রহণ ও মেলামেশা কোরতে থাকে, এমনকি একসাথে বাস ও আহারও করে। কিন্তু আমাদের সমাজে আর্থিক প্রগতির সেই জোয়ার এখনও আসেনি যার দ্বারা অনুন্নত শ্রেণী ও জাতিদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করা সম্ভব হয়। তাছাড়া, অর্থাভাবে ও অন্যান্য সুযোগের অভাবে, অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষের শৈথিল্যে, শিক্ষার্থীর একটা নির্দিষ্ট বাঁধাধরা গণ্ডীবদ্ধ সমাজের মধ্যে বাস কোরতে বাধ্য হয়। ফলে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সার্থক উন্মেষ বহুল

পরিমাণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যার বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ কোরতে পারলে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষার্থী-বিনিময় এবং সমাজজ্ঞান বিনিময় কোরতে পারলে আপনা থেকেই সার্বভৌম মানবতা-বোধের সৃষ্টি ঘটে। বস্তুতঃ এই কারণেই বহু প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে সার্বভৌম মানব-চেতনার বিকাশ ঘটেছিল। বহু-বিচিত্র সমাজে যদি গতিশীল ও সৃজনশীল বন্ধুত্ব সৃষ্টি না করা যায় তবে পরস্পর সংঘাতশীল অনুদার-মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ভারতবর্ষে এই দুই প্রক্রিয়ারই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। তাই ভারতবর্ষের বিদ্যালয়-গুলোকে আজ আমাদের নতুন মৈত্রী-ভিত্তিক সমাজগঠনের ল্যাবরেটরী হিসাবে গড়ে তোলা দরকার। ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষ পরিহার কোরে উদার, সহনশীল গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির সাথে সাথে আন্তর্জাতিক মানব-সৌভ্রাতৃত্ব-সৃষ্টির চেষ্টা আজ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

আমাদের বিদ্যালয় পরিবেশে সার্বভৌম মানবতাবোধের সৃষ্টি

এই উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষা-পরিচালনার বিশিষ্ট নীতিগুলি হবে ঃ—

(১) ধর্ম ও বর্ণ-বিদ্বেষ পরিহার করা।

(২) অর্থ-কৌলীন্য-চেতনা পরিহার করা।

(৩) ধনী-দরিদ্র, উন্নত-অনুন্নত নির্বিশেষে প্রত্যেকে সমাজের সমান অংশীদার-এই বোধকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং বিদ্যালয়েও প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে আত্মবিকাশের উপযুক্ত সুযোগ দিতে হবে।

(৪) বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সকল কাজ, খেলাধুলা, আহার, বসবাস, মেলামেশায় যে কোনো প্রকার উচ্চ-নীচবোধ পরিহার কোরতে হবে। সকলকে সমান অংশীদার হিসাবে গ্রহণ কোরতে হবে।

(৫) সংকীর্ণ সম্প্রদায়-বুদ্ধি পরিহার কোরে জাতীয় ইষ্ট-চেতনা শেখাতে হবে। তারই সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ইষ্ট-বোধও জাগ্রত কোরতে হবে।

(৬) গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানদান কোরতে হবে এবং সব কাজে গণতান্ত্রিক আচরণ গ্রহণ কোরতে হবে। গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও গণতান্ত্রিক নীতিগ্রহণের উপযোগিতা শিক্ষা দিতে হবে।

(৭) স্বাধীন চিন্তার বিকাশের সাথে সাথে সেই চিন্তাকে কাজে রূপায়ণের শিক্ষাদান কোরতে হবে। শিক্ষার্থী যেন নিজের সৎ চিন্তা ও বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকাজ কোরতে সাহস সঞ্চয় করে। সকল প্রকার বিদ্বেষবুদ্ধির বিরুদ্ধে ক্রিয়াত্মক ও সৃজনশীল মৈত্রী সৃষ্টি করা সহজসাধ্য নয়। তার জন্য নির্ভীক বিবেক, পরিচ্ছন্ন চিন্তাশক্তি ও প্রবল কর্মোদ্যমের প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মধ্যে যেন এগুলোর বিকাশ ঘটানো হয়।

(৮) ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ও সমাজের মধ্যে শিক্ষার্থী-বিনিময় নিয়মিতভাবে করা হয়। সাময়িক শিক্ষা-শিবিরসমূহ সংগঠন করা হয়। তাছাড়া, মাঝে মাঝে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী-বিনিময় যেন করা হয়। আমাদের দরিদ্র দেশের পক্ষে বাইরে ঘন ঘন শিক্ষার্থীদল পাঠানো সম্ভব নয়, তবে বাইরের প্রতিনিধিদল ভারতবর্ষের শহর, বিশেষ কোরে পল্লী-অঞ্চলগুলোতে পরিভ্রমণ কোরে ও সেখানকার শিক্ষার্থীদের নিজেদের অভিজ্ঞতার অংশদান করে সেবিষয়ে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৯) প্রতিটি বিদ্যালয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্য সমূহ প্রচারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(১০) মাঝে মাঝে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি নিয়ে আঞ্চলিক ও জাতীয় ভিত্তিতে সেমিনার সংগঠন করা দরকার।

(১১) উপযুক্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনাসম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি তাঁর শিক্ষাদান-কাজের সহায়ক হিসাবে পর্যটন, প্রদর্শনী এবং অন্য নানাপ্রকার কাজের স্থচী তৈরী কোরে নেবেন যা ভারতীয় শিক্ষার্থীদের নিজ জাতীয় সমাজ ও আন্তর্জাতিক মানব-সমাজ সম্পর্কে সম্যক অবহিত কোরবে এবং মানব-মহাজাতি গঠনে অনুপ্রাণিত কোরবে।

Questions

1. What is meant by international understanding? What is its necessity in the present-day world?

2. What are the means of developing international understanding? How can this understanding be promoted?

3. India is a miniature world. Training in democratic citizenship of India is helpful to the training of world citizenship.—Discuss.

4. What environment do you want to create in Indian schools so as to make them useful for training in world citizenship?

5. What is the role of Social Studies as an essential subject for teaching international understanding? Describe the role of Social Studies teacher in this respect.
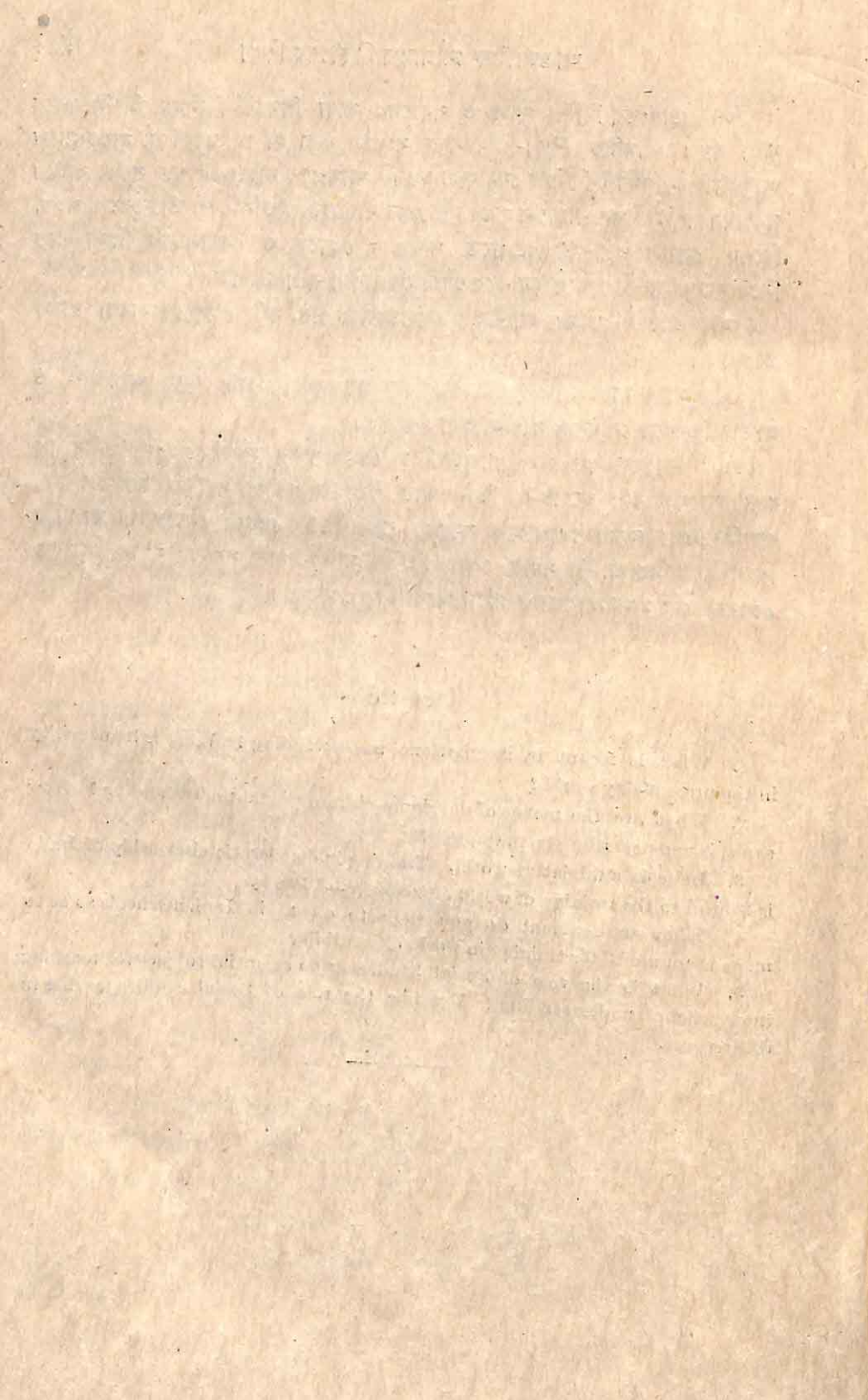
পরিশিষ্ট

সমাজবিদ্যা একটি জ্ঞানমুখী বিষয়। এর পাঠ-পরিকল্পনার অন্যান্য জ্ঞানমুখী বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিগুলোই প্রযুক্ত হবে। পাঠ-পরিকল্পনায় প্রথমে এক একটি ইউনিট সাধারণ পাঠ স্থির কোরতে হবে। তারপর সেই সাধারণ পাঠটিকে কয়েকটি উপযুক্ত অংশে ভাগ কোরে প্রতিদিনের পাঠের পরিধি নির্ধারণ কোরতে হবে। এইবার প্রতিদিনের পাঠদানের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্বালোচিত পন্থায় পাঠ-টীকা প্রস্তুত কোরতে হবে। পাঠ-টীকা সম্পর্কে স্পষ্টতর ধারণা দেবার উদ্দেশ্যে "রাষ্ট্র ও জনসাধারণ" শীর্ষক সাধারণ পাঠ অবলম্বন কোরে প্রতিদিনের নিমিত্ত এক একটি পাঠের পরিকল্পনা উপস্থিত করা হোলো। আশা করি, সেগুলো শিক্ষকমহাশয়ের কিঞ্চিৎ কাজে লাগবে।

পাঠ-টীকা (১)

বিদ্যালয়ের নাম—কমলা হাই স্কুল
শ্রেণী— নবম
ছাত্র সংখ্যা— ৪০
গড় বয়স— ১৪ বৎসর
তারিখ— ৬।২।৬২
সময়— ৪০ মিনিট
শিক্ষক— কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

বিষয়ঃ—সমাজ-বিদ্যা
সাধারণ পাঠ ঃ—রাষ্ট্র ও জনসাধারণ
বিশেষ পাঠ ঃ—রাষ্ট্রীয় শাসনের আবশ্যকতা

উদ্দেশ্য—রাষ্ট্রীয় শাসনের আবশ্যকতা এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে জ্ঞান-দান করা এবং ছাত্রদের চিন্তা, কল্পনা ও বিচারশক্তি বিকাশে সহায়তা করা।

উপকরণ—বর্তমান ভারত-রাষ্ট্রের মানচিত্র।

আয়োজন—ছাত্রদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন করা হইবে ঃ—

(১) আমরা কোন্ রাষ্ট্রে বাস করি ?
(২) আমাদের রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী কে ?
(৩) আমাদের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কে ?
(৪) আমাদের রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা কত ?

পাঠ-ঘোষণা—প্রতি রাষ্ট্রে বহুসংখ্যক লোকের বাস, জনসাধারণের প্রয়োজনেই রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিয়াছে, আজ আমরা "রাষ্ট্র ও জনসাধারণ" সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করিয়া "রাষ্ট্রীয় শাসনের আবশ্যকতা" আলোচনা করিব।

বিষয় ঃ (ক) রাষ্ট্রীয় শাসনের আবশ্যকতা—

উপস্থাপন ঃ যে কোন দেশেই মানুষ বাস করুক না কেন, সেই দেশের গভর্নমেণ্ট বা রাষ্ট্রীয় শাসন ও আইনকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয়। আমরা ভারত-রাষ্ট্রের শাসন ও আইনকানুন মানিয়া চলি।

ধরা যাক্, ট্রাম, বাস, লরী, রিক্শা, ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বহুপ্রকার যানবাহন পথে চলিতেছে। আবার পথিকও পথ চলিতেছে। যদি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না থাকে তবে বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবে। এইজন্য পথ চলার নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হয়। নতুবা ইচ্ছামত গাড়ী চালাইয়া দিলে অথবা খুশিমত রাস্তা পার হইতে চাহিলে দুর্ঘটনা ঘটিবে।

আমাদের প্রত্যেকের সুবিধার জন্যই আমরা নিজেদের ইচ্ছা ও খুশিকে অনেকখানি ত্যাগ করিয়া অপর মানুষের সহিত নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে বাস করিবার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি, রাষ্ট্র গঠন করিয়া নানাপ্রকার আইনকানুন প্রস্তুত করিয়াছি এবং তাহা সকলে মান্য করিতেছে কিনা তাহা দেখিবার জন্য দেশের গভর্নমেণ্টের বা সরকারের উপর তাহার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছি।

পদ্ধতি ঃ ছাত্রদিগকে ভারত রাষ্ট্রের মানচিত্রখানি দেখানো হইবে। অতঃপর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হইবে ঃ—

(১) আমরা কোন্ রাষ্ট্রের আইনকানুন মানিয়া চলি?
(২) পথে চলিবার নিয়মকানুন মানিয়া না চলিলে কি হইবে?
(৩) আমরা সকলের সুবিধার জন্য কি ত্যাগ করিয়াছি?
(৪) সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিবার সুবিধা কি?
(৫) রাষ্ট্র গঠন করিয়া আমরা কি প্রস্তুত করিয়াছি?
(৬) সকলে আইনকানুন মান্য করিতেছে কিনা, তাহা কে দেখিয়া থাকে?

বিষয় ঃ (খ) রাষ্ট্র সমাজের বৃহত্তম সংগঠন—

উপস্থাপন ঃ আমরা পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব প্রভৃতি গড়িয়া থাকি। ক্লাবে অনেক সদস্য থাকে, তাহারা মিলিয়া উহা পরিচালনার নিয়মকানুন প্রস্তুত করে এবং ক্লাব সেই নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হয়। সেইরূপ শ্রমিকেরা মিলিয়া শ্রমিক-সমিতি, মালিকেরা মালিক-সমিতি, আবার অনেকে মিলিয়া রাজনৈতিক দল, যথা—কংগ্রেস পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি গড়িয়া থাকে।

এই সকল সংগঠনের নিয়মকানুন মাত্র তাহাদের সদস্যরাই মান্য করে, অন্যেরা করে না। কিন্তু আমরা ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করি এবং প্রত্যেকেই—এমন কি ঐসব বিভিন্ন দলও—ভারত রাষ্ট্রের আইনকানুন মানিতে বাধ্য। রাষ্ট্র সমাজের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। রাষ্ট্রের কোন অধিবাসী ইহাকে উপেক্ষা করিতে পারে না।

পদ্ধতি ঃ (১) আমরা অনেকে মিলিয়া নিজেদের পাড়ায় কিরূপ সংগঠন গড়িয়া থাকি ?

(২) দুই-একটি রাজনৈতিক দলের নাম কর।

(৩) এই সকল ক্লাব ও দলের নিয়ম কানুন কাহারা মান্য করে ?

(৪) রাষ্ট্রের আইন কাহারা মানিতে বাধ্য ?

(৫) সমাজে রাষ্ট্রের ক্ষমতা কিরূপ ?

বিষয় ঃ (গ) গভর্নমেণ্ট বা সরকার গঠনের আবশ্যকতা—

উপস্থাপন ঃ ক্লাবের সকল সদস্যরা মিলিয়া উহার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করে না, তাহার জন্য কয়েকজন সদস্য লইয়া একটি পরিচালক-সমিতি গড়িয়া দেওয়া হয়। সেইরূপ আমরা সকলেই ভারত-রাষ্ট্রের সদস্য হইলেও সকলে মিলিয়া রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করি না। তাহার জন্য আমরা সকল নাগরিক মিলিয়া নির্বাচনের মারফত রাষ্ট্রের পরিচালক-সমিতি বা সরকার গড়িয়া দিয়াছি।

সেই সরকারই রাষ্ট্রের নাগরিকদের প্রত্যেকের নিরাপত্তা ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখে। রাষ্ট্র সকল নাগরিককে লইয়া গঠিত, কিন্তু 'সরকার' মাত্র কিছু সংখ্যক নাগরিক লইয়া গঠিত হয়। 'সরকার' আমরা ইচ্ছা করলে বদল করতে পারি। আমরা মাঝে মাঝে ক্লাবের পরিচালক-সমিতি বদল করিয়া থাকি। কিন্তু ক্লাব হইল একটি স্থায়ী সংগঠন। ক্লাবের পরিচালক-সমিতি যেরূপ ক্লাবের অঙ্গ, সেইরূপ সরকারও রাষ্ট্রের অঙ্গ।

(১) ক্লাবের দৈনন্দিন কার্য কাহারা পরিচালনা করিয়া থাকে ?

(২) রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্য কাহারা পরিচালনা করে ?

(৩) সরকার কিভাবে গঠিত হয় ?

(৪) ক্লাব ও উহার পরিচালক সমিতির মধ্যে পার্থক্য কি কি ?

(৫) রাষ্ট্র ও উহার সরকারের মধ্যে পার্থক্য কি ?

(৬) সরকার কাহার অঙ্গ ?

(৭) স্থায়ী সংগঠন বলিতে কি বোঝ ?

অভিযোজন ঃ ছাত্রদের লব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুনরালোচনা-মূলক প্রশ্ন করা হইবে ঃ—

(১) আমরা কোন্ রাষ্ট্রে বাস করিতেছি ?

(২) রাষ্ট্রে বাস করিতে হইলে কি কি মান্য করিয়া চলিতে হয় ?

(৩) রাষ্ট্রকে সমাজের বৃহত্তম এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন বলা হয় কেন ?

(৪) সরকার কাহার অঙ্গ ?

(৫) সরকারকে রাষ্ট্রের অঙ্গ বলা হয় কেন ?

বাড়ীর কাজ

ছাত্রদিগকে বাড়ীতে ভারত-রাষ্ট্রের একখানি মানচিত্র অঙ্কন করিতে বলা হইবে।

পাঠ-টীকা (২)

বিদ্যালয় :—কমলা হাই স্কুল
শ্রেণী :—নবম
ছাত্র সংখ্যা :—৪৭
গড় বয়স :—১৪ বৎসর
সময় :—৪০ মিনিট
তারিখ :—২৪।২।৬২
শিক্ষক :—কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

বিষয় :—সমাজবিদ্যা

সাধারণ পাঠ :—রাষ্ট্র ও জনসাধারণ

বিশেষ পাঠ :—রাষ্ট্রের উপাদান

উদ্দেশ্য : রাষ্ট্র এবং ইহার উপাদান সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জ্ঞানদান করা হইবে এবং ছাত্রদের চিন্তা, কল্পনা ও বিচার-শক্তি বিকাশে সহায়তা করা হইবে।

উপকরণ : ভারত-রাষ্ট্রের একখানি মানচিত্র।

আয়োজন : ছাত্রদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পাঠে সক্রিয় অংশ-গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হইবে :—

(১) আমরা একাকী বাস করিতে পারি না কেন ?
(২) আমরা দলবদ্ধ হইয়া বাস করি কেন ?
(৩) ভারত-রাষ্ট্রের সদস্য কাহারা ?
(৪) ভারত-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা নির্দেশ কর।
(৫) ভারত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ?

পাঠ-ঘোষণা : মানুষ আপন কল্যাণের নিমিত্ত দলবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছে। এবং তাহার পরিচালনার নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছে। এইরূপ একটি ব্যবস্থা হইল রাষ্ট্র গঠন। আমরা অদ্য "রাষ্ট্র এবং ইহার উপাদান" সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বিষয় : (ক) *সমা-গঠন, রাষ্ট্র—*

উপস্থাপন : অন্যান্য প্রাণীর জীবনযাত্রা সরল—মানুষের জীবনযাত্রা জটিল—মানুষের পরনির্ভরতা বেশী—পরস্পর সহযোগিতার প্রয়োজন—দলগঠন—পরস্পরের মঙ্গলের নিমিত্ত দলবদ্ধ জনসমষ্টিই সমাজ।

সমাজ-পরিচালনার নিমিত্ত নিয়মকানুন—তদনুযায়ী গঠিত পরিচালকমণ্ডলী—তাহাদের দ্বারা দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ।

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমাজ—সাহিত্য-সভা, ছাত্র-সমিতি, শ্রমিক-সমিতি—নিয়ম বা আইন অমান্যকারীর শাস্তি।

রাষ্ট্র হইল একটি দেশের সমস্ত মানুষের সমাজ—তাহাদের সর্বাত্মক কল্যাণই রাষ্ট্রের লক্ষ্য—রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার বাহিরের ব্যক্তি উহার সদস্য হইতে পারে না—সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সংগঠন—সদস্যদের অপরাধে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে—নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে ইহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ—বিদেশীরা রাষ্ট্রের সদস্য নহে—তাহাদের উপর রাষ্ট্রের এক্তিয়ারও নাই—রাষ্ট্রের সংজ্ঞা।

পদ্ধতি ঃ (১) মানুষ দলগঠন করে কেন ?
(২) সমাজ কাহাকে বলে ?
(৩) সমাজের নিয়মকানুন থাকে কেন ?
(৪) সমাজ বা সংঘের দৈনন্দিন কার্য কাহারা পরিচালনা করেন ?
(৫) বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গঠিত বিভিন্ন সমাজ বা সংগঠনের কয়েকটির নাম কর।
(৬) সমাজের নিয়ম অমান্য করিলে কি হয় ?
(৭) রাষ্ট্র কাহাদের সংগঠন বা সমাজ ?
(৮) রাষ্ট্রের শক্তি কিরূপ বা কতটা ?
(৯) বিদেশীদের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক কিরূপ ?

(খ) রাষ্ট্রের উপাদান—

উপস্থাপন ঃ চারিটি উপাদান ঃ—জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব। মানুষের জন্য রাষ্ট্র—সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইতে কয়েক কোটি পর্যন্ত হইতে পারে—ছোটরাষ্ট্র দুর্বল হয়।

একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস না করিলে মানুষের স্থায়ী সমাজ গঠিত হয় না—আইন-কানুনও উপযুক্তভাবে প্রযুক্ত হইতে পারে না—নির্দিষ্ট সীমানাবিশিষ্ট অঞ্চল প্রয়োজন—আয়তন ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইতে পারে।

রাষ্ট্রের সকল সদস্য মিলিয়া দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়—কয়েকজন লোকের উপর সকলে মিলিয়া দায়িত্ব অর্পণ করে—শান্তি-শৃঙ্খলারক্ষা, আইন-কানুন প্রয়োগ ও অন্য বহুবিধ কাজের জন্য শাসন-যন্ত্র বা সরকার গঠিত হয়।

সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে অপ্রতিহত ক্ষমতা—রাষ্ট্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য—অধিবাসীদিগের সম্পূর্ণ আনুগত্য—বিদেশী ব্যক্তি, সংগঠন বা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানিতে কোন রাষ্ট্র বাধ্য নহে—স্বাধীনতালাভের পরে বর্তমান ভারত-রাষ্ট্র একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র।

পদ্ধতি ঃ (১) 'জনসমষ্টি' রাষ্ট্রের একটি উপাদান ইহা বলা হয় কেন ?
(২) রাষ্ট্রগঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের প্রয়োজন কেন ?
(৩) 'সরকার' গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি ?
(৪) 'সরকার' না থাকিলে রাষ্ট্রে কিরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় ?
(৫) সার্বভৌম ক্ষমতা বলিতে আমরা কি বুঝি ?
(৬) সদস্যদিগের প্রতি রাষ্ট্রের কিরূপ ক্ষমতা থাকে ?
(৭) স্বাধীন ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র কেন ?
(৮) রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি এবং কি কি ?

অভিযোজন ঃ ছাত্রদের লব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুনরালোচনা-মূলক প্রশ্নগুলি করা হইবে :—

(১) সমাজ-গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি কি ?
(২) ভারত ইউনিয়নে যাহারা বাস করে তাহাদের সাধারণ সংগঠন বা সমাজের নাম কি ?
(৩) বিদেশীদের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক বুঝাইয়া বল।
(৪) রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি এবং কি কি ?
(৫) সার্বভৌম ক্ষমতা বলিতে কি বুঝায় ?
(৬) রাষ্ট্রের সদস্য এবং বিদেশীদের প্রতি এই ক্ষমতা কিভাবে প্রয়োগ করা হয় ?
(৭) স্বাধীন-ভারত একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র কেন ?

বাড়ীর কাজ

ছাত্রদিগকে বাড়ীতে ভারত-রাষ্ট্রের একখানি মানচিত্র অঙ্কন করিতে এবং ভারত-রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিবরণ লিখিতে বলা হইবে।

পাঠ-টীকা (৩)

বিদ্যালয় :—কমলা হাইস্কুল
শ্রেণী—নবম
ছাত্রসংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১৪ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—১৩।২।৬২
শিক্ষক—কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

বিষয় :—
সমাজবিদ্যা

সাধারণ পাঠ :—
রাষ্ট্র ও জনসাধারণ

বিশেষ পাঠ :—
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও নির্ব্বাচন রীতি

উদ্দেশ্য ঃ গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং নির্বাচন-রীতি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হইবে এবং ছাত্রদের চিন্তা, কল্পনা ও বিচার-শক্তিবিকাশে সহায়তা করা হইবে।

উপকরণ ঃ একটি নির্বাচনী জনসভার ফটো এবং একখানি নির্বাচন-প্রার্থীদের প্রচারিত পোস্টার।

আয়োজন ঃ ছাত্রদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পাঠে সক্রিয় অংশ গ্রহণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হইবে :—

(১) বর্তমান মাসের কোন্ তারিখে কলিকাতা হইতে বিধানসভা ও লোকসভা প্রার্থীদের নির্বাচন করা হইবে ?
(২) তোমাদের এলাকায় কয়জন বিধানসভার সদস্যপদের প্রার্থী ?
(৩) কয়জনই বা লোকসভার সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হইয়াছেন ?

(৪) বিধানসভা ও লোকসভার জন্য প্রধান দুইজন প্রার্থীর নাম কর।

পাঠঘোষণা : আমাদের দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা ভোট দিয়া সদস্যনির্বাচন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালক-সভাগুলি, যথা বিধানসভা, লোকসভা প্রভৃতি গঠন করিয়া থাকেন। এইজন্য আমাদের ভারত-রাষ্ট্র হইল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজ আমরা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও উহার নির্বাচন-নীতি সম্পর্কে আলোচনা করিব।

বিষয় (ক) রাষ্ট্রগঠনের অতীত পদ্ধতিসমূহ :—

উপস্থাপন : দলপতি বা রাজা নির্বাচন করা হইত না—তবে প্রাচীন বাংলার পাল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের নির্বাচন—উপজাতিদের Council of Elders (প্রধানদিগের সভা)—আর ইহা হইতেই রাজা ও মন্ত্রিসভার উৎপত্তি—রাজা "দেবতার প্রতিনিধি"—রাজার স্বেচ্ছাচার—মানুষের স্বাধিকারবোধ, আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও গভর্নমেন্টের উৎপত্তি।

পদ্ধতি : (১) উপজাতি সমাজের পরিচালন ব্যবস্থা কিরূপ ছিল?

(২) রাজা ও মন্ত্রিসভার কিরূপে উৎপত্তি হইয়াছিল?

(৩) রাজারা কি করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইবার সুযোগ পান?

(৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গঠনের গোড়ার কথাটি কি?

বিষয় (খ) "গণতন্ত্র" শব্দটির সংজ্ঞা নির্ণয় :—

উপস্থাপন : গণতন্ত্র—গণ অর্থাৎ জনসাধারণ, তন্ত্র অর্থাৎ তাহাদের নিমিত্ত তাহাদের স্বার্থে তাহাদের দ্বারা পরিচালিত ব্যবস্থা ; ইংরেজী democracy, গ্রীক 'demos' অর্থাৎ people, 'krateo' অর্থাৎ to rule—জনসাধারণের শাসন—'government of the people, for the people and by the people'—'of the people, for the people' বুঝায় রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও আদর্শ,—by the people বুঝায় রাষ্ট্রগঠনের পদ্ধতি।

পদ্ধতি : (১) 'গণতন্ত্র' কথাটির অর্থ কি?

(২) 'Democracy' কথাটির ব্যাখ্যা কি?—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞা কি?

(৩) Government 'of the people' এবং 'for the people' দ্বারা কি বুঝা যায়?

(৪) 'Government of the people' দ্বারা কি বুঝায়?

বিষয় (গ) নির্বাচন-রীতি :—

উপস্থাপন : রাষ্ট্র বা গভর্নমেন্ট গঠন ব্যাপারে মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের যোগদান—কারণ তাহাদের উপযুক্ত বয়স ও বিচারবুদ্ধি—প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা—নির্বাচন প্রার্থী হইবার ও ভোট দানের অধিকার—নির্বাচিত হইবার নিয়ম—নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনা—গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্র বলিতে বুঝায় দেশের সর্বাধিকসংখ্যক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরিচালিত রাষ্ট্র বা গভর্নমেণ্ট। গণতান্ত্রিক সংঘ—সভা-সমিতি ও নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত—গণতান্ত্রিক গভর্নমেণ্ট হইল প্রতিনিধি-পরিচালিত গভর্নমেণ্ট (representative government)—সংখ্যালঘু বিরোধীদলের অস্তিত্ব, তাহাদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

পদ্ধতি ঃ (১) রাষ্ট্রের জন্য কাহারা প্রতিনিধি নির্বাচন করে ?

(২) নির্বাচনের প্রয়োজন হয় কেন ?

(৩) কাহারা নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারেন ?

(৪) ভোটদানের অধিকার আছে কাহাদের ?

(৫) নির্বাচিত হইবার নিয়ম কি ?

(৬) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে কাহাদের পরিচালিত রাষ্ট্র বুঝায় ?

(৭) গণতান্ত্রিক সংঘ-সভা-সমিতি কাহাকে বলে ?

(৮) সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দল ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আর কোন্ দল থাকে ?

(৯) তাহাদের ভূমিকা কিরূপ ?

অভিযোজন ঃ ছাত্রদের লব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুনরালোচনা-মূলক প্রশ্ন করা হইবে ঃ—

(১) রাজা ও তাহার মন্ত্রিসভার কিরূপ উৎপত্তি হয় ?

(২) গণতন্ত্র কথার অর্থ কি ?

(৩) প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রয়োজন হয় কেন ?

(৪) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলিতে কাহাদের পরিচালিত রাষ্ট্র বুঝায় ?

(৫) গণতান্ত্রিক সংঘ-সভা-সমিতি কাহাকে বলে ?

(৬) সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারী দল ছাড়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আর কোন দল কাজ করে ?

বাড়ীর কাজ

বর্তমান সাধারণ নির্বাচনকে উপলক্ষ করিয়া তোমার পাড়ায় যে সকল কাজ চলিতেছে, তাহার একটি অভিজ্ঞতামূলক বর্ণনা বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে।

পাঠ-টীকা (৪)

বিদ্যালয় ঃ—কমলা হাইস্কুল
শ্রেণী—নবম
ছাত্র সংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১৪ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—২০।২।৬২
শিক্ষক—কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

বিষয় ঃ—সমাজবিদ্যা
সাধারণ পাঠ ঃ—রাষ্ট্র ও জনসাধারণ
বিশেষ পাঠ ঃ—ভোটাধিকার

উদ্দেশ্য ঃ গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের ভোটাধিকার সম্বন্ধে ছাত্রদিগকে জ্ঞান দান করা হইবে এবং ছাত্রদের চিন্তা, কল্পনা ও বিচার-শক্তি বিকাশে সহায়তা করা হইবে।

উপকরণ ঃ একটি ভোট-দানের আবেদন-পত্র।

আয়োজন ঃ ছাত্রদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পাঠে সক্রিয় অংশ-গ্রহণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তাহাদিগকে নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা হইবে ঃ—

(১) তোমাদের এলাকায় বিধানসভার সদস্যপদের প্রার্থী কে কে ?

(২) তাহার মধ্যে কে নির্বাচিত হইলেন, তাহা কিভাবে স্থির করা হইবে ?

(৩) প্রার্থীরা তাহাদের অনুকূলে ভোট দিবার জন্য কাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছেন ?

(৪) সকলকেই তাহারা অনুরোধ করেন না কেন ?

(৫) গোপনে ভোট দেওয়া হয় কেন ?

পাঠ-ঘোষণা ঃ আমাদের দেশের প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা ভোট দিয়া সদস্য নির্বাচন করিয়া আমাদের রাষ্ট্রের পরিচালক সভাগুলি, যথা বিধানসভা লোকসভা প্রভৃতি গঠন করিয়া থাকেন। এইজন্য আমাদের ভারতরাষ্ট্র হইল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আজ আমরা গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের ভোটাধিকার সম্পর্কে আলোচনা করিব। আমাদের অদ্যকার বিশেষ পাঠ হইল "ভোটাধিকার"।

বিষয় ঃ (ক) ভোট ঃ—

উপস্থাপন ঃ জনপ্রিয় ধ্বনি 'vote for—franchise, ভোট দানের অধিকার ঃ franc—free, freedom—নাগরিকের 'স্বাধীনতাই এখন ভোটদানের অধিকার—অধিকার স্বাধীনতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত—স্বাধীনতাবিহীন ভোটদান অর্থহীন—নাগরিকের কর্তব্য—নির্বাচনের ২।১ দিন পূর্বে প্রচার বন্ধ—অথবা প্রভাবিত না হইয়া বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী ভোটদান—polling অর্থাৎ head—প্রতি ভোটদাতার জন্য একটি ব্যালট পেপার ভোটের বাক্স—ভোট গণনা।

পদ্ধতি ঃ (১) নির্বাচনে কোন প্রার্থীর পক্ষে কিভাবে ধ্বনি দেওয়া হয় ?

(২) ইংরাজী franchise কথার অর্থ কি ?

(৩) কেন উপযুক্ত বিবেচনা সহকারে ভোট দেওয়া প্রয়োজন ?

(৪) কিভাবে ভোট দেওয়া হয় ?

বিষয় ঃ (খ) সাধারণ নির্বাচন ঃ—

উপস্থাপন ঃ পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন ভারতরাষ্ট্রের নির্বাচন ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন—১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। ব্রিটিশ আমলে

১৯১৯ সালের আইনে শতকরা তিনজনের ভোটাধিকার ছিল, ১৯৩৫ সালে শতকরা ১০ জনের—স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত।

পদ্ধতি ঃ (১) পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন্‌টি ?
(২) ১৯১০ সালের আইনে শতকরা আমাদের দেশে কয়জনের ভোটাধিকার ছিল ?
(৩) ১৯৩৫ সালের আইনেই বা শতকরা কয়জন ভোটাধিকার পাইয়াছিল ?
(৪) এখন ভারতরাষ্ট্রে কতজন এবং কাহারা ভোটাধিকার পাইয়াছে ?

বিষয় ঃ (গ) নির্বাচন কমিশন ঃ—

উপস্থাপন ঃ দেশের নির্বাচন পরিচালনা করিবার গুরুদায়িত্ব—দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনের নিমিত্ত নির্বাচন কমিশন গঠিত—স্বতন্ত্র স্বাধীন সংস্থা—সরকারী কর্মচারীদিগের সাহায্য গ্রহণ—মুখ্য নির্বাচন—কর্তা—নির্বাচনী অভিযোগ বিচারের নিমিত্ত স্বতন্ত্র নির্বাচন-আদালত গঠনের অধিকার।

পদ্ধতি ঃ (১) নির্বাচন-পরিচালক সংস্থার নাম কি ?
(২) কমিশনের প্রধানকে কি বলা হয় ?
(৩) নির্বাচনী অভিযোগ কোথায় বিচার করা হয় ?
(৪) নির্বাচন-আদালত কে গঠন করে ?

বিষয় ঃ (ঘ) নির্বাচনকেন্দ্র ঃ

উপস্থাপন ঃ লোকসভা ও বিধানসভায় প্রতিনিধি নির্বাচন—উপনির্বাচন—লোকসংখ্যার হিসাবে নির্বাচন-কেন্দ্র গঠন—প্রতিকেন্দ্র হইতে সাধারণতঃ একজন প্রতিনিধি নির্বাচন—বিধানসভা কেন্দ্রে সাধারণতঃ ৫০ হইতে ৭৫ হাজার লোকের বাস—প্রতি লোকসভা কেন্দ্রে ৫ লক্ষ হইতে ৭½ লক্ষ লোকের বাস—১৯৫৭ সালে, ভারতে নির্বাচিত মোট বিধানসভা সদস্য ২৯০১ জন এবং কেন্দ্রীয় লোকসভায় ৪৯৪ জন—ভারতের সমস্ত নাগরিকগণের প্রতিনিধি এখন ৩৩৯৫ জন কর্তৃক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরিচালনা হইয়াছে।

পদ্ধতি ঃ (১) সাধারণতঃ এক একটি বিধানসভা নির্বাচনকেন্দ্রে কতজন লোক বাস করে ?
(২) লোকসভা কেন্দ্রেই বা উক্ত সংখ্যা কত ?
(৩) উপনির্বাচন কাহাকে বলে ?
(৪) ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভাগুলি ও লোকসভাতে মোট কতজন সদস্য নির্বাচিত হয় ?
(৫) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাহারা পরিচালনা করিয়া থাকে ?

অভিযোজনঃ ছাত্রদের লব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করা হইবে ঃ—

(১) ইংরাজী franchise কথার অর্থ কি ?
(২) ভোটদানের অধিকার ও স্বাধীনতাকে কেন মূল্যবান মনে করা হয় ?
(৩) প্রত্যেক নাগরিকের ভোটদানের পূর্বে কি বিবেচনা করা প্রয়োজন ?
(৪) বর্তমান ভারত-রাষ্ট্রে কাহারা এবং শতকরা কতজন অধিবাসী ভোটাধিকার পাইয়াছে ?
(৫) ভারত-রাষ্ট্রে নির্বাচন-পরিচালক সংস্থার নাম কি ?
(৬) বিধানসভায় কতজন লোকপিছু একজন সদস্য নির্বাচন করা হয় ?
(৭) লোকসভার ক্ষেত্রে ঐ সংখ্যা কত ?
(৮) ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিধানসভাগুলিতে ও লোকসভায় মোট কতজন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন ?

বাড়ীর কাজ

তোমার পিতা একজন ভোটার ; তাহার সহিত একজন নির্বাচন-প্রার্থীর কথোপ-কথনের দৃশ্য ও বিষয়বস্তু, নিজের ভাষায় বাড়ী হইতে লিখিয়া আনিবে।

পাঠ-টীকা (৫)

বিদ্যালয়—কমলা হাইস্কুল
শ্রেণী—নবম
ছাত্র সংখ্যা—৪০
গড় বয়স—১৪ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—২৩।২।৬২
শিক্ষক—কৃষ্ণগোপাল কুণ্ডু

বিষয়
সমাজবিদ্যা
সাধারণ পাঠ
রাষ্ট্র ও জনসাধারণ
বিশেষ পাঠ
"সাম্প্রতিক ভোটযুদ্ধের অভিজ্ঞতা"

উদ্দেশ্য ঃ মুখ্য উদ্দেশ্য হইল, বর্তমান সামাজিক ঘটনাবলীর প্রতি ছাত্রদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং তাহাদের স্বীয় পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে তাহারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তাহা সরল ভাষায় সুসংবদ্ধভাবে লিখিয়া উপস্থিত করিতে সহায়তা করা।

গৌণ উদ্দেশ্য হইল, ভাষা-ব্যবহার, রচনা-শক্তি, কল্পনা, যুক্তি চিন্তাশক্তি ও বিচার-শক্তির বিকাশে ছাত্রদিগকে সহায়তা দান।

উপকরণ—তিনটি নির্বাচনী প্রতীক—

আয়োজন ঃ ছাত্রদিগের মন অন্তকার নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুর দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ভূমিকা-প্রসঙ্গে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা হইবে ঃ—

(১) তোমাদের এলাকায় সাধারণ নির্বাচনের নিমিত্ত কোন্ তারিখে ভোট গ্রহণ করা হইবে ?
(২) তোমাদের এলাকা হইতে বিধানসভার নিমিত্ত কংগ্রেস-প্রার্থী কে ?
(৩) লোকসভার নিমিত্তই বা কংগ্রেস-প্রার্থী কে ?
(৪) প্রধান বিরোধী প্রার্থীর দুইজনের নাম কর।

পাঠ-ঘোষণা ঃ আমরা অন্ত বর্তমান মুহূর্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ঘটনা, তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের নিমিত্ত ভোটগ্রহণ বিষয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিতে যত্নবান হইব। ইহাতে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং ধারণাই মুখ্যতঃ অভিব্যক্ত হইবে। বিষয়শীর্ষ হইবে—"সাম্প্রতিক ভোটযুদ্ধের অভিজ্ঞতা।"

উপস্থাপন ঃ ছাত্রদের নিকট অন্তকার পাঠটি সহজ করিবার উদ্দেশ্যে এবং পাঠ পরিচালনার সুবিধার্থে বিষয়টিকে ছাত্রদিগের সহযোগিতায় কয়েকটি শীর্ষে ভাগ করিয়া লওয়া হইবে এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ছাত্রদের সহায়তায় প্রতিটি শীর্ষের আলোচনা করা হইবে ঃ—

(ক) ভূমিকা

(১) স্বাধীনতালাভের পরে আমাদের দেশে আর কয়টি সাধারণ নির্বাচন হইয়াছে ?
(২) ইহা কোন্ দফার সাধারণ-নির্বাচন ?
(৩) এই নির্বাচনকে সাধারণ-নির্বাচন বলা হয় কেন ?
(৪) আমাদের দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরা কখন, কিভাবে ভোটের অধিকার লাভ করিয়াছে ?
(৫) ভোটের অধিকারটি অত্যন্ত মূল্যবান কেন ?
(৬) কয় বৎসর অন্তর আমাদের দেশে সাধারণ-নির্বাচনের নিমিত্ত ভোট গ্রহণ করা হয় ?

ভোটযুদ্ধের প্রস্তুতি—

(ক) (১) "কাস্তে হাতুড়ি তারা" কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রতীক ?
(২) "জোয়াল-কাঁধে জোড়া বলদ" কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রতীক ?
(৩) "কাস্তে ধানের শীষ" কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রতীক ?
(৪) "চালাঘর" কোন্ রাজনৈতিক দলের প্রতীক ?
(৫) ইহা ছাড়া আর কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতেছে ?

(৬) তোমাদের এলাকায় নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে কে কে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন ?
(৭) তোমাদের এলাকায় কংগ্রেস প্রার্থী দুইজনের নাম কি কি ?
(৮) "সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রন্টের" প্রার্থী দুইজনের নাম কি কি ?
(৯) কাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে বলিয়া মনে হয় ?

(খ) (১) কতদিন পূর্ব হইতে তোমাদের এলাকায় নির্বাচনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে।
(২) কংগ্রেস-প্রার্থীদের নাম কতদিন আগে ঘোষণা করা হইয়াছে।
(৩) অন্যান্য রাজনৈতিক বা নির্দলীয় প্রার্থীদের নামই বা কতদিন আগে ঘোষণা করা হইয়াছে ?
(৪) তোমাদের পাড়ায় কোন্ কোন্ প্রার্থী নির্বাচনী অফিস খুলিয়াছে ?
(৫) কোন্ কোন্ প্রার্থীর স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা বেশী ?

ভোট যুদ্ধের আরম্ভ—

(১) তোমাদের বাড়ীর দেওয়ালগুলিতে বিভিন্ন নির্বাচন প্রার্থীর লোকেরা পোষ্টার লাগাইতেছে কেন ?
(২) কতদিন আগে হইতে এইরূপ পোষ্টার লাগান হইতেছে ?
(৩) নির্বাচন প্রার্থীরা কতদিন আগে হইতে পাড়ার পার্কগুলিতে জনসভা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ?
(৪) এইসব জনসভাতে তাঁহারা প্রধানতঃ কি কি কথা বলিয়া ভোট প্রার্থনা করেন ?
(৫) পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে প্রার্থীদের তরফ হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের আনা-গোনা আরম্ভ হয় কেন ?

ভোট যুদ্ধের মধ্য পর্ব

(১) ক্রমেই বহুবর্ণের বহুসংখ্যক পোষ্টার লাগাইবার উদ্দেশ্য কি ?
(২) নির্বাচনী পোষ্টারগুলির কল্যাণে বাড়ীর দেওয়ালগুলির অবস্থা কিরূপ হয়।
(৩) পাড়ার গলিগুলিতে এইসব পোষ্টার আর কি কি ভাবে শোভা পাইতে থাকে ?
(৪) প্রধান রাজপথগুলিতেই বা কি কি ভাবে পোষ্টার লাগান হয় ?
(৫) এক দলের প্রার্থী অপর রাজনৈতিক দলের প্রার্থীকে কেন সমালোচনা করেন ?
(৬) উভয় বা সকল পক্ষের এইরূপ সমালোচনার ফলে জনসাধারণের কি জানিবার সুবিধা হয় ?
(৬) দেশের গণ্যমান্য নেতারা স্থানীয় পার্কগুলিতে এখন আসিতেছেন কেন ?
(৮) নির্বাচনী সভাগুলি হইতে শোভাযাত্রা বাহির করিবার উদ্দেশ্য কি ?

(৯) দেয়ালে দেয়ালে সাধারণ পোষ্টারের সহিত নানা ধরনে কার্টুন লাগাইবার বা কারণ কি ?

(১০) বিভিন্ন মতের, দলের বা নিরপেক্ষ খবরের কাগজগুলিই বা নির্বাচনী কার্যে কিভাবে সহায়তা করিয়া থাকে ?

ভোট যুদ্ধের সমাপ্তি—

(১) ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে সভা—শোভাযাত্রা—মাইক—চোঙা সহযোগে প্রচার প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হয় কেন ?

(২) প্রত্যেক প্রার্থীর তরফ হইতে ভোটারদিগকে আপন আপন প্রতীক সম্বলিত চিঠি দেওয়া হয় কেন ?

(৩) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে ইংরাজীতে কি বলে ?

(৪) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের আশে-পাশে বিভিন্ন প্রার্থীর নির্বাচনী আপিস বসে কেন ?

(৫) বাড়ী হইতে ভোটারদিগকে আনিবার জন্য সকল দলের স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটাছুটি করেন কেন ?

(৬) ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বাহিরে তাঁহারা ভোটারদিগকে কি বলিতে থাকেন ?

ভোট যুদ্ধের ফলাফল—

(১) কোন্ কর্তৃপক্ষ নির্বাচন পরিচালনা করেন ?

(২) ভোট গণনার সময়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীরা উপস্থিত থাকেন কেন ?

(৩) কোন্ প্রার্থী নির্বাচিত বলিয়া ঘোষিত হন ?

(৪) এই নির্বাচিত সদস্যের ভবিষ্যৎ মূল কর্তব্য কি ?

(৫) "ভোট জনসাধারণের প্রধান রাজনৈতিক হাতিয়ার"—এই কথার তাৎপর্য কি ?

অভিযোজন ঃ উল্লিখিত নির্দেশ-অনুসারে "ভূমিকা" শীর্ষটি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে একটি অনুচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করিতে বলা হইবে। ছাত্রদের লিখিবার সময় শ্রেণী-কক্ষে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছাত্রদের কার্য পর্যবেক্ষণ করা হইবে এবং প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা হইবে।

বাড়ীর কাজ

সমগ্র বিষয়টি ছাত্রদিগকে বাড়ী হইতে সুন্দর করিয়া লিখিয়া আনিতে বলা হইবে।

সমাজবিদ্যার অন্তর্গত ভারত-ইতিহাসের একটি বিষয়েরও পাঠ-টীকা দেওয়া গেল। বিষয়টি "মুঘল যুগে ভারতবর্ষ" এই সাধারণ পাঠের অন্তর্গত। নির্দিষ্ট বিষয় "মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ"। ঐতিহাসিক বিষয়ে পাঠ-পরিচালনায় একটি ধারণা এর থেকে স্পষ্টতর হবে আশা করা যায়।

পাঠ-টীকা (৬)

বিদ্যালয়ের নাম—মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউসন্ (মেন)
শ্রেণী—নবম
ছাত্রসংখ্যা—৩৬
গড় বয়স—১৪ বৎসর
সময়—৪০ মিনিট
তারিখ—২২।২।৫৮
শিক্ষকের নাম—ভুবনচন্দ্র ভূঞ্যা

বিষয়—
সমাজবিদ্যা
সাধারণ পাঠ
মুঘলযুগে ভারতবর্ষ
বিশেষ পাঠ
মুঘলসাম্রাজ্যের
পতনের কারণ

উদ্দেশ্য ঃ মুঘল সাম্রাজ্যেরপতনের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান দান করা এবং এতৎপ্রসঙ্গে ছাত্রদের চিন্তা, কল্পনা ও বিচারশক্তি বিকাশে সহায়তা করা।

উপকরণ ঃ মুঘলসাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক মানচিত্র ও সময়রেখা।

আয়োজন ঃ ছাত্রদের আগ্রহ ও কৌতূহল জাগ্রত করিয়া পাঠে সক্রিয় অংশ-গ্রহণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষকমহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন করিবেন।

(১) আমরা কোন্ দেশে বাস করি?
(২) ভারতবর্ষ কোন্ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে?
(৩) স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পূর্বে কোন্ জাতি আমাদের দেশ শাসন করিত?
(৪) ইহাদের পূর্বে কোন্ জাতি এবং সেই জাতির কোন্ বংশ ভারতবর্ষ শাসন করিত?

পাঠঘোষণা ঃ "আজ আমরা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব", এই বলিয়া শিক্ষক মহাশয় অদ্যকার পাঠঘোষণা করিবেন।

বিষয় ঃ (ক) সূচনা

উপস্থাপন ঃ ১৫২৬ খ্রীঃ বাবর ভারতবর্ষে মুঘলসাম্রাজ্য স্থাপন করেন। আকবর এই সাম্রজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। সাজাহানের সময়ে এই সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয়। ঔরংজেবের সময় মুঘলসাম্রাজ্য সারা ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃত হয়। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

পদ্ধতি ঃ শিক্ষক ছাত্রদিগকে মুঘলসাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ঐতিহাসিক মানচিত্র ও সময়রেখা দেখাইবেন। উহা হইতে ছাত্র জানিতে পারিবে মুঘলসাম্রাজ্য কত বড় ছিল এবং মুঘলগণ কত বৎসর এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাহার পর শিক্ষকমহাশয় বিষয়ের প্রতি শীর্ষের বিশদ আলোচনা করিবেন এবং প্রত্যেক শীর্ষের আলোচনান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশ্নের সাহায্যে উত্তর আদায় করিবেন।

(ক) (১) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
(২) কোন্ সম্রাট মুঘল সাম্রজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন ?
(৩) কোন্ সম্রাটের সময় এই সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে উঠে ?
(৪) কোন্ সম্রাটের সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী বিস্তৃত হয় ?
(৫) কোন্ সম্রাটের মৃত্যুর পর মুঘল সাম্রাজ্য পতনের দিকে অগ্রসর হয় ?

(খ) মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের কারণ সমূহ ঃ—

(১) মুঘলসাম্রাজ্যের বিশালতা—মুঘলসাম্রাজ্যের সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী বিস্তৃতি, যাতায়াতের পথের অভাব—নদ-নদী ও পাহাড়-পর্বতাদি চলাচলের বাধা-সৃষ্টি—কেন্দ্রস্থল হইতে সাম্রাজ্য শাসনের অসুবিধা।

(২) জাতীয়তাভাবের অভাব ঃ—
সৈন্যবলের সাহায্যে মুঘলসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা—সম্মিলিত ভারতীয় জাতির প্রীতির উপর উহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত—জাতীয় ভাবের বিকাশের জন্য আকবরের চেষ্টা—সাজাহান ও ঔরংজেবের ধর্মনীতির পথে বাধাসৃষ্টি।

(৩) হিন্দুজাতির পুনরুত্থান ঃ—
বহুদিন মুসলমান শাসনের অধীনে থাকিয়া এবং নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করার ফলে হিন্দুজাতির পক্ষে পুনরুত্থানের চেষ্টা করার স্বাভাবিকতা—ঔরংজেবের ধর্মনীতির ফলে রাজপুত, জাঠ ও শিখগণের মুঘলসাম্রাজ্যের চরম শত্রুরূপে পরিণতি—মারাঠাজাতির উদ্ভব।

পদ্ধতি ঃ (১) (ক) মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির পরিচয় দাও।
(খ) সাম্রাজ্যের বিশালতাকে এই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ বলা হয় কেন ?
(২) (ক) মুঘল সাম্রাজ্য কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ?
(খ) জাতীয়তার বিকাশের জন্য কোন্ সম্রাট চেষ্টা করিয়াছিলেন ?
(গ) কোন্ কোন্ সম্রাটের ধর্মনীতি এই ভাববিকাশের পথে অন্তরায় হইয়াছিল ?
(৩) (ক) ঔরংজেবের ধর্মনীতির ফলে কোন্ কোন্ জাতি মুঘলসাম্রাজ্যের চরম শত্রুতে পরিণত হইয়াছিল ?
(খ) হিন্দুজাতির পুনরুত্থানের কারণ কি ?
(গ) দাক্ষিণাত্যে কোন্ জাতি মুঘল সাম্রাজ্যের পরম শত্রু ছিল ?

(গ) ঔরংজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও নীতি ঃ—

তাঁহার নীতির ফলে হিন্দুজাতির-পুনরভ্যুদয়—জীবনের শেষ ২৫ বৎসর দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যুদ্ধে ব্যাপৃতি—অনবরত যুদ্ধের ফলে বহু অর্থ ও সৈন্য ক্ষয় এবং তাঁহার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিতে উত্তর ভারতের শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা।

[Cf "দাক্ষিণাত্য কেবল তাঁহার দেহের সমাধিক্ষেত্র নহে, তাঁহার কীর্তিরও সমাধিক্ষেত্র"—যদুনাথ সরকার]।

পদ্ধতি ঃ (ক) তাঁহার নীতির ফলে কোন্ জাতির পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল ?

(খ) জীবনের শেষ ২৫ বৎসর দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি সাম্রাজ্যের কি ক্ষতি করিয়াছিলেন ?

(গ) তাঁহার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার কি মন্তব্য করিয়াছেন ?

(ঘ) ঔরংজেবের পরবর্তী বংশধরগণের দুর্বলতা—

রাজ্যশাসনে অক্ষমতা—সিংহাসনলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা—ঘন ঘন রাজা পরিবর্তন—সৈয়দভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতি তথাকথিত প্রতিপত্তিশালী নায়কগণের চক্রান্ত—রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা—প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের স্বাধীনতা-ঘোষণা—মুঘল সেনাবাহিনীর নৈতিক জ্ঞানশূন্যতা ও অকর্মণ্যতা—সম্রাটগণের দুর্বলতার সুযোগে নাদির শাহ্ ও আহম্মদ শাহ্ প্রভৃতি নৃপতিদের সাম্রাজ্য আক্রমণ।

পদ্ধতি ঃ (ক) ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাটগণ কিরূপ ছিলেন ?

(খ) সিংহাসনলাভের জন্য তাঁহারা কি করিতেন ?

(গ) মুঘল সেনাবাহিনীর নৈতিক চরিত্র কিরূপ ছিল ?

(ঘ) প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন কেন ?

(ঙ) মুঘলগণের দুর্বলতার সুযোগে কোন্ কোন্ বৈদেশিক নৃপতি মোগল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন ? এবং তাঁহাদের আক্রমণ এই সাম্রাজ্যের পতনের পথ সুগম করিয়াছিল ?

ব্ল্যাকবোর্ড সারাংশ ঃ অদ্যকার আলোচিত অংশের সারাংশ শিক্ষক ছাত্রদের সহায়তায় ও সযোগিতায় ব্ল্যাকবোর্ডে লিখিয়া দিবেন। ছাত্রগণ তাহা তাহাদের খাতায় লিখিয়া লইবে।

সারাংশ ঃ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার অধঃপতন সম্পূর্ণ হয়। মুঘলসাম্রাজ্যের পতনের প্রধান কারণ হইতেছে এই সাম্রাজ্যের বিশালতা, মুঘল যুগে জাতীয় ভাবের অভাব, হিন্দুদের পুনরুত্থান, ঔরংজেবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও নীতি এবং ঔরংজেবের বংশধরগণের দুর্বলতা।

অভিযোজন ঃ ছাত্রদের লব্ধজ্ঞান পরীক্ষা করিবার জন্য শিক্ষক নিম্নলিখিত পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন করিবেন।

(১) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(২) এই সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে কতদূরব্যাপী বিস্তৃত ছিল।

(৩) এই সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান প্রধান কারণগুলি কি কি ?

বাড়ীর কাজ ঃ শিক্ষক ছাত্রগণকে বাড়ীতে মুঘলসাম্রাজ্যের মানচিত্র ও সময়রেখা অঙ্কন করিতে বলিবেন।

পরিশিষ্ট (খ)

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের নিদর্শন

১। যথার্থ উত্তর নির্ণয় (Multiple Choice Type) :—

নিম্নলিখিত উক্তিগুলির প্রত্যেকটির শেষে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। যথার্থ উত্তরটির তলায় দাগ দাও।

(ক) চা উৎপাদন বেশী হয়।
—উত্তর প্রদেশে, বিহারে, উত্তরবঙ্গ ও আসামে, উড়িষ্যা ও বোম্বাই রাজ্যে।

(খ) হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে যে চৈনিক পরিব্রাজক ভারতভ্রমণে আসিয়াছিলেন তাঁহার নাম—
—ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, মেগাস্থিনিস।

(গ) গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন—
—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত।

(ঘ) বিক্রমশীলার বিহারের মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে পদব্রজে গিয়াছিলেন—
—দাক্ষিণাত্যে, তিব্বতে, কাশীতে।

(ঙ) চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত করেন—
—লর্ড হেষ্টিংস, লর্ড কর্নওয়ালিশ, লর্ড বেন্টিঙ্ক।

(চ) ভারতের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়—
—তিন বৎসর অন্তর, পাঁচ বৎসর অন্তর, সাত বৎসর অন্তর।

(ছ) রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়
—রোমে, লণ্ডনে, জেনেভায়, নিউইয়র্কে, বেইরুতে।

২। শূন্যস্থান পূরণ অথবা বাক্য পূরণ (Completion Type) :—

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূরণ কর—

(ক) চিত্তরঞ্জন কারখানা — তৈরীর জন্য বিখ্যাত।

(খ) কবি জয়দেবের জন্মস্থান —— গ্রামে।

(গ) —— কে পশ্চিমবঙ্গের দুঃখ-নদী বলা হয়।

(ঘ) পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের শিকারের প্রধান হাতিয়ার হইল ————।

(ঙ) ——খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহে ঝাঁসির বিদ্রোহীদের নায়িকা ছিলেন সেখানকার রানী——।

(চ) প্রত্যেক নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হইল রাষ্ট্রের প্রতি——স্বীকার করা।

(ছ) ভারতে বিচার ব্যবস্থার উচ্চতম স্তর আছে——কোর্ট।

(জ) ভারতীয় পার্লামেণ্ট সারা —— জন্য আইন প্রণয়ন করে আর রাজ্যসমূহের আইনসভা নিজ নিজ — জন্য আইন প্রণয়ন করে।

৩। **সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ** (True False or Yes or No Type) ঃ—

নিম্নের বিবৃতিগুলির মধ্যে যেটি তোমার কাছে ঠিক বলিয়া মনে হয় তাহার পার্শ্বে √ চিহ্ন এবং যেটি ঠিক নয় বলিয়া মনে হয় তাহার পার্শ্বে × চিহ্ন দাও—

(ক) ফা-হিয়েন ছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় গ্রীকদূত।
(খ) মৌর্যযুগে গান্ধার-শিল্পের বিকাশ ঘটে।
(গ) সাঁচী স্তূপটি কণিষ্কের সময়ে নির্মিত হয়।
(ঘ) অজন্তার গুহাচিত্রগুলি গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের অপূর্ব নির্দশন।
(ঙ) অশোকের ধর্মনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল পরমতসহিষ্ণুতা।
(চ) আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজাহান প্রভৃতি মোঘল সম্রাটগণ সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন, কিন্তু ঔরংজীবের দরবারে সঙ্গীত নিষিদ্ধ হইয়াছিল।
(ছ) স্যার টমাস রো ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূতরূপে আসিয়া ঔরংজীবের রাজদরবারে চারি বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন।
(জ) ক্লাইভ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

৭। **সম্পর্ক অনুসারে প্রথম সারির বিষয়গুলির সহিত দ্বিতীয় সারির বিষয়গুলি মিলাও** (Matching Test) ঃ—

প্রথমসারি	দ্বিতীয়সারি
গণতন্ত্র	একজনের শাসন।
নেতাজী সুভাষচন্দ্র	"হর্ষচরিত" লেখক।
একনায়কত্ব	জনগণের শাসন
১৯৪৭ সালে	সিপাহী-বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়।
তাভার্নিয়ে	আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন করেন।
বাণভট্ট	ফরাসী জহুরী।
১৮৫৭ সালে	ভারত ও পাকিস্থান রাষ্ট্রদ্বয়ের জন্ম।

৫। **নিম্নলিখিত নাম ও ঘটনাগুলি কালানুক্রমিক ভাবে সাজাও** (Arrangement Test) ঃ—

(ক) হর্ষবর্ধন, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, অশোক।
(খ) ফা-হিয়েন, মেঘাস্থিনিস, হিউয়েন সাঙ।
(গ) কুষাণ জাতির ভারত আক্রমণ, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, হূনদের ভারত অভিযান।
(ঘ) রাজা রামমোহন, রামকৃষ্ণ পরমহংদেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
(ঙ) স্বদেশী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, আইন অমান্য আন্দোলন।

৬। **সংজ্ঞা (Defination) নিরূপণ কর :—**

(ক) "গণতন্ত্র", "পরিকল্পিত শহর," "সমাজোন্নয়ন" কথাগুলির সংক্ষিপ্ত সূত্রদ্বারা সংজ্ঞা নির্ধারণ কর।

সোজাসুজি এইভাবে সংজ্ঞা নির্ণয় করতে না বলে কতকগুলি প্রদত্ত বক্তব্য বিচার করে উপযুক্ত সংজ্ঞাটি বাছাই করতে বলা যেতে পারে ; যথা—

গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞাটি বাছাই কর :—

(ক) জনগণের স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

(খ) জনগণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

(গ) জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনই গণতন্ত্র।

(ঘ) জনগণের প্রতিনিধিদের বহুমত দ্বারা শাসনই গণতন্ত্র।

(ঙ) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত, জনগণের শাসনই গণতন্ত্র।

৭। **যোগসূত্র (Relationship) নির্ণয় কর :—**

এ প্রকার প্রশ্নের দ্বারা দুটি বিষয় বা ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র নির্ণয় করতে বলা হয়।

(ক) ইব্রাহিম লোদীর পতন ও ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মধ্যে সম্পর্ক-সূত্র নির্ধারণ কর।

(খ) কলিকাতা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সহিত যোগাযোগ-ব্যবস্থার মধ্যে যোগ সম্পর্ক থাকিলে তাহা সংক্ষেপে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দাও।

(গ) বর্ধমান জেলার শিল্পে শ্রীবৃদ্ধি ও উহার কোন কোন অংশে এবং সন্নিহিত অঞ্চলে খনিজদ্রব্যের প্রাচুর্যের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে ?

(ঘ) দেশের কোন অংশের জলবায়ু ও উহার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কি সম্পর্ক আছে ? (পশ্চিমবঙ্গের উদাহরণ দ্বারা উহা সংক্ষেপে বিচার কর।)

যোগসূত্র নির্ণয়ের অপর একটি প্রণালী দেওয়া গেল। যথা—

ঘটনা	স্থান	কাল
(ক) সিন্ধুসভ্যতার উৎস		
(খ) বুদ্ধদেবের জন্ম		
(গ) পুরুর সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ		
(ঘ) কণিষ্কের সিংহাসনে আরোহণ		
(ঙ) শঙ্করাচার্যের জন্ম		
(চ) হজরত মহম্মদের জন্ম		
(ছ) পৃথ্বীরাজের সহিত মুহম্মদ ঘুরীর যুদ্ধ		

ঘটনা	স্থান	কাল
(জ) বাবরের সহিত ইব্রাহিম লোদীর যুদ্ধ		
(ঝ) ঔরংজেবের মৃত্যু।		

৮। **শ্রেণী-বিন্যাস** (Classification Test) :—

এই ধরনের পরীক্ষায় এক এক শ্রেণীর বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়কে বাছাই করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে বলা হয়। যথা :—

(ক) বর্ধমান জেলায় যা উৎপন্ন হয় না—

—ধান, চা, পাট, তামাক, আখ, আলু, কমলালেবু, কার্পাস।

(খ) বিহার রাজ্যে যাহারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বাস করে না—
—বিহারী, শিখ, গ্রীক, বাঙালী, ইংরেজ, বর্মী, ওড়িয়া, রুশ, চীনা।

(গ) কলিকাতায় যে ভবনগুলি নাই—
—বিধানসভাভবন, হাইকোর্ট, পার্লামেণ্ট ভবন, জাদুঘর, জাতীয় গ্রন্থাগার, সুপ্রীম কোর্ট, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ, মমতাজমহলের স্মৃতিসৌধ, লালকেল্লা, ফোর্ট উইলিয়ম।

(ঘ) রাজ্য সরকার যে কাজ করেন না—
—বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ, জেলা শাসকদের নিয়োগ, হাইকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ, বহির্বাণিজ্যের অনুমতিদান, অন্তঃরাজ্য যানবাহন চলাচলের অনুমতিদান, রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রা-ব্যবস্থা-নিয়ন্ত্রণ।

৯। **বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নির্ণয়** (Distinction) :—

এই ধরনের পরীক্ষায় সহজ, সরল এবং সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য অথবা পার্থক্যসমূহ দেখাতে বলা হয়। যথা—

(ক) "অর্থকরী শস্য" ও "ভোগ্যশস্যে"র পার্থক্য দেখাও।

(খ) "পরিকল্পিত শহর" ও "অপরিকল্পিত শহরের" তুলনা কর।

(গ) "জৈন" ও "বৌদ্ধ"ধর্মের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য নির্দেশ কর।

(ঘ) "উৎপাদক শ্রম" ও "অনুৎপাদক শ্রমের" পার্থক্য দেখাও।

(ঙ) "গণতন্ত্র" ও "স্বৈরতন্ত্রের" মধ্যে প্রধান পার্থক্য কি কি ?

১০। **স্মৃতিমন্থন বা প্রশ্নোত্তর** (Recall or Questions and Answers) :

(ক) "বুনিয়াদী শিক্ষার" উদ্গাতা কে ?

(খ) "বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা কে ?

(গ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কোন্ বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন ?

(ঘ) শ্রেষ্ঠ মুঘলসম্রাটের নাম কর।

(ঙ) মুঘলযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী কে ?

(চ) ভারতবর্ষকে কবে "প্রজাতন্ত্র" বলিয়া ঘোষণা করা হয় ?

(ছ) রাজ্যের প্রধানকে কি নামে অভিহিত করা হয় ?

(১১) মানচিত্র অঙ্কন ও মানচিত্রে অবস্থান নির্দেশ প্রভৃতি :—

সমাজবিদ্যায় মানচিত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। কৃষি ও শিল্প উৎপাদন, বৃষ্টিপাত, পর্বত, সমুদ্র প্রভৃতির অবস্থান ও তাদের ভৌগোলিক তাৎপর্য, বিভিন্ন রাষ্ট্র, তাদের রাজধানী ও বিশ্বের প্রধান প্রধান নগর ও বন্দর সমূহের সম্পর্কে ধারণা সমাজবিদ্যা-শিক্ষার একটি অপরিহার্য অংশ। এজন্য শিক্ষার্থীদের মানচিত্র অঙ্কন করে তাতে বিভিন্ন বিষয় ও স্থানের নির্দেশ দেখাতে বলা যেতে পারে, অথবা অঙ্কিত মানচিত্রে ঐ সব অবস্থান নির্দেশ করতে বলা হবে। অনেক সময়, অঙ্কিত মানচিত্রে কিছু নির্দেশ করে তার ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি চাওয়া যেতে পারে।

আমরা অনেকগুলি ধরনের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার নিদর্শন দিলাম। সমাজবিদ্যার শিক্ষকগণ এ বিষয়ে আরও নতুন আলোকপাত করবেন বলে আশা করি।

পরিশিষ্ট (গ)

সমাজবিদ্যার নমুনা প্রশ্নপত্র

সময়—১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট পূর্ণ সংখ্যা—১০০

১। নিম্নের পরিমিত স্থানে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্তভাবে উত্তর দাও।

(ক) নিম্নোক্ত সংবাদটি যত্ন সহকারে অনুধাবন কর :—

"কলকাতায় টোন করা দুধ (Toned milk) জনপ্রিয় হয় নি। টোন-করা দুধে থাকে মোষের দুধ, গুঁড়ো দুধ এবং জল, খাঁটি দুধের যা যা উপাদান তা সবই আছে। বোম্বাইয়ের অভিজ্ঞতা কিন্তু অন্যরকম। সেখানে ডবল টোন করা দুধ (যে দুধে চর্বি আছে মাত্র শতকরা দেড়ভাগ, অথচ হরিণঘাটার দুধে আছে শতকরা তিনভাগ চর্বি) অন্য যে কোন প্রকার দুধের সমপরিমাণেই বিক্রি হয়। এখানকার সরকারের কাছে ব্যাপারটা প্রহেলিকা ঠেকেছে। সরকার জোর দিয়েই বলেছেন টোন-করা দুধ গরুর দুধের মতই পুষ্টিকর, অথচ সস্তা।" (দি স্টেটস্‌ম্যান, ৫।১০।৬০)

হরিণঘাটার টোন-করা দুধ কলকাতায় জনপ্রিয় নয় কেন?

উত্তর :

(খ) রাম গত দুমাস ধরে বাড়ীভাড়া দিতে পারে নি। দুদিনের মধ্যে ভাড়া পরিশোধ কোরতে না পারলে বাড়ীওয়ালা তাকে উচ্ছেদ কোরবে বলে শাসিয়ে গেছে।

রাম তার বন্ধু শ্যামলের কাছে গিয়ে ১০০ টাকা ধার চাইলে, শ্যাম সেদিন বিকেলবেলায় তাকে ১০০ টাকা পাঠিয়ে দিল। কিন্তু সেই সাথে একটা চিঠিও দিল তাতে সে জানিয়েছে যে ঐ টাকা সে তার ধনী জ্যাঠামশায়ের থেকে চুরি কোরেছে। রাম ঐ টাকা দিয়ে বাড়ীভাড়া শোধ কোরলো।

ঐ দুটো বালকের কাজ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?

উত্তর :—

(গ) অশোক এবং সতীশ দুই সহপাঠী। তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অশোকের ছিল বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র নষ্ট করার বদভ্যাস। সতীশ সেটা পছন্দ করত না। এটা যে একটা অনুচিত কাজ এবং গুরুতর অপরাধের বিষয়, সতীশ তা অশোককে অনেকবার বোঝাতে চেষ্টা কোরেছে। কিন্তু অশোক তার কথায় কান দেয় নি। সতীশ জানে যে সে যদি অশোকের বিরুদ্ধে নালিশ করে, তবে তার অনেক জরিমানা হয়ে যাবে, অথবা তাকে বিদ্যালয় থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

সতীশ কি অশোকের বিরুদ্ধে নালিশ কোরবে, অথবা চুপ কোরে থাকবে? তোমার অভিমতের উপযুক্ত কারণ বর্ণনা কর।

উত্তর :—

২। নিম্নোক্ত (ক) এবং (খ) নং বিবরণে দুটো ঐতিহাসিক সত্য পরিবেশন করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটা বিবরণের নীচে তার ব্যাখ্যা হিসেবে কতকগুলো মন্তব্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। বিবরণ এবং ব্যাখ্যাগুলো সযত্নে অনুধাবন করার পর প্রত্যেক ব্যাখ্যার পাশে যে বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া আছে তার মধ্যে ব্যাখ্যাটি যদি ঠিক হয় তবে "ঠিক" কথাটি লিখ, যদি সেটা ভুল হয় তবে "ভুল" কথাটি লিখ, আর

তোমার মনে ঐ বিষয়ে যদি কোনো সংশয় থাকে তবে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) দাও।

(ক) **বিবরণ**ঃ প্রাচীন মিশরীয়, আসিরীয় এবং ব্যাবিলোনীয় সভ্যতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় নাই। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা বিস্ময়করভাবে সর্বযুগে অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে।

মন্তব্যসমূহঃ

(১) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা অন্য দেশ কয়টির প্রাচীন সভ্যতা অপেক্ষা উন্নতর ছিল। ( )

(২) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রবাহ কখনও বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিঘ্নিত হয় নাই। ( )

(৩) ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। কোনো ঐতিহাসিক যুগেই ইহার সভ্যতাকে দেশের সকল অংশ হইতে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা যায় নাই। ( )

(৪) প্রাচীন ভারতীয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় জীবনে এইরূপ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে যে কোন শক্তিই তাহাদের মূলোচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয় নাই।

(৫) ভারতীয়গণ সকল যুগেই সর্বপ্রকার নূতন অবস্থায় সহিত নিজেদের সামঞ্জস্য বিধানে অদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাইয়াছে। ( )

(খ) **বিবরণ**ঃ আকবর দীন-ইলাহি নামে এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করেন।

মন্তব্যসমূহঃ

(১) প্রচলিত ধর্মমত সমূহ আকবরের নিকট ত্রুটিপূর্ণ মনে হইয়াছিল।

(২) বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট এবং মহম্মদের ন্যায় আকবর নিজেকে একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রতিষ্ঠাতৃরূপে প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন। ( )

(৩) সুহৃদ এবং সভাসদগণের তোষামোদে প্রভাবিত হইয়া আকবর একটি নূতন ধর্মমত প্রচার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ( )

(৪) আকবর ভারতীয় জাতি গঠন মানসে এমন একটি ধর্মপ্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন যাহা, তাঁহার বিবেচনায়, সকল ভারতবাসী তাহাদের নিজস্ব ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিবে। ( )

(৫) আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে পৃথিবীর সকল ধর্মেই কিছু সার সত্য আছে। তিনি সেই সকল সত্যকে একত্র সংগ্রথিত করিয়া একটি নূতন ধর্মমত প্রচার করেন। ( )

৩। নিম্নোক্ত (ক) এবং (খ) নম্বরে দুটো তথ্য বিবৃত করা হয়েছে। তাদের একটি আলমোড়া অঞ্চলের নারীদের সম্পর্কে অপরটি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন ব্যবস্থা

সম্পর্কে। প্রত্যেক বিবরণের নীচে কয়েকটি মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যেক মন্তব্যের পাশে বন্ধনী চিহ্ন দেওয়া আছে। মন্তব্যটি "ঠিক", "ভুল", "অংশত ঠিক" অথবা "হাস্যকর" হতে পারে। তোমার বিবেচনায় "ঠিক", "ভুল", "অংশত ঠিক" অথবা "হাস্যকর"—যা মনে হয় বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে তাই লিখ।

(খ) **বিবরণ**ঃ আলমোড়া অঞ্চলে নারীদের মৃত্যুহার পুরুষদের মৃত্যুহার অপেক্ষা বেশী। যাহারা আত্মহত্যা করে তাদেরও শতকরা পঁচাত্তর ভাগ নারী। তাছাড়া, নারীরা প্রায়ই স্বামী পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

মন্তব্যসমূহঃ

(১) আলমোড়ার অধিবাসীরা কন্যার জন্মকে অশুভ মনে করে। ( )

(২) কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ পায় না। ( )

(৩) পশুর ন্যায় নারীদের ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ( )

(৪) নারীদের যথেচ্ছ প্রহার করা হয়। ( )

(৫) নারীদের অবাধ গতিবিধির অধিকার নাই। ( )

(৬) গ্রামের পরিচালনা কার্যে নারীদের কোন হাত নাই। ( )

(৭) নারীরা কোনো অবসর, বিলাস-ব্যসন অথবা আমোদ-প্রমোদের সুযোগ পায় না। ( )

(৮) প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত নারীদের পরিশ্রম করানো হয়। ( )

(৯) নারীরা পর্দানশীন। ( )

(১০) সব থেকে শ্রমসাধ্য কাজগুলি নারীদের দ্বারা করানো হয়। ( )

(১১) স্বামীদের ভুক্তাবশিষ্ট নারীদের ভোজন করিতে হয়। ( )

(১২) আলমোড়া অঞ্চলের চিকিৎসা-ব্যবস্থা এখনও আদিম স্তরেই রহিয়া গিয়াছে। ( )

(১৩) ঐ অঞ্চলের জলবায়ু নারীদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়।

(খ) বিবরণ ঃ—এই বৎসরের প্রথম ছয় মাসের পথ-দুর্ঘটনার একটি সরকারী খতিয়ানে বলা হয়েছে যে প্রতি ধরনের পথচারী মোটরযানের মোট সংখ্যার ভিত্তিতে দেখা যায় যে কলিকাতায় রেজেষ্টারীভুক্ত ১০·৭% প্রাইভেট গাড়ী, ১০·৩% লরী এবং ৬৬% ট্যাক্সি দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে। কিন্তু ষ্টেটবাস দুর্ঘটনা করিয়াছে ২৫৪%। অর্থাৎ···৫৫০ খানি ষ্টেটবাসের প্রত্যেকখানি ২৫ বার দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছে···।"

মন্তব্যসমূহঃ

(১) বাসগুলিতে অসম্ভব ভিড় হয়। ( )

(২) কলিকাতার রাজপথগুলিতেও অসম্ভব ভিড়। ( )

(৩) পথচারীরা নিজেদের খেয়ালখুসীমত পথ চলে এবং তাহা অতিক্রম করিয়া থাকে। ( )

(৪) ষ্টেটবাসগুলি বৃহদায়তন ও ভারী। ( )

(৫) পুলিশ রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষের প্রতি কঠোর মনোভাবাপন্ন নয়। ( )

(৬) ড্রাইভাররা শিক্ষণহীন এবং অনভিজ্ঞ। ( )

(৭) রাষ্ট্রীয় পরিবহন কর্তৃপক্ষ দোষী কর্মচারীদের লঘু শাস্তি দান করেন। ( )

(৮) ড্রাইভাররা বেপরোয়া গাড়ী চালায়। ( )

(৯) ড্রাইভাররা মনে করে যে তাহারা সরকারী কর্মচারী বলিয়া তাহাদের বিশেষ সতর্ক হইবার প্রয়োজন নাই। ( )

(১০) বাসগুলি উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। ( )

(১১) যাত্রীরা প্রায়ই অসতর্ক এবং নির্বোধের ন্যায় আচরণ করেন। ( )

(১২) কলিকাতার পথের অবস্থা নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর। ( )

৪। সম্পর্ক অনুসারে প্রথম পাঠের বিষয়গুলির সহিত দ্বিতীয় সারির বিষয়গুলি মিলাও :—

১ম সারি	২য় সারি
গণতন্ত্র	পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
নেতাজী সুভাষচন্দ্র	একজনের শাসন
একনায়কত্ব	"হর্ষচরিত" লেখক।
১৯৪৭ সালে	জনগণের শাসন।
তাভার্ণিয়ে	সিপাহী বিদ্রোহ অনুষ্ঠিত হয়।
বাণভট্ট	আজাদ-হিন্দ বাহিনী গঠন করেন।
১৮৫৭ সালে	ফরাসী জহুরী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	অজয় মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।
১৯৬৭ সালে	ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

৫। গণতন্ত্রের প্রকৃত সংজ্ঞাটি বাছাই কর :—

(ক) জনগণের স্বার্থে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

(খ) জনগণের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাই গণতন্ত্র।

(গ) জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনই গণতন্ত্র।

(ঘ) জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত, জনগণের শাসনই গণতন্ত্র।

৬। রাষ্ট্র কাহাকে বলে? রাষ্ট্রের সহিত সরকারের সম্পর্ক নির্ণয় কর।

৭। পশ্চিমবঙ্গের পাট শিল্পের শ্রমিকদের জীবন বর্ণনা কর।

৮। তোমার স্কুলে "ধান চাষ" সম্পর্কে একটি প্রদর্শনী হবে। তার পরিকল্পনা কর।

৯। সম্রাট অশোক চিরকাল একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন —কেন, আলোচনা কর।

সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জী

(Cumulative Record Card)

সঞ্চয়শীল তথ্যপঞ্জী বিষয়বস্তু

সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ থাকবে না। ছেলেমেয়েদের সর্ববিধ পরিচয় যাতে জানা যাবে সেইভাবে এই পরিচয়পত্র রাখা হবে।

ব্যক্তিগত বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে এই পত্রে সামগ্রিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

প্রথমেই ছাত্রের নাম, বয়স, জন্ম তারিখ, বিদ্যালয়ের ভর্তি হবার তারিখ, শ্রেণী ইত্যাদি থাকবে। এরপর পারিবারিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হবে। অভিভাবকের পরিচয়—তাঁর আর্থিক অবস্থা, শিক্ষা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ ইত্যাদি বিশদভাবে লেখা থাকবে।

স্বাস্থ্যের পরিচয় ঃ—

উচ্চতা, শরীরের ওজন, কোন অসুখে ভুগছে কিনা, দেহগত কোন ত্রুটি আছে কিনা, বছরের পর বছর এগুলি লিপিবদ্ধ করে দৈহিক বিকাশ ও সাধারণ স্বাস্থ্যের খবর রাখা হবে।

বুদ্ধির পরিচয় ঃ—

বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ কতটা হয়েছে, আদর্শীকৃত পরিমাপের (Standardised Test) সাহায্যে তার পরিমাপ করতে হবে ও বুদ্ধ্যাঙ্ক (I. Q) স্থির করতে হবে।

স্বভাব, উপস্থিতি, দায়িত্ববোধ প্রভৃতি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে রাখতে হবে।

পাঠোন্নতির বিবরণ ঃ—

বিভিন্ন পরীক্ষায় শিক্ষার্থী কি নম্বর পেয়েছে এই অংশে তা লিপিবদ্ধ থাকবে, প্রচলিত প্রগতি-পত্রে যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে এই অংশে তার উল্লেখ থাকবে।

পাঠবর্হিভুত কার্যক্রম ঃ—

শিক্ষার্থী সাধারণ পাঠ্য বিষয়ের বাইরে বিভিন্ন কার্যে কিরূপ যোগ্যতার পরিচয় দিল তা থেকে তার যে সব কার্যক্ষমতা, রুচি, প্রবণতার পরিমাপ করবার জন্য নানা রূপ তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

অভিনয়, সঙ্গীত ঃ—

চিত্রকলা, চারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহ, হাতে কলমে কাজ করবার দক্ষতা কতটা অর্জন করেছে সে সব লিপিবদ্ধ থাকবে।

সামাজিক ক্রিয়াকর্মে অংশ গ্রহণ করে কিনা, খেলাধুলায় ও স্কুলের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে উৎসাহ ও কর্মক্ষমতার পরিচয়, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস. সংগঠন ক্ষমতা প্রভৃতি জানতে হবে।

শ্রেণী-শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক থেকে খোঁজ নিয়েও আলোচনা করে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করবেন।

বিভিন্ন বিষয় উন্নতি অবনতির পরিমাপ গণিতের সংখ্যা দিয়ে স্থির না করে Five Point Scale দিয়ে ঠিক করা অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়। A, B, C, D, E এই পাঁচটি প্রতীকের সাহায্যে গুণাগুণ বিচার ও একটি ছাত্রের থেকে অপর ছাত্রের মানের পার্থক্য বোঝান যেতে পারে। A—খুব ভাল, B—ভাল, C—সাধারণ, D—খারাপ, E—খুব খারাপ এইভাবে ছাত্রদের মান নির্ণয় করা হয়।

প্রচলিত ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাব্যবস্থাকে দোষমুক্ত করতে হলে সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের ব্যাপক প্রচলন প্রয়োজন। এই পরিচয় পত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করলেই এর মূল্য স্বীকৃত হবে। বার্ষিক পরীক্ষা শেষে দায় সারা ভাবে average-য়ে যে রকম টিক মারা হচ্ছে তাই যদি চলতে থাকে তাহলে সর্বাত্মক পরিচয় পত্র রাখবার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হবে। এই সম্ভাবনাপূর্ণ পরিচয় পত্রিকায় সঠিক ব্যবহারে শিক্ষকদের উপর অভিভাবকদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কর্তব্য নির্দ্ধারণে শিক্ষকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ গ্রহণ করবেন। ছাত্রদের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তায় অভিভাবকদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হবে। শিক্ষা যদি হয় শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতি তাহলে তার মূল্যায়ণ সাধারণ প্রচলিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে ধীরে ধীরে কিভাবে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে তার পরিমাপ সর্বাত্মক পরিচয়-পত্রের মাধ্যমেই রাখা সম্ভব।

(সঞ্চয়শীল পরিচয় পত্র পর পৃষ্ঠায় দেখুন।)

গোপনীয়/প্রবর্তনের তারিখ······ নিম্ন/উচ্চ বিদ্যালয়

শ্রেণী

সঞ্চয়শীল বিবরণ পত্র

সাধারণ ববরণ

ছাত্রের নাম (আগে পদবী)···············ছাত্র/ছাত্রী·····························
জন্ম তারিখ···
পিতা/অভিভাবকের নাম···
ঠিকানা···
বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা···
···

ভর্তি বহির নম্বর··············· তারিখ························
বিদ্যালয় পরিবর্তন··
···

ভর্তি বহির নম্বর························· তারিখ···············

(প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বৎসরের শেষে একবার মাত্র বিবরণের উল্লেখ করিতে হইবে)

১। স্বাস্থ্যের বিবরণ (Health Record)

বৎসর	সাধারণ স্বাস্থ্যের মান			শারীরিক বিকৃতি	গুরুতর অসুস্থতা	বিশেষ মন্তব্য
	ভাল	সাধারণ	খারাপ			
১৯৬···						
১৯৬···						
১৯৬···						

২। দায়িত্বশীল পদ ও পুরস্কার প্রভৃতি

Position of responsibility held in school and awards etc. obtained

১৯৬...	
১৯৬...	
১৯৬...	

৩। আগ্রহ (Interest)

বিভিন্ন শ্রেণী	১৯৬...			১৯৬...			১৯৬...		
	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ	উল্লেখযোগ্য	সাধারণ	মন্দ
ক) ভাষাগত									
খ) বিজ্ঞান সম্পর্কিত									
গ) যান্ত্রিক									
ঘ) শিল্পকলা সম্পর্কিত									
ঙ) সঙ্গীত সম্বন্ধীয়									
চ) কৃষি সম্বন্ধীয়									
ছ) বাণিজ্যিক									
ঝ) গৃহকার্য এবং ব্যবস্থাপনা									

৪। বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব (School Achivement)

		১৯৬...			১৯৬...			১৯৬...		
বিভাগ	বিষয় সমূহ	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরিক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব	স্থান	মন্তব্য	সাপ্তাহিক ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের গড় হিসাব	স্থান	মন্তব্য
ভাষা										
সাহিত্য										
অঙ্ক										
সমাজ-বিদ্যা										
বিজ্ঞান										
কলা										
কারুশিল্প										
সঙ্গীত										
শরীর বিদ্যা										
কার্যকরী										
অন্যান্য বিষয়										

৫। সহ-কার্যসূচীর কর্মাঙ্গ (Co-Curricular Activities)

বিভাগ	১৯৬…			১৯৬…			১৯৬…		
	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে	সাধারণের উপরে	সাধারণ	সাধারণের নীচে
ক) খেলাধূলা									
খ) বুদ্ধিগত ও সাহিত্য সম্পর্কিত									
গ) প্রমোদজনক									
ঘ) সমাজ সেবা									
ঙ) অন্যান্য (এন, সি, সি, স্কাউট ইত্যাদি									

৬। ব্যাক্তিত্ব (Personality)

বৃত্তি	১৯৬…			১৯৬…			১৯৬…		
	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে	গড়ের উর্দ্ধে	সাধারণ	গড়ের নীচে
ক) উদ্যোগ									
খ) শ্রম শীলতা									
গ) দায়িত্ব									
ঘ) সহযোগিতা									
ঙ) আবেগগত সাম্য									
চ) আত্মবিশ্বাস									
ছ) কাজে স্বভাব									

৭। অন্যান্য বিবরণ (Other Information)

১। যদি আচরণগত সমস্যা থাকে, তবে তাহা উল্লেখ করুন ঃ

(১৯৬...)..

(১৯৬...)..

(১৯৬...)..

২। যদি ছাত্রের উল্লেখযোগ্য কোনও ক্ষমতা বা অক্ষমতা থাকে তাহার উল্লেখ করুন ঃ

Year	SKill	Disability
১৯৬...		
১৯৬...		
১৯৬...		

৩। ছাত্রের কোন বিভাগে সুপারিশ করেন ঃ সাধারণ/বৈজ্ঞানিক/যান্ত্রিক

৪। আপনার মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন ... ...

... ...

৫। কোন্ ধরনের বৃত্তি ছাত্রের পক্ষে উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন

... ...

৬। সংক্ষেপে এই মনোনয়নের কারণ নির্দেশ করুন ..

.. ..

৭। ছাত্রের প্রতি নির্দেশদানের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন মনে করেন ...

১৯৬...১৯৬ · ১৯৬

প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষয়ত্রীর স্বাক্ষর

———

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ ॥ কুইক প্রিন্টিং সার্ভিস ॥ কলিকাতা ৯